GIFT

নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবী (স:)-এর শিক্ষা দর্শন ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীর অবদান

Dhaka University Library
466267

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

466267

গবেষক

রাশিদা আখন্দ
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
DIGITIZED

পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রাশিদা আখন্দ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **"নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবী (স.)-এর শিক্ষাদর্শন ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীর অবদান"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানামতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতোপূর্বে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পাণ্ডুলিপিটি পড়েছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

(ড. আ.ন.ম রইছউদ্দিন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

466267

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবী (স.)-এর শিক্ষাদর্শন ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীর অবদান"** অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণা পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

রাশিদা ২/৭/১৬

রাশিদা আখন্দ
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

466267

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

আ.	=	আরবী
আ.	=	আলাইহিস সালাম
আ.	=	আব্দুল
ইং	=	ইংরেজি
উঃ	=	উত্তর
খৃ.	=	খৃষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দে
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দে
খ্রি.	=	খ্রিষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দে
খৃ. পূ	=	খৃষ্টপূর্ব
জ.	=	জন্ম
দ.	=	দক্ষিণ
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর (পিএইচ.ডি)
প.	=	পশ্চিম
পুন.	=	পুনরায়
পুন. পুন	=	বারবার
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
বাং	=	বাংলা
মৃ	=	মৃত, মৃত্যু
মাও.	=	মাওলানা
রহ.	=	রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
রেজি.	=	রেজিষ্টার্ড
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু
স./সা.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
হি.	=	হিজরী
A.H	=	হিজরী সন
A.D	=	খ্রীষ্টাব্দ
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ/অনুদিত
সম্পা.	=	সম্পাদনা/সম্পাদিত
তা.বি.	=	তারিখবিহীন
বি.দ্র.	=	বিস্তারিত/বিশেষ দ্রষ্টব্য
P.	=	Page
Opcit	=	Open Cito.
Ed.	=	Edition/Editor/Edited.
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangal
Ibid	=	(Ibidem) in the same place, from the same source.
Vol	=	Volume

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)। অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যা-কুসংস্কার ও সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে সত্য, ন্যায় ও সাম্য মৈত্রীর বার্তা নিয়ে আরবের বুকে আগমণ করেন। অন্ধকার দূর করে বিদ্যাচর্চা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ দূরীকরণে জ্ঞানের অন্বেষণকে তিনি মহিমান্বিত করেছেন। মানব কল্যাণের মহান ব্রত নিয়ে তিনি পৃথিবীতে আগমণ করেছিলেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নে তিনি শিক্ষা ও জ্ঞানবৃত্তির দ্রষ্টা হিসেবে সর্বশীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিজ্ঞানভিত্তিক বহুবিধ কর্মসূচি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেন তিনি। শিক্ষা কর্মসূচিকে সফল করতে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষানীতি ও দর্শন প্রয়োগ করেন। অক্ষর জ্ঞানহীন হয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণে, প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত না হয়েও শিক্ষক হওয়ায় বিশ্বনবী (স.) এই অসাধারণ ও বিস্ময়কর ভূমিকা পৃথিবীর জ্ঞানজগতকে আলোড়িত করে তোলে।

নিরক্ষরতার অমানিশা দূর করতে তিনি কেবল জাতিকে অক্ষরজ্ঞানই দেননি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ, শিক্ষাকর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান প্রমাণ করে তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গবেষক এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাঁর গৃহীত নীতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদর্শন। আরবের তমসাচ্ছন্ন জাতিকে জ্ঞানের আলোয় বিকশিত করতে রাসূল (স.) যে বৈপ্লবিক শিক্ষাকর্মসূচি গৃহণ করেছিলেন তা ছিল অতুলনীয়। রাসূল (স.) এর শিক্ষাদর্শন ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত। নির্দিষ্ট কোন বয়স বা পেশার লোক বাছাই না করে তিনি সকল শ্রেণির জন্য উন্মুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

তিনি নিজে শিক্ষকসুলভ আচরণের মাধ্যমে আরবদের মাঝে লুকায়িত সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার কর্মসূচিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে (৬২৪ খ্রি.) প্রতিপক্ষের বন্দিদেরকে নিরক্ষর মুসলিমকে অক্ষর জ্ঞান দানের বিনিময় ব্যবস্থাকে মুক্তিপণ গণ্য করে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণে নিজেকে তিনি একজন উদ্যমী ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন।

মহানবী (স.) নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে শিক্ষা অনুপ্রেরণার পাশাপাশি কিছু বাস্তবমুখী ফলপ্রসূ কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। ব্যক্তির মাঝে শিক্ষানুরাগ সৃষ্টি ও সমাজে শিক্ষা অনুরাগী তৈরি করতে তিনি ইসলামের শিক্ষাদর্শন অনুসরণের তাগিদ দেন। তাঁর শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষা প্রেরণা পরিণত হয় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর আরব্য মরুভূমি পরিণত হয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে 'দারুল আরকাম' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন তিনি নিজেই। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটিই ইতিহাসের সর্বপ্রথম শিক্ষালয়। এভাবে মদিনার আবু উসামা বিন যুবায়ের (রা.) বাড়িতে একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) কে রাসূল (স.) এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। রাসূল (স.) দেয়া শিক্ষানীতি ও দর্শনের ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। হিজরতের পর প্রচুর সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষিত হলে তাদেরকে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-দক্ষতায় পারদর্শী করে তোলা হয়। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত এটিই সর্বপ্রথম শিক্ষালয়। মদিনায় দ্বিতীয় শিক্ষালয়টি হচ্ছে হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) এর ব্যক্তিগত বাসভবন। আনসারীর (রা.) এই ভবনে রাসূল (স.) এভাবে আলোকিত মানুষকে নিয়ে আলোকিত সমাজ গড়ার দৃপ্ত শপথ নেন।

নারীর বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে রাসূল (স.) গুরুত্বের সাথে সাথে পৃষ্ঠপোষকতাও দিতেন। কেননা তিনি মনে করতেন, চিন্তাশক্তির উন্নয়ন ও অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে নবতর তত্ত্ব উদঘাটনে নারীদের অংশগ্রহণ জরুরি। নারীকে শিক্ষাবঞ্চিত রেখে যেমন আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় তেমনি শিক্ষিত জাতি গড়তে কিংবা পারিবারিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতেও নারীদের শিক্ষাকার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করা অনস্বীকার্য। বিশ্বনবী (স.) এর শিক্ষাদর্শনে তিনি এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। নারীদের তিনি সরাসরি শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে 'একদা নবী (স.) হযরত বেলাল (রা.) কে নিয়ে বের হলেন। তিনি ধারণা করলেন, রাসূল (স.) পুরুষদের শিক্ষা দিতে গিয়ে পিছনের সারিতে বসা নারীদের কথা শুনতে পারছেন না। তখন তিনি নারীদের কাছে গিয়ে জ্ঞান ও উপদেশ শোনালেন।' নবী (স.) নারীদেরকে চিন্তা চেতনায় ও শিক্ষা গবেষণায় দক্ষ করার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুধু নারীদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতেন। হাদীসে এসেছে: 'নারী সম্প্রদায় রাসূলের (স.) কাছে এই মর্মে অভিযোগ করলেন যে, আপনার কাছে শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে পুরুষরা এগিয়ে। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন বরাদ্দ করুন। রাসূল (স.) ওয়াদাবদ্ধ হলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন।' শিক্ষা বৈঠকে কোন নারী তাঁর কোন বক্তব্য বুঝতে বা শুনতে না পারলে রাসূল (স.) তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বুঝাতেন, প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করতেন। ফলে খুব কম সময়ের ব্যবধানে নারীরা নিরক্ষরতামুক্ত হয়ে শিক্ষা-গবেষণায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে আরবে মাত্র সতের জন লোক লেখাপড়া জানত। এর মধ্যে পাঁচ জনই ছিল নারী। বিশ্বনবীর (স.) সহধর্মীনী হযরত আয়িশা (রা.) সহ অনেকেই নারী শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারীর ব্যক্তিসত্ত্বার পরিচর্যা, আত্মিক উন্নয়ন ও নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য নবী (স.) পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দিতেন।

মধ্যযুগে বাংলার সুলতানগণ তাঁদের ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালন করার জন্য প্রাথমিক ও উচ্চতর সব রকম শিক্ষা বিস্তারেই উৎসাহ প্রদান করতেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি নারীগণও অবদান রাখেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শুধু মুসলমান সম্প্রদায় নারী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক বিচার্য বিষয় সমূহে অবদান রাখেন। নারীরাও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হাতে কলম তুলে নেন এবং শিক্ষার উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে যার নাম স্মরণযোগ্য তিনি হচ্ছেন নারী শিক্ষার প্রবর্তক ও কবি জমিদার নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী (১৮৩৪-১৯০৩)। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন পশ্চিমগাঁও গ্রামের জমিদার আহমদ আলী চৌধুরীর কন্যা। তৎকালীন মুসলমানদের কঠিন পর্দাপ্রথার মধ্যে থেকেও ফয়জুন্নেসা আরবী, ফারসী ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়ও বুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯৭৩ সালে নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বিংশ শতকের পূর্বে এ ধরণের স্কুলে মুসলমান মেয়েরা যোগদান করেনি। তিনি অনেক জনহিতকর কাজের জন্য মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে ১৮৮৯ সালে নওয়াব উপাধি লাভ করেন। সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর পরিচয় রয়েছে। গদ্যে-পদ্যে রচিত তাঁর রূপজালাল ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সঙ্গীতসার ও সঙ্গীতলহরী নামে তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এমন সময় শুরু করেন যখন অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে এই ভাষা সাধারণত ব্যবহৃত হত না। তিনি ১৯০৩ সালে ইন্তেকাল করেন।

নওয়াব ফয়জুন্নেসার পরে যার নাম প্রাতঃস্মরণীয় তিনি হলেন বাংলাদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত ও নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। মুসলমান বালিকাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের যাত্রা শুরু করেন। ১৯১১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল মহিলাদের জন্য স্থাপিত প্রথম বিদ্যালয়। প্রথম দিকে কেবল বাঙালি ছাত্রীরা এ স্কুলে আসত। বেগম রোকেয়ার অনুপ্রেরণায় বাঙালি মেয়েরাও পড়াশোনায় যোগ দেয়। ছাত্রীদের পর্দার ভেতর দিয়েই ঘোড়ার গাড়ীতে করে স্কুলে নিয়ে আসতেন। এ স্কুলে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, সেলাই ও সঙ্গীত চর্চার সাথে সাথে কুরআন-তাফসীরের বিষয়ও শিক্ষা দেয়া হত।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন সমাজে তাঁর ব্যতিক্রমী প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। সমকালীন সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, আল-ইসলাম, নওরেজ ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। এছাড়াও ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নারীজাগরণমূলক নানা রচনা বিদ্যমান। পর্দা ও অবগুণ্ঠনের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কেও বেগম রোকেয়া অবগত ছিলেন এবং এগুলো সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন রচনায় আলোচনা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ১৯২৯ সালে ধারাবাহিকভাবে কৌতুকপূর্ণ রচনা সংকলন 'অবরোধবাসিনী'। তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতেই ধর্মীয় বিধানের অপব্যবহারের কথা, সে যুগের নারীদের শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবরুদ্ধতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মুসলিম নারীদের মাঝে কাজ করার জন্য ১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়া 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম' শুরু করেন। এমনকি তাঁর রচনায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও তাঁর বিভিন্ন মাত্রিকতার বিশ্লেষণে তাঁর গভীর আন্তদৃষ্টি এবং সংস্কারমূলক আধুনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মুক্তচিন্তা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শাণিত লেখনীর মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ শতকের একজন বিরল নারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ১৯৩২ সালে ইন্তে কাল করেন।

এছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে এদেশের যেসব নারীর নাম স্মারণীয় তাঁদের মধ্যে নূরুন্নেসা খাতুন (১৮৯২-১৯৭৫), জোবেদা খাতুন চৌধুরী (১৯০১-১৯৮৬), শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪), মাহযুযা হক (১৯১৪-১৯৯৬), অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী (১৯১২-২০০৭), আনোয়ারা মনসুর (১৯২৩-২০০৭), নূরজাহান বেগম (জন্ম-১৯২৫) অন্যতম।

সুতরাং বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সুন্দর অবয়বে ফুটিয়ে তোলার জন্য মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে প্রথম অধ্যায়ে-নিরক্ষরতার স্বরূপ, পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য এবং মানবজীবনে এর প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে-ইসলামের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে-নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবী (স.)-এর শিক্ষাদর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক গতিশীলতা আলোচনা করতে গিয়ে মহানবী (স.)-এর শিক্ষাদর্শন পরিচিতি, তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার পরিধি ও কাঠামো, তাঁর শিক্ষাদর্শনের ব্যাপকতা ও প্রগতিশীলতা, তাঁর শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য, তাঁর শিক্ষাদর্শনের উৎস পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে-মহানবী (স.)-এর শিক্ষাব্যবস্থায় নারী সমাজের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে-বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষাবিস্তারের ধারা ও নারী সমাজ (১২০৪-১৭৬৫) অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে-বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও ইসলামী শিক্ষার অবস্থা এবং মুসলিম নারী শিক্ষার বিকাশ পর্যালোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে-বাংলাদেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নে কয়েকজন মহীয়ষী মুসলিম নারীর অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে উপসংহার ও সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

যে সকল প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন আমাকে এ কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

রাশিদা আখন্দ
পিএইচ.ডি গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়:	**নিরক্ষরতার স্বরূপ, পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য এবং মানবজীবনে এর প্রভাব:**	(১১-৩৬)
	* নিরক্ষরতার স্বরূপ ও পরিচিতি	১২
	* নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থা................................	১৪
	* নিরক্ষরতার কারণ ও বৈশিষ্ট্য.............................	২৩
	* মানব সমাজে নিরক্ষরতার প্রভাব.........................	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়:	**ইসলামের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ব্যাপকতা:**	(৩৭-৭০)
	* শিক্ষা কি ও কেন ?..	৩৮
	* ইসলাম ও শিক্ষা	৪২
	* ইসলামের জ্ঞান ও শিক্ষার অবস্থানগত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ.	৫৮
	* ইসলামের শিক্ষাবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা..........	৬৫
তৃতীয় অধ্যায়:	**নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবী (স.) এর শিক্ষাদর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক গতিশীলতা :**	(৭১-১৩৪)
	* সূচনা বক্তব্য	৭২
	* মহানবী (স.) এর শিক্ষাদর্শন পরিচিতি.................	৭৩
	*তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার পরিধি ও কাঠামো....................	৭৪
	* তাঁর শিক্ষাদর্শনের ব্যাপকতা ও প্রগতিশীলতা..........	৭৬
	* তাঁর শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য......................	৮০
	* তাঁর শিক্ষাদর্শনের উৎস....................................	৮৭
	* নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক গতিশীলতার বিকাশে মহানবীর (স.) অবদান....................................	১০৯
	* খুলাফা-ই-রাশিদার যুগ.....................................	১২৪
	* উমাইয়া যুগ..	১৩০
	* আব্বাসীয় যুগ..	১৩১
চতুর্থ অধ্যায়:	**মহানবী (স.) এর শিক্ষাব্যবস্থায় নারী সমাজের অবস্থান:**	(১৩৪-১৫০)
	* ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ...........................	১৩৬
	* নারী শিক্ষায় মহানবী (স.)................................	১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়:	**বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষাবিস্তারের ধারা ও নারী সমাজ (১২০৪-১৭৬৫):**	(১৫১-২০৯)
	* বাংলাদেশের ইসলামের আবির্ভাব...........................	১৫২
	* বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ গঠন...........................	১৬৫
	* শিক্ষার বিকাশ..	১৭৭
	* শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি..	১৮১
	* শিক্ষা ব্যবস্থা..	১৮৫
	* মুগল যুগে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা............................	১৯৫
	* শিক্ষার স্তর..	১৯৫
	* শিক্ষা ক্যারিকুলাম..	
	* বিদ্যালয়ের শ্রেণি-বিন্যাস....................................	
	* শিক্ষার মাধ্যম..	
	* ব্যবস্থাপনা...	
	* পরীক্ষা পদ্ধতি..	
	* সামাজিক মর্যাদা...	
	* মুগল যুগে নারী শিক্ষা.......................................	
ষষ্ঠ অধ্যায়:	**বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী শিক্ষার অবস্থা এবং মুসলিম নারী শিক্ষার বিকাশ:**	(২১০-২৩১)
	* প্রতিপাদ্য সার..	২১১
	* বৃটিশ শাসনামলে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের ইসলামী শিক্ষা নীতি:	২১২
	* ইংরেজি বিরোধিতার অবসান................................	২১৯
	* নারী শিক্ষার বিকাশ ও মুসলিম নারী সমাজ...............	২২০
	* মিশনারীদের উদ্যোগে নারী শিক্ষার সূচনা.................	২২১
	* অন্তঃপুর নারীশিক্ষা: মুসলিমদের উদ্যোগ.................	২২৭
সপ্তম অধ্যায়:	**বাংলাদেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নে কয়েকজন মহীয়ষী মুসলিম নারীর অবদান:**	(২৩২-৩২৮)
	* বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন..........................	২৩৩
	* নূরন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী.............................	২৭৪
	* এস. ফাতেমা খানম..	২৮০
	* দৌলতননেসা খাতুন..	২৮৪
	* জোবেদা খানম..	২৯২
	* সুফিয়া কামাল..	২৯৯
	* নীলিমা ইব্রাহীম...	৩০৬
	* রাবেয়া খাতুন..	৩১৩
	* বদরুন্নেসা আহমদ...	৩১৯
	* মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা......................................	৩১৯
	* শামসুন নাহার মাহমুদ......................................	৩২০

	* ডা. জোহরা বেগম কাজী.....................................	৩২১
	* বেগম সারা তৈফুর...	৩২৩
	* আকিকুন্নেসা আহমদ..	৩২৩
	* জেব-উন-নেসা জামাল..	৩২৪
	* সৈয়দা মোতাহেরা বানু..	৩২৪
	* আখতার মহল সাইদা খাতুন..................................	৩২৫
	* ড. মালিহা খাতুন...	৩২৫
	* মাহমুদা খাতুন...	৩২৬
	* রোমেনা আফাজ..	৩২৬
	* মিসেস. রাজিয়া মজিদ..	৩২৬
	* কবি আজিজা এন মোহাম্মদ.................................	৩২৭
	* খোদেজা খাতুন...	৩২৭
	* ফজিলাতুন নেসা..	৩২৮
	উপসংহার..	(৩২৯-৩৩৩)
	গ্রন্থপঞ্জি...	(৩৩৪-৩৪১)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নিরক্ষরতার স্বরূপ, পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য এবং মানবজীবনে এর প্রভাব

* নিরক্ষরতার স্বরূপ ও পরিচিতি
* নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থা
* নিরক্ষরতার কারণ ও বৈশিষ্ট্য
* মানব সমাজে নিরক্ষরতার প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

নিরক্ষরতার স্বরূপ ও পরিচিতি:

নিরক্ষরতা মানবজাতির একটি অভিশাপ। তথাপি বিশ্বের প্রায় এক'শ কোটি লোক নিরক্ষর।[১] এই নিরক্ষর লোকদের অধিকাংশ বাস করে উন্নয়নশীল বিশ্বে, বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে।[২] শিক্ষাকে বলা হয় "Fundamental right of every Individual'' শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার।[৩] শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। যে কোন সমাজেই নিরক্ষরতা জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বাধাস্বরূপ। "UNESCO'' এর মতে "The burden of Illiteracy is further compounded by problems of geographic isolation, linguistic diversity, malnutrition, overpopulation, social and ethnic tension."[৪]

বিভিন্ন অনুসন্ধানে একথা প্রমাণিত সত্য যে, শিক্ষিত লোকেরা অধিক উৎপাদন ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিরক্ষর লোকদের চেয়ে বেশী অবদান রাখতে সক্ষম। নিরক্ষরতাকে সকল বিবেচনায় মানব জাতির জন্য অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

'নিরক্ষরতা' শব্দটি আভিধানিক অর্থে অক্ষরজ্ঞানহীনতা, অশিক্ষিত, লিখতে পড়তে জানে না ইত্যাদি অবস্থাকে বুঝায়। নিরক্ষরতার আরবী প্রতিশব্দ..... যারা লিখতে এবং পড়তে না পারা। ইংরেজিতে Illiteracy. যার অর্থ- Unable to reading, writing, not knowing how to read or write. মানুষের অনক্ষর থাকার বিশেষ অবস্থাই হলো নিরক্ষরতা।[৫] নিরক্ষরতার বিপরীত অবস্থা হলো সাক্ষরতা, লিখতে বা পড়তে পারা ইত্যাদি।

সাক্ষরতা আধুনিক ধারণা অনুযায়ী নিরক্ষরতা বলা হয় মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও দৈনন্দিন হিসাব করতে এবং তা লিখে রাখতে না পারার যোগ্যতাকে। যিনি তা না পারেন তাকে নিরক্ষর বলা হয়। মাতৃভাষায় লেখা পড়ে বুঝতে না পারা, মাতৃভাষায় কথা শুনে পুরোপুরি বুঝতে না পারা এবং দৈনন্দিন হিসাব মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে করতে না পারার অবস্থাও নিরক্ষরতা হিসেবে গণ্য হয়। তার এ অবস্থাই নিরক্ষরতা। নিরক্ষরতা মানে অশিক্ষা নয়। একজন নিরক্ষর মানুষ লিখতে পড়তে না জানলেও তিনি অশিক্ষিত নন। যেমনঃ বাংলাদেশের অনেক কৃষক নিরক্ষর। কিন্তু কিভাবে কৃষিকাজ করতে হবে তা তারা জানেন। তিনি এই শিক্ষা পেয়েছেন পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে। তাই তার মধ্যে নিরক্ষরতা আছে। কারণ তার সাথে এখনও অক্ষর জগতের পরিচয় হয়নি। কিন্তু তিনি তার পেশায় একজন স্বশিক্ষিত মানুষ।

---

১. ডা. সুলতান আহমদ, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও আমাদের করণীয়, দৈনিক সংগ্রাম, ১০ সেপ্টেম্বর/২০০৭ইং, পৃ.৯

২. "UNESCO বার্ষিক প্রতিবেদন" ১৯৮৮ইং এর তথ্যানুযায়ী আফ্রিকার ৫৪% (১৯৮৫) বয়স্ক লোক নিরক্ষর, এ সংখ্যা ভারতে ৬০% (১৯৮১) এবং বাংলাদেশে ৭০% (১৯৮১) এদের অধিকাংশই মহিলা এবং দরিদ্র মানুষ। (www.@sil.org)

৩. "UNESCO, 1948, Article 26.1 উল্লেখ আছে, In 1948, The United Nations Education, Scientific and cultural Organization (UNESCO) recognized educator, as a "Fundamental right of every individual''. [www.@sil.org]

৪. প্রাগুক্ত, www.@sil.org.

৫. বাংলায় নিরক্ষর অর্থ যার বর্ণ বা অক্ষর জ্ঞান নেই, সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। (নরেন বিশ্বাস, বাঙলা উচ্চারণ অভিধান, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯) পৃ.৪৩৪।

SAMSAD ENGLISH-BENGALI Dictionary তে Illiteracy 'ৱ' অর্থ করা হয়েছে। Ignorant of Letters, নিরক্ষর Uneducated, অশিক্ষিত, Unable to read, পড়তে জানে, বা পঠনক্ষম ব্যক্তি (Salendra Biswas, Samsad English-Bengali Dictionary) (Culcutta, India, Satbia Samsad 41th Impression 1996), P. 533

Oxford Dictionary তে Illiteracy এর অর্থ: Not Knowing how to read or write, not knowing very much about a particular subject area: Computer Illiteracy. (As Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, (London: Oxford University Press, Edition-2005), P. 674

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষরতা ও নিরক্ষরতা সংজ্ঞা নির্ধারণে গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং সাক্ষরতা ও নিরক্ষরতা নিয়ে কাজ করেন এমন পেশাদার ব্যক্তিবর্গদের মাঝে রয়েছে মতপার্থক্য। আবার যুগ, সমাজ আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সাক্ষরতার সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘটেছে। এডুকেশন ওয়াচ-২০০২ এর প্রতিবেদনে সাক্ষরতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: সাক্ষরতা হল পরিচিত বিষয় ও প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পড়তে ও লিখতে পারার দক্ষতা ও গাণিতিক দক্ষতা অর্জন এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখতে দৈনন্দিন জীবনে এই দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা।

একজন সাক্ষর ব্যক্তির পড়া, লেখা ও গণনা এই তিন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকবে। সাথে সাথে তিনি এসব দক্ষতাকে প্রতিদিনের কাজে এমনভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন যেন তিনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারেন। ফলে তিনি নিজের শিখন প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখতে পারবেন।[১]

বিগত ৫০ বছরে সাক্ষরতার ধারণার মৌলিক বিবর্তন ঘটেছে। পড়তে পারা বা লিখতে পারাকে এক সময় মনে করা হত সাক্ষরতার জন্য যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে যুক্ত হলো সংখ্যাজ্ঞান বা সাধারণ অংক কষার দক্ষতা, ষাট ও সত্তরের দশকে, অর্থাৎ যখন থেকে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বা জাতীয় উন্নয়নে সাক্ষরতার উপর গুরুত্বারোপ করতে শুরু করলেন, তখন থেকে কার্যকর সাক্ষরতা ধারণার উদ্ভব হলো, ১৯৭৮ সালে United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganization (UNESCO)-র সাধারণ সভায় কার্যকর সাক্ষরতার যে সংজ্ঞা গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ:

ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কার্যকর অংশ নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লিখতে পারা, পড়তে পারা ও গণনার দক্ষতা, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজজীবন উন্নততর হয়, তাই হলো কার্যকর সাক্ষরতা।[২]

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি বর্তমানেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যদিও আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষরতা ধারণায় একাধিক ভাষা বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির ভাষায় দক্ষতা অর্জনের উপর নতুন করে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

সাক্ষরতার স্তরভেদ:

সাক্ষরতাকে মোটামুটি নিম্নোক্ত ৪টি স্তরে ভাগ করা যায়।

(১) অ-সাক্ষর: বর্ণ ও শব্দ পড়তে ও লিখতে পারা, গণনা করতে না পারা এবং এ কারণে এ দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে না পারা।

(২) প্রাক্-সাক্ষর: কিছু শব্দ পড়তে ও লিখতে পারা, ন্যূনতম গণনার দক্ষতা অর্জন এবং দৈনন্দিন জীবনে এ দক্ষতাগুলোকে খুবই সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা

---

১. মনজুর আহমদ ও অন্যান্য, এ্যাডুকেশন ওয়াচ ২০০০ বাংলাদেশে সাক্ষরতা প্রয়োজন নতুন ভাবনার, (ঢাকা: গণসাক্ষরতা অভিযান, প্রথম প্রকাশ ২০০৩ইং) পৃ.১২

২. ড. মোহাম্মদ মাসুম, জীবনের জন্য সাক্ষরতা, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ.৭

Dhaka University Institutional Repository

(৩) **প্রারম্ভিক স্তরে স্বাক্ষর :** পরিচিত বিষয়াবলি সম্পর্কিত সহজ বাক্যসমূহ পড়তে ও লিখতে পারা, পাটিগণিতের চার মৌলিক নিয়মে (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) অংক কষতে পারা এবং প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত পরিবেশে এ দক্ষতা ও যোগ্যতাগুলো সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা।

(৪) **উচ্চতর স্বাক্ষর:** বিচিত্র বিষয়াবলি সম্পর্কিত লেখা সাবলীলভাবে পড়তে পারা, এ ধরণের বিষয়াবলি সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দে লিখতে পারা, পাটিগণিতের মৌখিক চার নিয়মে দক্ষতা লাভসহ গাণিতিক কার্যকারণ বুঝতে পারা, প্রাত্যহিক জীবনে এ দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা এবং অধিকতর শিক্ষা গ্রহণকল্পে সামগ্রিক স্বাক্ষরতা দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

স্বাক্ষরতা বলতে এখন যেহেতু বোধগম্যতার সঙ্গে মাতৃভাষায় একটা অনুচ্ছেদ লিখতে ও দৈনন্দিন হিসাব রাখতে সক্ষম ব্যক্তিকে বোঝায়, সেহেতু নাম স্বাক্ষর করতে পারা বা না বুঝে পড়তে পারা বা মুখস্ত বলতে পারার দক্ষতা থাকলেও সে নিরক্ষর হিসেবে গণ্য হয়।[১] এ নিরক্ষরতা যখন কোন স্থানে, অঞ্চলে বা দেশজুড়ে এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে দেখা যায় যখন তখন তাকে গণ্য নিরক্ষরতা বলো।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থাঃ

নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমাজের যে কোন বয়সের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষর করে তোলার উদ্দেশ্যে গৃহীত একটি সামাজিক আন্দোলন। আধুনিক যুগে খ্রিষ্টিয় ১৯৬০-এর দশকে জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে ও জনসম্পদে রূপান্তরিত করার অন্যতম পন্থা হিসেবে শিক্ষাকে গণ্য করার পর সারা বিশ্বে বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশে এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এর আওতায় রয়েছে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ দু'টো শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক স্বাক্ষরতা কার্যক্রম, উৎপাদন ও আয়মুখি প্রশিক্ষণ, চাহিদাভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা, সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় স্বাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা রয়েছে।[২]

বয়স্ক শিক্ষাঃ

নিরক্ষরতা দূরীকরণের বয়স্ক শিক্ষা কথাটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যক্তি বয়স্ক বলা হয় যাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স পার হয়ে গিয়েছে। সাধারণত ১১ বছর বা তদুর্ধো ব্যক্তিদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়স্ক বলা হয়। আর তাদের জন্য পরিচালিত বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বয়স্ক শিক্ষা বলে।

১৯৭৩ সালে বয়স্ক শিক্ষা উপলক্ষে প্রকাশিত 'বয়স্ক শিক্ষা' গ্রন্থের বয়স্ক শিক্ষার পরিচয় নিম্নোক্তভাবে দেয়া হয়েছে।

"বয়স্ক শিক্ষার সংজ্ঞায় শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, বয়স্কদের জন্য যে শিক্ষা তাই বয়স্ক শিক্ষা। উন্নত দেশসমূহে বয়স্কশিক্ষা নতুনরূপ পরিগ্রহ করেছে। উহা শিক্ষিতের জন্য আরও শিক্ষা,

---

১. শফিউল আলম, মমতাজ জাহান ও অন্যান্য সম্পাদিত, শিক্ষা কোষ, (ঢাকা: সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোং অপারেশন (এসডিসি), কানপানিয়ান অব এডুকেশন প্রজেক্ট, ২০০৩) পৃ. ২০৬-২০৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

চলতি শিক্ষা, উচ্চমানের শিক্ষা। আর উন্নয়নগামী ও অনুন্নত দেশে যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা শিক্ষিতের তিন, চার, পাঁচগুণ, সেখানে বয়স্ক শিক্ষা স্বাক্ষর শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। উন্নত দেশসমূহে বয়স্ক শিক্ষা এখনও সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সাধারণ শিক্ষার মত সমগুরুত্বপূর্ণ। আর অনুন্নত দেশে উহা প্রান্তিক পর্যায়ে। শিক্ষা সূচিতে নিতান্তই ক্ষুদ্রতম অংশ অনেকটা অবহেলিত।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং কার্যকর। স্বাধীনতা উত্তরকালে কুমিল্লাতে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, যে সকল বাব-মা বয়স্ক কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে শিক্ষা লাভ করেছে তারা তাদের সন্তানদের লেখা-পড়ার ব্যাপারে নিরক্ষর বাবা-মা'র চেয়ে সজাগ, সচেতন এবং যত্নবান। বিশেষ করে যে সকল মায়েরা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র থেকে সনদ লাভ করেছে তারা পরিবারকে শিক্ষিত করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বয়স্ক শিক্ষা তাই সর্বোতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক।[২] এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল :

১। বয়স্ক শিক্ষা শিক্ষিতের জন্য উচ্চশিক্ষা, অল্প শিক্ষিতের জন্য আরও জানার শিক্ষা, আর নিরক্ষরের জন্য স্বাক্ষরতা।

২। বয়স্ক শিক্ষা স্বাক্ষরতাকে সঞ্জীবিত করে এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে।

৩। বয়স্ক শিক্ষা ব্যক্তির আয় বাড়াতে সাহায্য করে। এ শিক্ষায় পেশাগত দক্ষতা অর্জন হয়।

৪। সুন্দর, সুখী, পরিকল্পিত, সমৃদ্ধ জীবন ও পরিবার গড়তে সাহায্য করে।

৫। বয়স্ক শিক্ষা, মানুষকে ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

৬। নিরক্ষরতা বিদ্যমান সমাজে মানুষের মৌলিক অধিকার ব্যহত হয়। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সকল দিক থেকে সচেতন হয়। ব্যক্তি তার মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে।

৭। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিরক্ষরতা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখে।

পরিশেষে বলা যায় সার্বজনীন বয়স্ক শিক্ষা নিরক্ষরতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বয়স্ক শিক্ষা সব বয়সের সব পেশার লোকদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার ফলাফল খুব সহজে তাড়াতাড়ি নগদ পাওয়া যায় যা অন্য পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বয়স্ক শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে তিনি ১৯৩৭ সালে কুমিল্লা জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: "শিশুদের মনে বীজ বপণ করলে ফল পাওয়া যায় পনের-বিশ বছর পর, আর বয়স্কদের মনে বীজ বপণ করলে ফল ধরবে আজই। তাই প্রাইমারী শিক্ষার আগে বয়স্ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত।"[৩] বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর এ মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

---

১. মুহিউদ্দীন আহমদ, বয়স্ক শিক্ষা, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং, ১৯৭৩), পৃ. ১৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯

Dhaka University Institutional Repository

গণশিক্ষা (Mass Education)'র স্বরূপ ও প্রকৃতি:

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গণশিক্ষা অত্যন্ত কার্যকরি পদক্ষেপ। গণ অর্থ সমূহ: সমষ্টি, দল, বর্গ শ্রেণি ইত্যাদি।[১] সুতরাং গণশিক্ষা অর্থ বয়স্ক ও পেশা নির্বিশেষে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত শিক্ষা।

গণশিক্ষার সংজ্ঞা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ আছে, "গণশিক্ষা" এক ধরণের অনানুষ্ঠানি শিক্ষা। দেশের আপামর জনসাধারণকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষিত বা স্বাক্ষর করে গড়ে তোলার জন্য এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। শিক্ষার হার বাড়ানোর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্যোগের পাশাপাশি এটি একটি বিকল্প এবং পরিপূরক উদ্যোগ।"[২]

সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সর্বস্তরে মানুষের জন্য পরিচালিত গণশিক্ষার গুরুত্ব ব্যাপক ও কার্যকর। মোটের উপর, শিক্ষা হল সভ্যতার বাহন। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কোন জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিয়ামক হল শিক্ষা। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন ও জীবনের সকল ক্ষেত্র ও বিভাগে নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। জাতিসংঘ কর্তৃক শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতি বছর জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নসূচক করে থাকে (Human Development Index) সূচক প্রধানত: শিক্ষার হার, মাথাপিছু আয় ও গড় আয়ুর ভিত্তিতে প্রণীত হয়। এ কথায় একটি জাতির উন্নয়ন অগ্রগতি সমৃদ্ধি নির্ভর করে ঐ জাতির শিক্ষার উপর। নিরক্ষর জাতি সকল দিক থেকেই থাকে পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর। এ নির্মম বাস্তবতা উপলব্ধি করে আধুনিক বিশ্বে নিরক্ষরতাকে এক নম্বর আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কর্মসূচি। জন্ম হয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার। এতকিছুর পরেও বিশ্বে নিরক্ষরতার মিছিল ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। সারাবিশ্বে আজ প্রায় ১২ কোটি শিশু ও ৮০ কোটি নিরক্ষর রয়েছে।[২৪] তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বে স্বাক্ষরতা হার নিম্নরূপ:
United Nations Development Programme Report 2007/2008
(সূত্র: www.nu.com/list coutries literacy rate)

ক্র: নং	মহাদেশ/অঞ্চল	দেশের নাম	মোট বয়স্ক শিক্ষার হার	মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়/GDP (মার্কিন ডলারে)	গড় আয়ু (বছর) মহিলা/পুরুষ	ধর্ম (সংখ্যা গরিষ্ঠ)
১.	এশিয়া-দক্ষিণ এশিয়া	বাংলাদেশ	৬২.৬৬%		৬৪.৯	মুসলিম ৮৮.৩%
২.	"	আফগানিস্তান	৩১.৫%	৬০০	৪৫.৮/৪৬.৯	মুসলিম ৮৪%
৩.	"	ভুটান	৫৪.০০%	৭৩০	৫১.৪/৫২.৪	বৌদ্ধ ৭৫%

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৯
২. মো: সিদ্দিকুর রহমান ও মো: শাওকাত ফারুক, শিক্ষা ব্যবস্থা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ.৫৫

Dhaka University Institutional Repository

নং			শিক্ষার হার	জাতীয় আয়/GDP (মার্কিন ডলারে)	(বছর) মহিলা/পুরুষ	
৪.	"	ভারত	৫৬.৫%	১,৫০০	৬০.৮/৫৯.৫	হিন্দু ৮০%
৫.	"	মালদ্বীপ	৯৬.২%	১,৫৬০	৬৮.৬/৬৫.২	মুসলিম
৬.	"	মায়ানমার	৮৪.৪%	১,০০০	৫৮.৫/৫৪.৯	বৌদ্ধ ৮৯%
৭.	"	নেপাল	৪০.৪%	১২,২০০	৫৪.৫/৫৩.৮	হিন্দু ৯০%
৮.	"	পাকিস্তান	৪৫.০০%	২,১০০	৫৯.৬/৫৮.০	মুসলিম ৭৭%
৯.	"	শ্রীলংকা	৯০.৭%	৩,৬০০	৭৫.৩/৭০.০	বৌদ্ধ ৬৯%
১০.	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া	ব্রুনেই	৯১%	১৫,৮০০	৭৩.২/৭০.০	মুসলিম ৬৩%
১১.	"	ইন্দোনেশিয়া	৮৬.৩%	৩,৫০০	৬৪.৩/৫৯.৯	মুসলিম ৮৭%
১২.	"	লাওস	৪৭.৩%	১,১০০	৫৪.৮/৫১.৬	বৌদ্ধ ৬০%
১৩.	"	মালয়েশিয়া	৮৭.০%	৯,৮০০	৭৩.২/৬৭.১	মুসলিম
১৪.	"	ফিলিপাইন	৯৫.১%	২৫,৩০০	৬৮/৬৫	খ্রিষ্টান, রোমান ক্যাথলিক ৮৩%
১৫.	"	সিঙ্গাপুর	৯২.১%	২২,৯০০	৮১.৭/৭৫.৩	বৌদ্ধ
১৬.	"	থাইল্যান্ড	৯২.৬%	৬,৯০০	৭২.৭/৬৫.১	বৌদ্ধ
১৭.	"	ভিয়েতনাম	৯০.৩%	১,৩০০	৬৯.৯/৬৫.০	বৌদ্ধ
১৮.	"	কম্বোডিয়া	৬৮.২%	৬৬০	৫১.৮/৪৮.৮	বৌদ্ধ ৯৫%
১৯.	"	পূর্বতিমুর	৫০.১%	৩২০	৪৯.০	খ্রিষ্টান
২০.	উত্তর পশ্চিম এশিয়া	কাজাকিস্তান	৯৯.০%	২,৭০০	৭০.১/৫৮.৭	মুসলিম
২১.	"	কিরগিজিস্তান	৯৭.০%	১,১৪০	৬৮.৯/৫৯.৩	মুসলিম
২২.	"	তাজিকিস্তান	৯৯.১%	১,০৪০	৬৮.৪/৬১.০	মুসলিম
২৩.	"	তুর্কমেনিস্তান	৯৮.০%	২,৮২০	৬৬.৭/৬৫.১	মুসলিম
২৪.	"	উজবেকিস্তান	৮৮.৫%	২৩৭০	৬৯.১/৬০.৬	মুসলিম
২৫.	দূরপ্রাচ্য	চীন	৮৩.৫%	২,৫০০	৭১/৬৮	বৌদ্ধ
২৬.	"	জাপান	৯৯%	২১,৩০০	৮২.৮/৭৬.৮	বৌদ্ধ
২৭.	"	উত্তর কোরিয়া	৯৫%	৯২০	৭৩.৯/৬৭.৫	বৌদ্ধ
২৮.	"	দক্ষিণ কোরিয়া	৯৭.৬%	১,৩০০	৭৭.৭/৭০.০	খ্রিষ্টান ৪৯%
২৯.	"	তাইওয়ান	৯৩.০%	১৩,৫১০	৭৯.১/৭৩.৭	বৌদ্ধ
৩০.	মধ্যপ্রাচ্য	বাহরাইন	৮৭.১%	১২,০০০	৭৭.২/৭২.১	মুসলিম ৭০%
৩১.	"	ইরান	৭৫.৭%	৩,০০০	৬৯.২/৬৬.৫	মুসলিম ৮৯%
৩২.	"	ইরাক	৫৮.০%	২,০০০	৬৮.৫/৬৬.৩	মুসলিম ৯২%

Dhaka University Institutional Repository

৩৩.	"	ইসরাইল	৯৫.৮%	১৫,৫০০	৮০.২/৭৬.৩	ইহুদী ৮২%
৩৪.	"	জর্ডান	৮৯.২%	৪,৭০০	৭৪.৭/৭০.৮	মুসলিম ৯২%
৩৫.	"	কুয়েত	৮১.৯%	১৭,০০০	৭৪.৭/৭০.৮	মুসলিম ৮৫%
৩৬.	"	লেবানন	৮৫.৬%	৪,৯০০	৭৩.০/৬৭.৮	মুসলিম ৭০%
৩৭.	"	মঙ্গোলিয়া	৬২.৩%	১,৯৭০	৬৩.২/৫৯.১	লামাপন্থী বৌদ্ধ
৩৮.	"	ওমান	৭০.৩%	১০,৮০০	৭২.৯/৬৮/.৮	মুসলিম ৭৫%
৩৯.	"	কাতার	৮০.৮%	২০,৮২০		মুসলিম ৯৫%
৪০.	"	সৌদিআরব	৭৬.১%	১০,১০০	৭১.৪/৬৭.৭	মুসলিম ১০০%
৪১.	"	সিরিয়া	৭৩.৬%	৫,৯০০	৬৮.৭/৬৬.২	মুসলিম ৭৪%
৪২.	"	ইয়েমেন	৪৫.২%	২,৫২০	৬১.৮/৫৮.৯	মুসলিম
৪৩.	"	সংযুক্ত আরব আমিরাত	৭৫.১%	১৭,৪০০	৭৬.২/৭৩.২	মুসলিম
৪৪.	"	তুরস্ক	৮৭.৪%	৫,৫০০	৭৪.৯/৭০.০	মুসলিম ৯৯.৮%
৪৫.	"	আরবেনিয়া	৮৪%	১,২১০	৭১.৬/৬৫.২	মুসলিম ৭০%
৪৬.	"	বেলারুশ	৯৯.৫%	৪,৭০০	৭৪.৩/৬৩.৫	অর্থোডক্স ৬০%
৪৭.	"	বসনিয়া-হার্জেগোভিনা	৯০%	৩০০	৬৪.৯/৫৫.৩	মুসলিম ৪০%
৪৮.	"	বুলগেরিয়া	৯৮.৩%	৪,৯২০	৭৫.৩/৬৭.২	অর্থোডক্স ৮৫%
৪৯.	"	ক্রোয়েশিয়া	৯৮.২%	৪,৩০০	৭৬.৯/৬৯.২	রোমান ক্যাথলিক ৭৬.৫%
৫০.	"	হাঙ্গেরি	৯৯.৩%	৭,০০০	৭৪.২/৬৪.৪	রোমান ক্যাথলিক ৭৬.৫%
৫১.	"	মেসিডোনিয়া	৯৪.০%	৮৮০	৭৪.৪/৭০.০	অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ৬৭.৫%
৫২.	"	পোল্যান্ড	৯৯.৭%	৫,৮০০	৭৬.৬/৬৮.১	রোমান ক্যাথলিক ৯৮%
৫৩.	"	রোমানিয়া	৯৮.০%	৪,৬০০	৭৯.৫/৫৭.২	রোমান অর্থোডক্স ৭০%
৫৪.	"	স্লোভেনিয়া	১০০%	৭,২০০	৭৭.৩/৬৯.৭	রোমান ক্যাথলিক ৬০%
৫৫.	"	স্লোভেনিয়া	৯৯.৬%	১১,০০০	৭৯.১/৭১.৫	রোমান ক্যাথলিক ৯৬%
৫৬.	"	সার্বিয়া	৯০%	১৩,০০০	৭৫.৬/৬৯.২	গ্রীক অর্থোডক্স ৭৮% মুসলিম ১৮%
৫৭.	"	মন্টিনেগ্রো	৮৪.৩%	-	-	-
৫৮.	মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ	অ্যান্ডোরা	৯৯.০%	১৬,২০০	৯৫/৮৬	রোমান ক্যাথলিক
৫৯.	"	আর্মেনিয়া	৯৯%	২৫৬০	৭৪.০/৭৩.৬	অর্থোডক্স ৯৪%
৬০.	"	অস্ট্রিয়া	১০০%	১৯,০০০	৮০.০/৭৩.৬	রোমান ক্যাথলিক ৮৫%
৬১.	"	আজারবাইজান	৯৭.০%	১,৪৮০	৬৯.৯/৬০.৩	মুসলিম ৯৩%
৬২.	"	বেলজিয়াম	৯৯%	১৯,৫০০	৮০.৬/৭৪.০	রোমান ক্যাথলিক ৮৫%

Dhaka University Institutional Repository

৬৩.	"	সাইপ্রাস	৯৬.৯%	১৩,০০০	৭৮.৮/৭৪.৪	গ্রীক অর্থোডক্স ৭৮%
৬৪.	"	চেকপ্রজাতন্ত্র	৯৯.০%	১০,২০০	৭৭.৮/৭০.২	নাস্তিক ৩৯.২%
৬৫.	"	ডেনমার্ক	১০০%	২১,৭০০	৮১.১/৭৩.৯	খ্রিষ্টান ৯১%
৬৬.	"	এস্তোনিয়া	৯৮%	৭,৬০০	৭৪.১/৬২.৮	খ্রিষ্টান
৬৭.	"	ফিনল্যান্ড	১০০%	১৮,২০০	৭৭.৩/৭৪.০	খ্রিষ্টান
৬৮.	"	ফ্রান্স	৯৯%	১৮,৬৭০	৮৩.০/৭৫.০	রোমান ক্যাথলিক ৯০%
৬৯.	"	জর্জিয়া	৯৯.৬%	১,০৮০	৮৩/৭৫	জর্জিয়ান অর্থোডক্স ৬৫%
৭০.	"	জার্মানি	১০০%	১৭,৯০০	৭৯.৪/৭৩.০	প্রটেষ্ট্যান্ট ৪৫%
৭১.	"	গ্রীস	৯৭.১%	৯,৫০০	৮১/৭৫.৮	আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স ৯৪%
৭২.	"	আইসল্যান্ড	১০০%	১৮,৮০০	৮০.৬/৭৩.১	খ্রিষ্টান ৯৬%
৭৩.	"	আয়ারল্যান্ড	১০০%	১৫,৪০০	৭৮.৬/৭৩.১	রোমান ক্যাথলিক
৭৪.	"	ইতালী	৯৮.৪%	১৮,৭০০	৮১.৬/৭৫.০	রোমান ক্যাথলিক
৭৫.	"	লাটভিয়া	১০০%	৫,৩০০	৭৩.৪/৬১.৩	রোমান ক্যাথলিক
৭৬.	"	লিথুনিয়া	৯৯.৫%	৩,৪০০	৭৪.৪/৬২.৬	রোমান ক্যাথলিক
৭৭.	"	লিচেনস্টাইন	১০০%	২২,৩০০	৮২.৩/৭৬.১	রোমান ক্যাথলিক
৭৮.	"	লুক্সেমবার্গ	১০০%	২৪,৮০০	৮২.১/৭৫.৮	রোমান ক্যাথলিক
৭৯.	"	মলদোভা	৯৮.৭%	২,৩১০	৮১.২/৭৫.৮	রোমান ক্যাথলিক
৮০.	"	মাল্টা	৯১.৮%	১২,০০০	৮১.২/৭৩.৩	রোমান ক্যাথলিক
৮১.	"	মোনাকো	৯৯.০%	২৫,০০০	-	রোমান ক্যাথলিক
৮২.	"	নেদারল্যান্ডস	১০০%	১৯,৫০০	৮০.৮/৭৫.১	রোমান ক্যাথলিক
৮৩.	"	নরওয়ে	১০০%	২৪,৫০০	৮০.৭/৭৪.৮	খ্রিষ্টান
৮৪.	"	পর্তুগাল	৯১.৯%	১,১০০	৭৯.৫/৭১.৮	রোমান ক্যাথলিক
৮৫.	রাশিয়া	রাশিয়া	৯৯.৫%	৫,৩০০	৭০.৭/৫৭.২	রুশিয়ান অর্থোডক্স
৮৬.	"	সানমেরিনা	৯৭%	১৫,৮০০	৮৫.৩/৭৭.৪	রোমান ক্যাথলিক
৮৭.	"	স্পেন	৯৭.৬%	১৪,৩০০	৮২.০/৭৫.২	রোমান ক্যাথলিক
৮৮.	"	সুইডেন	১০০%	২০,১০০	৮০.৭/৭৫.৭	খ্রিষ্টান ৯৮%
৮৯.	"	সুইজারল্যান্ড	১০০%	২২,৪০০	৮০.৭/৭৪.৭	রোমান ক্যাথলিক
৯০.	"	ইউক্রেন	৯৯.৬%	৩,৩৭০	৭২.৫/৬১.৯	ইউক্রেনীয় অর্থোডক্স
৯১.	"	যুক্তরাজ্য	৯৯%	১৯,৫০০	৭৯.৩/৭৪.০	রোমান ক্যাথলিক
৯২.	"	আলজেরিয়া	৬৬.৬%	৩,৮০০	৬৯.৮/৬৭.৫	মুসলিম
৯৩.	"	এঙ্গোলা	৪২%	৭০	৪৯.৬/৪৫.১	রোমান ক্যাথলিক ৬৮%
৯৪.	"	বেনিন	৩৭%	১,৩৮০	৫৫.২/৫১.২	উপজাতীয় ৭০%

Dhaka University Institutional Repository

৯৫.	"	বতসোয়ানা	৭৬.৪%	৩,২০০	৪৫.৬/৪৩.৫	উপজাতীয় ৫০%
৯৬.	"	বুরুন্ডি	৪৬.৯%	৬০০	৫০.১/৪৭.৯	রোমান ক্যাথলিক ৬২%
৯৭.	"	বারকিনোফাসো	২৩.০%	৭০০	৪২.১/৪২.৫	মুসলিম ৫০%
৯৮.	"	কেপভার্দে	৭৩.৬%	১,০৪০	৭৩.৪/৬৬.৮	রোমান ক্যাথলিক
৯৯.	"	ক্যামেরুন	৭৪.৮%	১,২০০	৫৩.৪/৫১.২	উপজাতীয় ৫১%
১০০.	"	মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	৬০%	৮০০	৪৬.১/৪৪.৪	প্রটেষ্ট্যান্ট ২৫% মুসলিম ১৫%
১০১.	"	কমোরোস	৫৯.২%	৭০০	৬১.৫/৫৬.৮	মুসলিম ৮৬%
১০২.	"	চাদ	৪১.০%	৬০০	৫০.৫/৪৫.৫	মুসলিম ৫০%
১০৩.	"	গণতন্ত্রী কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	৬০.৩%	৪০০	৪৯.০/৪৫.২	খ্রিষ্টান ৭০% মুসলিম ১০%
১০৪.	"	কঙ্গো	৭৯.৫%	৩,১০০	৪৭.৩/৪৪.২	খ্রিষ্টান ৯৮%
১০৫.	"	জিবুতি	৬৩.৪%	১,২০০	৫০/৪৭	মুসলিম ৯৪%
১০৬.	"	আইভোরিকোষ্ট	৪৫.৭%	১,৫০০	৫২/৫০	মুসলিম ৬০%
১০৭.	"	মিশর	৫৪.৬%	৫২,৭৬০	৬৩.৮/৫৯.৮	মুসলিম ৯৪%
১০৮.	"	নিরক্ষীয় গিনি	৮২.২%	৮০০	৪৮.০/৪৩.২	রোমান ক্যাথলিক
১০৯.	"	ইথিওপিয়া	৩৭.৪%	৫,২০০	৪৭.৮/৪৫.৫	খ্রিষ্টান, মুসলিম
১১০.	"	ইরিত্রিয়া	৫২.৭%	৪০০	৫২.৪/৪৮.৯	মুসলিম ৪৫.৫%
১১১.	"	গ্যাবন	৬৩%	৫,২০০	৫৯.১/৫৩.১	মুসলিম খ্রিষ্টান
১১২.	"	গাম্বিয়া	৩৫.৭%	১,১০০	৫৫.৮/৫১.২	মুসলিম ৯০%
১১৩.	"	ঘানা	৭০.৩%	১,৪০০	৫৮.৬/৫৪.৫	মুসলিম ৩০%
১১৪.	"	গিনি	৩৫%	১,০২০	৪৮.০/৪৩.২	মুসলিম ৮৫%
১১৫.	"	গিনি বিসাউ	৩৭.৭%	৯০০	৫০.৪/৪৭.১	মুসলিম ৩০%
১১৬.	"	লাইবেরিয়া	৪০%	৭৭০	৬১.৭/৫৬.৪	মুসলিম ২০%
১১৭.	"	কেনিয়া	৮১.৫%	১,৩০০	৫৪.৬/৫৪.২	প্রোটেস্টান্ট ৩৮%
১১৮.	"	লেসেথো	৮২.৯%	৪,৯০০	৫৩.৯/৪৯.৫	খ্রিষ্টান ৮০%
১১৯.	"	লিবিয়া	৭৯.১%	৬,৫১০	৬৭.৪/৬২.৮	মুসলিম ৯৭%
১২০.	"	মালাউই	৫৯.২%	৭০০	৩৫.৭/৩৪.৯	প্রোটেস্টান্ট ৫৫% মুসলিম ২০%
১২১.	"	মাদাগাস্কার	৬৫.৭%	৮২০	৫৩.৭/৪৫.৫	খ্রিষ্টান ৪১% মুসলিম ৭%
১২২.	"	মালি	৩৯.৮%	৬০০	৪৯.১/৪৫.৫	মুসলিম ৯০%
১২৩.	"	মরিশাস	৮৪.২%	৯,৬০০	৭৮.৫/৬৬.৯	হিন্দু ৫২%

Dhaka University Institutional Repository

১২৪.	"	মৌরতানিয়া	৪১.৬%	১,২০০	৫২.৬/৪৬.৫	মুসলিম
১২৫.	"	মরক্কো	৪৮.০%	৩০০০	৭২.২/৬৮.০	মুসলিম ৯৯%
১২৬.	"	নাইজেরিয়া	৬২.৬%	১,৩০০	৫৬.০/৫৩.৩	মুসলিম ৫০%
১২৭.	"	মোজাম্বিক	৪৩.২%	৭০০	৪৬.৯/৪৩.৭	খ্রিষ্টান ৩০% মুসলিম ২০%
১২৮.	"	নামিবিয়া	৮১.৪%	৩,৬০০	৬৬.৬/৬৩.২	খ্রিষ্টান ৮০%
১২৯.	"	নাইজার	১৫.৩%	৬০০	৪০.৭/৪১.৪	মুসলিম ৮০%
১৩০.	"	রুয়ান্ডা	৬৫.৮%	৪০০	৩৯.৬/৩৮.৬	খ্রিষ্টান ৭৪%
১৩১.	"	সিয়েরালিওন	৩২.০%	৯৬০	৫১.১/৪৫.১	মুসলিম ৬০%
১৩২	"	সাওটোম এন্ড প্রিন্সিপে	৫০%	১,০০০	৬৬.১/৬২.২	রোমান ক্যাথলিক
১৩৩.	"	সেনেগাল	৩৬.৪%	১,৬০০	৫৯.৮/৫৪.২	মুসলিম ৯২%
১৩৪.	"	সিসিলিস	৮৪.০%	৬০০০	৭৪.৫/৬৪.৮	রোমান ক্যাথলিক ৯০%
১৩৫.	"	সোমালিয়া	২৪.০%	৫০০	৫৬.২/৫৫.৫	মুসলিম
১৩৬.	"	দক্ষিণ আফ্রিকা	৮৪.৯%	৪৮০০	৫৮.২/৫৪.৪	খ্রিষ্টান
১৩৭.	"	টোগো	৫৬.৩%	৯০০	৬০.৬/৫৬.১	খ্রিষ্টান ২০% মুসলিম ১০%
১৩৮.	"	সুদান	৫৬.৯%	৮০০	৫৬.৫/৫৪.৬	মুসলিম ৯০%
১৩৯.	"	সোয়াজিল্যান্ড	৭৮.৯%	৩,৭০০	৬১.৮/৫৩.৭	খ্রিষ্টান ৬০%
১৪০.	"	তাঞ্জানিয়া	৭৪.৭%	৮০০	৪৩.১/৪০.৩	খ্রিষ্টান ৪৫% মুসলিম ৩৫%
১৪১.	"	তিউনিসিয়া	৫৯.৯%	৪,২৫০	৭৪.৩/৭১.৫	মুসলিম ৯৮%
১৪২.	"	উগান্ডা	৬৬.১%	৯০০	৪০.১/৩৯.৩	খ্রিষ্টান ৬৬% মুসলিম ১৬%
১৪৩.	"	জাম্বিয়া	৭৭.২%	৯০০	৪৫.৬/৪৫.৬	খ্রিষ্টান, মুসলিম
১৪৪.	"	জিম্বাবুয়ে	৮৮.০%	১,৬২০	৪০.৮/৪০.৯	খ্রিষ্টান, মুসলিম
১৪৫.	উত্তর আমেরিকা	যুক্তরাষ্ট্র	৯৬%	২৭,৬০৭	৭৯.৫/৭২.৮	খ্রিষ্টান
১৪৬.	"	কানাডা	৯৭%	২৪,৪০০	৮২.৯/৭৫.৯	রোমান ক্যাথলিক ৪৬%
১৪৭.	"	মেক্সিকো	৯১.১%	৭,৭০০	৭৭.৮/৭০.৪	রোমান ক্যাথলিক ৮৯%
১৪৮.	মধ্য আমেরিকা	এল সালভাদোর	৭৮.৩%	১,৯৫০	৭২.৮/৬৫.৯	রোমান ক্যাথলিক ৭৫%
১৪৯.	"	কোষ্টারিকা	৯৫.৫%	৫,৪০০	৭৮.৪/৭৩.৪	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
১৫০	"	গুয়েতামালা	৬৮.১%	৩৩০	৬৮.৪/৬৩.০	রোমান ক্যাথলিক

Dhaka University Institutional Repository

১৫১.	"	নিকারাগুয়া	৬৮.২%	১,৭০০	৬৮.৬/৬৩.৮	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
১৫২.	"	পানামা	৯১.৭%	৫০০০	৭৭.১/৭১.৬	রোমান ক্যাথলিক ৮৫%
১৫৩.	"	হন্ডুরাস	৭৪%	১,৯৮০	৭১.৪/৬৬.৪	রোমান ক্যাথলিক ৯৭%
১৫৪.	ক্যারিবিয়ান অঞ্চল	বারমুডা	৯০%	৬,৬০০	-	অ্যালিকান, খ্রিষ্টান
১৫৫.	"	কিউবা	৯৬%	১,৩০০	৭৭.৭/৭২.৮	রোমান ক্যাথলিক ৮৫%
১৫৬.	"	গ্রানাডা	৮৫%	৩০০০	৭৩.৭/৬৮.৬	রোমান ক্যাথলিক ৫৩%
১৫৭.	"	জ্যামাইকা	৮৬.৪%	৩২০০	৭৭.৬/৭২.৮	প্রটেষ্ট্যান্ট
১৫৮.	"	ডোমিনিকা	৯০%	২৪৫০	৮০.৬/৭৪.৪	রোমান ক্যাথলিক
১৫৯.	"	ডোমিনিকান রিপাবলিক	৮৩.২%	৩৪০০	৭১.৭/৬৭.২	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
১৬০.	"	টোবাগো	৯৩.৫%	১২,১০০	৭২.১/৬৮.১	রোমান ক্যাথলিক প্রটেষ্ট্যান্ট
১৬১.	"	বারবাডোজ	৯৭.০%	৯,৮০০	৭৭.০/৭১.৮	প্রটেষ্ট্যান্ট ৬৭%
১৬২.	"	বাহামা	৯৫.৭%	১৮,৭০০	৭৭.৪/৬৮.৬	খ্রিষ্টান
১৬৩.	"	বেলিজ	৯৩%	২৭৫০	৭০.৮/৬৬.৮	রোমান ক্যাথলিক ৬২%
১৬৪.	"	সেন্টকিউস নেভিস	৯৮%	২,০৬০	৭৪.৮/৭১.৭	প্রটেষ্ট্যান্ট ৭৬%
১৬৫.	"	সেন্টভিন সেন্ট ও গ্রেনাডাইস	৮৫%	২,০৬০	৭৪.৮/৭১.৭	খ্রিষ্টান
১৬৬.	"	সেন্টলুসিয়া	৭৮%	৪০৮০	৭৪.২/৬৬.৭	রোমান ক্যাথলিক ৯০%
১৬৭.	"	হাইতি	৪৮.৮%	১০০০	৫১.৬/৪৭.৫	রোমান ক্যাথলিক ৮০%
১৬৮.	"	অ্যাঙ্গুইলা	৪০.০%	৭০০	৪৯.৬/৪৪.১	রোমান ক্যাথলিক
১৬৯.	"	কেউম্যান দ্বীপ	-	-	-	রোমান ক্যাথলিক
১৭০.	"	পোয়েটোরিকা	-	-	-	রোমান ক্যাথলিক
১৭১.	দক্ষিণ আমেরিকা	আর্জেন্টিনা	৯৬.৭%	৮,১০০	৭৮.১/৭০.৮	রোমান ক্যাথলিক ৭০%
১৭২.	”	ইকুয়েডর	৯১%	৪,১০০	৭৪.২/৬৮.৬	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
১৭৩.	”	উরুগুয়ে	৮৭.৭%	৭,৬০০	৭৮.৬/৭২.১	রোমান ক্যাথলিক ৬৬%
১৭৪.	”	কলম্বিয়া	৯১.৫%	৫৩০০	৭৬.১/৭০.৩	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
১৭৫.	”	গায়না	৯৮.৪%	৫,১০০	৭৭.১/৭১.৬	রোমান ক্যাথলিক ৮৫%
১৭৬.	”	চিলি	৯৫.৬%	৮,০০০	৭৪.০/৭১.৫	রোমান ক্যাথলিক ৮৯%
১৭৭.	”	প্যারাগুয়ে	৯৩.০%	৩২০০	৭৫.৭/৭২.৬	রোমান ক্যাথলিক ৯০%
১৭৮.	”	বলিভিয়া	৮৫.০%	২৫৪০	৬৩.৪/৫৭.৫	রোমান ক্যাথলিক ৯৫%
১৭৯.	”	ব্রাজিল	৮৪.৯%	৬,১০০	৬৬.৩/৫৮.৮	রোমান ক্যাথলিক ৭০%
১৮০.	”	ভেনেজুয়েলা	৯২.৩%	৯,৩০০	৬৬.৩/৫৬.৮	রোমান ক্যাথলিক ৯৬%

Dhaka University Institutional Repository

১৮১.	"	সুরিনাম	৯৩.০%	২,৯৫০	৭৩.০/৬৭.৪	খ্রিষ্টান ৪৮%
১৮২.	"	পেরু	৮৯.৬%	৩,৬০০	৭১.৮/৬৭.৪	রোমান ক্যাথলিক
১৮৩.	ওসেনিয়া অঞ্চল	অস্ট্রেলিয়া	১০০%	২২,১০০	৮২.৭/৭৬.৭	অ্যাংলিক্কান
১৮৪.	"	পাপুয়া নিউগিনি	৬৩.৯%	২,৪০০	৫৮.৬/৫৬.৯	প্রোস্টেষ্ট্যান্ট ৪৪%
১৮৫.	"	সলোমান দ্বীপপুঞ্জ	৫৩%	-	-	খ্রিষ্টান
১৮৬.	"	ফিজি	৯২.৬%	৬,১০০	৬৮.৫/৬৩.৭	খ্রিষ্টান ৫২% মুসলিম ৮%
১৮৭.	"	নিউজিল্যান্ড	৯৯%	১৮,৩০০	৮০.৬/৭৪.২	অ্যাংকলিন ২৮%
১৮৮.	"	টোঙ্গা	৯৯%	২,১৬০	৭১.৭/৬৭.৩	খ্রিষ্টান
১৮৯.	"	পশ্চিম সমোয়া	৮০.২%	১,১০০	৭১.৬/৬৬.৭	খ্রিষ্টান ৯৯.৭%
১৯০.	"	নাউরু প্রজাতন্ত্র	৯৯%	৯৯%	-	খ্রিষ্টান
১৯১.	"	টুভালু	-	-	-	-
১৯২.	"	ভানুয়াটি	৫৩%	-	-	খ্রিষ্টান
১৯৩.	"	কিরিবাতি	৯০%	-	-	-

নিরক্ষরতার কারণ ও বৈশিষ্ট্যঃ

নিরক্ষরতা মানব জীবনের জন্য অভিশাপ। নিরক্ষরতার ব্যক্তি জীবনে এগিয়ে চলার পথকে বন্ধ করে দেয়। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার বড় একটি অংশ এ সমস্যায় জর্জরিত। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেও কাঙ্খিত সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা নিরক্ষরতার জন্য কতিপয় মৌলিক অনুসর্গ কারণ হিসেবে বিদ্যমান, যা সর্বযুগের, সর্বকালের জন্য কম-বেশী প্রযোজ্য। যেমনঃ **(ক) দারিদ্রতাঃ** দারিদ্রতা নিরক্ষরতার অন্যতম মৌলিক কারণ হিসেবে বিবেচিত। দারিদ্রতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যে সকল এলাকা বা দেশে দারিদ্রতার হার বেশী সেখানে শিক্ষার হার কম। দারিদ্রতার কারণে পরিবারকে সহযোগিতার জন্য রোজগারের পথ বেছে নিতে হয়। আমাদের দেশে নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ দারিদ্র। ৯৮৮ সালে Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics. 'BANBEIS' কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়, (দারিদ্রতার কারণে) প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন ছেলে-মেয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখা-পড়ার সুযোগ পায়না। একই সময়ে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্ন কারণে দিনাজপুর জেলার পঁচানব্বই হাজারেরও বেশী শিশু প্রাথমিক পর্যায়ের পর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[১] যে বয়সে একজন শিশুকে বইখাতা নিয়ে বিদ্যালয়ে যাবার কথা, কিন্তু পারিবারিক অস্বচ্ছলতার জন্য তাকে উপার্জনের জন্য বের হতে হচ্ছে।

১. হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সূচিপত্র প্রকাশন, ঢাকা-২০০২, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার সাথে দারিদ্রতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষার এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, দরিদ্র পরিবারের শতকরা ৬৪ জনের উপর নিরক্ষর। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষার হার বাড়লে দারিদ্রতা কমে, আর শিক্ষার হার কমলে দারিদ্রতা বাড়ে।[১]

শিক্ষাস্তর	দারিদ্রের শতকরা হার (উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুযায়ী)	
	১৯৯৫-১৯	২০০০
কোন শিক্ষা নেই	৬৪.৫	৬৩.৮
প্রথম শ্রেণি হতে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত	৫০.৫	৪২.৫
পঞ্চম শ্রেণি হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত	৩৭.৭	৩৭.১
মাধ্যমিক ও তার উপর পর্যন্ত	১৩.২	১৫.৩

সুতরাং দেখা যায় দারিদ্রতা নিরক্ষরতার অন্যতম মৌলিক কারণ।[২]

(খ) ঝরেপড়া: ঝরে পড়া বা ড্রপ আউট নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ। প্রথম শ্রেণিতে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী ভর্তি হয় দ্বিতীয় শ্রেণিতে গিয়ে সে পরিমাণ থাকে না। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে ঝড়ে পড়তে থাকে। ইউনিসেফের এক হিসাব মতে সারাবিশ্বে প্রতিবছর ১১ কোটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ে। আর তাদের অধিকাংশই মেয়ে শিশু। অনেক সময় দেখা যায় ধরে এনে কয়েক ঘন্টা আটকে রেখে শিক্ষাদান করা হয় কিন্তু বাড়িতে উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় শিক্ষার্থী বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। তাছাড়া দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের শিশু সন্তানটিকে কৃষি কাজে কিংবা সামান্য আয়-উপার্জনের জন্য দিনমজুর কিংবা অন্যকোন কাজে নিয়োজিত করে ফলে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে শিশুটি কঠোর বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পণ করে ঝরে পড়তে বাধ্য হয়।

৩০মে ২০০৮ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার প্রথম পাতার একটি সংবাদ শিরোনামে ছিল "উপবৃত্তির সুফল মিলছে না ড্রপ আউটের হার উদ্বেগজনক" রিপোর্টে বলা হয় যে, নারী শিক্ষায় উপবৃত্তিও কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনছেনা। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, দরিদ্র ও পাঠ্যগ্রহণে টিউটরের নির্ভরতা দূর করা না গেলে এ কর্মসূচি কোন কালেই সুফল বয়ে আনবে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। বর্তমানে মাধ্যমিক ৮৬ ভাগ এবং উচ্চমাধ্যমিক ৬০ ভাগ ছাত্রী ড্রপ আউট করছে। অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এ খাতে বছরে প্রায় পৌনে ৩শ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষা সচিব মো: মোমতাজুল ইসলাম এই উদ্বেগজনক ড্রপ আউটের জন্য শিক্ষকদের দায়ী করে বলেছেন, শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে আকৃষ্ট করতে পারছেন না। তাছাড়া ক্লাসে উপস্থিতি ও মেধামান নির্ধারণ করে দেয়ায় ড্রপ আউট বাড়ছে।[৩]

১. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮
২. উৎস: BIDS (HES 2000
৩. দৈনিক যুগান্তর, ৩০ মে ২০০৮, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

সাইমন ফ্রাজার ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট মিজ জেনিফার হোভ সম্প্রতি বাংলাদেশের International University of Bussience Agriculature and Techonology-এর ভিজিটিং ফেলো হিসেবে এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি হয়, তার মধ্যে মাত্র ১৪ ভাগ এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাঁর মতে, সবচেয়ে বেশী ড্রপ আউট হয় সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উঠার সময়ে।[১] প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে কোন মেয়ের বিয়ে দেয়া যায় না, কিন্তু আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তা অহরহ হচ্ছে।

(গ) শিক্ষার ফল তাৎক্ষণিক পাওয়া :

শিক্ষার আর্থিক ফলাফল তাৎক্ষণিক হাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শিক্ষার অর্থনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যবহ। উন্নয়নের জন্য প্রধান অনুসঙ্গ হচ্ছে শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার আর্থিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Quah (1999) তার গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, স্বাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ''যদি কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ আরেকটি দেশের চেয়ে বেশী থাকে, তাহলে ৩০ বছর পর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অন্তত ৭৫ শতাংশ বেশী হবে।''[২]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের দ্রুত উন্নয়নের ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের পিছনে সবচাইতে শক্তিশালী যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হল তারা সর্বপ্রথম নিরক্ষরতা দূরীকরণে সক্ষম হয়েছে।

দারিদ্র ও অসচেতন অভিভাকরা শিক্ষায় নগদ তাৎক্ষণিক আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় সন্তানদের শিক্ষার প্রতি যত্ন নেয় না ফলে তারা নিরক্ষর থেকে যায়। এছাড়া রয়েছে মৌসুমী কাজের চাপ। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব এলাকাতেই কায়িক পরিশ্রমের কাজ যেহেতু নিরক্ষর স্বল্প শিক্ষিত লোকেরাই করে থাকেন, তাই তাদের বিভিন্ন মৌসুমী কাজে সহযোগিতার জন্য বছরের উল্লেখযোগ্য একটি সময় সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠান না। এতে সন্তানরাও পড়া-লেখা ফাঁকি দেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যায়।

(ঘ) যুদ্ধা, সংঘাত ও সামাজিক অস্থিরতাঃ

বিংশ শতাব্দীতে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ। এতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরপরাধ নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ছাত্র-ছাত্রীর মৃত্যু হয়। যুদ্ধের জন্য উন্নত বিশ্ব কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। এখনও জাতীয় আয়ের বড় একটি অংশ ব্যয় করছে মানবতা বিধ্বংসী মারাত্মক অস্ত্র ও বোমা তৈরির কাজে। পরাশক্তিধর কয়েকটি দেশের উচ্চাভিলাস, সাম্রাজবাদনীতি, মোড়লীপনা আর শোষণ নির্যাতনে বিশ্বমানবতা আজ ক্ষতবিক্ষত। যার নেতৃত্বে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মিথ্যা অজুহাতে ইরাক, আফগানিস্তান, লেবানন, ভিয়েতনাম, জাপানসহ অনেক দেশেই আক্রমণ করে মানবতাকে করেছে ভুলুণ্ঠিত। সেখানকার লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী জানে না কেন তাদের জীবন দিতে হল, জানে কেন তাদের স্কুলঘরের উপর বোমা ফেলে তাদেরকে পঙ্গু করে দেয়া হল, তারা জানেনা কেন তাদেরকে বাবা-মায়ের আদর-স্নেহ থেকে এতিম করা হল। ফিলিস্থিনে, কাশ্মীরের প্রতিদিন মানবতার রক্ত ঝরছে। মাসের পর মাস স্কুল বন্ধ থাকছে। জীবনে নিরাপত্তাই যেখানে মূল্যহীন নিরক্ষরতা দূরীকরণ যেখানে বিলাসিতার নামান্তর।

১. প্রাগুক্ত, পৃ.১
২. ড. কাজী সাহাবুদ্দিন ও অন্যান্য, সম্পাদিত, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা-২০০৩, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড, সংঘাত দেখে অনেক কিশোর-কিশোরী পড়া-লেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। মানসিক ভারসাম্যও হারিয়েছে অনেকে। ভারতীয় বাহিনী ও কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের মধ্যেকার সংঘর্ষে মানবাধিকার গ্রুপ সমূহের তথ্যানুযায়ী এ পর্যন্ত ৬০ হাজার মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। স্বামী, সন্তান হারিয়ে অনেকে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এদেরই একজন 'সারওয়ারা' কাশ্মীর ভারতীয় সৈন্যরা তার স্বামীকে হত্যা করেছে। পিতৃহীন হয়ে পড়েছে তার নাবালক তিনটি শিশু সন্তান। তাদের লেখা-পড়া দূরে থাক, দু'মুঠো অন্ন তুলে দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তদুপরি তার ভাষ্যমতে, "ছেলেরাও পিতার মৃত্যুর পর একেবারে চুপসে গেছে তিনি বলেন, স্বামীর কথা স্মরণ করে সব সময়ই আমি ভীষণ বিষন্ন থাকি, একেক সময় মনে হয় আত্মহত্যা করি। সন্তানদের দিকে চেয়ে তা আর পারিনা।"[১]

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত শিশুরাই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিকার। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থদের শতকরা ৯০ ভাগই শিশু ও নারী যাদের স্বাক্ষরতা অর্জন ছিল অতীব জরুরি। কিন্তু তারা তা থেকে বঞ্চিত। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয়তে যে তথ্য পরিবেশন করা হয় তা রীতিমত ভয়ংকর: "সেভ দ্যা চিলড্রেনের" সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, "বিশ্বজুড়িয়া কমপক্ষে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু সশস্ত্র সংঘাত ও সহিংসতার কারণে স্কুলে যাইতে পারে না। এত হতভাগ্য ও বঞ্চিত শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে এই সংস্থা বিশ্বব্যাপি প্রচারাভিযান শুরু করিয়াছে।.... আজ ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক কিংবা লেবাননে যেসব শিশু বসবাসরত তাহাদের জীবনের মৌলিক অধিকারগুলি কবে পূরণ হইবে? বিশ্বের বিভিন্ন সশস্ত্র সংঘাতে আড়াই লক্ষের বেশী শিশু সেনা এখনও অংশ নিতেছে।.... হাজার হাজার মেয়ে শিশু যৌন নীপিড়নের শিকার। জাতিসংঘ মহাসচিবের শিশু ও সশস্ত্র সংঘাত বিষয়ক বিশেষ দ্রুত রাধিকা কুমারী স্বামী জানান, ২০০৩ সাল হইতে এই পর্যন্ত ১ কোটি ৪০ লক্ষের বেশী শিশু নিজেদের ভিতর ও বাইরে বাস্তুচ্যুত হইয়াছে। সূত্র মতে, বিশ্বে প্রতিদিন ১৫ কোটি শিশু অভুক্ত থাকে। ১০ কোটি শিশু শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত। সেভ দ্যা চিলড্রেন হতভাগ্য শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল নাগাদ ৩০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিতে চায়।"[২]

(ঙ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ:

বিশ্বব্যাপী নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক দূর্যোগ। নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঘনঘটায় সারা বিশ্ব অশান্ত। বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন, হারিকেন, সিডর, নারগিস, এসিড বৃষ্টি, খরা, ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পথ বেয়ে নেমে আসছে মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এমনকি দুর্ভিক্ষ। গ্রীণহাউজ এফেক্ট, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সূর্যের অতি বেগুণী রশ্মির প্রভাবে ওজোনস্তরে তারতম্য, শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, আর্সেনিক, নানাবিধ নিত্য নতুন বিপর্যয়ের মুখোমুখি আজকের সভ্যতাগর্বী আদম সন্তান।[৩] প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আদম সন্তানের শিক্ষার জীবন শুধুমাত্র ব্যাহত হয়না, বরং চিরতরে বঞ্চিত হয় শিক্ষাস্বরূপ নেয়ামত থেকে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সিডর, মায়ানমারের উপর দিয়ে নারগিস এবং চীনের মারাত্মক ভূমিকম্প তার প্রমাণ। বয়স্ক নারী-পুরুষের সাথে প্রাকৃতিক সমাধীতে সমাধিস্থ হয়েছে অনেক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী। যারা বেঁচে আছে তাদের অনেকের শিক্ষার প্রদীপ হয়তো নিভূ নিভূ অবস্থা।

১. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা-২০০৭, পৃ.৭
২. দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পাদকীয়, ঢাকা-১৬ ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ.৪
৩. ড. মোঃ ময়নুল হক, ইসলামঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগ, ঢাকা-২০০৩, পৃ.৯

Dhaka University Institutional Repository

(চ) নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচির ব্যর্থতা:

নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে গ্রহণ করা বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যর্থতাও নিরক্ষরতার জন্য অনেকটা দায়ী। নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয় বুনিয়াদী শিক্ষা, এছাড়া বয়স্কদের জন্য রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা, গণশিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করা এ সকল কর্মসূচি ভুল সিদ্ধান্ত, সঠিক পরিকল্পনা ও তদারকির অভাব, রাজনৈতিক স্বার্থ, সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন, কর্তৃপক্ষের লুটপাট, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি কারণে ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়।

(ছ) উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব:

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর শিক্ষার মেরুদণ্ড হল শিক্ষক। কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই তার শিক্ষকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়। পৃথিবীর বর্তমান অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি শিক্ষা। আর শিক্ষাকে চলমান করেছে শিক্ষক। সকল শিক্ষকই শিক্ষাকে চলমান করতে বা রাখতে সক্ষম নয়। যিনি পেশায় শিক্ষক, শিক্ষাদানে উৎসাহী, শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে পারঙ্গম, নতুন জ্ঞানের সাথে নিজে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম এবং সৃজনশীলতায় উৎসাহী তিনি শিক্ষাকে চলমান করতে এবং রাখতে সক্ষম।[১] কিন্তু স্বাক্ষরতার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অনেকেরই উপরোক্ত যোগ্যতা নেই, নেই তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ।

অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের ভাষায়, পাকা দালানের সংখ্যা বেড়েছে, কমেছে পাকা শিক্ষকের সংখ্যা। শিক্ষক নিয়োগ কোট ব্যবস্থা থাকায় মেধাবীদের অনেকের শিক্ষকতা পেশায় আসার ইচ্ছা থাকলেও কোটা ব্যবস্থার দেয়ালে আটকে আর আসতে পারছে না, ফলে অপেক্ষাকৃত মেধাহীনরা শিক্ষকতার মত মানুষ তৈরির কারিগরের পেশায় সহজে প্রবেশ করতে পারছে। অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকতায় পেশায় ৬০% মহিলা কোটা থাকায় গড়ে প্রায় ৮০% প্রাথমিক শিক্ষক হচ্ছে মহিলা। যাদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার শর্ত শিথিলসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া শারীরিকভাবে মহিলারা পুরুষের চেয়ে তুলনামূলক দুর্বল। অন্যদিকে একজন পুরুষ শিক্ষকের মূল দায়িত্ব থাকে শুধু শিক্ষকতাই। কিন্তু একজন নারী শিক্ষককে সেই তুলনায় কমপক্ষে শিক্ষকতার পাশাপাশি আরও ০৩টি পেশায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা- (১) শিক্ষকতা, (২) স্বামী, সংসার, সন্তান দেখাশোনা (৩) পারিবারিক কাজকর্ম (৪) সামাজিকসহ অন্যান্য আবশ্যক দায়িত্ব। ফলে শিক্ষকতায় তিনি ইচ্ছা থাকলেও আশানুরূপ সময় দিতে পারছেন না। ভুক্তভোগীদের সাথে আলাপ করে এমন তথ্যই জানা যায়।[২]

উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব তো আছেই। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুবান্ধব নয়। স্কুলে গাদাগাদি করে চারজনের বেঞ্চে সাতজন বসতে হয়। কখনও বেঞ্চ থাকেনা বসতে হয় মাটিতে তারপর কিছুক্ষণ ক আর র কর ধআর র ধর, এসব কর ধর, কিছুক্ষণ চিমটা-চিমটি, খামচা-খামচি, নালিশ-শালিস, আর না হয় স্কুল ঘরের সামনের কিঞ্চিৎ খোলা জায়গায় ছোটাছুটি, লুটোপুটি, হৈ-হল্লা তারপর ঢং ঢং ছুটা-ছুটি। কিছুদিন পর হালের গরুর সমান উঁচু হওয়ার আগেই স্কুলকে খোদা হাফেজ জানিয়ে বাবার সঙ্গে যেতে হয় ক্ষেতে।[৩]

---

১. হোসনে আরা শাহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৪
২. মোফাজ্জল করিম, হরেকরকম শিক্ষা ব্যবস্থা, দৈনিক যুগান্তর, ২০০৮, পৃ.৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

ফলে সামাজিকভাবে শিক্ষকরা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। এমনকি বিয়ের বাজারেও একজন বিএ পাশ শিক্ষকের চেয়ে ৮ম শ্রেণি পাশ একজন সরকারি অফিসের পিয়নকে মেয়ে পক্ষ জামাই হিসেবে বেশী পছন্দ করছে। শিক্ষকতা পেশার এ চরম দৈন্যদশা থেকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে অন্য কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনের চিন্তা করতে গিয়ে নিরক্ষরতার অতল গহবরে হারিয়ে যাচ্ছে।

(ট) ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের অভাব:

দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য, ধর্ম, জীবনাচার, সংস্কৃতি, সভ্যতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক না হলে সে শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে কাঙ্খিত মানের স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাকে মানসম্মত এবং স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির নামে বিদেশের অনুকরণে পাঠসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ভেবে দেখা হায়নি, ঐসব পাঠসূচি যেগুলো এদেশের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কতটুকু। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এনজিও'রা সেবার নামে নব্য উপনিবেশিক ষড়যন্ত্র করছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি এর ধারাবাহিকতার একটি।[১]

এছাড়া বাজারে শিশুতোষ বই নেই বললেই চলে। আগে যেমন নীতিবাক্য, নীতিকথা দিয়ে শিশুতোষ বই ছিল এখন নেই। অনেক স্কুলেই শিশুতোষ বই ও পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনামে ছিল এমন, হারিয়ে যাচ্ছে বাল্য শিক্ষার বই, শিক্ষক সংকটে শিশু শ্রেণি বন্ধ।[২]

(ঠ) শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য:

শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ। শহর গ্রামের স্কুলগুলোতে শিক্ষার গুণগত মানের ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। ফলে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। দেশের শহর ও গ্রাম এবং ধনী ও গরীব নির্বিশেষে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি সফল হবে না।

পত্রিকায় প্রকাশ, "মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকা টিউশন ফি'র স্কুলও আছে এই ঢাকা শহরে। সেখানে এ নগরবাসীর সন্তানেরাই লেখাপড়া করে।"[৩]

সেখানে অবশ্য এদেশী কৃষ্টিকালচার শেখানো হয়না। শেখানো হয় বিদেশী সভ্যতা, সাংস্কৃতি। আবার গ্রামে অনেক স্কুলে দেখা যায় ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে খালি পায়ে ক্লাস করছে অনেকেই। তাও নিয়মিত ক্লাসের সুযোগ সবার হয়না। বাড়িতে কাজের চাপ কম থাকলে সেদিন যাওয়া হল নয়তো নয়। এদেশে প্রাথমিক স্তরে হরেকরকম শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে মোট ১১ ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলো হল: (১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২) রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩) নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪) এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল (৫) স্যাটেলাইট স্কুল (৬) হাইস্কুল (৭) প্রাইমারী স্কুল (৮) কিণ্ডারগার্ডেন (৯) এবতেদায়ী মাদরাসা (১০) দাখিল/আলিম/ফাজিল/কামিল মাদরাসা সংলগ্ন ইবতেদায়ী মাদরাসা (১১) উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়।[৪]

---

১. ফোরকান আলী, এমজিডি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প নেই, দৈনিক যায় যায় দিন, ১৮ মে-২০০৮, পৃ.১

২. দৈনিক ইনকিলাব, ৭ জুন-২০০৮, পৃ.১

৩. মোফাজ্জল হোসেন, হরেকরকম বা শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ.৪

৪. এডুকেশন ওয়াচ, ২০০২, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

(জ) শিক্ষক স্বল্পতা:

শিক্ষক স্বল্পতা নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ। অনেক স্কুল আছে যেখানে ৭ জন শিক্ষকের স্থলে আছে ৩ জন। তারাও অনেক সময় ছুটিতে থাকে। আবার কেউ কেউ টাকার বিনিময়ে অন্যকে দিয়ে প্রক্সি দেওয়ান। গত ১লা এপ্রিলে প্রকাশিত দৈনিক যায় যায় দিন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সচিত্র সংবাদের শিরোনামে ছিল "সবই আছে নেই শুধু শিক্ষক"। বাগেরহাট সদরের উত্তর খানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষিকা টিউলিপ রাণী দান ট্রেনিং এ বাগেরহাট থাকায় বিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয় না।

ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে এসে কিছুক্ষণ খোলাধুলা করে যার যা বাড়িতে চলে যায়। উল্লেখ্য যে, উক্ত স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ৩জন। প্রধান শিক্ষক ও আরেকজন সহকারী শিক্ষক অবসরে যাওয়ায় একমাত্র শিক্ষিকা টিউলিপ রাণী দাস, যিনি ট্রেনিং এ আছেন।[১] আবার কোন কোন স্কুলে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। হবিগঞ্জের সাধুপুর উপজেলার পশ্চিম বাঘাসুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঐ রকম একটি বিদ্যালয়, যেখানে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ প্রধান শিক্ষক নেই। মাত্র ৩ জন সহকারী শিক্ষক দিয়ে কয়েকশ ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া কোন রকমে চলছে।[২] স্কুলে কোন আয়া, কেরানী ও পিয়ন না থাকায় ঘন্টা দেয়াসহ যাবতীয় কাজ শিক্ষকদেরই করতে হয়। এতে লেখাপড়ার যেমন বিঘ্ন হয় তেমনি শিক্ষকতার মর্যাদাও হয় ভুলুণ্ঠিত।

(ঝ) নৈতিক অনুভূতিক ও জবাবদিহিতার অভাব:

শিক্ষকতা মহান পেশা। শিক্ষকতাকে আর্থিক বিচারে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু বর্তমান নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকতাকে টাকার অংকে বিচার করা হয়। তদুপরি প্রায়ই শোনা যায় শিক্ষকদের নৈতিক অবক্ষয়ের কথা। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়া সমুচিত মনে করছিনা। এছাড়া রয়েছে জবাবদিহিতার অভাব। অনিয়ম, দুর্নীতি, আর স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে যখন প্রবেশ করেছে তখন শিক্ষকতার মত মহান পেশা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বাদ পড়েনি তা থেকে। ফলে শিক্ষার কাঙ্খিত মান অর্জন হচ্ছে না। শিক্ষকদের মধ্যে আগের মত পেরেশানী দেখা যায় ছাত্রকে গড়ে তোলবার জন্য যা আগে দেখা যেত সম্মানিত শিক্ষকদের মধ্যে। টিউশনি ও নোটবইও নিরক্ষরতার জন্য কম দায়ি নয়।

(ঞ) শিক্ষকতা পেশায় বৈষম্য ও যথাযথ মূল্যায়ণের অভাব:

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সবকিছুকে পরিমাপ করা হয় আর্থিক বিচারে। শিক্ষকতা পেশায় বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম। তদুপরি রয়েছে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষক বৈষম্য। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। যারা সরাসরি নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাথে যুক্ত। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারি কোষাগার থেকে মূলবেতনের ৯০ ভাগ পেলেও পরিমাণের দিক দিয়ে এটা সরকারি শিক্ষকদের তুলনায় অনেক কম। এছাড়া তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্রাচুইটির মত সুবিধাগুলোও নেই। ঈদ বোনাসের ক্ষেত্রেও আছে নানা বৈষম্য। কমিউনিটি শিক্ষকদের বেতনমাত্র ৭৫০ টাকা। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এ সময়ের একজন শিক্ষককে এ সামান্য পরিমাণ বেতন দিয়ে কিভাবে চলবে।[৩] আমাদের দেশে শিক্ষার নামে যে অপচয় ও দুর্নীতির কথা মিডিয়াতে প্রচারিত হয়, তার তুলনায় এসব শিক্ষকের পুরো বছরের বেতন কি খুব বেশী? সূত্রমতে, পাঁচ লক্ষাধিক বেসরকারি শিক্ষক এ বৈষম্যের শিকার।

---

১. দৈনিক যায় যায় দিন, ১লা এপ্রিল, ২০০৮, পৃ.৯
২. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৪ সেপ্টেম্বর-২০০৭, পৃ.৯
৩. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৪ জানুয়ারি-২০০৬, পৃ.৯

Dhaka University Institutional Repository

(ড) উপজাতি ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী:

নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ হল পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী, উপজাতি ও অধিবাসি সম্প্রদায়। এদের অধিকাংশই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয় বিধায় তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে পারে না। এদের নির্দিষ্ট পেশা থাকায় কাজের উপযুক্ত হলেই পিতামাতাকে সাহায্য করতে হয়। এভাবে তারা শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আবার অনগ্রসর এলাকায় দেখা যায় অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্কুলের স্বল্পতা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব অত্যন্ত প্রকট। বান্দরবন তথা দেশের সবচাইতে দুর্গম এলাকা থানছি উপজেলা। বসবাসরত সম্প্রদায়ের মধ্যে মারমা, মুরং, ত্রিপুরা, বম, চাকমা, খুমী সম্প্রদায়ের লোকই বেশী। বাঙালির সংখ্যাও প্রায় দুই হাজার। একটি মাত্র বেসরকারি হাইস্কুল উক্ত উপজেলায় অবস্থিত। ৫ জন মাত্র শিক্ষক দিয়ে কোনরকম চলছে।[১] উল্লেখ্য একমাত্র চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার হার কিছুটা বেশী বাকি অন্যসব উপজাতির মধ্যে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। জেলে, কুমার, মেথর, চরাঞ্চলের দারিদ্র কৃষক পরিবার, বেদেসহ অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগ না থাকা এবং সচেতনতার অভাবে তাদের অধিকাংশ নারী-পুরুষ, বালক-বালিকাই নিরক্ষর থেকে যায়।

(ঢ) নারী শিক্ষায় পশ্চাৎপদতা:

নারী-পুরুষ সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও বাস্তবে নারী শিক্ষা এখনও পশ্চাৎপদ অবস্থানেই রয়েছে। অনেকেরই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে না করতেই বিয়ে হয়ে যায়, আবার গরিব ঘরের অনেক কন্যা শিশুর অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজের মেয়ে হিসেবে কাজ করতে হয়। যারা বাবা-মায়ের কাছে থেকেও তাদের অনেকের দিন কাটে বাড়ির কাজে সাহায্য করে, খড়ি খুঁটে, শাক কুঁড়িয়ে। পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। তাই তারা স্কুলে যেতে পারে না।

এডুকেশন ওয়াচ এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের নারীরা পুরুষদের তুলনায় স্বাক্ষরতার দিক থেকে ১২ শতাংশ পিছিয়ে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পুরুষ স্বাক্ষরতার হার ৪৭.৬ শতাংশ এবং নারী স্বাক্ষরতার হার ৩৫.৬ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী ৩০ বছরে নারী শিক্ষার অগ্রগতি মাত্র ২৭.৩।[২]

(ণ) কার্যকর স্বাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচির অভাব:

নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ স্বাক্ষরতা উত্তর কার্যকর কর্মসূচির অভাব। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যারা স্বাক্ষরতা অর্জন করেন পরবর্তী সময়ে চর্চার অভাবে তারা আবার পরিণত হয় নিরক্ষরে। কারণ লেখাপড়া শিখে স্বাক্ষরতা অর্জনের পর কৃষকের ছেলেরা যায়, ক্ষেত-খামারে, জেলের ছেলেরা মাছ ধরতে, কুমারের ছেলেরা যায় মৃৎশিল্পে, এভাবে সবাই নিজ নিজ পেশায় চলে যাওয়ায় স্বাক্ষরতার সাথে আর ন্যূনতম সম্পর্ক থাকে না। কোন দেশে মানুষকে কেবল স্বাক্ষর করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। স্বাক্ষরতা উত্তর যাতে শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে, সামষ্টিক জীবনে স্বাক্ষরতার প্রভাব পড়ে এবং প্রতিনিয়ত স্বাক্ষরতার দ্বারা উপকৃত হয় তাকেই প্রকৃত স্বাক্ষরতা বলে।

---

১. গুলশান আরা, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা, ঢাকা-২০০৬, পৃ.৬২

২. বাসন্তি সাহা, ২০০৬ এ বাংলাদেশের নারী: কিছু বাস্তবতা কিছু প্রত্যাশা, স্বাক্ষরতা বুলেটিন, গণস্বাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত (ঢাকা: ১৪৭ তম সংখ্যা ১৩ মে-২০০৬) পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

(ত) প্রতিবন্দিদের উপযোগী শিক্ষার অভাব:

নিরক্ষরদের বড় একটি অংশ শারীরিক অথবা মানসিক প্রতিবন্ধী। অভিভাবক ও সমাজের একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা এই যে, প্রতিবন্ধী হলে তার দ্বারা লেখাপড়া সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ প্রতিবন্ধীরাই যে, চিকিৎসা এবং বিশেষ ব্যবস্থায় লেখাপড়ার সুযোগ আছে তা তারা জানে না অথবা জেনেও কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না। এই প্রতিবন্ধীদের অধিকাংশই আবার গরীব ঘরের সন্তান। দক্ষিণ এশীয় বিষয়ক ডিপিও কর্মশালায় উপস্থাপিত তথ্য মতে, বিশ্বের গরীব শ্রেণি মানুষের ২০ শতাংশই প্রতিবন্ধী। উন্নয়নশীল দেশে ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী স্কুলে যায় না। এছাড়া প্রতিবন্ধী মাতৃ মৃত্যুর হার ৮০ শতাংশ।[১]

(থ) সামাজিক সচেতনতার অভাব:

সামাজিক সচেতনতার অভাবে অযুত মানব সন্তান নিরক্ষরতার অতল গহবরে তলিয়ে যায়। শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে না পারলে এ অবস্থা চলতেই থাকবে। শিক্ষা, স্বাক্ষরতা সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিকল্প নেই। নিরক্ষরতা দূরীকরণকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ না দেয়া নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ।

(দ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নিরক্ষরতার জন্য কম দায়ী নয়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য কথায় কথায় হরতাল, অবরোধ, গাড়ি ভাংচুর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তালা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

(ধ) শিক্ষা ব্যবস্থায় এনজিও এবং বিদেশী প্রভাব:

বিদেশী টাকায় পরিচালিত বিভিন্ন এনজিও শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে কাজ করে। উক্ত শিক্ষা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাহযিব তামুদ্দুনের পরিপন্থীও হতে পারে। বিশেষ করে দাতা দেশগুলো তাদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি নিজ দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে গিনিপিগ হিসেবে গরীব দেশগুলোতে পরীক্ষা চালায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, উক্ত কর্মসূচিগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের ৩০টি উপজেলার ৩১৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মনিটরিং এর দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণের শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করেছে বলে মনে করছে অনেকেই। আত্মঘাতী এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশের শিক্ষক সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ ফুঁসে উঠেছে।[২] অথচ প্রাথমিক শিক্ষা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্ভর দেশের ভবিষৎ। কোমলমতি শিশুকে যেভাবে গড়ে তোলা যায় সেভাবেই গড়ে ওঠে এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি। সে যে পরিবেশে লালিত-পালিত হয় ভবিষ্যতে তার অনেক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের নিজস্ব আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচারের মধ্যে শিশুরা বেড়ে উঠবে এগুলো তাদের নাগরিক অধিকার।[৩] এই অধিকারটুকু খর্ব করে অপসংস্কৃতি, ভিন্ন আদর্শ চাপিয়ে দিলে শিক্ষার কাঙ্খিত ফলের পরিবর্তে ক্ষতির পরিমাণ হবে বেশী।

---

১. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা-৪ জুন-২০০৭, পৃ.১১
২. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা-২৯ মে-২০০৮, পৃ.১
৩. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এনজিও করণ, ঢাকা: দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ জুন-২০০৮, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

কচি মনের শিশুদের সুপ্ত মেধার যথার্থ বিকাশ প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই ঘটে থাকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার মত এত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে এনজিওদের হাতে ছেড়ে দিলে শিক্ষিত জাতি গঠনের কার্যক্রম অক্টোপাসের জালে আটকা পড়ে। শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ থাকা সত্ত্বেও ব্র্যাকের নিয়ন্ত্রণে প্রদানের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক। ইতিহাস বলে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ শিক্ষা কার্যক্রম এনজিওদের দায়িত্বে অর্পণ করেছিল তাদের পরিণতি হয়েছিল মেধাশূন্য জাতির বিস্তার।[১]

(ন) কিশোর অপরাধ:

মাদকদ্রব্য, অশ্লীল সিনেমা নিরক্ষরতার জন্যকম দায়ী নয়। সাম্প্রতিক সময়ে কিশোর অপরাধ মারাত্মকভাবে বেড়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অনেক ছাত্রই বর্তমানে মাদকের নীল ছোবলে আক্রান্ত। ঘরে-ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, মোড়ে মোড়ে সিডির দোকান, ডিশ এন্টেনার বদৌলতে অশ্লীল ছবি, কিশোর-কিশোরীদের লেখাপড়া বিমুখ করছে। শিশু-কিশোরদের ব্যবহার করা হচ্ছে সন্ত্রাসের কাজে।

(প) ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা:

অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো মোটেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় নয়। তা ছাড়া ৬০/৭০/৮০ জন ছাত্রের একটি ক্লাসের জন্য সময় বরাদ্দ থাকে মাত্র ৪০/৪৫ মিনিট সময়। এত অল্প সময়ে তিনি কোনক্রমেই ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে পাঠদান করতে পারেন না। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, "আখাউড়ায় পরিত্যক্ত ভবনে পাঠদান যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা।" বজ্রপাতের শব্দ শুনলেই ভোঁ দৌড় দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয় ভবন ভেঙ্গে কখন যে আবার অঘটন ঘটে যায়।[২] অন্য একটি খবরে বলা হয়, "শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ক্লাস করছে।"[৩] বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যাওয়ায় উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মানসিক চাপ: প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানসিক চাপ প্রচণ্ডভাবে লক্ষ্য করা যায়। ক্লাস রোলের ভিত্তিতে ভাল-মন্দের বিচার হওয়ায় অনেক প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী মুখস্থ বিদ্যায় ভাল না করায় অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়ায় কম নম্বর পায়। ফলে তার মধ্যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়।

উপরন্তু নিরক্ষরতার জন্য যে সকল করণ দায়ী তা হ'ল:

(১) অভাব অনটনের সংসার।

(২) দিনব্যাপী কঠোর ও কঠিন পরিশ্রমের ফলে স্বাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার মত সুযোগ ও আগ্রহ নিরক্ষর, গরীব মানুষদের থাকে না।

(৩) দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে অভিভাবকরা অন্ন-বস্ত্র ক্রয় করতেই হিমশিম খেয়ে যায়। শিক্ষাপোকরণ, শিক্ষা ব্যয় তাদের কাছে বিলাসিতার নামান্তর।

(৪) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার অভাব।

(৫) প্রয়োজনীয় শিক্ষাপোকরণের অভাব।

---

১. দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ জুন-২০০৮, পৃ. ১৩
২. দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ জনু-২০০৮, পৃ.১৫
৩. দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ জুন-২০০৮, পৃ.৫

Dhaka University Institutional Repository

মানব জীবনে নিরাপত্তর প্রভাব:

মানব জীবনে নিরক্ষরতার নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক, সুদূরপ্রসারী, ভয়াবহ ক্ষতিকর। বলা হয়ে থাকে শিক্ষাহীন মানুষ পশুর সমান। শিক্ষাই পারে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করতে। তবে সে শিক্ষা অবশ্যই নৈতিকতা নির্ভর সুশিক্ষা হতে হবে। কুশিক্ষা শিক্ষাই নয়। কুশিক্ষা অশিক্ষার চেয়েও ক্ষতিকর। সুশিক্ষায় থাকবে মনুষত্বের লালন এবং পশুত্বের দমন। বিশ্ববাসী তথা বিশ্বমানবতার জন্য অকল্যাণকর, বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি, মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর তার সবই নিরক্ষরতার ফল। এর কোনটি নিরক্ষরতার সাথে সরাসরি প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত আবার কোনটি পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। তার প্রধান প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হ'ল:

দারিদ্র্য: শিক্ষা হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। বলা যায় শিক্ষার ও দরিদ্রতার অবস্থান বিপরীত মেরুতে। নিরক্ষরতার অনিবার্য ফল হল দারিদ্র্যতা। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে সকল দেশে শিক্ষার হার কম সেখানে দরিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার উর্ধ্বমুখী। মহানবী (স.) বলেন: "দারিদ্র মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।"[১]

কার্যত দারিদ্র্য হল রক্তের শূন্যতা বিশেষ। অর্থ সম্পদ মানুষের জন্য সে কাজ করে যা রক্ত করে মানুষের দেহের জন্য। রক্ত মানুষের দেহ ও জীবনের স্থিতির নিয়ামক। রক্ত-স্বল্পতা দেখা দিলে মানব দেহ নানা দুরারোগ্য ব্যধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে অর্থসম্পদ না থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে। তা যেমন ব্যক্তিজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তেমনি করে সামষ্টিক জীবনে। কারণ, মানুষের আর্থিক প্রয়োজন দেখা যায় জন্মমুহূর্তে থেকেই। অর্থসম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোন শক্তি বা মান-মর্যাদা থাকেনা তেমনি দরিদ্র জাতিও বিশ্ব জাতিসমূহের সামনে সম্মান সম্ভ্রম থেকে হয় বঞ্চিত।[২] দারিদ্র্যতা দূরীকরণে শিক্ষার অবস্থান অনস্বীকার্য।

বেকারত্ব: বেকারত্ব নিরক্ষরতার অনিবার্য ফল। যা মানবতার জন্য অভিশাপ। বেকারত্ব বলতে কর্মহীন, জীবিকাশূন্য অবস্থাকে বুঝায়। কাজ করার শক্তি, সামর্থ ও ইচ্ছা থাকার পরও কর্ম না পাওয়ার দরুন বসে থাকাকে বেকারত্ব বলে। নিরক্ষর জনগোষ্ঠী শিক্ষার অভাবে নিজ নিজ পেশায় নৈপূণ্য বিকাশ করতে পারে না। অপরদিকে স্বাক্ষর জনগোষ্ঠী নানাবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উদ্যোক্তা, উন্নয়ন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

অষ্টাদশ শতকে বর্তমান পরাশক্তি জাপান যখন নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখন দেশটিতে বেকারত্বের হার ছিল অনেক বেশী। পরবর্তী সময়ে তারা দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে উনিশ শতকের শেষদিকে ইউরোপের সর্বোচ্চ শিল্পোন্নত দেশের সমপর্যায়ে আসে। উল্লেখযোগ্য, খনিজ সম্পদ না থাকা সত্বেও বহিবিশ্ব থেকে আমদানিকৃত কাঁচামালের সদ্ব্যবহার করে তখুনি দেশটি শিল্প উৎপাদনে এক তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। এটা সম্ভব হয় প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করে দেশব্যাপী ছড়ানো যন্ত্রাংশ নির্মাণের নেটওয়ার্ক এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্পে তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগত শিক্ষা পদ্ধতি এবং প্রায়োগিক কৌশল ব্যবহারের দরুন।[৩]

---

১. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল-কোরআনে রাষ্ট্র ও সরকা, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৫৫, পৃ.৩১৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৬
৩. হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সূচিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা-২০০২, পৃ.৫৯৯

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পে উন্নত হলেও ১৯৬০ এর দশকের আগে জাপান ছিল একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে তাকে পূরণ করতে হত ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি। জাপানের বেশিরভাগ ভূমি পর্বতময় এবং কঙ্করাকীর্ণ বলে ভূমির উর্বরতাশক্তি ছিল খুবই কম। উর্বরতা বাড়ানোর নিজস্ব কৌশল অবলম্বন এবং সমুদ্র থেকে ড্রেজিংয়ের সাহায্যে ভূমি উদ্ধার প্রকল্প নিয়ে সে দেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণ খাদ্য ঘাটতি সমস্যার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন।

ভূমি উদ্ধার এবং নিজেদের উন্নত চাষ পদ্ধতির ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানে প্রতি একর জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে এখন চারগুণের বেশী হয়েছে। এদিকে একই জমিতে উপরের দিকে কয়েক তলা পর্যন্ত চাষের জমির ছাদ বানিয়ে গ্রীণহাউস পদ্ধতিতেও তারা দূর করছে উর্বর জমির অভাব এবং উৎপাদনের ঘাটতি। দেশের কোথাও এক ইঞ্চি জমি অনাবাদি রাখছেনা তারা। জমি অনাবাদি রাখা সে দেশে বেআইনী।[১] নিরক্ষরতার কারণে সম্পদের অপচয় হয়। এ অপচয় ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে বা জাতীয়ভাবে হতে পারে। যা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি ও দেশকে দরিদ্র করে দেয়।

নিরক্ষরতার কারণে ব্যক্তি ও জাতি সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না। নিজেদের ভাগ্যন্নোয়নে তারা গ্রহণ করতে পারে না কোন উচ্চ পরিকল্পনা। ফলে তারা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির পথও খুঁজে পায়না।

অদক্ষ জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়:

মানব জীবনের জন্য অকল্যাণকর সকল কিছুই নিরক্ষরতার ফল। নিরক্ষর জনসংখ্যাকে জনশক্তি ও সম্পদের পরিণত করা যায় না। একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ঐ দেশের বড় নিয়ামত। কিন্তু নিরক্ষর জাতি নিজেদের সম্পদ নিজেদের ভাগ্যন্নোয়নের কাজে লাগাতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা শুধুই সমস্যা নয়, অপর সম্ভাবনাও বটে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসংখ্যা জনশক্তিকে রূপান্তরিত করে নিজেদের উন্নয়ন করা সম্ভব।

সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, একটি দেশের উন্নয়নের শতকরা ৬৪ ভাগ আসে মানবসম্পদ থেকে। ২০ শতাংশ আসে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং বাকি শতকরা ১৬ ভাগ আর্থিক মূলধনের উপর নির্ভরশীল।[২]

উক্ত সমীক্ষা থেকে বুঝা যায় যে, জনসংখ্যা শুধু সমস্যা নয়, সম্পদও বটে। ২০০১ সালে UNDP পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে সকল জাতি শিক্ষা তথা লেখাপড়ার মধ্যে যতবেশী সময় ব্যয় করে তারা তত উন্নত। ঐ প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৫ বছরের উর্ধ্ববয়সী বাংলাদেশীরা স্কুলে মাত্র ২.৬ বছর লেখাপড়া করেছে, সেখানে দক্ষিণ কোরিয়ার একই বয়সী ১০.৮ বছর স্কুলে লেখাপড়া করেছে, আর জাপান ৯.৪ বছর। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাত বাংলাদেশে ১.১, পাকিস্তান ১.৯, ভারত ১.৭, ইন্দোনেশিয়া ৩.১, দক্ষিণ কোরিয়া ১৩.০ এবং জাপান ১০.০।

বিদ্যুৎ সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন। দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, জনশক্তি, জনসম্পদ, এসব শব্দের সাথে বিদ্যুতের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষার হার দেশে মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জনপ্রতি বাংলাদেশে বিদ্যুতের ব্যবহার ৯৯ কিলোওয়াট, পাকিস্তানে ৩৩৭ কিলোওয়াট, ভারতে ৩৮৪ কিলোওয়াট, ইন্দোনেশিয়ায় ৩২০ কিলোওয়াট, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪৪৯৭ কিলোওয়াট এবং জাপানে ৭৩২২ কিলোওয়াট।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৯
২. মনিরুজ্জামান মিঞা, শিক্ষা ও উন্নয়ন: বাংলাদেশের সামগ্রিক চিত্র, দৈনিক ডেসটিনি, ৯ জুন, ২০০৮, পৃ.৩০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় আমিত সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদ যথাঃ তেল, গ্যাস, স্বর্ণ, রৌপ্য, হিরক ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ সম্পদ, নদী, সাগর, পাহাড়, মৎস সম্পদ, বনজসম্পদ, পর্যটন সম্পদ ইত্যাদি থাকার পরেও শিক্ষা ও দক্ষ জনসম্পদ না থাকায় তাদের সম্পদ নিয়ে বিদেশীরা ভাগ্য গড়লেও নিজেদের ভাগ্যন্নোয়নে এ সম্পদ কোন কাজে লাগাতে পারে না।

অপরিকল্পিত জীবনঃ

নিরক্ষর মানুষের জীবনে কোন বিষয়ে সুষ্ঠ, সঠিক পরিকল্পনা থাকে না। সুশিক্ষিত বিবেকবান মানুষের সকল কাজই পরিকল্পিতভাবে কোন না কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্যহীন কাজ শুধুমাত্র উন্মাদের ক্ষেত্রেই মানায়। মহান আল্লাহ্ সুন্দর এ পৃথিবীকে বিনা পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। তাই তার সুনিপুণ সৃষ্টিতে ভারসাম্যহীনতা ও অসামঞ্জস্যতার প্রমাণ মিলেনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও। কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ। তোমার দৃষ্টিতে ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।"[১]

মহান আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকি চলতে পারে না। স্বাভাবিক প্রয়োজনেই তাকে সামাজিক, পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। এজন্য তার থাকতে হয় একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা। কিন্তু নিরক্ষর মানুষের মাঝে যা প্রায়ই অনুপস্থিত দেখা যায়।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের শিকারঃ

নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয় অতি সহজেই। তাদের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাকে পুজি করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদেরকে শোষণ করলেও এ ব্যাপারে তারা কিছুই না বুঝে নিজেদের ভাগ্য হিসেবে মেনে নেয়। নিতান্তই অভাবের তাড়নায় তারা গ্রাম্যমহাজন অথবা বিভিন্ন সুদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদে টাকা নেয় পরবর্তী সময়ে সে টাকা আর যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারেনা। চক্রবৃদ্ধির হারে বাড়তে থাকে সুদের বোঝা। এক সময় সহায় সম্বল, ভিটে-মাটি বিক্রি করে সুদ পরিশোধ করতে হয়। এমনকি সুদের বলি হতে হয় অনেককে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, 'ধানের বদলে প্রাণ দিল আশরাফ' শিরোনামে একটি সংবাদ। নিতান্তই অভাবে আশরাফ (৩৫) চার মাস আগে মাত্র ৭০০ (সাতশত) টাকা ধার নিয়েছিল একই গ্রামের (সুদি) মহাজন বাচ্চু শিকদারের কাছ থেকে। কথা ছিল ধান উঠলেই কর্জকৃত টাকার বিপরীতে দিতে হবে সাত মন ধান। কিন্তু অভাবী সংসারে সে ধান কিংবা নগদ টাকা দিতে না পারায় মহাজনের লোকেরা তাকে বাড়ি থেকে মাঠের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধোর করলে তার অবস্থা সংকটাপন্ন হলে তার মুখে কিটনাশক ঢেলে রেখে যায়। এভাবে মৃত্যু হয় আশরাফের।[২] এভাবে আশরাফদের মত কত অসহায় মানুষদের সমাজের এক শ্রেণি শোষক নিরক্ষরতা আর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শোষণ করছে তার ইয়ত্তা নেই।

এভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে নিরক্ষর দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরও দরিদ্র হচ্ছে এবং মহাজন ধনী শ্রেণি আরো ধনী হচ্ছে। এছাড়াও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির টাউট নিরীহ মানুষের সহায়-সম্পত্তি, জমিজমা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নেয়।[২]

১. আল-কোরআন, ৬৭:৩-৪
২. দৈনিক যায় যায় দিন, ১৬ জুন-২০০৮, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠী সবসময়ই রাজনীতিকদের শোষণের নির্মম শিকার। নির্বাচনের সময় আসলে হাসিমুখের দু'টো কথা, পান, বিড়ি, সিগারেট, গরম চা, উষ্ণ করমর্দনে আর নগদ কয়েকটি টাকায় ভুলে গিয়ে তারা এমন ব্যক্তিদেরকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করে যারা এসকল জনগণকে নিজেদের স্বার্থের জন্য বলির পাঠা হিসেবে ব্যবহার করে, বঞ্চিত করে তাদের ন্যায্য হক থেকে।

নিরক্ষরতার অন্যতম ফলাফল হলো নারী নির্যাতন ও নারী অবমূল্যায়ন। শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠী নারীর যথাযথ মূল্যায়ন অনুধাবন করতে পারেনা। শিক্ষা, সমতা, উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষার্জনের পথে নারী নির্যাতন ও নারীর অবমূল্যায়ন একটি প্রতিবন্ধকতা। নারী নির্যাতন যেমন মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা দলিত করে। তেমনি নারী অধিকার ক্ষুন্ন করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, নিরক্ষর নারী ও শিশুরা পাচারকারীদের প্রলোভনে পড়ে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। গত ১৯শে জুন ২০০৮ ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ "স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) আবদুল মতিন মঙ্গলবার সি.আই.ডি'র বিশেষ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নারী ও শিশু পাচার সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তাকে ভয়াবহ বললেও কম বলা হবে। চার লক্ষ বাংলাদেশী নারী পাচার হয়ে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেহব্যবসা করতে বাধ্য হচ্ছে। এর বাইরে আরও তিন লক্ষ বালক পাচার হয়ে গেছে সে দেশটিতে। ২০০০ হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ২ হাজার ৪০৫ জন বাংলাদেশী শিশু নিখোঁজ হয়েছে।"[১] অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, কম শিক্ষিত দেশ থেকে উন্নত দেশে পাচার হয়ে থাকে।

আল্লাহর আদেশ অমান্য করার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি:

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র গ্রহণযোগ্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলা পথহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল স্ব-স্ব জাতির শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা স্বীয় জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েচেন। নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁদের ইহ্কালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ। কিন্তু জাতির অহংকারী, অজ্ঞ নিরক্ষর জনগোষ্ঠী নবী-রাসূলদের অমান্য করে নিজেদের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনকে ধ্বংস করেছিল। নিরক্ষর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নিরক্ষর অজ্ঞ লোকেরা সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের কথায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের শুধু অমান্যই করেনি, প্রচণ্ড বিরোধীতাও করেছে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে অক্ষমতা:

নিরক্ষরতার অন্যতম প্রভাব হল, নিরক্ষর পিতা-মাতা/অভিভাবক তাদের সন্তানদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে না। নিজেদের শিক্ষার সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক না থাকায় শিক্ষাকে তারা লাভজনক মনে করেনা। প্রায়ই তারা সন্তানকে লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ দিতে পারে না।

ভিক্ষুক ও ভবঘুরের বৃদ্ধি:

ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা যা নিরক্ষরতার পরোক্ষ পরিণতি। একজন শিক্ষিত মানুষ কখনই অন্যের বোঝা হয়না। নিরক্ষরতা জনগোষ্ঠী ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় নিরাপত্তাহীনতা, গ্রাম্য শোষণ-নির্যাতন, কুসংস্কার ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেয় পরিণত হচ্ছে। ভিক্ষাবৃত্তি একটি জাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ। ভিক্ষুক ও ভবঘুরেরা একদিকে সমাজে পরগাছা ও নির্ভরশীল হিসেবে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দুর্বল করতঃ জাতীয় উন্নয়নকে ব্যহত করে। অন্যদিকে সমাজে সৃষ্টি করে নানা সামাজিক সমস্যা। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে জানা যায়, ভিক্ষুকদের অধিকাংশই নিরক্ষর, অলস, দৈহিকভাবে পুঙ্গ ইত্যাদি।

ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম সমস্যা। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সর্বোপরি নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

১. দৈনিক যুগান্তর, ১৯ জুন-২০০৮, পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

ইসলামের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ব্যাপকতা

* শিক্ষা কি ও কেন?
* ইসলাম ও শিক্ষা
* ইসলামের জ্ঞান ও শিক্ষার অবস্থানগত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
* ইসলামের শিক্ষাবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা কি ও কেন?:

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ 'তালিম' যার মূল হল ইলম বা ইংরেজিতে Knowledge. 'তালিম' অর্থ শিক্ষা গ্রহণ বা গ্রহণে সহায়তা করা।

শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education' এর উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Educare বা Educatume হতে। Educare অর্থ Reading বা লালন-পালন করা, Educare অর্থ ভেতর থেকে বাইরে আনা, আর Educatume অর্থ প্রশিক্ষণ দান।

শিক্ষার উপরোক্ত আভিধানিক অর্থ থেকে এর সংজ্ঞা তেমন পরিষ্কার করে প্রকাশিত হয়নি। তাই আর একটু এগিয়ে দেখা যাক World book of Encyclopaedia তে শিক্ষার সংজ্ঞা কিভাবে দেয়া হয়েছে, "Education is the process by which people acquire knowledge, skills, habits, values of attitudes''[১]

অর্থাৎ শিক্ষা এমন একটি পদ্ধতির নাম যার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান, দক্ষতা, অভ্যাস, মূল্যবোধ কিংবা আচরণ আয়ত্ত করে থাকে।

এতে পরবর্তী পর্যায়ে যা উল্লেখ করা হয় তাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্ক পরিষ্কার ধারণা ফুটে ওঠে, Education should help people become useful members of the society. It should also help them develop an appreciation of their cultural heritage and live more satisfactory lives. Education is continious process through which mental, physical and moral training is provided to new generation who also acquire their ideals and culture through it.[২]

বিশ্ব মনিষীদের কেউ কেউ মনে করেছেন, নিজেকে জানার নামই শিক্ষা।[৩] কেউ মানুষের ভেতরের আসল মানুষটির পরিচর্যা করে তাকে খাঁটি করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যে শিক্ষার সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছেন।[৪] আবার কেউবা খুদির উন্নয়নের মধ্যেই শিক্ষার বীজ রোপিত বলে ধারণা দিয়েছেন।[৫] পাশ্চাত্যের অন্যতম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ Prof. Heman H. Home তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন: "Education is the eternal process of superior adjustment of the physical and mantaly developed free and conscious human being to God as manifested in the intellectual emotional and volitional environment of man.'' শিক্ষা বলতে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত মুক্ত মানবত্মাকে মহান স্রষ্টার সাথে সমন্বিত করার চিরন্তন প্রক্রিয়া বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৬] তবে শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট।

---

১. World Book of Encyclopaeda, United States, Vol-3, P.561
২. Ibid.
৩. সক্রেটিস মনে করতেন Education is to know thyself.
৪. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধারণা প্রদান করেন। শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বেশ সমৃদ্ধ। শিক্ষা, রাশিয়ার চিঠি প্রভৃতি প্রবন্ধগুলোতে তিনি শিক্ষার সার্বজনীন উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা এবং তা সমাধানের উপায় ইত্যাদি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।
৫. ইসলামী দার্শনিক ও বরেণ্য কবি আল্লামা ইকবাল মনে করতেন মানুষের 'খুদি' বা আত্মার উন্নয়ন যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব তাকেই শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।
৬. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মনে করতেন, 'শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করে, শিক্ষা ছাড়া মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। মহানবী (স.) ইরশাদ করনে, 'জ্ঞান অন্বেষণ করা সকল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।[১]

এ অবস্থায় ওপরে উপস্থাপিত ধারণার আলোকে শিক্ষার যে সংজ্ঞা দাঁড়ায় সংক্ষেপে তা হল মানুষকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট জীব হিসেবে মনুষত্ব ও মানবিক মূল্যবোধে বিকশিত করে তোলার পাশাপাশি দুনিয়াদারী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে তৈরি করার জন্য পরিচালিত প্রয়াসের নামই শিক্ষা।

শিক্ষাটা অর্জনের বিষয়, এটা উত্তরাধিকার সূত্রে বা জন্মসূত্রে কেউ পায় না। জন্মের পর থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। এর মধ্যে কিছুটা সময় চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার থাকে একটি নির্দিষ্ট সিলেবাস পাঠ্যসূচি, শিক্ষা কারিকুলাম। বিশেষ বিশেষ কারিকুলাম বা সিলেবাস মানুষকে বিশেষ বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানী করে তোলে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। প্রতিটি মানব শিশুর মধ্যেই কিছু প্রতিভা সুপ্ত থাকে, উপযুক্ত চর্চা পেলে এগুলো বিকশিত হয়, আর যথাসময়ে যথাযথ চর্চা না করা হলে এসব প্রতিভা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। মানব শিশুর ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে জীবন যাপনের প্রক্রিয়াগুলো জানিয়ে দেয়া হয়। মানুষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তা জানতে হলে শিক্ষালাভ করতে হবে। ব্যক্তির সব বৈশিষ্ট্য ও গুণের বিকাশের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই।

ক্রমবিকাশমান মানবসভ্যতার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে হলে লিখতে পড়তে জানতে হবে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারা ও গতি-প্রকৃতি বুঝতে হলে এ সম্পর্কে পড়তে হবে এবং এর জন্য দরকার শিক্ষা। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর জীবনধারা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য শিক্ষা দরকার। শিক্ষা ছাড়া, লেখাপড়া ছাড়া অন্যকে জানার উপায় একেবারেই ক্ষীণ।

যে ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম, তাকে আয়ত্ত করতে হলে লিখতে পড়তে জানতে হবে। পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা আছে। এর মধ্যে কিছু কিছু ভাষা আছে খুবই সমৃদ্ধ। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যকে ধারণ করতে ভাষা জানা দরকার। মাতৃভাষার সাথে সাথে ভিনদেশীয় ভাষাও জানতে হয়। ভিন্ন ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব এবং এতে করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সকলের মধ্যে ভাগাভাগি করে তাকে আরো সমৃদ্ধ করা যায়। ভাষা বিশ্বমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের, সেতুবন্ধন রচনার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই মাধ্যমকে আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।[২]

বিশেষ বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞান যা জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি তা অর্জনের জন্য শিক্ষা আবশ্যক। আইন, চিকিৎসা, প্রকৌশল, চারুকলা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে, ব্যবহারিক জীবনে এসব কাজে লাগাতে হলে শিক্ষালাভ করতে হবে। আধুনিক যুগে এসব বিষয়ে উচ্চতর ও উন্নত

---

১. আল-হাদীস সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম।
২. গাজী শামসুর রহমান, মানবাধিকার ভাষ্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ.৫২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই এখন এসব ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সনদ না থাকলে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো যায় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হলে এ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে হবে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অভাবিত উন্নতি হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এখন এর ব্যবহার হচ্ছে। এই ব্যবহারকে বাস্তবানুগ এবং যথাযথ করতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কলাকৌশল এবং সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সময়ের অনেক পিছনে পড়ে থাকতে হবে। তাই বর্তমানে বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যারা লিখতে পড়তে পারে না, যারা শিক্ষালাভ করেনি, বর্তমান সময়ে তাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হবে। এই অসুবিধাগুলো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে খুবই বিপদজনক।

প্রথমত: উৎপাদনের যে কোন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য উৎপাদনের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থানা আবশ্যক। সেটা কৃষি, শিল্প বা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। এই জ্ঞান না থাকলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় না। এই জ্ঞান, জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষা না থাকলে উন্নত জীবিকা অর্জন প্রায় অসম্ভব। আর জীবিকা উপার্জন ছাড়া বেঁচে থাকা খুবই কঠিন।

দ্বিতীয়ত: নিজের এবং পরিবারের সদস্যাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা জরুরি। শিক্ষা ছাড়া এ জ্ঞা অর্জনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে শিক্ষা না থাকলে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। নিতান্ত অশিক্ষার কারণেই তৃতীয় বিশ্বের অনেক মানুষ অপুষ্টি ও বিভিন্ন ধরণের রোগে ভোগে।

তৃতীয়ত: জীবন হচ্ছে আদর্শ নির্ভর। জীবনযাপনের জন্য একটি জীবন দর্শনকে অবলম্বন করা চাই। একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, দর্শন অবলম্বন করা ছাড়া জীবন যাপন সম্ভব নয়। জীবন দর্শন অবলম্বন করতে হলে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষা ছাড়া জীবনে কোন আদর্শ অবলম্বন করা, মেনে চলা কঠিনই নয় শুধু, প্রায় অসম্ভব। যারা শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি, বা করেনি, তাদেরকে জীবনের পদে পদে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনকে জটিল করে তুলেছে। এ জটিল জীবন শিক্ষা ছাড়া পরিচালনা করা অসম্ভব।[১]

যারা শিক্ষিত এবং যারা শিক্ষিত নয়, তারা কি এক? যোগ্যতা তৎপরতায় তারা কি সমান? নিশ্চয়ই নয়?

আইন প্রণয়ন, বিচারকার্য সম্পাদন, প্রশাসন পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি সম্প্রসারণ, শিল্প উৎপাদনসহ সকল কাজ কর্মে শিক্ষিত লোকজন যে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পরে,

১. প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৭

Dhaka University Institutional Repository

যার শিক্ষা নেই তার পক্ষে ততটুকু যোগ্যতা প্রদর্শন দক্ষতার পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। অবশ্য সামান্য ব্যতিক্রম যা হয়, তা সাধারণ নিয়ম হিসেবে গ্রাহ্য নয়। তেমনিভাবে যিনি শিক্ষিত এবং যিনি শিক্ষিত নন সেই দুই ব্যক্তি স্বীয় কর্মক্ষেত্রে সমান তৎপর হতে পারে না।

শিক্ষিত লোক তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকেন। তিনি মনিষীদের জীবন পর্যালোচনা করে নিজের জীবনের ছক বা নকশা তৈরি করে নেন। জীবনের ভালমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ-অশুভ সম্পর্কে পূর্ণ সতর্ক হয়ে তিনি দৈনন্দিন জীবনের কর্ম তৎপরতাকে নিয়োজিত করেন। শিক্ষা মানুষকে জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন ও দূরদর্শী করে। একজন শিক্ষিত লোক যতটা সচেতন, দূরদর্শী ও পরিণামদর্শী হন অশিক্ষিত লোক ততটা হন না, হতে পারেন না।

শিক্ষা যেহেতু জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, শিক্ষা ছাড়া যেহেতু মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়, প্রগতিশীল মানব সমাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত ও একাত্ম করার জন্য শিক্ষার যেহেতু বিকল্প নেই, সেহেতু মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ ও অর্জন করতেই হবে। মানুষের মতো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য, জীবনের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য শিক্ষা অর্জন করতে হবে। যথার্থ শিক্ষা লাভ না করলে শারীরিক উন্নতি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হবে, তাই মানুষকে শিক্ষালাভ করতেই হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। মানুষ যে সব অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যে সব অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না, সে সবের মধ্যে শিক্ষার অধিকার অন্যতম। জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এই অধিকার।[১]

মানব জীবনের অপরিহার্য মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতোই জরুরি এই মৌলিক অধিকার। খাদ্য, কাপড়, বাসগৃহ এবং ঔষুধ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে পরিশীলিত করে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, মানুষকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখায়, মানুষের বসবাস উপযোগি একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাই শিক্ষা লাভ করা মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমেই ঘটে থাকে একটি জাতির উৎকর্ষতা ও বিকাশ। এই উৎকর্ষতা ও বিকাশ মানবিক ও আত্মিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার অবকাশ রাখে। আধুনিক মনিষীদের দৃষ্টিকে Economic employment এর জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাঁর আরো মনে করেন Education is a key to development. আধুনিক এসব অর্থনীতিবিদ নিরক্ষরতাকে প্রগতির পথে মহাপ্রতিবন্দকরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে দেশের জনসংখ্যায় নিরক্ষরতার প্রাবল্য উন্নয়ন কর্মে বিরাট বাঁধার সৃষ্টি করে।

১. প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৮

Dhaka University Institutional Repository

Bowman and Anderson স্বাক্ষরতার হার এবং মাথাপিছু আয়ের মধ্যে অনুবন্ধ (Correlation) পরীক্ষা করে যা বলেছেন তার অর্থ হলো, উচ্চ স্বাক্ষরতার হার (৯০% ও তদুর্ধ্ব) ও উচ্চ মাথাপিছু আয়ের (বার্ষিক পাঁচশ ডলারের উর্ধ্বে) মধ্যে, আর নিম্নস্বাক্ষরতার হার (৩০% এ নীচে) ও নিম্নমাথাপিছু আয়ের (বার্ষিক দু'শ ডলারের নীচে) মধ্যে উল্লেখযোগ্য উচ্চ অনুবন্ধ পাওয়া যায়।[১]

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Harbition মনে করেন, নিরক্ষরতার গ্লানি থেকে চাষী মজুরদের মুক্তিদানকে একটি নিশ্চিত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এও সত্য যে, স্বাক্ষরতা ব্যতিরেকে কোন প্রকার কৃষিজীবীরা প্রগতিশীল হয়েছে এমন ঘটনা জগতে কোথাও ঘটেনি।[২]

সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, কৃষি উন্নয়নের পিছনেও স্বাক্ষরতার গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই শিক্ষা অর্জন করতে হবে বা এটিই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এমন কথা ভাবা নিরেট বস্তুবাদিতার নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুগত বা বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকারের কোন উপায় নেই। কিন্তু শুধু সেই শিক্ষা যা কেবল মানুষের বাইরের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন বা আত্মার বিকাশের প্রয়াসকে গৌণ করে তোলে সেই শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত ও চিরস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না এ সত্য বিশ্বে আজ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ যে আত্মা মানুষকে পরিচালিত করে তা যদি যথার্থ পথের দিশা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে যত মেধা-মস্তিষ্ক সম্পন্ন নিখুঁত পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যত লজিস্টিক সার্পোটই দেয়া হোক না কেন তার দ্বারা সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের যে বিকাশ তা হতে হবে অবশ্যই সুষম, অর্থাৎ তার দেহ আর আত্মা যেন শিক্ষায় সমন্বিতভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেদিকটি বিবেচনায় আনতে হবে। আর মানুষের এই সুসমন্বিত বিকাশের জন্য এমন একটি যুগোপযোগী ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন যার মাধ্যমে জাতি একই সাথে মানবিক ও আত্মিক উৎকর্ষতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। এ দিকটি সামনে রেখে জাতিকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ও উন্নয়ন। এর মাধ্যমেই সম্ভব জাতিকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার আসল প্রয়োজন এখানেই নিহিত।

ইসলাম ও শিক্ষা:

ইসলাম বিশ্ব মানবতার ধর্ম। অপার মহিমা ও গৌরব বিকশিত করার লক্ষ্যে মহান স্রষ্টা এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) মানুষের মধ্যে নিহিত আছে অশেষ ও অনন্ত সুপ্ত প্রতিভা। যে প্রতিভা বিকাশ সাধনে প্রয়োজন হয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় দিক নির্দেশনা সম্বলিত বিধি বিধান। তাই সৃষ্টির আদি যুগ থেকে মানুষের সঠিক পরিচয় ও মানবতা বিকাশের জন্যে বিশ্বনিয়ন্তা লক্ষ লক্ষ মহামানব বা রাসূল পাঠিয়েছেন।

---

১. মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, স্বাক্ষরতা ও স্বাক্ষরতা পদ্ধতি, ঢাকা, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ ১৯৭৯, পৃ.৫ এর সূত্রে আবু হামিদ লতিফ তাঁর 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা' গ্রন্থে এই মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। (প্রকাশক বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯০/ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ১০০)

২. প্রাগুক্ত, পৃ.১০১

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে নবী-রাসূল পাঠানো হয়নি। আল কোরআনে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন, আদি পিতা হযরত আদম (আ.) হতেই চলতে থাকে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য পয়গাম্বর প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি। এ শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল ইসলামী বিধান। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মহান শিক্ষক পাঠাবার লাগাতার ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমনে। জ্ঞান মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে যায়। যথার্থ শিক্ষা লাবের মাধ্যমে মানব জীবন যাতে সুখী ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তজ্জন্যে ইসলামে শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামে শিক্ষার সূত্র হলো পবিত্র কোরআন ও হাদীস। এই উভয়ের মধ্যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, শিক্ষার অর্থ, লক্ষ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্য বাণী রয়েছে। সে সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষাঃ

মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে যতাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য আল্লাহ ত'য়ালা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে যে জীবনবিধান অনুমোদন করেছেন তাই ইসলাম। আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলামই গ্রহণযোগ্য দীন[১] এবং অন্য কোন দীন বা জীবনবিধান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[২] মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের ধারণা অসংখ্য নবী-রাসূলের মাধ্যমে পেশ করেছেন। কিন্তু যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পথনির্দেশ ও নিয়ন্তণের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান অবতীর্ণ করেছেন শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে। শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূল লক্ষ্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানব জাতির সর্বস্তরে শান্তি স্থাপন করা। এই শান্তি স্থাপনের মাধ্যমেই পরলৌকিক শান্তি লাভের প্রচেষ্টাই ইসলামের মূলকথা। মহানবী (স.) মানব জাতির জন্য এই ইসলাম প্রচার করেছেন। সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী আল্লাহ্ জানেন তাঁর সৃষ্টি মানুষের মঙ্গলে সর্বকালের জন্য কোন বিধান হবে পরম কল্যাণময়। তিনি আল-কোরআন অবতীর্ণ করেছেন স্পষ্ট প্রমাণসহ যাতে সে আলোকে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভুল-নির্ভুল ও ন্যায়-অন্যায় পৃথক করতে পারে।[৩] "আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘনকে।"[৪] একটি সম্পূর্ণ সংযুক্ত অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে আল্লাহ্ এ বিশ্বজগৎকে সৃজন করেছেন। প্রতিটি প্রজাতি পরস্পর যুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ধর্ম ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের তাৎপর্য বহনকারী এবং সে দীনকে তাঁর ফিতরাত অনুযায়ী সাজিয়েছেন। সে জন্যই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ "তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[৫]

---

১. আল-কোরআন, ৩:১৯
২. আল-কোরআন, ৩:৮৫
৩. আল-কোরআন, ৪২:১৭
৪. আল-কোরআন, ১৬:৯০
৫. আল-কোরআন, ৩০:৩০

Dhaka University Institutional Repository

'ইসলাম' এর শাব্দিক অর্থ শান্তি, সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ হলো ইসলাম।[১] অপর অর্থে শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পণে আল্লাহর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় এবং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিতে সাম্যনীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত শান্তির পথে আল্লাহ্ ও মানবত্মার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মানবতার উন্নয়নে সৎকাজ করা এবং মানুষের অকল্যাণ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকাই হলো মুসলমানের মূলনীতি। তাদের সম্পর্কেই আল-কোরআনে বলা হয়েছেঃ "হ্যাঁ, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহার দুঃখিত হইবে না।"[২]

শান্তিই ইসলামের মূলকথা। এর অন্যতম মৌলিক নীতি আল্লাহর একত্ববাদ ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তির স্বাক্ষ্য বহন করে। ব্যাপক অর্থে ইসলামের তাৎপর্য দু'টি আল্লাহর একত্ব ও মহানবী (স.) এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এভাবে একজন শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই মুসলমান এবং আর একজন আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই নিজের বাসনা ও কামনাকে বিসর্জন দিয়ে মুসলমান।[৩]

মানবজাতির সৃষ্টির সঙ্গেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত আদম (আ.) ছিলেন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নয়, হযরত আদম (আ.) এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন তাঁদের সকলেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর শেষ প্রচারক এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করে। এ ধর্মের কোন প্রচারকের নামানুসারে এর নাম হয়নি। এর নাম হয়েছে ইসলাম।

হযরত আদম (আ.) এর পর যত নবী-রাসূল আল্লাহর মহান বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেনঃ "তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা তাঁহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।"[৪]

মুসলমানগণ শুধু তাই শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর প্রেরিত সকল নবী-রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বহু নবীর আর্বিভাব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেনঃ "আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।"[৫]

---

১. আল-কোরআন, ২:১১২
২. আল-কোরআন, ২:১১২
৩. কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯) পৃ.১
৪. আল-কোরআন, ২:১৩৬
৫. আল-কোরআন, ৩৫:২৪

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানমাত্রই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-সহ সকল নবী-রাসূলকেই বিশ্বাস করেন। ইসলাম কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না; কোন ধর্মনেতাকেও অশ্রদ্ধা করে না। বিশ্বের সকল ধর্মের মহামিলন ঘটেছে এই মহান ধর্মে। বিশ্ব সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর তাকেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে; মানব সভ্যতার যা কিছু মহান তাই ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো মানুষকে সবচেয়ে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করা। প্রকৃতির সব কিছুর মতো মানুষের মধ্যেও নানাবিধ সুপ্ত মনোবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষকে তাই কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং এরূপ নিয়ম-কানুন প্রদান করাই হলো ইসলামের কাজ। ইসলাম মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দান করেছে এবং তার দ্বারা সে সুপ্ত মানবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। যা মানুষকে পূর্ণতা ও মুক্তির পথে নিয়ে যায়।[১]

ইসলামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা। আল্লাহ বলেছেন: "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি। স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি, উহাদিগকে উত্তম রিযক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।"[২] এজন্যই মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা বলা হয়।[৩] সৃষ্টির সবকিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বীয় সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা মানুষের কর্তব্য। মানুষ যদি প্রকৃতি তাড়িত হয়ে অন্য কোন শক্তির নিকট মাথা নত করে তা তার অবনতির কারণ হয় এবং আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ফলে তা মানুষের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম নির্দেশ দেয় যে, মানুষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর নিকট সাহায্য ও দয়া প্রার্থনা করবে এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।[৪] এভাবেই আল্লাহ নির্দেশিত পথের অনুসরণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবনের তথা মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

ইসলামের তৃতীয় লক্ষ্য মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন। ইসলাম শুধু আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের কথা বলে না, পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার কথাও বলে যার মূলমন্ত্র হলো মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ। এই মূলনীতির আলোকেই মানুষ একজন অপরজনের কাছে নিরাপদ থাকবে। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করবে। কোন জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার কেউ হবে না। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। শান্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ করতে হবে। যারা যুদ্ধক্ষম নয় যথা: অপ্রাপ্তবয়স্ক, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ, নারী, মঠ-মন্দিরাশ্রমী সাধু তাদের উপর আঘাত করা নিষিদ্ধ অথবা তাদের শস্য ও সম্পদ ধ্বংস করা, তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা যাবে না। বিনা উস্কানিতে এককভাবে শান্তি ভঙ্গ করা যাবে না। "যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের

১. কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫
২. আল-কোরআন, পৃ.৭০
৩. আল-কোরআন, পৃ.৩০
৪. আল-কোরআন, পৃ.৪৮

Dhaka University Institutional Repository

আশঙ্কা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীগণকে পছন্দ করেন না।[১] যুদ্ধরত বিধর্মী আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে এবং যতক্ষণ তাকে তার পক্ষে নিরাপদ স্থানে পৌছে না দেয়া হয়, ততক্ষণ তাকে আঘাত করা যাবে না।[২] উৎপীড়িত মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া দেয়া নিষিদ্ধ যদি তজ্জন্য শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে।[৩] যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করতে হবে।[৪]

পরিবার ও সমাজে বসবাসরত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। এসকল নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আসল উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি স্থাপন করা ও তা বজায় রাখা।

সুতরাং ইসলাম যেমন একদিকে স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করে অপরদিকে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষের সাথে সৃষ্টজগতের অন্যান্য প্রজাতির সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সমগ্র জীবনকে বেষ্টন করে আছে ইসলাম। ইসলামে পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। মানব জীবনের প্রতিটি দিক ইসলামে মিশে গেছে এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে ঐশীবাণী এলেও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ আল-কোরআনের মাধ্যমেই মানব জাতির জন্য এ জীবনবিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৫] মানব জাতির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছুই কোরআন পাক থেকে বাদ দেয়া হয়নি। এ কিতাবে কোন কিছুই অবহেলিত হয়নি। ইসলাম প্রদত্ত জীবন বিধান সর্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জীবনের অপরাপর স্তরগুলির এক অবিভাজ্য পরিপূর্ণ ও পরিকল্পিতরূপ। ইসলাম পার্থিব এবং অপার্থিব জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ইসলাম ইহকাল ও পরকালের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে। কোরআন অনুসৃত নীতিমালার বিপরীতে কোন মৌলিক আইন-প্রণয়নের সুযোগ থাকে না কারো হাতে। ইসলামই সরকার, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে নৈতিক মূল্যবোধের অধীনস্থ করেছে। সাধারণ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম অখণ্ডতা, পবিত্রতা ও নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিচার সমানভাবেই করে। এমনকি রাসূল (স.) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এভাবে ইসলাম সকল দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সুষ্ঠু সমাজ সৃষ্টি করেছে।[৬] Lammers এর ভাষায়: "কোরআননীয় আইন "শরীয়াহ্" ইসলামী রাষ্ট্রের একজন বিশ্বাসী নাগরিকের জন্য তিনটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব আরোপ করে বিশ্বাসী হিসেবে, মানুষ হিসেবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে। শরীয়াহ্ তার ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই সাথে ইহার বহুবিধ অভিব্যক্তি তত্ত্বাবধানের ও উহার জটিল ছন্দের নির্দেশনার ক্ষমতাও সংরক্ষণ করে।"[৭]

---

১. আল-কোরআন, পৃ.৫৮
২. আল-কোরআন, পৃ.৬
৩. আল-কোরআন, পৃ.৭২
৪. আল-কোরআন, পৃ.৮
৫. আল-কোরআন, পৃ.৩
৬. মুজিবুর রহমান (এডভোকেট) 'ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব' বাংলাদেশ সৌদি আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন-১৯৯১, বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃত্ব সমিতি, পৃ.১০৮
7. Lammens S.d. Islam: belief and Institution, P.82

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম দেশ কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি ও প্রয়োগ বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। তাওহীদভিত্তিক ধর্ম বলে ইসলাম কখনো আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কিংবা ধর্মীয় ও ধর্মবর্হিভূত জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে না। ইসলাম জীবনকে দেখেছে সার্বিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে। ইসলামী আইন-কানুনও প্রণীত হয়েছে সম্পূর্ণ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জগৎ ও জীবনের মৌল স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। ইসলাম শুধু সাধু-পুরুষ বা মহাজ্ঞানী মনিষীদের কথাই বলে না' বরং সঠিক পথনির্দেশ করে পাপ-পূণ্য ও সুখ-দুঃখ নিয়ে যাদের জীবন সেই সাধারণ মানুষকেও।[১]

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ভেতরের সাথে বাইরের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বহির্জাগতিক সমস্যাবলীও যে মানুষের আন্তর জীবন, আধ্যাত্মিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার চরিত্র ও আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, ইসলাম সে সম্পর্কে অবহিত।[২] ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা যেকোন যুগের উপযোগী, জীবনের যে কোন গতিশীল অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। সৈয়দ আমির আলী বলেছেন: "সর্বকালের ও সকল জাতির ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিসমূহের বিস্ময়কর উপযোগিতা, প্রজ্ঞার আলোকের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সঙ্গতি, মনুষ্য হৃদয়ের সহজাত মৌলিক সত্যকে ঘিরে আবেগময় অজ্ঞতার ছাপ ফেলে এমন রহস্যঘন মতবাদের অনুপস্থিতি এসব প্রমাণ করে যে ইসলাম আমাদের জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের বিকাশের চূড়ান্ত রূপের পরিচয়বাহী।"[৩] তিনি আরো বলেছেন: "ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমানকালের জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সৎচিন্তা ও সত্য কথনের ধর্ম। এটা ঐশীপ্রেম, সর্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৪] গিবের ভাষায়: "বাস্তবিক ইসলাম ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক কিছু বেশী, এটা একটা পরিপূর্ণ সভ্যতা।..... ইসলামের চেয়ে অন্যকোন ধর্ম বিকাশের এত বৃহত্তর সম্ভাবনা নেই, কোন ধর্মই অধিকতর বিশুদ্ধ অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সাথে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[৫]

ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহর ও তার রাসূলের নির্দেশের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করেছে। এতে অন্য কারোর ইচ্ছা বা নির্দেশের কোন অবকাশ নেই। আল-কোরআন ঘোষণা করেছে: "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদিগের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী: কোন বিষয়ে তোমাদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিল উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[৬] আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে সে বিষয়ে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।[৭] যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের নির্দেশের আলোকে তার সমস্ত কাজ ও সমস্যার মীমাংসা না করে তাহলে অবশ্যই সে একজন কাফির, জালিম, ফাসিক ছাড়া আর কিছু নয়। আল-কোরআন ঘোষণা করেছে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিওনা। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৮]

---

১. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ.২৫
২. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ.১১
৩. Sayed Amir Ali, The spirit of Islam, Delhi, 1947, P.175
৪. Ibid, P.175
৫. Gibb, Whither Islam হতে উদ্ধৃত: ড. রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৬. আল-কোরআন, পৃ. ৫৯
৭. আল-কোরআন, পৃ. ৩৬
৮. আল-কোরআন, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা, আংশিক বর্জন করা এবং মধ্যপথ ধরে চলাও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী একজন কাফিরের কাজ বলে বিবেচিত এবং তার জন্য অপমানজনক শাস্তির বিধান রয়েছে।[১] ইসলামকে আংশিকভাবে গ্রহণ করা অবাধ্যতার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সতর্ক করে দেয়া হয়েছেঃ "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা এইরূপ করে তাহাদিগের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।[২]

ইসলামে মানব মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগকে চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি।"[৩] মানুষ যদি আত্মবিশ্লেষণ করে আত্মপরিচয় লাভ করে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত হয়, তবে দেখা যাবে যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা সর্বত্র স্বীকৃত। সমগ্র পৃথিবীর সবকিছুই মানুষের সেবায় নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের মত নিয়োজিত রয়েছে। আল-কোরআনের বহু স্থানে বা আয়াতে মানব জাতিকে তার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে সেরা সৃষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "তোমরা কি দেখনা আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন।"[৪]

বিশ্বলোকের বিশালতার তুলনায় মানুষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। বিশ্বলোকের বয়সের তুলনায় মানুষের বয়স খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বয়সের মানুষই তার প্রাণ ও আত্মার এবং অন্ত র্নিহিত সত্তার দিক দিয়ে এক বিরাট বিশাল অসীম ও মহান সত্তা। মানুষ বলতে মানুষের আত্মা ও তার অন্তর্নিহিত সত্তাই বোঝায়। কেবল দেহটা হলো মানুষ নয়।[৫] মানুষ এক মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই।[৬] এটাই হলো মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় সনদ। মানুষের এ মর্যাদা ও সম্মান যেমন আল্লাহর নিকট, তেমনি তা বিশ্বলোকের সবকিছুর উপর। আল্লাহ্ তা'য়ালা এক বিশেষ উন্নতমানের তাঁকে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে রূপ, আকার-আকৃতি গঠন প্রকৃতিও দিয়েছেন সবকিছু থেকে ভিন্নতর, সব কিছুর তুলনায় উন্নত ও উত্তম।

আল্লাহ্ নিজেই তাঁর "রূহ" তার দেহ সত্তায় ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার একনিষ্ঠ কর্মচারী ফেরেস্তাদের দ্বারা সিজদাও করিয়েছেন মানুষকে। তিনি মানুষকে যেমন দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, তেমনি দিয়েছেন জ্ঞান-বিদ্যা-বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার শক্তি। এই মানুষ হলো সমস্ত সৃষ্টির নির্যাস, সৃষ্টিকূলের গৌরবের অমূল্য অতুলনীয় একমাত্র ধন। এ দুনিয়ার সবকিছু যা

---

১. আল-কোরআন, পৃ. ১৫০-১৫১
২. আল-কোরআন, পৃ. ৮৫
৩. আল-কোরআন, পৃ. ৭০
৪. আল-কোরআন, পৃ. ২০
৫. আব্দুর রহীম (মাওলানা), আল-কোরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শঃ খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ৮২
৬. আল-কোরআন, সুরা-২, আয়াত-২২৫

Dhaka University Institutional Repository

আছে উর্ধ্বেলোকে, যা আছে ভূতলে, সবকিছুই মানুষের অধীন, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ্ সবকিছুকে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগের অনুকূল ক্ষেত্র বানিয়ে দিয়েছেন। আর দৃশ্য-অদৃশ্য যত নিয়ামত, মানুষের জন্য কল্যাণকর যা কিছু, সবই বিপুলভাবে তাকে দান করেছেন। সবকিছু তার জন্য অনুগত ও অনুকূল।[১]

একজন মুসলিম জানে যে, মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি নয়। মৃত্যুর পর আর একটি জগৎ আছে। মৃত্যু মানুষের অনন্ত যাত্রার একটি স্তরমাত্র। এ মহাযাত্রা হবে অনন্তকালের অসীমতার পানে। সেখানে তাকে সংবর্ধনা জানানো হবে এই বলে "যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।"[২]

ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার তুলনা দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আল-কোরআনের বহু আয়াতে মানুষের এই উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। হযরত জিব্রাইল (আ.), নবী করীম (স.) এর নিকট প্রথম যে প্রত্যাদেশ বাণী নিয়ে আসেন সেখানে শুধু মানুষের মর্যাদারই কথা নয়, মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের কথাও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছেঃ "পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না।"[৩]

বহু আয়াতে আল্লাহর কাছে মানুষের নৈকট্য ও মানুষের কাছে আল্লাহর নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। "আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই।"[৪] আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমণী অপেক্ষাও নিকটতর।"[৫] ..... তিনি ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি (আল্লাহ্) উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হউক; উহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ উহাদিগের সঙ্গে আছেন।"[৬] "পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; এবং যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সে দিকই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী; সর্বজ্ঞ।"[৭]

১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
২. আল-কোরআন, পৃ. ৭৩
৩. আল-কোরআন, পৃ. ১-৫
৪. আল-কোরআন, পৃ. ১৮৬
৫. আল-কোরআন, পৃ. ১৬
৬. আল-কোরআন, পৃ. ৭
৭. আল-কোরআন, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চতর জগতে অর্থাৎ মহান আত্মার জগতে মানুষের যেস্থান তা এতই উচ্চ ও মহান যে, আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেস্তাদের মস্তকও তাদের সম্মুখে অবনমিত। মহান আল্লাহ্ তাঁরই জমিনে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ নিজেই খিলাফতের এ মহান উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন: "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদিগকে বলিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি; তাহারা বলিল, আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে; আমরাই তো আপনার সপ্রশংসায় স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষাণা করি। তিনি বলিলেন, আমি জানি যাহা তোমরা জান না এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, এই সমুদয় নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাহারা বলিল, আপনি মহান, আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বলিলেন, হে আদম! তাহাদিগকে এই সকল নাম বলিয়া দাও। যখন সে তাহাদিগকে এই সকল নাম বলিয়া দিল তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি।"[১] মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর এ নির্দেশ ইবলিশ মেনে নিতে পারেনি।

মানুষ এ বস্তু জগতের সারনির্যাস। মানুষের সম্ভাবনা অপরিসীম। এটাই হলো মানুষের মর্যাদা। ইসলামের পরিকল্পনায় মানুষই হলো সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। তার জন্যই সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং তার জন্যই এত আয়োজন। আল্লাহ্ মানব জীবনের চাহিদা পূরণের সকল ব্যবস্থা করে মানুষকে সর্বোতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২] সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে ও তাদেরকে ব্যবহারের সফলকল্পে সমগ্র সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহ্ বলেছেন: "তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে....।"[৩]

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে। যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্বারা তোমাদিগের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছো তাহা হইতে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ।"[৪]

---

১. আল-কোরআন, পৃ. ৩০-৩৩
২. আল-কোরআন, পৃ. ১০
৩. আল-কোরআন, পৃ. ৬৫
৪. আল-কোরআন, পৃ. ৩২-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এ বিশ্বজগতে এই হচ্ছে মানুষের স্থান ও মর্যাদা এবং তার সঙ্গে এই হলো সম্পর্কের আসল রূপ। এ সৃষ্টলোকে মানুষের চেয়েও বহু বড় এ সূক্ষ্মতম সৃষ্টি রয়েছে, তৎসত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার কারণ এই যে, মানব সত্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহর জ্যোতির একটা অংশ এবং মানুষের দেহে রয়েছে সেই রূহ, যা আল্লাহ্ নিজে তাঁর রূহ থেকে তাঁর দেহে ফুঁকে দিয়েছেন।

ইসলামের মতে, মানুষ অপরিসীম সম্ভাবনার অধিকারী। তাই সে জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে পারে। এজন্য তাকে অন্য কোন সৃষ্টির সামনে মাথা নোয়াতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে মানব মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে। কেননা; আল-কোরআনে শিরককে জঘন্যতম অপরাধ বলা হয়েছে। যেমনঃ "ইন্নাশ শিরকা লাজুলমুন আযীম।"[১] শিরককে ঘোষণা করা হয়েছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।[২] ইসলামের মতে, আল্লাহ্ পরম আধ্যাত্মিক বাস্তব সত্তা এবং সবকিছুর উৎস। নিছক প্রশংসাবাণী উচ্চারণের জন্য মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে এমনভাবে ঐশী গুণাবলি অর্জন করতে হয় যেন সে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কেনান মানুষই মহান আল্লার একমাত্র সৃষ্ট জীব যে তার আপন শক্তির বিকাশ সাধন করে সচেতনভাবে সৃষ্টিকর্তার সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। এই সক্ষমতার মধ্য দিয়েই দেশ ও কালে অবস্থিত অসংখ্য বস্তু ও ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। মানুষ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়, বরং প্রকৃতির সর্বোত্তম সৃষ্টি, আল্লাহর সৃজনী শক্তির সর্বোৎকৃষ্ট নির্দশন। প্রকৃতির প্রতিটি পরমাণু মানুষের দেহে স্থান পেয়েছে। মানুষ জগতের ক্ষুদ্ররূপ, যেন একটি অণুজগৎ। সে যেসব শক্তি ও বৃত্তির অধিকারী, সেগুলির মাধ্যমেই সে বুঝতে পারে চারদিকের পরিবেশ তার বিকাশ ও অগ্রগতির পক্ষে বেশ প্রতিকূল। কিন্তু এই প্রতিবেশকে পরিবর্তিত করতে এবং কল্যাণকর করে ঢেলে সাজাতে সে সক্ষম। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরোধিতা মানুষকে এমন এক সুযোগ এনে দেয় যার সাহায্যে সে সৃষ্টি করতে পারে এক জল্পজগৎ এবং সেই সূত্রে পেতে পারে অপরিমেয় আনন্দ ও অনুপ্রেরণা। সুতরাং একমাত্র এ জগতের ও নিজের পরিবেশের জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ পারে তার সুপ্ত শক্তিসমূহকে বিকশিত করতে।[৩]

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সবরকম অধিকার ও কার্যক্রম কোন পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করা হয়নি; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের উপর তা আরোপ করা হয়েছে। ফলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বাভাবিকভাবেই সমাজের নেতৃত্ব লাভ করেন। এ ব্যক্তি মানুষ গঠনের লক্ষ্যেই ইসলামে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সর্বজনীন শিক্ষার নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর কাছে জ্ঞানার্জনের তাগিদই ছিল প্রথম ঐশীবাণী।

ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা। ইসলামের বিঘোষিত নীতিতে সকল মানুষই সমান এবং জন্ম বা মর্যাদার কারণে মানুষের অন্তরে যে একটি নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে এবং তারা যে পরস্পর ভাই এ কথা ইসলামই হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছে। আল-কোরআনে ঘোষিত হয়েছেঃ "সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি।"[৪]

---

১. আল-কোরআন, পৃ.১৩
২. আল-কোরআন, পৃ. ১১৬
৩. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান-১৯৯১, পৃ. ৪২
৪. আল-কোরআন, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে; যাহাতে তোমরা একে-অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদিগের মধ্যে অধিকমুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেরন।"[১]

ইসলামের প্রতিটি বিদানই মানুষকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করা ছাড়াও জীবনে সৎপথে থেকে তার আত্মচেতনাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করে। বিশ্বে বিভিন্ন সমস্যা ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা সদুত্তরের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার স্বত্ব, সম্পদের বণ্টন, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক, ন্যায়পরায়ণতা, সামরিক সংগঠন, যুদ্ধ ও শান্তি, দরিদ্রের কল্যাণ বিধান, এতিম ও বিধবার মঙ্গল সাধন প্রভৃতি বিষয়ের সঠিক পথ নির্দেশ রয়েছে ইসলামে।

ইসলাম ফিতরাত বা স্বাভাবিকতার ধর্ম। যা স্বাভাবিক, যা প্রকৃতিসম্মত, যা জীবনের উপযোগি, যা জীবনের রক্ষা ও পোষণে প্রয়োজনীয় তাই ফিতরাত বা স্বাভাবিক। "নিজে বাঁচ অপরকে বাঁচতে দাওৎৎ এটাই প্রকৃত ব্যবস্থা।[২] তাই মানবতার জন্য ইসলাম প্রত্যেক নাগরিককে যে সমস্ত অধিকার দিয়েছে তা ইক বিস্ময়কর উপযোজন। এর নির্দেশ রয়েছেঃ "মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও আহতদের উপর কখনই অবিচার করবে না; সর্বাবস্থায় নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। ইসলামে মুসলমান-অমুসলমান প্রত্যেক নাগরিকই বিভিন্ন ধরণের মৌলিক অধিকার ভোগ করে। জীবন, সম্পত্তি ও মর্যাদার নিরাপত্তার বিধান, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং মতামত প্রকাশ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকারের আওতাভুক্ত। ইসলাম মানব মর্যাদা, তার স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সর্বজনীন আদর্শকে বিশ্বের বুকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করেছে। ইসলাম মানব অধিকারকে নিজস্ব পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সাফল্যের সাথে এ অধিকার বাস্ত বায়নের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। মানব মর্যাদার প্রবক্তা ও সহায়ক হিসেবে ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই মানব জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি এবং হত্যার পরিবর্তে হত্যা ছাড়া নর হত্যাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। যদি কেউ একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে ইসলামের দৃষ্টিতে ধরে নেয়া হয় যে, যেস সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা এবং একজন মানুষের জীবন রক্ষাকারীকে সমগ্র মানব জাতির জীবনরক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৩] আল্লাহ্ নরহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করা যায় না। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারীদেরকে কিসাসের দাবি করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।[৪]

সপ্ত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ইসলাম দাসপ্রথা ও দাসব্যবস্থা অবলুপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। দাস ব্যবসাকে নবী (স.) পাপ এবং অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। দাসদেরকে শুধু মুক্ত করার জন্যই নয়, মর্যাদা সহকারে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে নেতৃত্ব করার অধিকারও দেন নবী (স.) নিজে। যায়েদকে মুক্ত করে তাঁকে নিজের পরিবারভুক্ত করে নেন এবং নবীজী তাঁর চাচাতো বোন যয়নাবের সাথে বিয়ে দেন। মহানবী (স.) তাঁকে সৈন্যবাহিনীর জেনারেলের দায়িত্ব দেন। মুক্তি লাভের পর হাবসী গোলাম বেলাল (রা.) কে মুয়াজ্জিনের উচ্চমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়।

---

১. আল-কুরআন, পৃ.১৩
২. কাজী দীন মুহাম্মদ, মানব জীবন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৮৭) পৃ.১৬৩
৩. আল-কুরআন, পৃ. ৩২
৪. আল-কুরআন, পৃ.৩৩

Dhaka University Institutional Repository

এ হল ইসলামের মর্মকথা। ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার প্রতি তার অপরিসীম অনুরাগ। আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণীই হল 'পড়' অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর।[১] কুরআন শুধু একটা ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা সমস্যাপীড়িত মানব জীবনের পথ চলার নির্দেশনামা। কুরআনের বহু আয়াতে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ উদঘাটন ও মানুষের কাজে নিয়োগ, সৃষ্টি রহস্য আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণা চালানোর ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন- "যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এসবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। আর বিজ্ঞজনেরা ছাড়া কেউ শিক্ষা গ্রহণ করেনা।"[২]

ইলম ব্যতীত মানুষ উন্নতি লাভ করতে পারে না, তাই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) কে ইলমের উন্নতি এবং জ্ঞান বর্ধনের দো'আ শিক্ষা দান করেছেন এবং সেই দো'আ করার আদেশ করেছেন, "আপনি বলুন হে প্রভু! আমার ইলম বর্ধিত করে দিন।"[৩]

"আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলিমগণের অন্তরেই খোদার ভয় থাকে।"[৪]

"দোযখবাসীরা এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে, হায়! যদি আমরা অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতাম বা অন্তত বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম জ্ঞান লাভ করিতাম, তবে আমরা দোযখীদের দলভুক্ত হইতাম না।"[৫]

"হে মুহাম্মদ আপনি বলিয়া দিন যাহারা ইলম হাসিল করিয়াছে আর যাহারা ইলম শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। এই উভয় দল কি সমান হইতে পারে? কখনই না। বিদ্বাহীন ব্যক্তি পশুর সমান। আর বিদ্বান ব্যক্তি সমাজের আরোকবর্তিকা। আর বিদ্বান ও মূর্খের পার্থক্য আলো ও অন্ধকার তুল্য।"[৬]

"তোমার জানা না থাকিলে তুমি জ্ঞানী লোকদের জিজ্ঞাসা কর।"[৭]

"করুণাময় আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন, সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, তাহাকে শিখাইয়াছেন বর্ণনা।"[৮]

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদের কাছে পাঠ করেন তাঁহার আয়াতসমূহ, তাহাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।"[৯]

"কুরআন ওহী, যাহা প্রত্যাদেশ হয়। তাহাকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী ফেরেশতা।"[১০]

---

১. আল-কুরআন, ৯৬:১
২. আল-কুরআন, ৩:৭
৩. আল-কুরআন, ১৭:১১৪
৪. আল-কুরআন, ২০:১৬
৫. আল-কুরআন, ২৯:১
৬. আল-কুরআন, ২৩:১৫
৭. আল-কুরআন, ২৩:৪৩
৮. আল-কুরআন, ২৩:১-৪
৯. আল-কুরআন, ৬২:২
১০. আল-কুরআন, ৫৩:৫

Dhaka University Institutional Repository

"এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই, কিন্তু জ্ঞানীরাই তাহা বোঝে।"[১]

"বরং যাহাদের জ্ঞান দেয়া হইয়াছে, তাহাদের অন্তরে ইহা (কুরআন) তো স্পষ্ট আয়াত।"[২]
"নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানীদের জন্যে নির্দেশনাবলী রহিয়াছে।"[৩]

"যাহারা জ্ঞান প্রাপ্ত, তাহারা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কুরআনকে সত্যজ্ঞান করে এবং ইহা মানুষকে আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে।"[৪]

"পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিতনা।"[৫]

"তাহারা আপনাকে 'রুহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলিয়া দিন 'রুহ' আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত, এই বিষয়ে তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হইয়াছে।"[৬]

"তোমাদিগকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হইয়াচে, যাহা তোমরা এবং তোমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা জানিতনা।"[৭]

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে যাহা আছে, তাহা উত্তম তোমাদের জন্যে, যদি তোমরা জ্ঞানী হও।"[৮]

"আপন পালনকর্তার পথে প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝাইয়া ও উপদেশ শুনাইয়া উত্তমরূপে এবং তাহাদের সাথে সতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।"[৯]

"তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাহাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তুপ্রাপ্ত হয়। উপদেশ তাহারাই গ্রহণ করে, যাহারা জ্ঞানবান।"[১০]

"নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নির্দেশ রহিয়াছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।"[১১]

"যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মারণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, (তাহারা বলে), পরওয়ারদেগার! এইসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনাই। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"[১২]

---

১. আল-কুরআন, ২৯:৪৩
২. আল-কুরআন, ২৯:৪৯
৩. আল-কুরআন, ৩০:২২
৪. আল-কুরআন, ৩৪:৬
৫. আল-কুরআন, ৯৬:১-৫
৬. আল-কুরআন, ১৬:৮৫
৭. আল-কুরআন, ৬:৯১
৮. আল-কুরআন, ১৬:৯৫
৯. আল-কুরআন, ১৬:১২৫
১০. আল-কুরআন, ২:২৬৯
১১. আল-কুরআন, ৩:১৯০
১২. আল-কুরআন, ৩:১৯১

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ্ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা আপনি জানিতেননা। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।"[১]

"তোমরা জানিয়া নাও যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"[২]

"আমি আপনাকে পাঠ করাইতে থাকিব ফলে আপনি বিস্মৃত হইবেন না আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। আমি আপনার জন্য সহজ শরীয়ত সহজতর করিয়া দিব।"[৩]

"আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।"[৪]

"তাহারা বলিল, তুমি পবিত্র। আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যাহা আমাদিগকে শিখাইয়াছ (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয়ই তুমি প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন, হিকমতওয়ালা।"[৫]

"আর আল্লাহ্ তা'য়ালা শিখাইলেন আদমকে সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম।"[৬]

"অতঃপর হযরত আদম (আ.) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখিয়া লইলেন অতঃপর আল্লাহ্পাক তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।"[৭]

"হে পরওয়ারদেগার! তাহাদের মধ্যে থেকেই তাহাদের নিকট একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাহাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাহাদের পবিত্র করিবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা।"[৮]

মহানবী (স.) জ্ঞান অর্জনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কে বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানের তালাশে গৃহ ত্যাগ করে সে আল্লাহর রাস্তায় হাটে।"

"যে ব্যক্তি জ্ঞানের খোজে ভ্রমণ করে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করেন।"[৯]

"সৃষ্টিকর্তার কার্যাবলী সম্পর্কে নিমগ্ন চিত্তে এক ঘন্টার ধ্যান সত্তর বছর নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।"

---

১. আল-কুরআন, ৪:১১৩
২. আল-কুরআন, ৫:৯৭
৩. আল-কুরআন, ৮৭:৬-৮
৪. আল-কুরআন, ৩৩:৩৪
৫. আল-কুরআন, ২:৩২
৬. আল-কুরআন, ২:৩১
৭. আল-কুরআন, ২:৩৭
৮. আল-কুরআন, ৯৬:১২৯
৯. হাদীসগুলো উদ্ধৃত: সায়্যিদ আমীর আলী, (অনুবাদ অধ্যাপক দরবেশ আলী খান), 'দি স্পিরিট অব ইসলাম', ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩৭৯-৩৮০

Dhaka University Institutional Repository

"এক ঘন্টাকাল বিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা শ্রবণ হাজার শহীদের জানাযায় শরীক হওয়ার চেয়ে অধিকতর সওয়াবের কাজ এবং এক হাজার রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে অনেক বেশী সওয়াবের কাজ।"

"যে ছাত্র জ্ঞানের অন্বেষণে গমণ করে, আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে উচ্চাসন দান করবেন। তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে পূণ্য অর্জিত হবে, আর সে যা পাঠ গ্রহণ করবে তার প্রত্যেকটির জন্য সে পুরস্কার লাভ করবে।"

"জ্ঞানের অন্বেষণকারীকে বেহেশতে ফিরিশতারা অভ্যর্থনা জানাবে।"

"বিদ্বানের কথা শোনা, আর হৃদয়ে বিজ্ঞানের পাঠ মনোযোগসহকারে গ্রহণ করা ধর্মানুশীলনের চেয়ে উত্তম, একশটি দাস মুক্ত করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

"যে ব্যক্তি বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি অনুরক্ত, পরলোকে আল্লাহ্ তাকে অনুরাগ প্রদর্শন করবেন।"

"যে ব্যক্তি বিদ্বানকে সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করে।"

"বিদ্যার বিভিন্ন শাখার উপর হযরত আলী (রা.) বক্তৃতা করতেন। যেমন- (১) বিজ্ঞানের পারদর্শিতা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। (২) যে বিদ্যার্জনের জন্য জীবন দান করে সে অমর। (৩) বিদ্যাবত্তা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ।"[১]

"হে আল্লাহ্! তাকে কুরআনের ইলম দান কর, পরিপক্ক জ্ঞান দান কর এবং দ্বীন-ইসলামের সঠিক বুঝ শক্তি দান কর।"

"দ্বীন শিক্ষা দানে লোকদের সুবিধা সময় ও দিন নির্দিষ্ট করা যায়েজ আছে।"

"মানুষের কথা ও কাজের পূর্বে ইলম-জ্ঞান শিক্ষা আবশ্যক। মানুষ যে বিষয় বলবে। যে কাজ করবে সে বিষয়ে প্রথম তার ইলম-জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।"[২]

"ধর্ম জ্ঞানে-জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।"

"একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যুর তুলনায় একটি সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি হাল্কা ব্যাপার।"

"রোজ কিয়ামতে জ্ঞানীদের লিখার কালি শহীদগণের রক্তের সাথে ওজন করা হবে।"[৩]

"আমার যে উম্মত চল্লিশটি হাদীস স্মরণ করে রাখে, রোজ কিয়ামতে সে আল্লাহর সাথে ধর্মজ্ঞানী ও আলিম হিসেবে স্বাক্ষাৎ করবে।"

"প্রত্যুষে বের হয়ে ইলমের একটি পরিচ্ছেদ শিক্ষা করা একশ রাকাত নামাজ আদায়ের চেয়ে উত্তম।"

---

১. হাদীসগুরো উদ্বৃদঃ সায়িদ আমীর আলী, (অনুবাদ অধ্যাপক দরবেশ আলী খান), 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩৭৯-৩৮০

২. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.), বোখারী শরীফ (১ম খণ্ড), হামিদিয়া লাইব্রেরি লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৯১-৯৫

৩. হাদীসগুলো উদ্বৃদঃ ইমাম গাযালী (রহ.), (অনু. এম.এন.এম ইমদাদুল্লাহ), 'এহইয়াই উলূমুদ্দীন' (১ম খণ্ড), (নরসিংদী-১৯৯৫), পৃ.১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

"জ্ঞানের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা সারা দুনিয়া এবং দুনিয়াস্থিত সব কিছু থেকে উত্তম।"

"জ্ঞান একটি রত্নাগার সদৃশ, প্রশ্ন করা তার চাবি, সুতরাং জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন কর। এতে চার ব্যক্তির ফায়েদাহ রয়েছে। তারা হলেন (ক) প্রশ্নকারী (খ) যার কাছে প্রশ্ন করা হয় (গ) শ্রোতা (ঘ) যে তাদেরকে ভালোবাসেন।"

"মূর্খ ব্যক্তির মূর্খতা নিয়ে চুপ করে থাকা ঠিক নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরও জ্ঞান নিয়ে নীরব থাকা উচিত নয়।"

"যে জ্ঞানের একটি অধ্যায় মাত্রও অন্যকে শিক্ষাদানের জন্যে নিজে শিক্ষা লাভ করবে, নিশ্চয় তাকে সত্তরজন নবী ও সিদ্দিকীনের ছওয়াব দান করা হবে।"[১]

"পিতা সন্তানকে যাহ দান করে তার মধ্যে সুশিক্ষা ও আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার ন্যায় এমন উৎকৃষ্ট দান আর কিছু নাই।"

"যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করে সে ইলম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহপাক তাকে এমন ইলম দান করবেন, যা সে জানত না।"

"আলিম যদি তার ইলমের দ্বারা শুধু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে, তবে সে আলিমকে এমন হায়াত দান করা হয় যে, তাকে সকলেই ভয় এবং ভক্তি করে।"

"যে সমস্ত আলিম ইলম শিখে (তদানুযায়ী) আমল করেন তাঁরা নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা।"[২]

"একজন আবিদের উপরে একজন আলিমের মর্যাদা এমনি যেমনি একজন সাধারণ উম্মতের উপর আমার মর্যাদা।"

"কোন আলিমের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা আমার নিকট এক বছরের রোজা-নামাজ প্রভৃতি ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম।"

"আমি কি তোমাদের কাছে বেহেশতের সর্বাধিক সম্মানিত দলটির কথা বলব না? সাহাবীগণ আরজ করবেন, হাঁ হুজুর অবশ্যই বলবেন। তিনি বললেন, তারা হল আমার উম্মতদের আলিম সম্প্রদায়।"

"ইলম হাছিলের প্রয়োজনে নিদ্রা যাওয়া মূর্খতা নিয়ে নামাজ আদায় অপেক্ষা শ্রেয়।"

"ইলম কেবল ভাগ্যবানেরাই অর্জন করতে পারে, হতভাগ্যরা তা থেকে বঞ্চিত হয়।"[৩]

---

১. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.), বোখারী শরীফ (১ম খণ্ড), হামিদিয়া লাইব্রেরি লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ২০-২৭

২. হাদীসগুলোতে উদ্বৃত: মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশতী (রহ.). (অনু. মাওলানা শামছুল হক (রহ.), 'বেহেশতী জেওর' (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ৭৩-৭৫

৩. হাদীসগুলো উদ্বৃত: ইমাম গাযালী (রহ.), (অনু. মাওলানা মাজহার উদ্দীন), 'মিনহাজুল আবেদনী', আব্দুল্লাহ এন্ড ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ২৮-৩২

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবেই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে চলছে জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কিত অপ্রতিহত বর্ণনার ধারা। ইসলামের শিক্ষা বিজ্ঞানের পরিপন্থিতো নয়ই, বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ইসলামের প্রাণশক্তি। আল-কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের বর্ণনায় পঞ্চমুখ। সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করার জন্য কুরআন বহুভাবে মানব জাতিকে আদেশ-নির্দেশ দিয়েছে। জ্ঞানের সাধনায় সৃষ্টি তত্ত্বের গবেষণায় ইসলামের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, মহানবী (স.) এর দুরদৃষ্টি জগতের ইতিহাসে একক দৃষ্টান্ত। তাই ইসলামের এ প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে রাসূলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম জাতি এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তারা বিশ্বের জ্ঞান পিপাসুদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। আধুনিক ইউরোপ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাতে সমর্থ হয়েছে তার মূলেও ইসলামী সভ্যতার প্রেরণা বিদ্যমান। ইসলামের এ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য করেই মনিষী গ্যেটে বলেছেন "If this is Islam, then every thinking man among us is, infact a muslim."

ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষার অবস্থানগত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণঃ

(ক) মতাদর্শ হিসেবে ইসলাম জ্ঞানের গুরুত্ব দিয়েছে সবার আগে। ইসলামী তত্ত্বের মূল উৎস আল-কুরআন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতটি হচ্ছেঃ 'পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।"[২]

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, 'পড়'। পড়ার সাথে সম্পর্ক রয়েছে জ্ঞানের তথা বুদ্ধিবাদিতার। মানুষের জীবনে জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা, এটা তত্ত্বগত স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতি ইসলামী তত্ত্ব কাঠামোর প্রথমেই এসেছে। অন্যান্য প্রসঙ্গাবলী এসেছে এর পরে। পড়ার এ কুরআনী তাকিদ সর্বজনীন। স্থান-কাল ও ব্যক্তির গণ্ডিতে তা সীমাবদ্ধ নয়। শুধু পড়ার কথা বরেই নির্দেশনা শেষ হয়নি। পাঠলব্ধ জ্ঞানকে সুদৃঢ় করার তাকিদও দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে যেমনঃ সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' হতে। পাঠ করুন আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন- শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যাহা সে জানিতনা।[৩]

এ আয়াতসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে, 'পড়ার' বা জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত আছে মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গে যা জ্ঞানের নৃতাত্ত্বিক বলয়কে উম্মোচন করে। আরো আছে স্রষ্টার প্রসঙ্গ যা মানব নৃতত্ত্বের যাত্রাবিন্দু। সেই সাথে জ্ঞানেরও। এর পরবর্তী সময়ে 'কলমের সাহায্যে শিক্ষার প্রসঙ্গ' জ্ঞানের স্থায়ী উৎকর্ষতা ও বাস্তবমুখীনতার ইংগিত বহন করে। শেষের আয়াতটি জ্ঞান রাজ্যে মানুষের অবস্থান ও জ্ঞান লাভের উপায়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। মানুষ জানত না, আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। পৃথিবীতেও মানুষের জন্মেই জ্ঞানী হয়ে যায় না। অজ্ঞতা থেকেই তার যাত্রা শুরু হয় এবং শিক্ষার মাধ্যমে সে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে।

---

১. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, বগুড়া-১৯৮২, পৃ. ৩৪
২. আল-কুরআন, ৯৬:১
৩. আল-কুরআন, ১৯:২-৫

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা মহানবী (স.) এর নিকট অবতীর্ণ প্রথম ওহীর সব ক'টি আয়াতে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, এর পরিধি, ধরণ ও তা অর্জন করার সবিশেষ উল্লেখ রয়েছে।[১] ইসলামী নৃতত্ত্বের প্রতি তাকালে জ্ঞানগত উৎকর্ষতার জন্য সর্বপ্রথমে নির্দেশ দেবার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

(খ) ইসলাম মানুষকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক তাকিদই দেয়নি, বরং এর নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকেও তুলে ধরেছে। ফলে এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রসঙ্গ অত্যাবশ্যকভাবেই এসে যায়। পবিত্র কুরআন মানুষ সৃষ্টি যে প্রক্রিয়া তুলে ধরে, তাকে এভাবে বর্ণনা করা যায়: 'আল্লাহ্ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণের কথা ব্যক্ত করলে ফেরেশতাগণ ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশংকা প্রকাশ করেন।[২] আল্লাহ্ তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন[৩] এবং পৃথিবীর কাদা মাটি দিয়ে প্রথমে আদমের দেহ[৪] সৃষ্টি করে স্বয়ং তিনি তার মধ্যে নিজের শক্তি হতে প্রাণ সঞ্চার করেন।[৫] এরপর আল্লাহ্ আদমকে বিভিন্ন জিনিসের নাম শিক্ষা দেন।[৬] এ শিক্ষার বলেই আদম ফেরেশতাদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।[৭] সবাই তা মেনে নিলেও একমাত্র ইবলিস তা অস্বীকার করে[৮] এবং ঘোষণা দিয়েই কিয়ামত পর্যন্ত আদম ও আদম সন্তানদের চিরস্থায়ী শত্রুতে পরিণত হয়।[৯]

উল্লেখ্য যে, আদম সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌পাক তা'আলা তাঁর থেকেই প্রথম মহিলা হাওয়াকে তাঁর সঙ্গিনী হিসেবে সৃষ্টি করেন।[১০]

আদি মানব হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির উপরোক্ত ঘটনার প্রক্রিয়াগত দিক ছাড়াও একটি দার্শনিক অবয়ব রয়েছে। আদমের উত্তরসূরি হিসেবে সমগ্র মানব জাতির উপর তা সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। এ ঘটনার মানব সৃষ্টিতে ব্যবহৃত ও অবস্তুগত উপাদানের উল্লেখ রয়েছে। এ সমস্ত উপাদানই মানুষের সহজাত ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যাবলীর জন্য দায়ী। এ উপাদানগুলো হচ্ছে যথাক্রমে পৃথিবীর কাদামাটি, 'আল্লাহ্ প্রদত্ত রূহ, নাম শিক্ষা এবং দাম্পত্য শিক্ষা।[১১] এসবের দু'টোই জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথমটি হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্ থেকে সঞ্চালিত রূহ। মানব দেহের রূহের সংযোজনের ফলে মানুষের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর সন্নিবেশ তাই মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। স্রষ্টার গুণাবলী তাঁর মতোই অসীম। স্রষ্টা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। মানুষকে প্রদত্ত অব্যবহিত পরেই আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে বিভিন্ন জিনিসের নাম শিক্ষা দানের মাধ্যমে। আল্লাহর শিখানো 'নাম' জ্ঞান জগতের বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় বাচক সবকিছুকে পরিবেশিত করে। একে সীমিত অর্থে বিবেচনা করার কোন উপায় নেই।

---

১. আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, ১৯ খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮১, পৃ. ১৬৭
২. আল-কুরআন, ২:৩০
৩. আল-কুরআন, ৫:২৬, ২৮, ১৭:৬১, ৩৮:৭১
৪. আল-কুরআন, ১৫:২৯, ৩৮:৭২, ৭৬
৫. আল-কুরআন, ২:৩১
৬. আল-কুরআন, ২:৩৩
৭. আল-কুরআন, ২:৩৪, ৭:১১, ১৫:৩০, ১৭:৬১, ২০:১১৬, ৩৮:৭৩, ৫০:৫০
৮. আল-কুরআন, ২:৩৪, ৭:১১, ১৫:৩১
৯. আল-কুরআন, ৭:১৪-১৮, ১৫:৩৬-৩৯, ১৭:২৬-৩৪, ১৮:৫০, ২০:১১৬-১১৭
১০. আল-কুরআন, ৭:১৮৯
১১. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ধারণার জন্য দেখুন, ফিরোজ আহমেদ, 'ইসলামী উন্নয়ন তত্ত্ব: নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে' লোক, দুই, চট্টগ্রাম: লোক অধ্যয়ন কেন্দ্র, শ্রাবণ, ১৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের স্রষ্টাও প্রথম শিক্ষক আদম (আ.) কে শুধু তত্ত্বগত জ্ঞান দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, অধিকন্তু তার ব্যবহারিক দিকেরও সূচনা করেছেন ফেরেশতাদের মধ্যে প্রয়োগের মাধ্যমে। জ্ঞানের বলে আদম (আ.) ফেরেশতাদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। সামগ্রিকতার প্রেক্ষিতে জ্ঞান তাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপায় হিসেবে বাস্তব স্বীকৃতি পায়।

(গ) বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের ফলাফল মূল্যায়নের বাস্তবসম্মত বিজ্ঞান হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস শুধু অতীত ঘটনাবলীর ধারণাই দেয় না; অধিকন্তু জীবন নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন আইন এবং সমাজ পরিবর্তনের সূত্রসমূহকেও উদ্ধার করে।[১] ইতিহাসের এ গুরুত্বের যথার্থতা কুরআনে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে কুরআন ঐতিহাসিকতা টেনে এনেছে। জ্ঞানের প্রসঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। কুরআনী ঐতিহাসিকতায় বেশ কিছু সার্থক মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া, যাঁরা ইসলামী নৈতিক মানদণ্ডে যথার্থ মানুষ হিসেবে পরিগণিত। এদের চরিত্রাংকনে কুরআন অবশ্যম্ভাব্য রূপেই জ্ঞানগত সমৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে। শুধু তাই নয়, একে সফলতার একটি পূর্বশর্ত হিসেবেও চিহ্নিত করেছে।

হযরত আদম (আ.) কে আল্লাহ নিজেই শিক্ষক হয়ে জ্ঞানগত উৎকর্ষতার সবার শীর্ষে উঠিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জাতিতে তাদের মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে নবী বা রাসূল করে পাঠিয়েছেন।[২] কুরআনের বিচারে এরা সফলকাম মানুষ। এদের জ্ঞানগত সমৃদ্ধির কথা সাধারণভাবে কুরআন এভাবে প্রকাশ করেন: "...........আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রসূল প্রেরণ করিয়াছি যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে এবং কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করে এবং তোমরা যাহা জানিতে না, তাহা শিক্ষা দেয়।[৩]

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীই কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিতাবকে কুরআনে জ্ঞানময় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪] আর এ কিতাব যাঁদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরাও ছিলেন জ্ঞানসমৃদ্ধ। এসব নবী এবং রাসূল ঈমানী মানদণ্ডে অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন। কুরআন এ সব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চিত্রণে অত্যন্ত সাধারণভাবে ব্যক্ত করেছেন: "......বস্তুত জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।"[৫]

কুরআন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ হলেও এর ঐতিহাসিক ধারায় এসেছে নূহ, হূদ, সালিহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, লূত, ইসহাক, ইয়া'কূব, ইউসুফ, আইয়ূব, শু'আইব, ইদরীস, মূসা, দাউদ, সুলায়মান, ইউনুস, যাকারিয়া, ঈসা (আ.) প্রমুখ (এঁদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) সহ অনেক মহামানবের উল্লেখ। এঁদের চরিত্র জ্ঞান ছিলো অবিচ্ছেদ্য উপাদান। নিম্নে কয়েকজনের ব্যাপারে কুরআনের ভাষা বিশেষভাবে তুলে ধরা হল:

---

১. Prof. Murtada Mutahhari, Society and Change, Tehran: Islamic Propagation Organization, 1985, PP. 45-6
২. আল-কুরআন, ৭:৬৩, ৯:১২৮, ১০:১, ৪৭, ১২:১০৯, ২৮:৫৯, ৩৫:২৪
৩. আল-কুরআন, ১৫১, আরো দেখুন-৩:১৬৪
৪. আল-কুরআন, ৩১:২, ৩৬:১-৪, ৪৩:৪, ৪৫:২০
৫. আল-কুরআন, ২:২৬৯, ১৩:১৯, ৩৫:২৮

Dhaka University Institutional Repository

(১) ইব্রাহীম (আ.) 'আমি তো ইহার পূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।'[১]

(২) লূত (আ.) 'এবং লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিলো অশ্লীল কর্মে; উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী।[২]

(৩) সুলায়মান (আ.) 'এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝাইয়া ছিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান.......... ।'[৩]

(৪) ইউসুফ (আ.) 'সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম এভং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।'[৪]

(৫) মূসা (আ.) 'যখন সে মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল, তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; একইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কর প্রদান করিয়া থাকি।'[৫]

(৬) ইয়াহইয়া (আ.) 'আমরা তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান...... ।'[৬]

(৭) দাউদ (আ.) 'আমি তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।'[৭]

(৮) ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুব (আ.) '.........ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবের কথা স্মরণ করো; উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।'[৮]

ঐসব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও যে জ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কুরআনী ঐতিহাসিকতায় তারও উল্লেখ রয়েছে। যেমন- হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর নিকট যে দু'আ করতেন তার কুরআনী রূপ হচ্ছেঃ 'হে আমার প্রতিপালক। আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদিগের শামিল কর।'[৯]

হযরত মূসা (আ.) এর দু'আ ছিলো অনুরূপ।[১০] জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলাম এইভাবে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে দাঁড় করিয়েছে এবং সমগ্র মানব জাতির প্রার্থনায়ও জ্ঞান আহরণের অত্যাবশ্যকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে এভাবে........... 'হে আমার প্রতিপালক। আমার জ্ঞানের বৃদ্ধিসাধন কর।''[১১]

---

১. আল-কুরআন, ২১:৫১
২. আল-কুরআন, ২১:৭৪
৩. আল-কুরআন, ২১:৭৯
৪. আল-কুরআন, ১২:২২
৫. আল-কুরআন, ২৮:১৪
৬. আল-কুরআন, ১৯:১২
৭. আল-কুরআন, ৩৮:২০
৮. আল-কুরআন, ৩৮:৪৫
৯. আল-কুরআন, ২৬:৮৩
১০. আল-কুরআন, ২০:২৫
১১. আল-কুরআন, ২০:১১৪

(ঘ) মানুষ জ্ঞান লাভ করতে চায়। জ্ঞানের প্রতি তার এ আকর্ষণ সৃষ্টিজাত কারণেই। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এর স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। কুরআনী ঐতিহাসিকতায়ও মহামানবদের প্রাসঙ্গিক সোচ্চার বৈশিষ্ট্য হলো তাঁদের জ্ঞান সমৃদ্ধি। কুরআন জ্ঞানকে শুধুমাত্র অন্তজ চাহিদা বা অনুপম বৈশিষ্ট্য বলে বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং মানব জীবনের এর বাস্তব প্রয়োজনীয়তারও ইঙ্গিত দিয়েছে পারিবেশিক অধিব্যবস্থার আলোকে।

মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দ্বান্দ্বিকতা। দ্বন্দ্বের অনিবার্য ফলে পৃথিবীতে মানুষের চলার পথটি কুসুমাস্তীর্ণ না হয়ে উল্টোটি হয়েছে। এ দ্বন্দ্বের সঠিক অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে প্রাসঙ্গিকভাবেই নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতটি বিশ্লেষণ করতে হয়। কেননা ইসলামী নৃতত্ত্বে এর উৎস ও ব্যাপকতার উল্লেখ আছে। আল্লাহর নির্দেশনানুযায়ী ফেরেশতাদের সবাই আদমের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেন। কিন্তু একমাত্র ইবলিস তা অস্বীকার করে এবং ঘোষণা দিয়েই কিয়ামত পর্যন্ত আদম (আ.) ও আদম সন্তানদের চিরস্থায়ী শত্রুতে পরিণত হয়। দ্বন্দ্বের মূল উৎস হচ্ছে ইবলিসের বৈরিতা। এর ফলেই আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা মানুষের জীবনে প্রকট হয়ে ওঠে। কুরআনের ভাষায়: 'সে (ইবলিস) বলিল, তুমি আমাকে শাস্তি দান করিলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁত পাতিয়া থাকিব।'[১]

ইবলিসের এ আক্রমণ সর্বব্যাপী। যেমন: 'আমি (ইবলিস) তাহাদিগের নিকট আসিবই তাহাদিগের সম্মুখ, পশ্চাত, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে......... ।'[২]

মোটকথা, ইবলিসের সপ্রতিজ্ঞ ও সর্বাত্মক বৈরিতাকে সঙ্গে নিয়েই পৃথিবীতে মানুষের যাত্রা শুরু এবং মানুষের সমাজ এতটা পথ অতিক্রম করে জটিল থেকে জটিলতর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ন্যায়ের বদলে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও চিন্তা চেতনার জগতে বিচ্যুতি এসেছে, অন্যায় বেড়ে উঠেছে এবং শোষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। ইবলিসের রণনীতি ও রণ-কৌশলের কাছে মানুষের পরাজয়ই এর প্রধান কারণ। এর মুকাবিলার জন্য মানুষের প্রয়োজন তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও তা প্রয়োগের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা। ঈমানের সুদৃঢ়তার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। কুরআনী ঐতিহাসিকতা এর বড় স্বাক্ষী।

বিশেষ নিয়মের মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়েছে, এর গতি-প্রকৃতি আবর্তিত হচ্ছে। তবে প্রাকৃতিক জগতের মতো তা সহজেই ধরা যায় না। কিন্তু মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনেই এসব সামাজিক নিয়মের উদ্ধার করা অপরিহার্য। এছাড়াও মানুষ যে প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, সে বিরাট পারিপার্শ্বিকতা ও তার প্রত্যেকটি জিনিস অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ।[৩] সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক জগতের নিয়মাবলী উদ্ধার করে তাতে নিজস্ব প্রয়োজন মাফিক উপযোগিতা সৃষ্টি করতে না পারলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব লুপ্ত হতে বাধ্য। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখেও তার যাত্রা সম্ভব নয়। জ্ঞানই এক্ষেত্রে তার একমাত্র হাতিয়ার।

১. আল-কুরআন, ৭:১৬
২. আল-কুরআন, ৭:১৭
৩. আল-কুরআন, ৩:৮৩

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) কুরআন যে জ্ঞানের আহরণকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করে সমগ্র জাতির জন্য, তার ব্যাপ্তি কতটুকু সে সম্বন্ধে কোন আলোকপাত ছাড়া জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা সম্পন্ন হতে পারে না। এ ব্যাপারটি কুরআনে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। কুরআনের আলোকে জ্ঞানকে খণ্ডিত করে দেখা যায় না। জ্ঞান সর্বব্যাপী, কুরআনী নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সামাজিক নিয়ম ও নীতিমালা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখেছি মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবণতাসমূহ হচ্ছে, পার্থিবতা যা দৈহিক অস্তিত্ব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত, স্রষ্টার দেয়া রূহ হতে উৎসারিত স্রষ্টাধর্মী আধ্যাত্মিকতা যা জ্ঞানানুশীল, আত্মার উৎকর্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, সত্যবাদিতা ইত্যাদির মতো সুকুমার বৃত্তির মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়, জ্ঞান পিপাসা ও যৌনতা মানুষের এসব সহজাত চাহিদা পূরণের জন্য এগুলো সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানার্জন সবার আগে দরকার।[১] সঠিক জ্ঞানই চাহিদা পূরণের সঠিক উপায় বাতলাতে পারে। যেমনঃ ধরা যাক, মানুষের পার্থিব দেহের চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে প্রাকৃতিক ও বস্তুজগত সম্বন্ধেও। অন্যদিকে জরা ব্যাধির হাত থেকে দৈহিক সুস্থতা রক্ষার জন্য দেহ ও তা সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। একইভাবে সহজাত চাহিদা পূরণের জন্যই আধ্যাত্মিকতা ও যৌনতা সংক্রান্ত জ্ঞান মানুষের জন্য অপরিহার্য।

উপরোক্ত চাহিদাসমূহের কারণে মানুষ বহুমুখী সম্পর্ক ধারার তালিকা বিন্যাস জড়িত আছে। এ সম্পর্কে বিন্যাস ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এর নামই সমাজব্যবস্থা। এখানে আছে মানুষের সাথে মানুষ, পুরুষের সাথে মহিলা, মানুষের সাথে বস্তু ও প্রাকৃতিক জগত, মানুষের সাথে জ্ঞান, মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের পরস্পরযুক্ত ও নির্ভরশীল জটিল বিন্যাস। এ ব্যবস্থা স্থবির নয়। এখানে দ্বন্দ্ব আছে, গতি আছে ও নিয়ম আছে। পূর্বে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে পুরো ব্যবস্থাটা ভারসাম্যময় কাঙ্ক্ষিত খাতে অগ্রসর না হয়ে ভারসাম্যহীন অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। মানুষের ভোগান্তি এর পরিণাম। এমতাবস্থায় সমাজের প্রত্যেকটি সম্পর্ক ধারা ও এদের গতি-প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞানকেও অনুশীলন থেকে ইসলাম বাদ দেয় না।

জ্ঞানের ব্যাপ্তি সংক্রান্ত উপরের আলোচনা সর্বমুখী অখণ্ড জ্ঞানের স্বপক্ষে দাঁড়ায়। বস্তু যেমন এর আওতা বর্হিভূত নয়, তেমনি নয় প্রকৃতি, স্রষ্টা, আধ্যাত্মিকতা এবং মানুষ নিজে। সামগ্রিক জ্ঞানকে কুরআন আওতাভুক্ত করে বলেন:

'তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।'[২]

সামগ্রিক জ্ঞানের প্রয়োজন অন্য একটি কারণেও। ইবলিস, যে মানুষের প্রত্যয়ী শত্রু, তার আক্রমণ সর্বগ্রাসী। কুরআনের ভাষায়: 'তাহাদের কার্যকলাপকে শয়তান তাহাদের জন্য চাকচিক্যময় বানাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদেরকে সঠিক পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিল......... ।'[৩]

---

১. শহীদ অধ্যাপক, আয়াতুল্লাহ মুর্তজা মোতাহারী, আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ, ঢাকা-ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতিক কেন্দ্র-১৯৮৪
২. আল-কুরআন, ৪৫:১৩
৩. আল-কুরআন, ২৯:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

'শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে।'[১]

এ সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে সর্বাত্মক জ্ঞানের দরকার। এ জ্ঞান আর নিছক ধারণা অনুষ্ঠানের ব্যাপার নয়। বরং বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ। নিম্নের আয়াত দু'টি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে: 'ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী লোকেরা ধ্বংস হইয়াছে। তাহারাই মূর্খতায় নিমজ্জিত ও চরম গাফিলতিতে বিভোর হইয়া আছে।'[২] এবং 'উহারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।'[৩]

ভাসা ভাসা কোন জ্ঞান নয়, ইসলাম আন্তর্নিহিত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের কথা বলে। এ জ্ঞান আবার শুধুমাত্র তত্ত্বচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অধিকন্তু এর সঠিক প্রয়োগও জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য পর্যায়। আদম (আ.) কে তাত্ত্বিক জ্ঞান দানের পর এর প্রায়োগিক পর্যায় এ অবিচ্ছেদ্যতারই ইঙ্গিত বহন করে।

প্রয়োগধর্মী সর্বাত্মকবাদিতার জন্য ইসলামে জ্ঞানের স্বরূপ বিশেস বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে দু'টো ভিন্ন বিষয় ধারণা করে অনেক চিন্তাবিদই জ্ঞানকে অনীতিবাদী ও মূল্যবোধমুক্ত আখ্যায়িত করে থাকেন। অনেকের মতে এটাই বৈজ্ঞানিকতা, কিন্তু ইসলাম জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে আলাদা করে দেখে না। আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ। কুরআন বারবার বলেছে, যারা ঈমান এনেছে তারাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রেরিতদের প্রত্যেকেই ছিলেন প্রজ্ঞাসম্পন্ন। বস্তুগত জ্ঞান বস্তু সম্পর্কিত যাবতীয়তা ঘিরে আবর্তিত কিন্তু তা কেন বা কোথায় প্রয়োগ করা হবে, ইসলামে আধ্যাত্মিক জ্ঞানই ঈমানী ভিত্তির উপর তার নির্দেশনা দেয়। স্মর্তব্য সে, প্রয়োগবিহীন অধ্যাত্মিক জ্ঞানকেও যথার্থ অর্থে আধ্যাত্মিক বলা যায় না। এখানেও তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় অনস্বীকার্য। এর স্বপেক্ষ কুরআনের হুঁশিয়ারী হচ্ছে: 'তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমরা কর না?'

কুরআন আল্লাহকে অখণ্ড জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে পরিচিত করেছেন। জ্ঞান দ্বারা তিনি সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন।[৪] মানুষের মধ্যে যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ রূহ বিদ্যমান, সেহেতু জ্ঞানের প্রতি তার অন্তজ চাহিদা ও ব্যাপ্তিও সর্বব্যাপী, সৃষ্টির সমস্ত অঙ্গনই এর আওতাভুক্ত।

ইসলাম এক সুসংহত পটভূমিকার উপর সবার আগে জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আল-কুরআনে উন্মোচিত জ্ঞানের নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি বা বাস্তব প্রয়োজনীয়তার স্বরূপ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এ গুরুত্ব সর্বজনীন, দলমত নির্বিশেষে তাবৎ মানবগোষ্ঠীর বেলায় প্রযোজ্য। মানুষের উন্নয়নে, প্রচলিত চিন্তা চেতনায় জ্ঞানকে একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে মাত্র। কিন্তু ইসলামে জ্ঞান মানুষের জন্য অন্ন, বায়ু, যৌনতা ইত্যাদির মতো একটি অন্তজ চাহিদা এবং সেই সাথে লক্ষ্য অর্জনের উপায়ও। অর্থাৎ জ্ঞান মানুষের লক্ষ্য ও উপায় দু'টোই।

---

১. আল-কুরআন, ২৭:২৪
২. আল-কুরআন, ৫১:১০, ১৩
৩. আল-কুরআন, ৫৩:২৮
৪. আল-কুরআন, ৪:১, ২, ৬, ৬:৮১, ২০:৯৮, ৪১:৫৪, ৬৫:১২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের শিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতাঃ

ইসলাম হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং রাসূল (স.)-এর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, মানুষকে 'পদার্থ' (মাটি) থেকে তৈরির পর, এর মাঝে আল্লাহর পবিত্র "রূহ" সঞ্চার করে দেয়া হয়েছে।[১] এভাবে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীতে আল্লাহর "খলিফা" হিসেবে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (স.) এর প্রদর্শিত নিয়মে ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।"[২]

মানুষকে তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগি করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে ইসলাম প্রতিটি নর-নারীর উপর শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন/অম্বেষণ ফরয ঘোষণা করেছে (ইবন মাজাহ)। সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত রাসূল (পথ প্রদর্শক) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতেই 'পড়া' ও 'লেখার' মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৩] রাসূল (স.) তাঁর অনুসারীদেরকে জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে এমন তাগিদও দিয়েছেন যে, "যেখান থেকেই পার জ্ঞান আহরণ কর।"[৪] এবং "জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও।"[৫]

সুতরাং ইসলামে জ্ঞান অর্জন হচ্ছে একটি পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। ইসলামের প্রতিটি অনুসারী ইবাদতের সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন: 'হে প্রভু" আমার ইলম (জ্ঞান) বৃদ্ধি দাও।[৬]

সমাজ বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবনের বহুমুখী চাহিদা ও আচরণের মধ্যে কারণগত সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষের জীবন প্রবাহকে ব্যক্তিগত, দৈহিক, সামাজিক ও মনস্তাত্বিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৭] ইসলামেও মানুষের জীবন বিকাশের ধারা প্রবাহকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরকে বলা হয় নফসে আম্মারা (প্রবৃত্তির তাড়না), যেখানে মানুষ প্রাণিকূলের অন্যান্য জীবদের ন্যায় দৈহিক চাহিদাসমূহ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি) মেটানোর তাড়নায় আচরণ করে। মানব জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয় নফসে লাউয়ামা (আত্মজিজ্ঞাসা/সচেতনতা), যেখানে মানুষ সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তার উর্ধ্বে উঠে আধ্যাত্মিক বা ভালো-মন্দের বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানব জীবনের সর্বোচ্চ বলা হয় নফসে মুতমাইন্না (আত্মসন্তুষ্টি), যেখানে মানুষ দয়া ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে সৎকর্ম সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়।[৮]

---

১. আল-কুরআন, ৬:২ ও ১৫:২৮-২৯
২. আল-কুরআন, ২:৩০ ও ৩:১১০
৩. আল-কুরআন, ৯৬:১-৫
৪. Imam Chazali, Ihay Ulum-al Din, Vol-1, P. 14
৫. Ibid, P. 14
৬. আল-কুরআন, ২০:১১৪
৭. See, Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, New York, 1970
৮. Dr. Moinuddin Ahmad Khan, Political of the Present Age, Capitalism, Comminism and what next, Baitush Sharf Islamic Research Centre, Chittagong, 1990, P. 47

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জীবন বৃত্তের উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশনাবলীতে নিম্নোক্ত তিনটি মাত্রা (Dimension) সংযোজিত হয়েছেঃ

(১) আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাশিকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগি করার জন্য মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টি।

(২) বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার (Observation and analysis) মাধ্যমে এসবের পশ্চাতে সক্রিয় চিরন্তন সত্যের (Ultimate truth) উপলব্ধি এবং

(৩) পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত ভূমিকা পালনার্থে প্রয়োজনীয় আত্মিক বিকাশ বা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষাঃ

মানুষের জীবনের প্রাথমিক স্তরে (নফসে আম্মারা) পৃথিবীতে বেঁচে থাকা ও স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় বহুবিধ উপকরণের। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ "সেই তিনি যিনি (আল্লাহর) তোমাদের (মানুষের) জন্য পৃথিবীতে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।"[১] আল্লাহ প্রদত্ত এ সকল নিয়ামতকে মানুষের উপযোগি করার জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের পক্ষ থেকে কিছু অতিরিক্ত প্রচেষ্টায়। ইসলাম মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ এবং এগুলোকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার উপযোগি করার জন্য সকল ধরণের উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আরও বলেন, "পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি এবং ইহাতে পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি সুপরিমিতভাবে এবং ইহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের (মানুষের) জন্য, আর তোমরা যাহাদের জীবিকাদাতা নহ তাহাদের জন্যও।"[২]

"তিনি সমুদ্রকে অধীনে করিয়াছেন যাহাতে তোমরা তাহা থেকে তাজা মৎস্য আহার করিতে পার এবং যাহাতে তাহা থেকে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী যা দ্বারা তোমরা অলংকৃত হও।"[৩]

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ রহিয়াছে?"[৪]

এসকল আয়াত থেকে তিনটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়ঃ

(১) আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমুদয় সম্পদের সৃজনকারী হচ্ছেন আল্লাহ;

(২) এ সকল সম্পদরাশি প্রদান করা হয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষ বা মানবজাতির প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য এবং

(৩) এ সকল আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ এবং মানুষের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা মানুষের দায়িত্ব।

---

১. আল-কুরআন, ২:২৯
২. আল-কুরআন, ১৫:১৯-২০
৩. আল-কুরআন, ১৬:১৪
৪. আল-কুরআন, ৩১:২০

Dhaka University Institutional Repository

(৪) এ সকল আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ এবং মানুষের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা মানুষের দায়িত্ব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রাশিকে ব্যবহার উপযোগি করার জন্য ইসলাম মানুষকে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অর্জনে উৎসাহিত করেছে। এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে পবিত্র কুরআনের তাগিদ, যেখানে বলা হয়েছেঃ "নামাজ সমাপনান্তে তোমরা বাহিরে (কর্মক্ষেত্রে) ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (নিয়ামত) অনুসন্ধান কর"[১] এবং যাহাকে বিজ্ঞানের জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হইয়াছে।[২]

মুসলিম সমাজের একাংশের মধ্যে এ জাতীয় একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইসলামে জ্ঞান অর্জন বলতে শুধু ধর্মীয় বা শরীয়াতের জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত রাসূল (স.) এর হাদীসসমূহ যেমনঃ যেখান থেকেই পার জ্ঞান আহরণ কর এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও' ইত্যাদি এবং বদরের যুদ্ধবন্দী কাফিরদের মুক্তিপণ হিসেবে জনপ্রতি দশজন মুসলিম বালক-বালিকাকে পড়ালেখা শিক্ষা দেবার ঘটনা উপরোক্ত বক্তব্যের সীমাবদ্ধতাই প্রমাণ করে। আসলে ইসলাম মানুষের মানসিক বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনে (মানব কল্যাণকামী) যে কোন শিক্ষাকেই গ্রহণীয় করেছে।

অপরদিকে, এক শ্রেণির মুসলমানদেরকে এমন কথাও প্রচার করতে দেখা যায় যে, মানুষের ভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত। সুতরাং ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ প্রচেষ্টা ব্যতীত মানুষের কিছুই প্রাপ্য নেই।[৩]

"আল্লাহ তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যাহারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয়।"[৪] এ সকল আয়াতে ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ব্যাপারে মানুষের প্রতি তাকীদ রয়েছে।

জীবন ও জগতের চরম ও অবিমিশ্র সত্যকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে শিক্ষা:

মানব জীবনের প্রাথমিক বা দৈহিক প্রয়োজন (খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি মিটানোর পর মানুষ জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (নফসে লাউয়ামা) উন্নীত হয়। অর্থাৎ তার সামনে হাজির হয় মানসিক চাহিদা। এই স্তরে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনে যে সকল প্রশ্ন জাগরিত হয় তা হচ্ছে তার স্রষ্টা কে? বিশ্ব জগতের সৃষ্টি রহস্য কি? পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহের পেছনে মূল চালিকা শক্তি কি? স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কি সম্পর্ক?

কোন শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না কে তার মা। মাতৃস্তন পান করার মাধ্যমেই সে বুঝতে পারে তার মাকে। তেমনি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রাখা অফুরন্ত সম্পদ ভোগে মানুষের চেতনায় উদ্ভাসিত হয় তার স্রষ্টার কথা। ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে, একমাত্র মহান আল্লাহই (তাওহীদ) হচ্ছে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, পরিচালক, সংরক্ষক ও সর্বময় কর্তা।

---

১. আল-কুরআন, ৬২:২০
২. আল-কুরআন, ২:২৬৯
৩. আল-কুরআন, ৩৩:৩৯
৪. আল-কুরআন, ১৩:১১

Dhaka University Institutional Repository

এই চরম সত্যটি উপলব্ধির জন্য আল্লাহ মানুষকে গভীরভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্ম রহস্য ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য বারংবার উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের ৭৫০টির মত আয়াত বা এর এক-অষ্টমাংশ জুড়ে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী।

পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহের উপর পরিচালিত গবেষণা। প্রাকৃতিক ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটন সম্ভবপর হয়। এভাবে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত করা হল: "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল পানিযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"[১]

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নির্দেশনাবলী রহিয়াছে বোধ শক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য।"[২]

"যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে "হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র......."[৩]

"পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন.......আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৪]

"তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর আমি যখন ইহাতে বারিবর্ষণ করি, তখন তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ, এটাই তো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"[৫]

"আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্র হইতে, তারপর রক্তপিণ্ড হইতে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট অথবা অসম্পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে। তোমাদের নিকট আমার শক্তি ব্যক্ত করার জন্য আমি ....এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখিয়া দেই। তারপর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও।"[৬]

"এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[৭]

---

১. আল-কুরআন, ২:১৬৪
২. আল-কুরআন, ৩:১৯০
৩. আল-কুরআন, ৩:১৯১
৪. আল-কুরআন, ২৯:২০
৫. আল-কুরআন, ২২:৫-৬
৬. আল-কুরআন, ২২:৫
৭. আল-কুরআন, ১৬:৭৮

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রকৃতি জুড়ে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর মহান ক্ষমতার কথাই বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এই চরম সত্যটি উপলব্ধি করার জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং আবহাওয়াবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে অধ্যয়ন প্রয়োজন। বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলীর মতেঃ আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের জন্য কুরআনের কতিপয় আয়াত বুঝতে সহায়ক হচ্ছে যেগুলোর অর্থ কিছুদিন পূর্বে আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব ছিল।"[১]

গভীর অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল্লাহকে উপলব্ধির পর, স্বভাবতই মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এবং তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি জাগরিত হয়, মানুষ কামনা করে আল্লাহর সান্নিধ্য ও করুণা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার ব্যাপারে কুরআনের এসব আয়াতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগে জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-রাজী, আল-বেরুনী, আল-জাযারি, আল-ফারাবী প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মুসলিম জ্ঞান সাধক বিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণা কর্মের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিলেন, যা আজকের বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করেছে। তাঁরা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, জ্ঞান আহরণ এবং বস্তু পৃথিবীর পদ্ধতিগত পর্যালোচনা চরম সত্য আল্লাহকে অনুধাবন ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য অতীব প্রয়োজন।[২]

মানবিক গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষাঃ

আল্লাহর অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যবোধ জাগ্রত হাওয়ার পর, মানুষ তার জীবন বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে (নফসে মুতমাইন্না) উন্নীত হয়। সে জানতে আগ্রহী হয় পৃথিবীতে তার কি করণীয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর 'খলীফা' হিসেবে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য।[৩]

আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা বা করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ "হে বনী আদম".......বল! আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার" "আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ করিয়াছেন সকল বিষয়ে ন্যায়বিচার করিতে এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে।"[৪]

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করিবে, অসৎকার্যে নিষেধ করিবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করিবে।"[৫]

"যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদের পুরস্কার.......স্থায়ী জান্নাত যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।"[৬]

---

১. Mausrica Bucaille, The Bible, The Quran and Science, American Trust Publication, Indianapolis-1979, P.251
২. M.A. Kazi, The pursuit of scientific knowledge in Islam, Islamic Thought and Scientific Creativity, Vol-1, January- March, 1990
৩. আল-কুরআন, ২:৩০
৪. আল-কুরআন, ১৬:৯০
৫. আল-কুরআন, ৩:১১০
৬. আল-কুরআন, ৯৮:৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহে পৃথিবীতে মানুষের "বিশ্বদর্শন" সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর "খলীফা" হিসেবে পৃথিবীতে মানুষের মিশন হচ্ছে সামাজিক আচরণ বা লেনদেনের ক্ষেত্রে "ন্যায়বিচার" প্রতিষ্ঠা ও "মানুষের কল্যাণ" সাধন করা এবং "সৎকার্যের নির্দেশ" প্রদান করা ও "অসৎকর্মে নিষেধ" করা। আর এই মহান দায়িত্ব পালনের পথ নির্দেশিকা বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (স.) এর আদর্শ। পবিত্র কুরআনে তাই বলা হয়েছেঃ "আমি যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছি ন্যায়-নীতির কিতাবসহ যাতে মানুষ সমাজে ন্যায়বিচার কায়েম করে।"[১] মানুষকে এও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে এ সকল দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে মানুষকে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।[২] ইসলাম আরও বিশ্বাস করে যে, পার্থিব জীবনই মানুষের জন্য শেষ নয়। মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য নির্ধারিত রয়েছে আর এক দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী জীবন, যে জীবনের কল্যাণ নির্ভর করছে পার্থিব জীবনের কর্মমূল্যায়ণের উপর। এটাই হচ্ছে সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও জীবনদর্শন সম্পর্কে আদর্শিক অনুপ্রেরণা বা দিক দর্শন।

আধুনিক শিক্ষার ন্যায় ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা সেক্যুলার বা মূল্য-নিরপেক্ষ নয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু বস্তুগত উন্নতির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বস্তুগত উন্নতির ব্যাপারে ইসলামও মানুষকে উৎসাহ প্রদান করেছে। কিন্তু একই সাথে ইসলাম মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যবোধ এবং তাঁর "খলীফা" হিসেবে নির্ধারিত ভূমিকা ('ন্যায়বিচার' ও 'মানব কল্যাণ' সাধন) পালনার্থে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি ও মানবিক গুণাবলী (সততা ও ন্যায়বোধ, দয়া ও ত্যাগের অনুভূতি ইত্যাদি) বিকাশের উপরও গুরুত্ব আরোপ করে। এটাই হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের আদর্শিক অনুপ্রেরণা বা দিক দর্শন।

অতএব, ইসলাম স্বীকার করে শুধু সেই জ্ঞানকে যেটা মানুষের কল্যাণে প্রয়োজনীয়তা এবং যেটা মানুষকে সৎ, কল্যাণকামী ও ন্যায়বান হিসেবে আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। সংক্ষেপে, যেটা মানুষকে সৎ, কল্যাণকামী ও ন্যায়বান হিসেবে আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। সংক্ষেপে, যেটা "তাকওয়া" অর্জনে সাহায্য করে। "তাকওয়া" শব্দটি পবিত্র কুরআনে ২৫৮ এরও অধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। "তাকওয়া" হচ্ছে এমন একটি নৈতিক বিধান যেটা মানুষকে আনুপাতিক হারে অসৎ ও মন্দ কর্ম পরিহার এবং ভাল ও পুণ্য কাজে উদ্বুদ্ধ করে। "তাকওয়া"র কেন্দ্র হচ্ছে মানুষের হৃদয় (আত্মা), যেটাকে পরিশুদ্ধ করা যায় শিক্ষার মাধ্যমে। আল্লাহ্ চান মানুষ নীতিবান বা বিবেকবান হিসেবে পরিশুদ্ধ হউক। মানুষ তাকওয়ার এই নৈতিক মান বজায় রাখতে পারে শুধুমাত্র "ঈমান-বি-আল্লাহ্" (আল্লাহর উপর বিশ্বাস) এবং "আমল-আল-সালেহ" (সৎকর্ম) এর মাধ্যমে।

উপরোক্ত আলোচনাকে অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন রাসূলে করীম (স.) নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমেঃ মানুষ ঈমানের মাধুর্য তখনই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, যখন তার ভেতর নিম্নোক্ত তিনটি জ্ঞানের সমন্বয় ঘটেঃ (১) সবকিছুর উপর আল্লাহর প্রতি প্রেম এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, (২) আল্লাহর উদ্দেশ্য মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং (৩) দোযখের আগুনের ন্যায় অসৎকর্মের প্রতি ঘৃণাবোধ।[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৫৭:২৫
২. আল-কুরআন, ২:২৮১
৩. As Quoted by Dr. Serajul Haque, Imam Ibn Taimiyah (R.) and His projects of Reform, 1987, P. 167

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নিরক্ষরতা দূরীকরণে মহানবী (স.)-এর শিক্ষাদর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তিক গতিশীলতা

* সূচনা বক্তব্য
* মহানবী (স.)-এর শিক্ষাদর্শন পরিচিতি
* তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার পরিধি ও কাঠামো
* তাঁর শিক্ষাদর্শনের ব্যাপকতা ও প্রগতিশীলতা
* তাঁর শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য
* তাঁর শিক্ষাদর্শনের উৎস
* নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক গতিশীলতার বিকাশে মহানবী (স.)- এর শিক্ষাদর্শন
* খুলাফা-ই-রাশিদার যুগ
* উমাইয়া যুগ
* আব্বাসীয় যুগ

Dhaka University Institutional Repository

সূচনা বক্তব্যঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষাদর্শন বলতে মূলতঃ তাওহীদ ভিত্তিক শিক্ষাকে বুঝায়। এর অপর নাম ইসলামী শিক্ষা। এ শিক্ষার মূল উৎস হল আল-কুরআন ও সুন্নাহ। এ দু'টি নীতি অনুসরণের মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে, এরই নাম ইসলামী শিক্ষা। এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমন্বয় সাধনের এ ধারাবাহিকতাও তখন থেকেই শুরু হয়। মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায় স্বয়ং তিনিই শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব পালন করতেন। সাহাবা-ই-কিরাম তাঁর ছাত্র হিসেবে আল-কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞান গরিমা ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন। কেননা, ইসলামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার প্রতি তার অপরিসীম অনুরাগ। আল-কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাণীই হল "পড়" অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন কর।[১] মানব জাতির চিরঅজ্ঞতা, অন্ধকার, অনৈতিকতা, যুলুম-অত্যাচার, অসভ্য, অকল্যাণ দূর করতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস। মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের বন্ধু। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানের সাথে পরিচালিত করেন। মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আল্লাহর যে সমস্ত গুণ আত্মস্থ করা প্রয়োজন তার প্রথমটি হল সেই বৈশিষ্ট্য, যা জীবনের জন্য সক্রিয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রিকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"[২]

কেবলমাত্র কুরআনে বর্ণিত এসব বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে তার (মানুষের) গবেষণা করা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন তার যথার্থ ব্যবহার। এ পথে অর্জিত হয় শক্তি এবং শক্তিকে নাগালে আনার একমাত্র উপায় হল জ্ঞান। এজন্য ইসলামে জ্ঞানার্জনকে সকলের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। (ইবনে মাজা) জ্ঞানার্জনের জন্য বিশ্বের যে কোন স্থানে (সুদূর চীন দেশে) এবং অবিশ্বাসীদের কাছে পাওয়ারও কথা বলা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ কর, কেননা যে আল্লাহর পথে জ্ঞানার্জন করে সে পূণ্যের কাজ করে; যে জ্ঞানের কথা বলে সে আল্লাহর প্রশংসা করে; যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে আল্লাহর আরাধনা করে, যে জ্ঞান দান করে, সে দান-খয়রাত করে; আর যে উপযুক্ত পাত্রে তা দান করে সে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করে। জ্ঞান এমন বস্তু যা জ্ঞানীকে নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয় এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সহায়তা করে; জ্ঞান বেহেশতের পথ আলোকিত করে; নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞান আমাদের বন্ধু, নির্জনে তা আমাদের সমাজ; পরিত্যক্ত অবস্থায় এ আমাদের সাথী; এ আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করে; এ বিপদে আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে। বন্ধুমহলে এ আমাদের অলঙ্কার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর বান্দা পবিত্রতার শীর্ষে ও মহৎ মর্যাদায় উন্নীত হয়।

---

১. আল-কুরআন, ৯৬:১
২. আর-কুরআন, ২:১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ইহজগতে নৃপতিদের সঙ্গ লাভ করে এবং পরকালে পূর্ণাঙ্গ সুখপ্রাপ্ত হয়।[১] এভাবে ইসলামের সুমহান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ অসীম স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে সত্য, শুভ ও সুন্দরের চর্চা করবে এবং জীবন, সমাজ ও জগতকে কল্যাণময় করে তুলবে।

মহানবী (স.)-এর শিক্ষাদর্শন:

তত্ত্বগত ও বাস্তবদিক থেকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ব্যাপক ও সমন্বিত বিষয়। ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন শাশ্বত ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। তাই ইসলামী শিক্ষা বলতে শুধু বুনিয়াদী ইবাদত ও ব্যক্তি জীবনের গণ্ডীতে সীমিত কতিপয় মাস'আলা মাসায়িল শিক্ষার মধ্যেই সীমিত নয়। মানুষের সামষ্টিক জীবন যত ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ, ইসলামী শিক্ষাও তত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ। অসীম আল্লাহ প্রদত্ত ওহীভিত্তিক জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উৎস। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামী ভাবধারার ভিত্তিতে মানব জাতির ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবন ও বৃত্তির বিকাশ এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা। তাওহীদ ভিত্তিক যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক, ব্যষ্টিক কল্যাণ নিশ্চিত হয় তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। যে শিক্ষা লাভ করলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক সুস্থ মানব প্রকৃতিকে সর্বপ্রকারের অনাচার ও পাশবিক প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র রাখতে পারে, মূলত তাই ইসলামী শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম সঠিক বিশ্ব দৃষ্টির সাথে সমন্বিত করতে পারে তার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ।[২]

মানুষের আত্মিক জগত, বস্তু বা পৃথিবীর জগত, পরকাল বা আখিরাতের অনন্ত জীবন ও জগতের সাফল্য এবং মুক্তির সঠিক জ্ঞান যে শিক্ষা দ্বারা লাভ করা যায় তাই ইসলামী শিক্ষা। মানুষের সমগ্র জীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত। (১) মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক (২) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক (৩) মানুষের সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। যে প্রক্রিয়ায় এ ত্রিবিধ সম্পর্ককে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করতে পারে তাই ইসলামী শিক্ষা।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তার 'ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৩] যে জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ধারাকে আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের বুনিয়াদে পরিচালনা করতে পারে তাই ইসলামী শিক্ষা।

এক সঙ্গে যে শিক্ষা ও প্রক্রিয়া জড় ও আত্মার সমন্বয় সাধন করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানবল্যাণের নিমিত্তে ব্যবহারের উপযোগি দেহ ও আত্মার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের সঠিক প্রক্রিয়া ও জ্ঞানদান করে তাই ইসলামী শিক্ষা। ইসলামের জাগতিক বিষয়সমূহ, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য। এভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে পৃথিবীতে ও মৃত্যুর পর উভয় জীবনের জন্যই প্রস্তুত করে গড়ে তোলে। এককথায়, সত্য,

---

১. Syed Amir Ali, The Spirit of Islam, Delhi, Madras, Calcutta, 1947, P. 360-61

২. সামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইসহাক, শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ৭

৩. আল-কুরআন, ৫১:৩

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর ও কল্যাণের উপলব্ধি এবং সে আলোকে জীবনধারা ও বিকাশের মাধ্যমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা।

মুসলিম শিক্ষার প্রথম বিশ্ব করফারেন্স যা ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত হয় তাতে বলা হয়েছেল: Education should aim at the balanced growth at th total personality of man through the training of Man's spirit, intellect, the rational self, feelings and badly senses. Education should therefore eater for the growth of man in all its aspects: Spiritul, intellectual, imatinative, physical, scientific, linguistic, both invividually and collectively, and motivate all these aspects towards goodness and the allainment of perfection, the ultimate aim of Muslim Education lies in the realisation of complete Submission to Allah on the lavel of the individual, the community and humanity at large.[১]

'মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুষম বৃদ্ধি' ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।[২]

মহানবী (স.)-এর শিক্ষাব্যবস্থার পরিধি ও কাঠামো:

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি হওয়ায় মানব জীবনের সকল শাখার জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত। ঈমান 'আকীদা, বিশ্বাস, প্রত্যয়, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, ইবাদাত-বন্দেগী, তাওহীদ-রিসালাত, কুফর-শিরক, কৃষ্টি, সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, বিবাহ-শাদী, সৌজন্য-শালীনতা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, প্রশাসন, শিষ্টাচার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, গণতন্ত্র, আইন বিচার, শাসন সকল কিছুই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।[৩]

---

১. The world conference on Muslim Education, Mecca, 1977.

২. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে জোর দেয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও সমাজের জাগতিক মঙ্গলের দিকে। শিশুদের কাছে আশা করা হয় তারা যাতে বড় হলে নিজেদের অবস্থান খুঁজে পেতে পারে। সেই লক্ষ্যেই তারা নিজেদের উৎসাহিত, প্রস্তুত ও প্রশিক্ষিত করে তোলে। তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, শিক্ষা, নৈতিক উৎকর্ষ লাভ, শালীনতা, সত্যবাদীতা, ন্যায়পরায়ণাত, ন্যায্য ব্যবহার, ত্যাগ, যত্নশীলতা, নিঃস্ব ও অসহায় অরক্ষিতদের জন্য উদ্বেগ এবং সামাজিক দায়িত্বের জন্য প্ররোচিত ও উৎসাহিত করা হয় না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বৈষয়িক বিষয়াদির প্রতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে আরো ধারালো করে তাকে জড়বাদী এই পৃথিবীতে ভয়ংকর প্রতিযোগিতায় নামায়। নৈতিকতা, আর্থিক উন্নতি এবং অন্যান্য শ্রেয়তর জীবনের মূল্যবোধ অপেক্ষা 'পৃথিবী যোগ্যতাময়' এটাই একমাত্র আদর্শ হিসেবে এখানে প্রতীয়মান। প্রশ্ন করার সীমাহান স্বাধীনতা ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি সংশয়াপন্নতা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য শর্ত। মানুষ হিসেবে তার উপযুক্ততা ও দায়বদ্ধতার সাথে সাথে সততা, সাধুতা এবং উচ্চ এক জীবনের সচেতনতার চেয়ে তাকে নীতিগতভাবেই বৈষয়িক বিজ্ঞ এক জীবন তৈরির লক্ষ্য তার সামনে তুলে ধরা হয়। মানব জাতির চরিত্র ও ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে 'অবস্থানগত নীতিতন্ত্রের' সার সংক্ষেপে দেখা যায় যে পরম মূল্যের প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে অপেক্ষবাদের চর্চার প্রতিই যেন তাদের ঝোঁক বেশী। প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্তিশীল এই অপেক্ষাবাদ উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধ ও সর্বজনীনতাকে ধ্বংস করছে। সর্বদর্শী স্রষ্টার উপর বিশ্বাস নিয়ে আসে দায়দায়িত্ব, হিসাব দেয়ার ইচ্ছা, নীতি, সততা ও শিষ্টতার বিচারবোধ এ ব্যাপারগুলো শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই জাগ্রত হয়। ইসলামী শিক্ষার বিশিষ্টতা, গ্রহণযোগ্যতা-নিরিখেই বিচার্য।

৩. ড. আবু ইউছুপ মো: নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান (১৯৭১-১৯৯৯ খ্রি:) অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০২, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানের সব শাখা ইসলামী শিক্ষায়ও স্বীকৃত। রসায়ন, জীব, তড়িৎ বিদ্যাসহ বিজ্ঞানের সব শাখার আলোচনা কুরআন ও হাদীসে গুরুত্বসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিচালনার জন্য কলা ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা 'ইসলামী শিক্ষায়' যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আগামীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ইসলামী শিক্ষায় ইতিহাস বিষয়কে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[১]

যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ মানব জাতির বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চেতনার সাথে সাথে পার্থিব জীবনাচরণ এবং বস্তু ও আত্মার নির্ভুল পন্থা ও প্রক্রিয়া দান করেছে। নবীগণ কুটিরশিল্প, পাত্রশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, বস্ত্রশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে পারদর্শী ছিলেন। বস্তুত মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় জ্ঞানই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে স্বীয় ঐতিহ্যে পরিচালিত পরিপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিচালিত সকল বিষয় এখানে বিদ্যমান। তবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ (Almighty Allah) বলে উল্লেখ করা হয়।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মূল দর্শন 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' (Islam is the complete code of life) এর আলোকে বিন্যস্ত। ফলে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, খিলাফত, ইখওয়াত, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা, সৎকাজে আদেশ/অসৎ কাজে নিষেধ এবং পরস্পরকে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে মানুষকে বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ধাবিত করে। ফলে তারা ধর্ম-কর্ম ও ভালো-মন্দের তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রের গোলামে পরিণত হয়। এতে শ্রেণিবৈষম্য তৈরি হয়। ব্যক্তি স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়ে এক ধরণের হতাশাপূর্ণ ও একঘেয়েমীপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দেয়। এমনিভাবে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নামেও পৃথিবীতে আরেকটি ব্যবস্থার জন্ম দেয়। এমনিভাবে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নামেও পৃথিবীতে আরেকটি ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেও মানুষের ইহকালীন জীবনের আলোকে শিক্ষা দেয়া হয়, পরকাল সম্পর্কে সেখানে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয় না। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত হয়ে মানুষ জাতিগত ও দেশগত শ্রেণি বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। অথচ ইসলামী শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনুপম আদর্শ দ্বারা দুনিয়ার জীবনের সাফল্য লাভের পাশাপাশি পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের জন্য পথ নির্দেশ করে। অন্যকথায়, ইসলামী শিক্ষা মানবীয় গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর সৎ বান্দা হিসেবে তৈরি করে দেয়।[২]

তাছাড়া বিজ্ঞানের যত শাখা অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্ণয় করা হয়েছে, ইসলামী শিক্ষায়ও তা যথাযথ রয়েছে। রসায়ন, জীব, পদার্থ, তড়িৎ বিদ্যাসহ বিজ্ঞানের সকল শাখার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিচালনার জন্য কলা ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা 'ইসলামী শিক্ষায়' যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে

---

১. অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম ছিফাতুল্লাহ, 'ইসলামী শিক্ষা: বন্ধ সংকোচন ও নিরসন' মাসিক দারুস সালাম ৩য় বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ১৪১

২. ড. নেসার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

কাজে লাগিয়ে আগামীর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ইসলামী শিক্ষায় ইতিহাস বিষয়কে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মূলকাঠামো হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা যায় তা হ'ল:

(ক) ইসলাম জড় ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিস্বত্তাকেই মানুষ মনে করে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মাকে রূহ বলে, আর আত্মা বিবর্জিত দেহকে লাশ বলে। তাই দেহ ও আত্মার যথার্থ গুরুত্ব প্রদানই ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর মূল দর্শন।

(খ) মানব সমাজে ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার, স্বার্থের সংরক্ষণ, ব্যক্তি ও সমাজের সুবিচারভিত্তিক সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর দ্বিতীয় শর্ত।

(গ) চিন্তা বিশ্বাস প্রত্যয় ও কর্ম এবং বাস্তব জীবনের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। তাই চাহিদা, উৎপাদন, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধন ও স্ফুরণ, আল্লাহমুখী, কল্যাণধর্মী, আদর্শবাদী, সংবেদনশীল, মানবদরদী জনশক্তি সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) আত্মসচেতন, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিতামূলক কর্তব্যপরায়ণ, ব্যক্তি স্বত্তার সার্বিক উন্নয়ন সর্বজনীন কল্যাণমুখী মানবতার মূর্ত প্রতীক, তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান বিশ্বাস ও কর্মের বাস্তব মিল ও সমন্বয় সাধনের উপযোগি জনগোষ্ঠী সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্যের বিলুপ্তির সাধন করে ধর্ম ও বাস্তব জীবনকে একই বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(চ) এ শিক্ষার সকল বিভাগের ইসলামী দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য প্রদান ও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পুনর্গঠন ও ইসলামী জীবন চেতনার প্রভাব সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী শিক্ষা কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহানবী (স.)-এর শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতা ও প্রগতিশীলতা:

একটি জাতির শিক্ষার স্বরূপ সে জাতির জীবনাদর্শনের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট জাতির জীবনবোধ, জীবনাচার, জীবনের বিকাশ ও পরিণতির উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি হয়। আধুনিককালের শিক্ষাবিদদের কেউ কেউ মনে করেন, ইসলামী শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি শাখাবিশেষ। এই শ্রেণির শিক্ষাবিদদের মতে, এ শিক্ষা ব্যক্তি জীবনের একটি অংশের সাথেই সম্পৃক্ত, ব্যক্তির গোটা জীবন এই শিক্ষার আওতায় আসে না।[১] বলাবাহুল্য, ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কিত এ ধরণের ধারণা প্রাক-ইসলামী যুগের একটি বিশেষ চিন্তা থেকেই উৎসারিত। আর তা হচ্ছে জীবন লোকায়ত ও ধর্মনিরপেক্ষ। তাই শিক্ষার অধিকাংশ পর্যায়ই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে এর সামান্য অংশই সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষা সম্পর্কিত এ ধরণের অভিমত ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ, ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবিধান।[২] মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জীবনের সর্বদিক সম্পর্কেই ইসলামের বিধান রয়েছে। ইসলাম সর্বকালের, সর্বযুগের,

১. এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪২
২. আল-কুরআন, ৫:৩

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশ্রেণির মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এজন্য এই বিধানের পরমুখাপেক্ষিতার কোন অবকাশ আদৌ নেই। ইসলাম মানব সৃষ্টি ও মানব প্রকৃতির বিকাশ, চলমানতা, যুগ চাহিদা সম্পর্কে একটি নির্ভেজাল স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।[১]

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি।[২] মহান আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা আদেশ-নিষেধের বাস্তবায়নই হলো মানবতার ধর্ম। মানুষ এই দায়িত্ব পালনে যদি কৃতকার্য হয়, সফলতা লাভ করে তা হলেই তার জীবন সার্থক। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ একটি জটিল সৃষ্টিও বটে। তিনি মানবের মাঝে অনন্ত সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে রেখেছেন। সেই প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশে শিক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। সে জন্য প্রয়োজন সঠিক পথ নির্দেশনা সম্বলিত বিধি-বিধানের। আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত এক বা দুই লক্ষাধিক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে সঠিক পথ-নির্দেশ করার জন্য। তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিল ১০৪ খানা কিতাব ও সহীফা। এগুলো ছিলো আসমানী সংবিধান। এর আদলেই বনী আদমের জীবন পরিচালনা অপরিহার্য ছিল, আছে, থাকবে। দুনিয়াতে শুরু থেকে নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ধারা চলে আসছিল।[৩] হযরত আদম (আ.) এর সময়ে ইসলামী শিক্ষার সূচনা ও হযরত নূহ (আ.) এর সময়ে এটি বাস্তবায়িত হলেও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নবুওয়াত কালীন। আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে তাঁর হাবীবের উপর নাযিল করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন। এই গ্রন্থকেই তিনি মানবজাতির জন্য জীবন-বিধান হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন, আর ইসলামকে করেছেন মানুষের জন্য মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন পদ্ধতি।[৪] কুরআন হচ্ছে সেই জীবন-বিধানের প্রধান উৎস। সুতরাং ধর্ম জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম ব্যতীত জীবন সুন্দর ও সমুজ্জ্বল হতে পারে না। জীবন ও ইসলাম এ দুটোর একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। মুসলমানের জীবন কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে। আমৃত্যু মানব জীবন ইসলামী অনুশাসনের অধীন। দৈনন্দিন জীবন-যাপন পদ্ধতি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এককথায় জীবনের সব দিকেই ইসলামী বিধি-বিধানের অধীনে পরিচালিত হওয়াই আল্লাহর নির্দেশ।

দুনিয়াতে মানুষ কর্মশীল। কাই মানুষের জীবন। তাই, জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেকেরই একটা না একটা অবলম্বন রয়েছে। সে অবলম্বন বা বৃত্তি মানব জীবনের সঙ্গে সংযোজিত। এটা জীবনের এক অঙ্গ। সুতরাং মানব জীবন কেমন হবে, কিভাবে পরিচালিত হবে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি, মানুষের দাবীই বা কিসে পূরণ হতে পারে, মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিই বা কিভাবে অর্জিত হতে পারে এমন সব প্রশ্নের জবাব দানই হল ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ।

---

১. আল-কুরআন, ১৭:৭০
২. আল-কুরআন, ২:৩০
৩. আল-কুরআন, ২:১৩৬
৪. আল-কুরআন, ৫:৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে দুনিয়ায় তাঁর খলীফা হিসেবে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, তারা দুনিয়াতে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাস্তবায়ন করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।[১] এই গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনা এবং জ্ঞান ও শক্তি-সামার্থ্য দান করেছেন। প্রকৃতিগত এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই মানুষ অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। এর মাধ্যমেই আদিমানব হযরত আদম (আ.) ফিরিশতাকূলের মোকাবিলায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যথারীতি বজায় রাখতে সমর্থ্য হন। সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষালাভ ও জ্ঞান আহরণের জন্য সব পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। একমাত্র যথার্থ জ্ঞানের আলোকেই মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। বস্তুত জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ মহান স্রষ্টার সাথে নিজের ও অন্যের সম্পর্ক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।[২]

আল্লাহ্ তা'আলার যত নিয়ামত মানুষের উপর বর্ষিত হতে পারে তার মধ্যে জ্ঞান দ্বারাই হযরত আদম (আ.) আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি লাভ করেন। আর মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লাভের গোড়ার কথাই হল বিদ্যার্জন। কুরআনে ঘোষিত হয়েছেঃ আর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।[৩]

জ্ঞানার্জন সাধারণত পড়াশোনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই, জ্ঞানার্জনের প্রথম শর্তই হলো 'পড়'। পড়ার সঙ্গে জ্ঞানার্জনের সম্পর্ক সেই আদিকাল থেকেই স্বীকৃত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের কাছে প্রেরিত প্রথম ওহীতেই ঘোষণা প্রদান করেন।

'হে নবী!' পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন এবং আপনার রব মহাসম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তাই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।[৪]

উপরে উদ্বৃত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন। মানুষ প্রথমে কোন অস্তিত্বসম্পন্ন জীব ছিল না। অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকেই সে অস্তিত্ব লাভ করে পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ লাভ করেছে। তাই, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাকেই প্রথম জ্ঞান আহরণ করতে হবে। স্বীয় অস্তি ত্বের জ্ঞান করো অর্জিত হলে সে মানুষ কোন অবস্থাতেই অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার দ্বারা স্বীয় মনুষ্যত্বকে কলুষিত করতে পারে না। আর ইসলামী শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নৈতিক শিক্ষাদান এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।

অতএব, নির্ভুল-নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারাই এই যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব। এর জন্য মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান সূত্রেরই শরণাপন্ন হতে হবে। সৃষ্ট জগত আল্লাহর মহাকুদরত আর জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। গোটা সৃষ্ট জগতই সীমাহীন রহস্যের ভান্ডার। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকার সৃষ্টিই গভীর রহস্যের জালে আবৃত। অনেক কিছুই মানুষের অজানা আর মানুষ ইচ্ছা ও চেষ্টা করলেই সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে না। মানুষের এই অসহায়ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্ মানুষকে তাই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"[৫]

---

১. আল-কুরআন, ৩:১১০
২. Syed Amir Ali, The Spirit of Islam, Delhi, Madras, Calcutta, 1947, P. 317
৩. আল-কুরআন, ২:৩০-৩১
৪. আল-কুরআন, ৯৬:১-৫
৫. আল-কুরআন, ২:২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত অর্থেই মানুষের জন্য কল্যাণকর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য সূত্র একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান। এ জন্যই ঘোষিথ হয়েছে, 'যাকে হিকমত তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তাকে সর্বোত্তম সম্পদই প্রদান করা হয়েছে।'[১]

জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ লাভ সম্ভব। যথার্থ শিক্ষা লাভ করা ছাড়া জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আসে না। তাই কুরআন ও হাদীসের অনেকাংশেই বিদ্যার্জনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তাকিদ দেয়া হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত 'ফরয' শব্দটি ইসলামী শরীআতে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ (১) ফরযে আইন ও (২) ফরযে কিফায়াহ। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অপরিহার্য ও সমষ্টিগত অপরিহার্য করণীয়। ফরযে আইনের অন্তর্গত হলো নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য জরুরি সর্ববিধ বিষয়ের জ্ঞানার্জন। যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত, পবিত্রতা অর্জন, হালাল-হারাম, চারিত্রিক গুণাবলী ও বান্দার হক এবং ইসলামী শরীআতের মৌলিক 'আকীদা ও ঈমানের বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। বলা যায়, পার্থিব জীবনের যেসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন।

ইসলামে ঈমান, 'আকাঈদ, 'ইবাদাত, পারস্পারিক লেনদেন, সামাজিক লেনদেন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, উসূলে ফিকহ্ এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন বিষয়ক অর্থনৈতিক, শিল্প সংক্রান্ত, কারিগরি, কৃষি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা হলো ফরযে কিফায়ার আন্তর্গত। এটা সবার উপর সমভাবে ফরয নয়, বরং সমাজের কিছু সংখ্যক লোক এসব উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করলেই অন্যরা এসব জ্ঞানার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

বিদ্যার্জন সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরীআতসম্মত পন্থায় হতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞান হবে শরী'আতের জ্ঞানসম্বলিত অথবা মানুষের ইহজাগতিক ও পরলৌকিক কোন জীবনের জন্যই প্রয়োজনীয় নয় তা অর্জনে অযথা সময় ব্যয় মূল্যবান সময়ের অপচয় মাত্র। তদুপরি ইসলামী শরী'আতসম্মত পন্থায় জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা না হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। দ্বীনি ইলমই হোক আর পার্থিব ইলমই হোক, তা অর্জনের পদ্ধতি শরীআতসম্মত হতে হবে।

দ্বীনি ইলম শিক্ষার উপর এর স্থায়িত্ব, কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভরশীল। তাই দ্বীনি 'ইলম অর্জনেও মানুষকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 'ইলম অর্জনে দ্বীনি' আলিমের দ্বারস্থ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই এ জ্ঞানই হল দ্বীন, সুতরাং কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছ, চিন্তা-ভাবনা কর।'[২]

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করলেই কারো দায়িত্ব শেষ হয় না। নিজে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের মধ্যেই দেশ-জাতির অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ, এ পন্থা ছাড়া দ্বীনি 'ইলমের প্রচার, প্রসার ও স্থায়িত্ব লাভের দ্বিতীয় কোন কার্ডকর পন্থা নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) দ্বীনি 'ইলম নিজে শিক্ষা করতে ও অন্যকে শিক্ষা দিতে ইরশাদ করে বলেন, 'উত্তম সদকা বা দান হলো কোন মুসলমান দ্বীনি ইলম শিক্ষা করবে, অতঃপর সে ইলম তার অপর ভাইকে শিক্ষা দেবে।'[৩]

---

১. আল-কুরআন, ৯৬:৫
২. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাল আল-কুশায়রীঃ মুসলিম শরীফ, আল মাকতাবা রশিদিয়া, দিল্লী, ১৩৭৬ হিজরী
৩. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, মেশকাত শরীফ, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ১৯৭৪, ২য় খণ্ড, পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যা ব্যতীত কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না, আর সীমিত জ্ঞান দ্বারাও আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা শিখিয়েছেন এভাবে, "হে নবী! আপনি বলুনঃ হে প্রভু, আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।"[১]

মানুষকে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় দ্বীনি 'ইলম এবং পরবর্তী সময়ে দুনিয়াবী ইলম অর্জন করে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, যাতে কোন দিকই উপেক্ষিত না হয়, আর দুনিয়ার জীবন পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বাস জন্মে এবং তা মনে বদ্ধমূল হয়। কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে জীবন-যাপন করলে মানুষ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে সে সম্পর্কে পথ নির্দেশ দানই হলো ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ। বলা বাহুল্য, ইসলামী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমেই মানুষ মহৎ লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে।

মহানবী (স.)-এর শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্যই হচ্ছে একজন মানুষের বিশ্বাস, কাজ-কর্ম, সম্ভাবনা, ধীশক্তি, চিন্তা-ভাবনা, মতের প্রকাশ, উচ্চাকাঙ্খা, উদ্যম এবং ঐ মানুষটির সাথে সম্পর্কিত সকল কিছুরই একটা পরিপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করা। অন্যকথায়, আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সুষম উন্নয়ন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান আহরণ, দক্ষতা অর্জন ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভের মাধ্যমে শুধু এই জীবনের সাফল্য ও সুখের লক্ষ্যেই পৌঁছিয়ে দেয় না, বরং আল্লাহর অপার কৃপা ও দয়ায় আখিরাতের পথকেও সহজ করে। শিক্ষার সর্বস্তরে সকলের নিকটই এই লক্ষ্যই জানা থাকতে হবে।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য বহুমুখী। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে এ পৃথিবীতে দায়িত্ব পালনের জন্য যে ধরণের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুণাবলী প্রয়োজন তা অর্জনই হবে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

উত্তম চরিত্র গঠন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও'[২] অর্থাৎ মহৎ চরিত্রের অধিকারী হও। মহানবী (স.) বলেছেনঃ 'আমাকে নৈতিক চরিত্র মহাত্ম পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্যেই প্রেরণ করা হয়েছে। কাজেই নৈতিক চরিত্র গঠন, সুন্দর ও মহৎ জীবন গড়ে তোলা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে করে মানুষ আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করে তাকে ভয় করতে শিখে। মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব যেন মানুস গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। স্বয়ং আল্লাহ্ বলেছেন, 'নিশ্চয় জ্ঞানবানরাই আল্লাহকে ভয় করে।'[৩] কাজেই তাকওয়া অর্জন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণের শিক্ষা দিয়েছে। কুরআনের ভাষায়ঃ 'হে আল্লাহ্! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর আর দান কর আখিরাতের কল্যাণ।[৪] কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যার মাধ্যমে মানুষ উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়।

---

১. আল-কুরআন, ২০:১১৪
২. আল-কুরআন, ২:১৩৮
৩. আল-কুরআন, ৩৫:২৮
৪. আল-কুরআন, ২:২০১

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্টিজগত তথা প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জ্ঞান গবেষণা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদের্শন রয়েছে।'[১]

অন্যত্র রয়েছে 'আর পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শনাবলী দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্যে এবং তোমাদের সত্তারও। অতএব তোমরা কি কিছুই উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পার না?'[২]

হাদীসে আছে: 'এক ঘন্টা কালের চিন্তা-গবেষণা এক বৎসরের 'ইবাদত অপেক্ষা উত্তম'। পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়, ফিরিশতাদের উপর হযরত আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষায় সৃষ্টি বস্তুসমূহের নাম (অর্থাৎ বস্তুর পরিচয়, গুণাবলী ইত্যাদি) জানার বিষয়টি পেশ করা হয়।[৩] অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা এও জানিয়েছেন যে, পৃথিবীর সব কিছু আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪] অতএব প্রাকৃতিক জগত ও বস্তুজগতের উপর জ্ঞান গবেষণা, বস্তুর উপকারিতা অবগত হওয়া, তাকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, অনুসন্ধান আমাদের দায়িত্ব। কাজেই চিন্তা-গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার জানা শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

ইসলাম সত্যিকার মানবতাবাদী আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা মানব জাতি এক আদম-হাওয়া থেকে সৃষ্টি। মানব জাতির বিভিন্ন গোত্র, জাতি-গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে শুধু পরিচয়ের সুবিধার জন্য। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্বের কিছুই নেই। ইসলামে গোত্রবাদ, বর্ণবাদ, জাতি বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধ শিক্ষা দেয়। তাই ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতাবোধ জাগ্রত করা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা।

ইসলাম স্বাস্থ্যরক্ষা ও সামরিক শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিক নিক্ষেপ কর না।'[৫] অন্য আয়াতে আছে, 'তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনেক দয়াবান।'[৬] আর রোগ-শোক ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা নিজেদের ধ্বংস ও হত্যারই শামিল। তাই মহানবী (স.) বলেছেন: 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা রোগের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করো। কেননা আল্লাহ কোন রোগেরই সৃষ্টি করেন নি যার জন্য কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন নি।'[৭]

অতএব স্পষ্ট প্রমাণিত হলো স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামরিক শিক্ষার উপরও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন মহানবী (স.) বলেছে, 'তীরন্দাজী কর ও ঘোড়ায় চড়া শিখ।'[৮] অন্যত্র বলেছেন, 'তোমাদের কেউই যেন তীরন্দাজী খেলার ব্যাপারে গড়িমসি না করে'[৯] সে যুগে তীরন্দাজী ও ঘোড়া যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় সে বিষয়ের উপর অত্যাধিক তাগিদ করা হয়েছে। কাজেই এটি স্পষ্ট যে, সামরিক শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার একটি

---

১. আল-কুরআন, ৩:১৯০
২. আল-কুরআন, ৫১:২০-২১
৩. আল-কুরআন, ২:৩০
৪. আল-কুরআন, ২৪:৩২-৩৪
৫. আল-কুরআন, ২:১৯৫
৬. আল-কুরআন, ৪:২৯
৭. ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল আশশায় বাণী, আল-মুসনাদ, কায়রো: মাতবা'আ-আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৭, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২
৮. আবু দাউদ তায়ালিসী, মুসনাদ, মিসর: আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়া, ১৩৮৯ হিজরী, পৃ. ১২৯
৯. মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, দিল্লী: আল-মাকতবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হিজরী, ২য় খণ্ড, পৃ.১২৪

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত জরুরি দিক। মোটকথা স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষত উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীন ও সমাজের জন্য কল্যাণকর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। কুরআনে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না যারা দ্বীনের বুৎপত্তি লাভ করত ও স্বজাতিকে সতর্ক করত।[১]

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দ্বীন বিষয়ক একদল বিশেষজ্ঞ তৈরি হওয়া জরুরি। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ প্রয়োজনকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। সাথে সাথে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়েও একমত যে, সমাজ ও মানবজাতির জন্যে অন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন ও কল্যাণকর যেমন চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনও ফরজে কিফায়াহ। তাই এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা জরুরি। এককথায় বিশেষজ্ঞ তৈরি করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যকে এভাবে সারসংক্ষেপ করা যায়:

* ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে তৈরি ও প্রশিক্ষিত করা।
* সমাজে ভালো (মারুফকে) কে উৎসাহিত ও মন্দের (মুনকার) ধ্বংস নিশ্চিত করা।
* একজন মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।
* শিশুদের তাদের বয়োঃপ্রাপ্ত জীবনে দায়-দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা অর্জন ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য আত্মিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক, মানবিক ও বাস্তবগত চিন্তাধারার উন্নতি সাধন করা।
* মানুষের সমস্ত প্রচ্ছন্ন ধারণার উন্নতি সাধন করা।
* আখিরাতের দায়-দায়িত্ব ও হিসাবের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতার উন্নতি সাধন।
* মানুষকে সমাজের অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নতির জন্য মানব জাতির ঐক্য ও সম্পদের পক্ষপাতহীন সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।
* সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা, ইকোলোজিক্যাল ক্ষতি করা ও সৃষ্ট প্রত্যেকটি জীবের ভালো রক্ষাকবচ হিসেবে সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাওয়ার ধারণাগত উন্নতিসাধন করা।
* জনগণ ও সমাজের মহত্ত্ব কল্যাণের সর্বোচ্চ লক্ষ্যকে চরম উৎকর্ষতা দানে সকল ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় উৎসাহ যোগানো।
* শিশুরা সুযোগ-সুবিধার সমভাগাভাগি, নিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার, ন্যায্য ব্যবহার, ভালোবাসা, যত্ন, স্নেহ, স্বার্থহীনতা, সততা, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা এবং কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বড় হবে এর নিশ্চিয়তা বিধান করা।
* জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল ধারণা ও জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।
* জড় ও আত্মার সঠিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যমীনে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

---

১. আল-কুরআন, ৯:১২২

Dhaka University Institutional Repository

*ব্যক্তি প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধন সামষ্টিক জীবন ধারাকে কুরআন ও সুন্নাহের বিধান মোতাবেক পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

* সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু প্রাণি পদার্থ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

* বস্তুত জগতের সকল বস্তু প্রাণি পদার্থ প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

* বস্তু মানুষের পার্থিব র পরকালীন জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও সাফল্যের লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও বিশ্ব প্রকৃতির সকল সৃষ্টিকে মানব কল্যাণের লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালনার সার্বিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলামী অনুশাসন মোতাবেক পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপযোগি সমাজ গঠন ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

* ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, ব্যক্তির নিজের প্রতি, পরিবার-পরিজনের প্রতি, প্রতিবেশী ও সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধকরণ।

* ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানদান।

* ধর্মীয় আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানদান।

* ধর্মীয় বিধান পালনের কায়দা-কানুন ও নিয়ম-নীতির সাথে পরিচিত করা।

* সঠিক পদ্ধতিতে জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং পদ্ধতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

* স্ত্রী-পুরুষের আচার-আচরণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলা।

* চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন ও মূল্যবোধ সৃষ্টি।

* ইসলামী বিধান অনুযায়ী সম্পদ অর্জন, অংশীদারিত্বের ব্যাপারে অর্থাৎ নিজের, প্রতিবেশীর ও দরিদ্রের হক সম্পর্কে সচেতন করা।

* একজন নাগরিকের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সে সব কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা।

* ইসলামের গতিশীলতার প্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

* নবী করীম (স.) এর শিক্ষা ও ক্রিয়াকর্মকে জীবনাদর্শের মূল নিয়ামকরূপে গ্রহণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা।

* সৃষ্টি রহস্য ও আল্লাহর কুদরতের উপর গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।

* মানব কল্যাণের উপাত্ত ও উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে যথাযথ মানব কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার যোগ্য করে তোলা।

* ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের চাহিদার বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, সামাজিক জীবন ধারা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সকল কিছুকেই ইসলামের বুনিয়াদে পরিচালিত করার উপযোগি নেতা ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। সর্বোপরি ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীক, ঈমান ও নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান জনশক্তি সৃষ্টি করা, নিরক্ষরতা ও জাহিলীয়াতের অভিশাপ মুক্ত সমাজ সৃষ্টিই।

শিক্ষা মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা মানুষের প্রাণশক্তি, জাতির মেরুদণ্ড, উত্থান-পতনের মানদণ্ড। জাতির উন্নতি-অবনতি শিক্ষার মানদণ্ডেই বিবেচিত হয়ে আসছে। সুশিক্ষায় জাতি অগ্রগতির পতে অগ্রসর হয়, দুনিয়ায় আধিপত্য স্থাপনে সামর্থ হয়। শিক্ষা আর অশিক্ষার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বর্তমান। একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই এ প্রভেদ সম্যক উপলব্ধি করা যায়। আলো আর অন্ধকারে যেমন পার্থক্য, তেমনি পার্থক্য সুশিক্ষা আর অশিক্ষা বা কুশিক্ষার মধ্যে। শিক্ষার্জন করে একজন হন জ্ঞানী, পণ্ডিত আর শিক্ষার অভাবে অন্যজন হয় অজ্ঞ, মূর্খ। মানুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা ও মননশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করেছেন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?'[১]

অন্য আয়াতেও প্রশ্ন করা হয়েছেঃ অন্ধ আর চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে?[২]

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অশিক্ষা বা কুশিক্ষা কোন মতেই কাম্য হতে পারে না। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিশক্তির ন্যায় আর অশিক্ষা অন্ধত্বের শামিল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি যেমন মানুষকে পথ চলতে সাহায্য করে, তেমনি শিক্ষা মানুষকে সঠিক জীবন ও পথের নির্দেশ দেয়।

মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, সে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি। তাই আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাস্তবায়ন ও তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠাই হলো একজন মুসলিমের গুরুদায়িত্ব। ইসলাম শব্দের অর্থই হচ্ছে আল্লার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আনুগত্যের শির নত করে দেয়া। আল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ তার পালনীয়, আর প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বস্তু ও কাজ বর্জনীয়। ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে সহায়তা দান, অর্থাৎ, প্রকৃত মুসলিমরূপে জীবন-যাপন ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা, যাতে মানুষের জীবনের সব দিক ও বিভাগের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর হয়। সর্বোপরি আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন-বিধান এবং তাঁর রাসূল (স.)-এর জীবনাদর্শের অনুসরণ দ্বারা ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই হলো ইসলামী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনে সাহায্য করে। মানুষকে শুধু প্রকৃতিস্থ, স্বাস্থ্যবান ও প্রয়োজনীয় শক্তিমত্তার অধিকারী করাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়; বরং তার মধ্যে কল্যাণকর চেতনা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

---

১. আল-কুরআন, ৩৯:৯
২. আল-কুরআন, ১৩:১৬

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শিক্ষাবিদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এর মতে, ইসলামী শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের উন্নতির পথে নিয়ে যায়, যা তার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির দ্বারা এবং তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য 'আদালত' এর পূর্ণতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[১]

ইসলামী শিক্ষা যে মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীই সঞ্চার কর তাই নয়; বরং এর একটি বৃহদাংশের লক্ষ্য হলো মানুষের স্বাভাবিক উন্নতির পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে পথ প্রদর্শন। এসব প্রতিবন্ধকতা সাধারণত শারীরিক ও জৈবিক শ্রেণীর-যা আবেগের তাড়না, বিকৃত বস্তুবাদী মানসিকতা এবং ভ্রান্ত শিক্ষার ফলেই জন্ম নিয়ে থাকে।[২]

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের মূল কথা হলো মানুষের মাঝে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য গুণ সৃষ্টি করা, আর সে সঙ্গে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা, স্বাধীকারের চেতনা জাগ্রত করে মানুষকে শ্রেণী, বর্ণ, জাত, গোত্র ও গোষ্ঠি সম্পকীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে ধরে বিশ্বজনীন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এছাড়া ইসলামের মৌল আদর্শসমূহ প্রতিপালনের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক কারণও নিহিত রয়েছে। এজন্য মুসলিম মণীষী শাহ ওয়ালী উল্লাহর নামাযকে বহুবিধ যৌগিক বলবর্ধক ওষুধ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, নামায তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক আদর্শের মধ্যে মানুষের সার্বিক গুণাবলীকে উজ্জীবিত করে তোলার মতো শক্তি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইসলামী শিক্ষায় কুরআন অধ্যয়ন মানুষের ভাবাবেগকে বিশুদ্ধকরণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ছাড়াও তার বুদ্ধিবৃত্তি গঠনের সহায়ক অন্যান্য গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করে। অবশ্য কুরআনে চিন্তা-গবেষণার বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমতের উপর গুরুত্বারোপ করে অহমিকাহীন নম্রতাপূর্ণ ভাব সহকারে আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে উৎসুক মনোভাব নিয়ে প্রকৃতির সম্বন্ধে গবেষণা করতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা যে মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, মৌলিকতা ও সৃজনশীলতার ক্ষমতা দান করে তা-ই নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতিও ঘটায়। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক ক'টি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়:

মনুষ্যত্বের বিকাশ: ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ জীবনবিধান। জীবনের প্রত্যেক দিকের পথনির্দেশই এ জীবনবিধানে রয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত সর্ববিধ শক্তির সুষ্ঠু ও সুমন্বিত সার্বিক বিকাশ সাধন দ্বারা ইহকালীন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই ইসলামী শিক্ষা উদ্দেশ্য। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স.) নারী পুরুষ সবার উপর শিক্ষা ফরজ করেছেন্ সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করতে হবে। কারণ, মনুষ্যত্বের যথাযথ বিকাশই সমাজ-সংস্কৃতির উৎকর্ষ লাভের প্রথম সোপান। মানুষের সীমিত পার্থিব জীবনকে অনন্ত জীবনের সেতুবন্ধন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন মজীদের শিক্ষায়উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী জনকল্যাণ, জনসেবা, সামাজিক ন্যায়-নীতি, উদারতা, প্রেম, ভালবাসা, গণতান্তিক মূল্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে নিজের বিকাশ সাধন ও অন্যের বিকাশে অনুপ্রেরণা দানই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।

---

১. ইসলামী শরী'আতের ভাষায় 'আদালত হলো সর্ববিষয়ে ন্যায্যতা, মহানুভবতা, 'ন্যায়-নিষ্ঠতা, মহত্ত্ব, নৈতিক পবিত্রত এবং আল্লাহ সম্পর্কে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর সমন্বিত বিকাশ।

২. ড. আবদুল ওয়াহিদ, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঢাকা-২০০১, পৃ-১৫

Dhaka University Institutional Repository

চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন: মানব জীবনের প্রধান ভূষণ ও সম্পদ হলো চরিত্র। ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করা। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর মনোনীত খলিফা বা প্রতিনিধি। আত্মবিশ্বাস ও যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকলে মানুষের জীবনে সর্ববিধ গুণের বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হতে পারে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই।

আত্মপরিচয় ও স্রষ্টার পরিচয় লাভ: ইসলামী শিক্ষা আত্মপরিচয়, আত্মোপলব্ধি ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের সুযোগ করে দেয়। কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে জানার, পরিচয় লাভের নির্দেশ রয়েছে। কুরআনের অনেক আয়াতেই স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির পরিচয় লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করে চিন্তা-গবেষণা ও সত্যোদঘাটনের পুন: নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, জ্ঞানার্জন ব্যতীত আত্মপরিচয় ও সৃষ্টা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

মানব কল্যাণ ও মুক্তি: পরিবেশ-প্রতিবেশে প্রাপ্ত বস্তু নিয়ে নিজের ও জগতের অন্যান্য কল্যাণের প্রয়োগের শিক্ষাই হলো ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটায় জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া মানবতার কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। তাই, অধিকতর জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করাই ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

বিজ্ঞান সাধনা: মানব জীবন সদা পরিবর্তনশী, আরো বেশি পরিবর্তনশীল মানুষের পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এগুলোর সঙ্গে মানব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ইসলামী শিক্ষার একটি অপরিহার্য লক্ষ্য। এলক্ষ্য অর্জনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং এর সঙ্গে সংঘাতময় যে কোন ধরনের শিক্ষা বর্জনীয়। তাই জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের কাজে লাগাতে হবে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের মধ্যেও মানব কল্যাণ ও উন্নতির অনেক উপাদান বর্তমান। এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহতা'আলা ঘোষণা দেন:

'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।"[১]

তাই মানুষের নিকটতম ও দূরতম পরিবেশের বস্তুনিচয় সম্পর্কে জ্ঞানীদের গবেষণা দ্বারা খুঁজে বের করতে হবে বস্তু ও শক্তিসমূহের কোনটিকে কিভাবে মানবকল্যাণের কাজে লাগানো যায়। আর এই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, মানুষের কল্যাণার্থে বিজ্ঞান সাধানাও ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

দ্বীনের পুনর্গঠন: সমাজ জীবনে ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে পুনর্জীবন দানও ইসলামী শিক্ষার আরেকটি উদ্দেশ্য। সমাজ বীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম সমাজ জীবনে পুণ: প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে তবেই ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশ ও বিস্তার লাভ করতে পারে। এক মুসলমানের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্যকে শিক্ষাদান ও বিস্তার লাভ করতে পারে। এক মুসলমানের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্যকে শিক্ষাদন করা তার নৈতিক দায়িত্ব। যে শিক্ষার দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয়না, সে শিক্ষা যেমন মূল্যহীন, তেমনী কোন বিদ্বজ্জনের শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবত্তা দ্বারা যদি দেশ-জাতি উপকৃত না হয়, কোন প্রকার কল্যাণ

---

১. আল-কুরআন, ৪:১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

লাভ না করে, তবে সে ব্যক্তিরও কোন মূল্য নেই। তাই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বীনের পুনর্জীবনকল্পে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাবে। তবেই দেশ-জাতি তার বিদ্যাবত্তা থেকে উপকৃত হবে এবং তার শিক্ষার্জন সার্থক বলে পরিগণিত হবে। দ্বীনের পুনর্জীবনের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা ওয়াবি।

পার্থিব সুখ-শান্তি লাভঃ পার্থিব জীবনে মানুষ সমাজবন্ধ হয়ে বাস করে, আর সমাজীবনে সব মানুষই সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে চায়। শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে। মানুষ নিজ বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানবলে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাজি কাজে লাগিয়ে নিত্য-নব আবিস্কারের মাধ্যমে নিজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে পারে, দেশবাসীর জন্য জীবিকা অর্জনের বহুমখী পন্থা উদ্ভাবন করে দেশ থেকে বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলোৎপাটন করতে পারে।

চুড়ান্ত লক্ষ্যঃ জ্ঞানার্জনের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেনঃ 'প্রথম জ্ঞান আল্লাহকে জানা এবং শেষ জ্ঞান তাঁর কাছে পুরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।' আল্লাহর অপর শক্তি, কুদরত, সৃষ্টিকৌশল তথা আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে জেনে এবং তাঁর সৃষ্টির পরিচয় লাভ করে তাঁর কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করার নামই হলো ইসলাম। এটা বিদ্যার্জন ব্যতীত আদৌ আশা করা ঠিক নয়। অতএব সর্ম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে, মহান স্রষ্টা সম্পর্কে জানবে এবং তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাঁরই কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে-এটাই স্বাভাবিক।[১] এই স্বাভাবিকতার জ্ঞানবেধ সৃষ্টি করবে মুলত ইসলামী শিক্ষা। এ নিরিখেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বিচার্য।

মহানবী (স.) এর শিক্ষাদর্শনের উৎসসমূহঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বিশ্ববাসীর সামনে নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে শিক্ষা দর্শন পেশ করছেন তাঁর মূল ভিত্তি হল আল-কুরআন, আল-হাদীস ও ইসলামের গতিশীলতার নীতি। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো যেমন-

আল-কুরআনঃ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মৌল প্রেরণা ও উৎস কুরআন মজীদ। মুসলিম জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণের সকল নিয়মকানুনই আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ হতে নিঃসৃত হয়েছে। আল্লাহর আদেশে হযরত জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট প্রেরিত ঐশী নির্দেশাবলীর সংকলনই পবিত্র কুরআন। পবিত্র রমান মাসের 'লায়লাতুল কৃদর' রাত্রিতে প্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়। কুরআন হযরতের নিকট বোধগম্য করার জন্য আরবী ভষাতেই নাজিল হয়। দীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবত সমগ্র কুরআন শরীফের বিভিণ্ন অংশ নাযিল হয়। বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শকরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। মহাগ্রন্থ কুরআনের বর্ণনার মধ্যেই আল্লাহ কুরআনের এই বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন-"এই কুরআন এমন গ্রন্থ নয় যাহা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও দ্বার উদ্ভাবিত হইতে পারে। যেমন-"এই কুরআন এমন গ্রন্থ নয় যাহা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা উদ্ভাবিত হইতে পারে। ইহা সমুদয় পর্বতন ঐশীবাণীর সমর্থনকারী এবং যে শাশ্বত ঐশীগ্রন্থ সমস্ত সংশয় ও সন্দেহের অতীত, বিশ্ববিধাতার তরফ হইতে তাহারই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা।"[২]

---

১. আ.খা. আবদুল মান্নান, শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষনীতির মূলকথা, ঢাকাঃ তা.বি. পৃ. ৩৫-৩৭

২. আল-কুরআন-১০:৩৭

Dhaka University Institutional Repository

"আর যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছেন এবং ভাল কাজ করিয়াছে এবং তাহারা সেই সব বস্তুর প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে যাহা মুহাম্মদের (স.) প্রতি নাজিল করা হইয়াছে।"[১]

"রমজান মাস-এই মাসেই পবিত্র কুরআন নাজিল হইয়াছি যে মানুষের পথ প্রদর্শক এবং ধর্ম-পথের ও ন্যায়-অন্যায় বিচারের সুস্পষ্ট নিয়ামক।"[২]

"আমরা নিশ্চয়ই কুরআন আরবীতে নাজিল করিয়াছি যাহাতে আপনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।"[৩]

"অনন্তর এই জন্য আমরা ইহা (আল-কুরআন) তোমার ভাষায় সহজ করিয়াছি যেন তাহারা বুঝিতে পারে।"[৪]

"এই কুরআনকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদে বিভক্ত করিয়াছি যেন আপনি মানুষকে বিভিন্ন সময়ে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে পারেন। বাস্তবিক আমরা ইহাকে পর্যায়ে পর্যায়ে নাজিংল করিয়াছি।"[৫]

"নিশ্চয়ই এই কুরআন বিশ্বপতির নিকট হইতেই অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ। সত্যপরায়ণ ও বিশ্বস্ত দূত জিবরাইল এই বাণী লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন আপনার হৃদয়-কন্দরে, যেন আপনি লোকজনকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন প্রাঞ্জল আরবী ভাষার মাধ্যমে।"[৬]

ইহা এমন একটি গ্রন্থ যাহা আমি আপনার নিকট নাজিল করিয়াছি যেন আপনি মানুষকে আল্লাহ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে আলোকের পথে পরিচালিত করিতে পারেন, যে পথ সর্বশক্তিমান ও সর্বপ্রশংসিত আল্লাহর পথ"।

'কুরআন' শব্দটি ক্বারায়া' ধাতু হতে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ 'সে সংগ্রহ করেছিল সে পড়েছিল' আবৃত্তি করেছিল'। শব্দার্থের দিক দিয়েও কুরআন হয় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও পাঠযোগ্য গ্রন্থ। এই দুই দিক দিয়েই কুরআনের নামকরণ সার্থক হয়েছে। কারণ কুরআন সমস্ত আসমাণী কিতাব সমূহের সারসংগ্রহ এবং পৃথিবীর সর্বাধিক আবৃত্তিযোগ্য গ্রন্থ যাথে মানব জীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। কুরআন শরীফের অন্যান্য নাম ও প্রদত্ত হয়েছে। যেমন কালামুল্লাহ (আল্লাহর বাণী); আল-কিতাব (স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ), আল-ফোরকান (ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদকারী), আজ্‌জিকর (স্মারক); আত তানজিল (প্রত্যাদেশ); আল হিকমত (জ্ঞান) আল হুদা (পথ প্রদর্শক): আর রাহমাহ্ (করুণাশিষ): আর্ রুহো (আত্মা বা জীবন): আন্নুর (আলোক বর্তিকা), আশশিফা (নিরাময়কারী): আননিয়ামাহ (নিয়ামত) ইত্যাদি।[৮]

কুরআনের বিন্যাস: মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একদিনে নাজিল হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হতে আরম্ভ করে তার ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তেইশ বৎসর ধরে আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে কুরআন নাজিলের স্বপক্ষে কুরআনের যুক্তি প্রণিধানযোগ্য: "সত্যদ্রোহী কাফিররা আরও বলিয়া থাকে,

---

১. আল-কুরআন,৪৭:২
২. আল-কুরআন,২:১৮৫
৩. আল-কুরআন,৪৩:৩
৪. আল-কুরআন,৪৪,৫৮
৫. আল-কুরআন,১৭:১১৬
৬. আল-কুরআন,২৬:১৯২-৯৫
৭. আল-কুরআন,১৪:১
৮. Ali, The Religion of Islam, London,m 1965, P.171

Dhaka University Institutional Repository

আচ্ছা, একসঙ্গে কুরআন তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইল না কেন? এইভাবে নাজিল করা হইয়াছে, যেন ক্রমশ: আপনার অন্তরকে আমরা ইহা দ্বারা (শ্বাশবৃত সত্যের নিগূঢ় উপলব্ধিতে) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। অধিকন্তু আমরা মৃশ্খলার সহিত ইহার অংশের (জিবরাইলের মারফত) আপনাকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছি।"[১]

কুরআন শরীফের বিভিন্ন অধ্যায় মুহম্মদ (স.) এর ব্যক্তিগত নির্দেশনায় বিন্যস্ত হয়েছিল। কুরআনের সূরাসমূহ নাজিলের কলক্রম অনুসারে সাজানো হয়নি। যখন কুরআন শরীফের কোন অংশ নাজিল হত তখন হযরত নির্দিষ্ট লিপিকারদিগের মধ্যে যিনি উপস্থিত থাকতেন তাকেই উক্ত অংশ পূর্বে অবতীর্ণ কোন সূরার অংশ বিশেষের পর লিখে রাখার আদেশ করনে। অবশ্য পবিত্র-আত্মা আল্লাহর দূত জিব্রাইল (আ.) তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতেন। হযরতের নিয়ম ছিল কোন আয়াত লিখে রাখতে বলতেন। কুরআনের লিপিকারদের মধ্যে জায়েদ বিন সাবিত (রা.) এর নাম সর্বাগ্রহণ্য, কারণ তিনিই ছিলেন হযরতের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী যিনি কুরআনের অধিকাংশ আয়াতের লিপিকার। কাজেই বর্তমান কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের যে বিন্যাস ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই তা হযরতের নির্দেশনারই ফল।

পবিত্র কুরআন শরীফ ১১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায় এক একটি সূরা বলে পরিবিদিত। এই সূরাসমূহ দীর্ঘ নয়। কোন সূরা অত্যন্ত দীর্ঘ, আবার কোন সূরা অত্যন্ত হ্রস্ব। কুরআন শরীফের শেষ পঁয়ত্রিশটি সূরা ব্যতিরেকে অন্যান্য সূরাগুলি রুকুতে (Section) বিভক্ত। প্রত্যেক রুকু আবার কতকগুলি আয়াতে বিভক্ত। কুরআনের বৃহত্তম সূরা 'বাকারা' ২৮৬ আয়াত বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্রতম সূরা 'আছর' তিন আয়াত বিশিষ্ট। কুরআনের মোট আয়ত সংখ্যা ৬২৪৭: 'বিসমিল্লাহ' বিযুক্ত একমাত্র সূরা 'তওবা' বাদে অবশিষ্ট সংখ্যা ৭৭৯৩৪ এবং অক্ষর সংখ্যা ৩,২৩,৬২১। আবার সমগ্র কুরআন শরীফ ৩০টি সমান অংশে বিভক্ত এক একটি অংশের নাম পারা জুজ বা সিপারা। সূরার ক্রমিক বিন্যাস এবং সূরার মধ্যে আয়াত সংযোজন হযরত মুহাম্ম (স.) নিজেই সম্পাদন করেছিলেন। কুরআন শরীফের এই বিন্যাস প্রণালী আবৃত্তির পক্ষে সুবিধাদায়ক।

কুরআন শরীফের সূরাসমূহ মক্কী ও মাদানী দুই ভাগে বিভক্ত। হযরত মক্কাতে অবস্থানকালে যে সূরাগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলিকে মক্কী সূরা বলা হয়। মক্কী সূরার সংখ্যা ৯২টি মদীনায় হিজরতের পর সেখানে যে সূরাগুলি অবতীণ হয়েছিল সেগুলির নাম মাদানী সূরা। মাদানী সূরার সংখ্যা ২২টি। মাদানী সূরা সাধারণত মক্কী সূরা অপেক্ষা দীর্ঘতর। কুরআনের সূরা বিন্যাসের দিক দিয়া মক্কী ও মাদানী সূরা পরস্পর মিশ্রিত হয়ে আছে। মক্কী সূরাসমূহ সাধারণত ক্ষুদ্র কলেবর এবং ক্ষুদ্র আয়াতের সমষ্টি। এই সূরাগুলি ক্ষুদ্র কবের হলেও প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে তীক্ষ্ম, উত্তেজনাপূর্ণ, আবেগধর্মী, ও সম্ভাবনাময়। আল্লাহর একত্ব, ঐশীগুণাবলী, মানুষের নৈতিক কর্তব্য, হাশরের দিবস প্রভৃতি বিষয় মক্কী সূরা সমূহের বিষয়বস্তু। পক্ষান্তরে, মাদানী সূরাসমূহ সাধারণত দীর্ঘ, দিবস' সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি বিঘোষিত হয়েছে। এ সমস্ত সূরায় বিধি-নিষেধ,

---

১. আল-কুরআন-২৫:৩২

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম কানুন, এককথায় মানব জীবনের যাবতীয় সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, পারিবারিক প্রয়োজনীয় সকল বিধানই মাদানী সূরাসমূহে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই বলা যায়, মক্কী সূরা হল এই সমস্ত মূলনীতির বাস্তবায়নের নির্দেশনামা। মদ্যপান, জুয়াখেলার নিষেধাত্মক আদেশ, রাজকীয় ও সামরিক বিধিসমূহ, নরহত্যা, প্রতিশোধ, চুরি, সুদ, ব্যভিচার, বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনসমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীর সূরার মধ্যে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্য লাভই পরম শান্তি। মক্কীয় সূরার মধ্যে এইভাবেই ফুটে উঠেছে আর মাদানী সূরার মধ্যে মানবজীবনের ভাবময় রূপ অপেক্ষা কর্মময় রূপই প্রতিফলিত হয়েছে।

কুরআন শরীফের বিষয়বস্তু:

করআন আল্লাহর বাণী, কতকগুলি আয়াতের সমষ্টি। সমগ্র কুরআন শরীফের আয়াত সংখ্যা ৬২৪৭ (মতন্তরে ৬২৪০) কিন্তু সকল আয়াত একই শ্রেণীভুক্ত নয়। কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ দ্বিবিধ: আয়াতে মুহকামাত' এবং 'আয়াতে মুতাসাবিহাত'। আয়াতে মুহকামাত বলতে সেই সকল আয়াতকে বুঝায় যাতে আল্লাহর হুকুম আহকাম বা বিধি-বিধান ঘোষিত হয়: এ সমস্ত আয়াতে ইসলামের মৌলিক বিধান ও নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। এগুলিকে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়ে থাকে। যেমন 'হে বিশ্বাসীগণ, ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি দাখিল হইয়া যাও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না: নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[১]

"আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পুরাপুরি উদযাপন করা।"[২]

তোমাদের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করে তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করিও: সীমা লঙ্ঘন করিওনা। আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।"[৩]

হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য রোজার বিধান দেওয়া গেল যেমন দেওয়া হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করিতে পার।[৪]

আর নিয়মিত নামাজ প্রতিষ্ঠান রাখিও, জাকাত আদায় করিও এবং প্রণতিকারীদের সঙ্গে প্রণতি জানাইও।"[৫]

এই শ্রেণির আয়াতসমূহের মমার্থ নিয়ে কোনরূপ মতভেদ নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণির আয়াতসমূহকে বলা হয় 'আয়াতে মুতাশাবিহাত'। এই শ্রেনীর আয়াতসমূহ রূপক উপমা সহকারে বর্ণিত। এই আয়াতসমূহের অর্থ নিযে মতবিরোধের সম্ভাবনা আছে এবং অল্পবিস্তর মতানৈক্য তফসিরকারদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। পাঠকের জ্ঞান ও দৃষ্টির প্রসারতার ক্রম অনুসারে এই সকল আয়াতের বিভিন্ন অর্থ করাও অসম্ভব নয়। সূরা নূরে বলা হয়েছে: "আল্লাহ ভুলোক দ্যুলোক বিশ্ব ভুবনের জ্যোতি:। তাঁহার জ্যোতির রূপ হইল একটি দেওয়াল গাত্রস্থিত গর্ত বা কুলুঙ্গি-যাহার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ-স্বচ্ছ আয়ানায় বা স্ফটিকে ঢাকা এই প্রদীপ। এই স্ফটিক পাত্রও যেন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক। এই প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে কল্যাণপূত জলপাই বৃক্ষের তেল

---

১. আল-কুরআন-২:২০৮
২. আল-কুরআন-২:১৯৬
৩. আল-কুরআন-২:১৯০
৪. আল-কুরআন-২:১৮৩
৫. আল-কুরআন-২:৪৩
৬.মৌ. আবদুর রহমান,কুরআন ও জীবন দর্শ, ঢাকা-১৯৬৯, পৃ-১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

হইতে যে বৃক্ষ পূর্ব পশ্চিম কোন মুখীই নয় এবং যাহা অগ্নি সংযোগ ব্যতীতও উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করে। ইহা আলোর আলো, জ্যোতির জ্যোতিঃ। আল্লাহ যাহাকে খুশী আপন আলোর পানে চালিত করেন। মানুষের বুঝিবার সুবিধার জন্য আল্লাহ উপমা ও রূপক ব্যবহার করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ।"[১] "তাহারা তোমাকে 'রুহ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাস করে। বলিয়া দাও, এই রুহ আমার প্রভুর অনুজ্ঞা বিশেষ এবং তোমাদিগকে শুধু তত্ত্ব জ্ঞানের স্বল্প মাত্রাই দেয়া হইয়াছে।"[২]

কুরআন শরীফ এই দ্বিবিধ আয়াতসমূহ সম্পর্কেই সাক্ষ্য দিয়েছে। যেমন-"তিনিই আপনার নিকট কিতাব নাজিল করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি আয়াত সুনির্দিষ্ট অর্থবিশিষ্ট। ইহারাই কুরআনের মূল ভিত্তি। অপর আয়াতগুলি একাধিক অর্থবোধক, রূপক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে কুটিলতা আছে তাহারা অশান্তি ও বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং অন্তর্গূঢ় মমার্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় এই আয়াতগুলির অনুশীলন করিয়া থাকে। ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্য কেবল আল্লাহতায়ালা'ই জ্ঞাত আছেন, আর জ্ঞানে যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহারা কেবল বলিয়া থাকেন আমরা এইগুলিকে বিশ্বাস করি, কারণ সকল আয়াতই আল্লাহর তরপ হইতে প্রেরিত। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্যেরা সদুপদেশ গ্রহণ করে না।"[৩]

কুরআন শরীফ বিশ্বমানবের পথ চলার নির্দেশনামা। মানব জীবনের এমন দিক নেই যেদিন সম্পর্কে এতে আলোকপাত করা হয়নি। কুরআন শরীফের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত ব্যাপক। কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুকে আমরা প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন (ক) বৈজ্ঞানিক, দর্শনিক ও মরমীয় (খ) ঐতিহাসিক এবং (গ) বিধিবিধান সংক্রান্ত।

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মরমীয় আয়াতসমূহঃ

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে, দিনরাত্রির পর্যায়ক্রমে অনুগমনে, মানুষের লাভজনক বাণিজ্য সম্ভারপূর্ণ সমুদ্রগামী জলযানসমূহে, আকাশ হইতে বৃষ্টি রূপে আল্লাহ যাহা বর্ষণ করিয়া মৃতধরণীকে সঞ্জীবিত করেন তাহাতে, ভূ-পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া জীবজন্তুর সম্প্রসারণে, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে এবং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থলে মেঘ সম্ভারের সুনিয়ন্ত্রিত সঞ্চরণে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নির্দেশনাসমূহ নিহিত রহিয়াছে।"[৪]

" আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈষম্যও তাঁহার পরম বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। জ্ঞানীদের জন্য বাস্তবিকই ইহাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিহিত আছে।"[৫]

বলিয়া দিন, তোমরা পৃথিবীর বুকে ভ্রমন এবং পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখ তিনি কিরূপে আদি সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াছেন।"[৬]

---

১. আল-কুরআন-২৪:২৫
২. আল-কুরআন-১৭:৮৫
৩. আল-কুরআন-৩:৭
৪. আল-কুরআন-২:১৬৪
৫. আল-কুরআন-৩০:২২
৬. আল-কুরআন-২:২৯

Dhaka University Institutional Repository

"আর আমি লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে মানুষের জন্য কঠিন যুদ্ধাস্ত্র ও সুফলসমূহ রহিয়াছে।"[১]

"আমি প্রত্যেক চেতনা পদার্থকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। তবু কি তাহার বিশ্বাস করিবে না।"[২]

"নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বিষয় উহার পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি।"[৩]

"তিনি আল্লাহ যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর আকাশ হইতে বারি বর্ষন করিয়াছেন, অনন্তর তোমাদের জীবিকার জন্য তদ্বারা ফল পুস্প উৎপন্ন করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকাসমূহ আয়ত্তাধীন করিয়াছেন যেন তাঁহার আদেশ উহা সাগরে পরিচালিত হয়ঃ এবং তোমাদের জন্য স্রোতাস্বিনীসমূহ আওতাধীন করিয়াছেন, আর তিনি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অধীন করিয়অ গিয়াছেন। আর তোমাদের জন্য রজনী ও দিবসকে অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং তোমরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তিনি সমস্তই তোমাদিগকে দান করিয়াছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত সম্বন্ধে গণনা কর, তোমরা উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবেন।"[৪]

আর তোমরা গর্দ্দভের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং এই হেতু যে আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর জন্য নিদর্শনা করিব এবং অস্তিপুঞ্জের প্রতি লক্ষ্য কর কিরূপে আমি উহাকে সংযুক্ত করি তৎপর উহাকে মাংসাবৃত্ত করি।"[৫]

"তুমি সর্বপ্রদাতার সৃষ্টির কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না। অতঃপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি কি উহাতে কোন ত্রুটি দেখিতে পাইতেছি?"[৬]

"ভুমন্ডল ও নভোমন্ডলের সৃজনে দিন ও রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে। (তাহারা জ্ঞানবান) যাহার দাড়াইয়া, বসিয়া বা শুইয়া আল্লাহর স্মরণ ভজন করে এবং পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের রহস্যের চিন্তা করে (আর বিস্ময় বিমুগ্ধ অন্তরে বলে), হে প্রভু। এই সমুদ নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই।"[৭]

"আর আমি প্রত্যেক বিষয়ের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি, যেন তোমরা অনুধাবন কর।"[৮]

"হে মানব, যদি রোজ হাশরে পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমাদের অন্তরে সংশয় জাগে, তবে চিন্তা করিয়া দেখিও আমি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, তৎপর ঘনীভুত রক্তবিন্দু হইতে ও তৎপর সংযোগিত ও অসংযোজিত ক্ষুদ্র মাংসপিন্ড হইতে। তোমাদিগকে আমার অসীম সৃষ্টি ক্ষমতা বুঝাইবার জন্য এই বর্ণনা করা হইতেছে। হে রাসূল, আপনি এখন পৃথিবীকে অনুর্বর ও নির্জীব দেখিতে পান। কিন্তু আমি যখন তাহাতে বৃষ্টিপাত করি এখন উহা প্রাণের স্পন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠো এবং হরক রকম নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করে।"[৯]

---

১. আল-কুরআন-৫৭:২৫
২. আল-কুরআন-২১:৩০
৩.আল-কুরআন-৫৪:৪৯
৪.আল-কুরআন-১৪:৩২-৩৪
৫.আল-কুরআন-২:২৫৯
৬.আল-কুরআন-৬৭:৩
৭.আল-কুরআন-৩:১৯০-৯১
৮.আল-কুরআন-৫১:৫০
৯.আল-কুরআন-২২:৫

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি রাত্রিক দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেন, আর দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেন, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যে রত রখিয়াছেন, প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ে চলিতে থাকিবে।"[১]

"তিনিই রজনী দিবস এবং সুর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকেই কক্ষপথে দ্রুত গমন করিয়া থাকে।"[২]

"আমি আকাশকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ছাঁদ স্বরূপ করিয়া দিয়াছি এবং আল্লাহ পানি দ্বারা সর্ববিধ জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর উহাদের কতিপয় স্ব স্ব উদরে ভর দিয়া গমন করে এবং উহাদের কতিপয় পদদ্বয় দ্বারা গমন করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"[৩]

"হে পিপীলিকাগণ তোমরা তোমাদের আবাসে প্রবেশ কর; যেন সোলায়মান ও তদীয় সেনাদল অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে নিস্পেষিত না করে।"[৪]

"আর তোমার প্রতিপালক মদুমক্ষিকাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে পর্বতমালায় ও বৃক্ষসমূহে ও সমুদ্রশিখরে মধুচক্ষ নির্মাণ কর। অতঃপর সর্ববিধ ফল হইতে ভক্ষণ কর এবং তৎপর স্বীয় প্রতিপালকের পথসমূহে পরিক্রমণ কর। উহাদের উদর হইতে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট পানীয় নির্গত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মানব মন্ডলীর জন্য রোগমুক্তি রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"[৫]

"আর সমুদ্র মধ্যে পর্বতাকার জলযানসমূহ ও তাহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত।"[৬]

"হে মানবগণ, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; নিশ্চয় কিয়ামতের ভূমিকম্প গুরুতর বিষয়।"[৭]

"তবে কি তাহারা তাহাদের উর্ধ্ব আকাশের দিকে লক্ষ করিতেছে না যে কিরূপে আমি উহা নির্মাণ করিয়াছি এবং উহা সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন দাগ নাই। তিনি নভোমন্ডল ভূ-মন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা ছয় দিবসে সুষ্টি করিযাছেন।"[৮]

"যিনি স্তরে স্তরে সাতটি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৯]

"তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা উহা হইতে আরও আগুন ধরাইয়া লও।"[১০]

---

১. আল-কুরআন-৩:১৩
২. আল-কুরআন-২১:৩৩
৩. আল-কুরআন-২:৪৫
৪. আল-কুরআন-২৭:১৮
৫. আল-কুরআন-১৬:৬৮-৬৯
৬. আল-কুরআন-৪২:৩২
৭. আল-কুরআন-২২:১
৮. আল-কুরআন-২৫:৫৯
৯. আল-কুরআন-৬৭:৩
১০. আল-কুরআন-৩৬:৮০

466267

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যায়, কুরআন শরীফ শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; এটা মানুষকে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে উপাদান প্রদান করে। মানুষকে সৃষ্টি রহস্য ও সৃষ্ট বৈচিত্র্য সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে। কুরআন মজীদ মানুষের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তাকে নব নব আবিস্কার ও উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে দেয়। কুরআন শরীফের সূরা সমূহের নামকরণের দিকে লক্ষ করিলে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। যেমন 'নমল' (পিপীলিকা), 'নহল' (মধুমক্ষিকা), আনকাবুত' (মাকড়সা), দোখান (ধুম, গ্যাস), মাইদা (আহার্য), 'নুর' (জ্যোতিঃ), 'নজম' (তারকা), 'কামার' (চন্দ্র), 'হাদীদ' (ইস্পাত), 'দহর' (কাল), আলবুরুজ, (রাশি), আশ শামস, (সূর্য), অললায়ল (রাত্রি), অদদোহা (প্রাতঃকাল), রাদ (বিদ্যুত) ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক আয়াতসমূহঃ

কুরআন শরীফের এই শ্রেণীর আয়অতসমূহকে একদিকে প্রেরিত পুরুষদের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ তিতিক্ষা, ধৈর্য সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে অপরদিকে সত্যের বিরোধী শক্তির লোমহর্ষক অত্যাচার ও পরিণামে জুলুমকারী রাজা বাদশাহদের পতনের কহিনী বর্ণিত হয়েছে। জাতির জীবনে, সমাজের জীবনে ও পারিবারিক জীবনে সত্যের অনুসরণ কিভাবে জাতি, সমাজ ও পরিবারকে উন্নতির শীর্ষ শিখরে উন্নীত করে, পক্ষান্তরে সত্যের অস্বীকৃতি ও মিথ্যার অবলম্বনে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কি মহা অনর্থ ঘটায়, আল্লাহ সে জাতি, সে সমাজ ও সে পরিবারকে কিভবে পযুদর্স্ত করেন, অমর্যাদা ও অবহেলার পঙ্কে নামিয়ে দেন, কুরআন শরীফের বহু আযাতে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত নূহ (আ.) হযরত মুসা (আ.) হযরত ফিরাউন, নমরূদ প্রভৃতি পরাক্রমশালী বাদশাহের প্রসঙ্গে এবং হযরত রসূল করীম (স.) এর জীবনের কার্যাবলীর সত্য ও অসত্য, ধর্ম ও অর্ধমের জয়-পরাজয়ের বিষয় বিবৃত হয়েছে। এই সকল আয়াত বিশ্বমানবের সম্মুখে জীবনের পরিচ্ছন্ন নিয়ামক নীতি তুলে ধরেছে। এই সকল আয়াত বিশ্বমানবের সম্মুখে জীবনের পরিচ্ছন্ন নিয়ামক নীতি তুলে ধরেছে। আমরা এই জাতীয় আয়াতসমূহের অল্পবিস্তর উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

"লূত (আ.) যখন স্বীয় গোত্রের লোকদের বলিয়াছিলেন, দুনিয়াতে কেহ কোন দিন ইতিপূর্বে যাহা করে নাই এমন অশ্লীল কাজে কেন তোমরা লিপ্ত আছ? নিশ্চয় তোমরা কামন্ধ হইয়া নারী ছাড়িয়া নরের সাথে রতি বিলাসের রত আছ। বাস্তবিক তোমরা এক দুকৃতকরী সম্প্রদায়; আর তাঁহার সম্প্রদায় কোন উত্তর দিতে পারিল না-ইঁহা ব্যতীত যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এই লোকদিগকে তোমরা নিজেদের এই অঞ্চল হইতে বাহির করিয়া দাও; ইহারা খুবই অপবিত্রতা অবলম্বন করিতেছে। অনন্তর আমি লূত (আ.) কে এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদিগকে রক্ষা করিলাম। তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত, যেহেতু সে ঐ লোকদের মধ্যেই রহিয়া গেল যাহারা আজাবে নিপতিত রহিয়া গিয়াছিল। আর আমি তাঁহাদের উপর একটা নূতন ধরণের বৃষ্টি (শিলা ও অগ্নি) বর্ষাইলাম; এক্ষণে দেখতো দেখি এই অপরাধীদের পরিণাম কি ভয়াবহ হইয়াছিল।"[১]

---

১. আল-কুরআন, ৭:৮০-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

"ইসরাইল গোষ্ঠিকে আমরা সমুদ্রের অপর পারে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম। ফিরাউন ও তাহার সৈন্যসামন্ত উদ্বত-রোষে ও শত্রুতাবশে তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিয়াছিল। জলপ্লাবন যখন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্বৃত তখন সে (ফিরাউন) বলিয়া উঠিল, আমি স্বীকার করিলাম ইসরাইল গোষ্ঠি যে আল্লাহতে ঈমান আনিয়াছে সে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই এবং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিও একজন। উত্তর আসিল "এখন কেন? মুহূর্ত পূর্বেও তুমি বিদ্রোহ করিয়াছিলে এবং দুস্কৃতিকারীদের অন্যতম ছিলে। আজ আমি তোমার দেহকে জলপ্লাবনে তলাইয়া যাওয়া থেকে রক্ষা করিব যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের এক আশ্চর্য নিদর্শনস্বরূপ গণ্য হইতে পার। তবুও কিন্তু অধিকাংশ লোকই আমর সংকেতপূর্ণ নিদর্শন সম্বন্ধে উদাসীন থাকে।"[১]

"আর যখন আমার হুকুম আসিয়া পৌঁছিল আমি শো'আয়েবকে এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম; আর সেই জালিমদিগকে এক ভীষণ ধ্বনি আক্রমণ করিল। ফলে নিজেদের গৃহসমূহের মধ্যে তাহার অধোমুখে পড়িয়া রহিল যেন কোন সময় এই গৃহসমূহে বসতি করে নাই। উত্তমরূপে শ্রবণ করা; মাদইয়ানের রহমত হইতে বিচেছদ ঘটিল, যেমন সামুদ রহমত হইতে বিদুরিত হইয়াছিল।"[২]

"তাহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় রাসসের অধিবাসীগণ, সামুদ-আর আ'দ, ফিরাউন এবং লুত সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসীগণ ও তুব্বা সম্প্রদায় অবিশ্বাস করিয়াছিল সকলেই পরয়গম্বরগণকে অবিশ্বাস করিয়াছির, সুতরাং আমার শাস্তি প্রযুক্ত হইয়া গিয়াছে।"[৩]

"আর আমি ইহাদের (মক্কাবাসীদের) পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছি, তাহারা শক্তিতে ইহাদের অপেক্ষা অধিক ছিল এবং নগরসমূহে ঘুড়িয়া বেড়াইত। তাহারা পলায়নের কোন স্থান পাইল না।"[৪]

"ইঁহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় অবিশ্বাস করিয়াছিল অর্থ্যাৎ আমার বান্দাকে অবিশ্বাস করিয়াছিল। আর বলিয়াছিল যে, এই ব্যক্তি পাগল এবং নূহকে ধমক প্রদান করা হইয়াছিল। তখন নূহ স্বীয় প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলেন, আমি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। অতএব আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। অতঃপর আমি মুষলধর বৃষ্টির পানি সেই কার্যের জন্য মিলিত হইল যাহা নির্ধারিত হইয়াছিল। আর আমি নূহকে তক্তা এবং পেরেক বিশিষ্ট জাহাজের উপর যাহা আমার তত্ত্বাবধানে ছিল আরোহন করা হইয়াছিল। ইহার সব কিছুই সেই প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত করিয়াছিলাম, যাহাকে অপমান করা হইয়াছিল।"[৫]

"আ'দ সম্প্রদায় অবিশ্বাস করিয়াছিল, অতএব আমা আজাব ও ভীতি দর্শনে কেমন হইয়াছিল। আমি তাহাদের উপর এক প্রকান্ড ঝটিকা প্রেরণ করিলাম, কোন এক স্থায়ী অশুভ দিবসে। উক্ত ঝটিকা মানুষকে এমনিভাবে উপড়াইয়া নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা উপড়ান খেজুর বৃক্ষের ন্যায়। "[৬]

---

১. আল-কুরআন-১০:৯০-৯২
২. আল-কুরআন-১১:৯৪-৯৫
৩. আল-কুরআন-৫০:১২-১৪
৪. আল-কুরআন-৫০:৩৬
৫. আল-কুরআন-৫৪:৯-১৪
৬. আল-কুরআন-৫৪:২১-২২

Dhaka University Institutional Repository

"সামুদ সম্প্রদায় পয়গাম্বরগণকে অবিশ্বাস করিয়াছে। আর বলিল, আমরা কি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করিব, যে আমাদেরই জাতীয় একজন মানুষ এবং একাকী, তবে এমতাবস্থায় আমরা একান্ত ভুল এবং পাগলামীর মধ্যে নিমগ্ন হইব। আমাদের সকলের মধ্য কেবল এই ব্যক্তির উপরই কি ওহী নাজিল হইল? বরং এই ব্যক্তি একান্ত মিথ্যাবাদী এবং অহংকারী। তাহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে যে, মিথ্যাবাদী অহংকারী কে ছিল? আমি উট বাহির করিব, তাহাদের পরীক্ষার জন্য, কাজেই আপনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে থাকুন এবং ধৈর্য সহকারে অবস্থান করুন। আর তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে পানি তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পালার অধিকারী নিজ পালাক্রমে উপস্থিত হইবে। পরন্তু তাহারা তাহাদের বন্ধুকে ডাকিয়া আনিল। অনন্তর সে আঘাত করিল এবং হত্যা করিল। অতএব আমার আজাব এবং ভীতি প্রদর্শন কেন হইয়াছিল? আমি তাহাদের উপর একটি মাত্র চিৎকার আপতিত করিলাম। ফলে তাহারা কাঁটার বেড়ার খণ্ডসমূহের মত (চূর্ণ বিচূর্ণ) হইয়া গেল।"[১]

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম হাওয়ারীদিগকে বলিলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে কে আমার সহায় হইবে? সেই হাওয়ারীগণ বলিল, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার সহায় হইলাম। অতএব বনি ইসরাইল গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক ঈমান আনয়ন করিল এবং কিছু সংখ্যক লোক অবিশ্বাসী থাকিয়া গেল, পরিশেষে আমি মুমিনদিগকে তাহাদের শত্রুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাহায্য করিলাম। ফলে তাহারা জয়ী হইল।"[২]

"আমি লোকমানকে বিশেষ প্রজ্ঞা দান করিয়াছিলাম এবং আদেশ দিয়াছিলাম, "আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিও।" বস্তুতঃ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তাহা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না তাহার জানা উচিত আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ ও বিশ্বনন্দিত।"[৩]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ ও অনুরূপ বহু আয়াতের মাধ্যমে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা মানুষকে সত্যপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যে সব জাতি আল্লাহর নির্দেশিত পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহারা ইহলোক ও পরলোকে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি যেমন বিশ্ববাসীদের সম্মুখে আল্লাহর অপরিসীম সৃষ্টি কৌশল তুলিয়া ধরিয়াছে, বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনও তেমনি সমাজের পথ চলার ইশারা হিসেবে কাজ করিয়াছে। বিভিন্ন নবী-রাসূল জ্ঞানী বাদশাহ আমির সম্প্রদায়ের কাহিনীভিত্তিক আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহার প্রেরিত পুরষ ও বিশ্ববাসীদের মধ্যে পথ চলার সুষ্ঠু প্রাণবন্ত নির্দেশ দান করিয়াছেন এবং জীবনের কাম্য সম্পর্কে নির্দেশ পেশ করিয়াছেন। কুরআনে উক্ত হইয়াছে, "নবী-রাসূলের যে সব কাহিনী আমি আপনার নিকট বর্ণনা করি তাহা আমি আপনার অন্তরকে বিশ্বাসে আশ্বাসে অবিচল (ও প্রদীপ্ত) রাখি। এই বর্ণনার মাধ্যমে আপনার নিকট চিরন্তন সত্য উদঘাটিত এবং ভক্ত বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও স্মারকবাণী উচ্চারিত হয়।"[৪]

---

১. আল-কুরআন, ৫৪:২১-২২
২. আল-কুরআন, ৬৪:১৪
৩. আল-কুরআন, ৩১:১২
৪. আল-কুরআন, ১১:১২০

বিধিবিধান সংক্রান্ত আয়াতসমূহঃ

কুরআন শরীফের তৃতীয় আয়াতসমূহ হল বিধিবিধান সংক্রান্ত আয়াত। এই আয়াতসমূহ মুসলমানদের জীবন নিয়ন্ত্রণের আদেশ ও নির্দেশাবলী সম্বলিত। ইসলামে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কানুন ও পন্থা নির্দেশ করেছে। কুরআন এই সকল নির্দেশাবলী আমাদের নিকট পৌছে দেয়। কুরআন শরীফের এই শ্রেণির আয়াতসমূহ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নীতি নির্দেশ করে। এখানে এই শ্রেণিভুক্ত কতকগুলি আয়াত উদ্বৃত করা যায়:

"হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিও যখনই আল্লাহর তরফ হইতে নতুন জীবনের প্রেরণাদায়ক আহ্বান আসে।"[১]

"আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাহাকেও উপাস্যরূপে গ্রহণ করিওনা। যদি কর তবে তুমি লাঞ্ছনা ও অপমানভারে বসিয়া পড়িবে।"[২]

"আত্মীয়-স্বজনকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করিও। আর গরীব, মিছকিন ও পথিক মুসাফিরদেরকেও দান খয়রাত করিও, বরং ব্যয়বহুল ধনসম্পত্তির অপচয় করিও না।"[৩]

"ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাইবে না নিশ্চয়ই ইহা একটি গর্হিত কাজ এবং অকল্যাণের সুরঙ্গ পথ।"[৪]

"তুমি যখন ওজন কর তখন পুরাপরি ওজন করিও। ওজনের দাড়ীপাল্লা ঠিক রাখিও। সব সময়ে ইহাই বেশী লাভজনক কল্যাণকর প্রমাণিত হইবে।"[৫]

"ধরাপৃষ্ঠে উল্লাসিত ও দাম্ভিক পদক্ষেপে চলাফেরা করিওনা। তুমি পদভারে নিশ্চয় ধরণীকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে পারিবেনা। উচ্চতায়ও তুমি পর্বতের নাগাল পাইবে না। এইসব চালচলনের বিশ্রী অসঙ্গতি তোমার প্রভুর নিকট অত্যন্ত গর্হিত।"[৬]

"তোমার হাতকে, তোমরা ঘাড়ের সাথে দৃঢ় সংলগ্ন করিয়া রাখিও না। অথবা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করিয়াও দিও না। এইরূপ আচরণে তুমি নিন্দার্হ ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।"[৭]

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতৃগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিওনা যদি তাহারা কুফরী বা অবিশ্বাসকে ঈমানের চেয়ে প্রিয়তার মনে করে। তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের প্রতি প্রেম-প্রীতিতে আকৃষ্ট হয়, তাহারাই দৃস্কৃতিকারী।"[৮]

"বাস্তবিক স্বার্থক জীবন সেই মুমিনদের যাহারা নামাজের মধ্যে বিনয় মিনতিতে লুটাইয়া পড়ে; যাহারা অসার বাক্য ও কর্ম হইতে বিরত থাকে; যাহারা জাকাত নিয়মিত আদায় করে; যাহারা যৌন শূচিতা ও সংযম রক্ষা করিয়া চলে, কেবলমাত্র তাহাদের জীবন-সঙ্গিনী ও করায়ত্ত যুদ্ধ বন্দিনীদের বেলায় ব্যতীত কেননা সে ক্ষেত্রে তাহাদের অপরাধী করা হইবে না। কিন্তু তদতিরিক্ত যাহারা কামনা করে তাহারা নিশ্চয় সংযম ও সীমা লঙ্ঘনকারী। আর যাহারা বিশ্বস্তার সঙ্গে আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যাহারা মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখে তাহারাই হইবে উত্তরাধিকারী-উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদাউস বেহেস্তের, যেখানে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে।"[৯]

---

১. আল-কুরআন, ৮:২৪
২. আল-কুরআন, ১৭:২২
৩. আল-কুরআন, ১৭:২৬
৪. আল-কুরআন, ১৭:৩২
৫. আল-কুরআন, ১৭:৩৫
৬. আল-কুরআন, ১৭:৩৭
৭. আল-কুরআন, ১৭:২৯
৮. আল-কুরআন, ৯:২৩
৯. আল-কুরআন, ২৩:১-১১

Dhaka University Institutional Repository

"ন্যায্য প্রাপ্য হইতে লোককে বঞ্চিত করিওনা এবং অন্যায় আচরণ দ্বারা পৃথিবীতে অনর্থের সৃষ্টি করিওনা।"[১]

"আর তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আল্লাহ্ রসূলের একান্ত অনুগত হয় এবং সৎকাজ করে, তাহাকে আমরা দ্বিগুণ পুরস্কার দিব। তদুপরি তাহার জন্য (পরকালে) পর্যপ্ত উপজীবিকার ব্যবস্থাও করিয়ারিছ।"[২]

"যদি কোনও বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের সুনির্দিষ্ট বিধান বিদ্যমান থাকে, তবে সে সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণের অধিকার ভক্তবিশ্বাসী মুসলমান নর-নারীর নাই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের বিধান অমান্য করে, স্পষ্টতই সে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।"[৩]

"খাদ্য হিসেবে তোমাদের জন্য হারাম করা হইল মৃত জীবজন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহা কিছু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে উৎসর্গীত হয়, তাহা গলাটিপিয়া বা লগুড়াঘাতে নিহত প্রাণি, উচ্চস্থান হইতে পতনের ফলে বা শৃঙ্গাঘাতে হত পশুপক্ষী, হিংস্রপ্রাণি কর্তৃক অংশবিশেষ ভক্ষিত পশুপাখি যাহারা জবাই করার পূর্বেই মরিয়া যায়। কোন প্রস্তাব বেদিকার নিকট বলি দেয়া পশুপক্ষী বা যাহারা ভাগ্যনির্দেশক শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হয়। ইহা পাপাচার।"[৪]

"বলুন, তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তুই হালাল করা হইয়াছে।"[৫]

"আজিকার দিনে তোমাদের জন্য সব ভাল জিনিষই হালাল করিয়া দিলাম। ধর্মগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতিদের খাদ্য তোমাদের জন্য এবং তোমাদের খাদ্য তাহাদের জন্য হালাল করা হইল। তোমাদের জন্য আরও বৈধ করিয়া দিলাম মুসলিম এবং তোমাদের পূর্বে ধর্মগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতিসমূহের সতীসাধ্বী রমণীগণকে তবে কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নয়। বরঞ্চ যথারীতি যৌতুক দানে সংযত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই এবং তাহাদিগকে তোমরা উপপত্নী হিসেবে রাখিতে পারিবে না। ঈমান বা ধর্ম বিশ্বাসকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তাহার কাজ কর্মই নির্থক ও নিস্ফল এবং পরকালে সে হইবে সর্বহারাদের অন্যতম।"[৬]

"চোর-স্ত্রী হউক বা পুরষ হউক, কুকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিবে। ইহাই আল্লাহর অভিপ্রেত আদর্শ শাস্তি। আল্লাহ অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আধার।"[৭]

"হে মুমিনগণ, মাদকদ্রব্য, জুয়া বা দ্যুতাক্রীড়া, প্রস্তর পূজা, তীর নিক্ষেপ দ্বারা ভবিষ্যত নিরূপণ শয়তানী কাজের অন্তর্ভুক্ত পাপাচার। সুতরাং এই পাপাচার পরিহার করিয়া চলিও যেন তোমরা জীবনে স্বার্থকতা অর্জন করিতে পার।"[৮]

"হে কেহ ভালো কাজ সুপারিশ করে সেই কাজের জন্য সেও পুণ্যভাগী হইবে। আর যে ব্যক্তি মন্দকাজে উ'সাহ জোগায় সেও সেই মন্দ কাজের জন্য দায়ী হইবে।"[৯]

---

১. আল-কুরআন, ২৬:১৮৩
২. আল-কুরআন, ৩৩:৩১
৩. আল-কুরআন, ৩৩:৩৬
৪. আল-কুরআন, ৫:৩
৫. আল-কুরআন, ৪:৫
৬. আল-কুরআন, ৫:৫
৭. আল-কুরআন, ৫:৩৮
৮. আল-কুরআন, ৫:৯০
৯. আল-কুরআন, ৪:৮৫

Dhaka University Institutional Repository

"হে মুমিনগণ, আল্লাহকে মানিয়া চলিও, রসূলকে মানিয়া চলিও আর তোমাদের চালক ও নেতাদের যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিষয়ে মীমাংসার সূত্র আল্লাহর ও রসূলের বাণীতে অন্বেষণ কর যদি অবশ্যই তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস কর। ইহাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতম মীমাংসা।"[১]

"তোমাদের জন্য (নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকদিগকে) বিবাহ করা নিষিদ্ধ (১) তোমাদের মা (২) মেয়ে (৩) বোন (৪) পিসী ও মাসী (৫) খালা (৬) ভাইয়ের মেয়ে (৭) বোনের মেয়ে (৮) দুগ্ধ-মাতা বা যাহারা তোমাদিগকে স্তন্য পান করাইয়াছে (৯) দুগ্ধ-মাতার মেয়ে (১০) শাশুড়ী (১১) সৎ মেয়ে অর্থাৎ তোমার স্ত্রী পূর্ব স্বামীর মেয়ে যাহারা তোমাদের হেফাজতে এবং যেসব স্ত্রীর সঙ্গে তোমরা সহবাস করিয়াছ, কিন্তু যদি ঐ সব স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাক তবে ঐরূপ সৎ মেয়ে নিষিদ্ধ নয় (১২) তোমাদের ঐরসজাত পুত্রের স্ত্রী (১৩) এক সঙ্গে দুই বোন, অবশ্য অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ছাড়া নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"[২]

"তোমাদের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করে তাহাদের সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করিও; কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করিওনা। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"[৩]

"নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে অপরের ধন উদরসাৎ করিওনা। আর বিচারকদের নিকট মামলা রুজু করিও না যেন জ্ঞাতসারে অপরের ধনসম্পত্তির কিয়দংশ তোমরা অন্যায়ভাবে গ্রাস করিতে পার।"[৪]

উপরের বিধিবিধান সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত উদ্বৃত করা হইল। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা একটা সার্বজনীন ব্যাপার; কাজেই সেখানে মানব জীবনের পথ চলার নির্দেশনামাও সুষ্ঠুভাবে ও সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত। তবে এটা সাধারণ পাঠকদের অবগতি ও জিজ্ঞাসার কিঞ্চিত মাত্রা পরিতৃপ্তির জন্য এবং ইসলামী জীবনধারার বিশালতা ও মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুর কিছুটা আভাস বা ইঙ্গিত মাত্র।

কুরআন মজীদের সাহিত্যিক মূল্য:

কুরআন মজীদ মুসলমানদের জীবন দর্শনের মূল উৎস, তাদের ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতির নির্দেশনামা। ইসলাম ধর্মের মূলনীতিসমূহের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হিসেবে ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন মজীদের সর্বোচ্চ মূল্য নিরূপিত হলেও এর সাহিত্যিক মূল্যও স্বল্প নয়। কুরআনের সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। আরবী সাহিত্যে এর সমতুল্য কোন গ্রন্থ নেই, এমনকি বিশ্ব সাহিত্যেও মূলনীতির নিরস বর্ণনায় কুরআনের মত কোন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

---

১. আল-কুরআন, ৪:৫৯
২. আল-কুরআন, ৪:২৩
৩. আল-কুরআন, ২:১৯০
৪. আল-কুরআন, ২:১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত নীতির বর্ণনায়, প্রয়োজনের বিবৃতিতে বিষয়বস্তু নিরস হয়ে পড়ে, কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী এমনই প্রাঞ্জল, ধ্বনিসমৃদ্ধ ও ছন্দোময় যে অত্যন্ত কঠোর হুসিয়ার বাণী নীতির একার্থক প্রকাশও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, অপূর্ব ধ্বনি ব্যঞ্জনা, শব্দের ঝঙ্কার ও লালিত্য, বর্ণনার বলিষ্ঠতা ও প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা, সর্বোপরি রসবোধ কুরআনকে যে কোন ভাষায় রচিত প্রথম শ্রেণির সৃষ্টিধর্মী গ্রন্থসমূহের পুরোভাগেই স্থাপন করে। মুহাম্মদ আলী বলেন, There was no literature, properly speaking, in Arabic before the Holy Quran, the few pieces of poetry that did exist never soared beyond the praise of wine or woman, or horse or sword, and can hardly be called literature at all. It was with the Quran that Arabic literature originated, and through the Quran that Arabic became a powerful language spoken in many countries and casting its influence on the literary histories of many others. Without the Quran, the Arabic language would have been nowhere in the world''[১]

ড. স্টেইনগ্যাস (Dr. Steingass) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব ও কুরআন মজীদের অনুপস্থিতিতে আরবী ভাষার কি দশা হত সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, 'কুরআন আবতরণের পূর্বেও আরবী ভাষায় কিছু কিছু উচ্চাঙ্গের কবিতার সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু সে সমুদয় কবিতার অধিকাংশই স্মৃতিতে রক্ষিত হত, আর কবিতা সাহিত্যের সমার্থকও নয়। কুরআনই প্রাচীন ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করেছিল। কুরআন শুধু আরবীকে সাহিত্যের বাহনে পরিণত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং লেখন ক্রিয়াকে অপরিহার্য ক্রিয়ায় পরিণত করে কুরআন আরবী ভাষার বিবর্তনের পথ সুগম করে দিয়েছিল এবং আরবী সাহিত্য, গদ্য ও অলঙ্কার দ্বারা সমৃদ্ধ' (But not only by raising a dialect, through its generalisation, to the power of a language, and by rendering the adoption of writin indispensable, has the Quran initiated the development of an Arabic literature: its composition itself has contributed two factors absolutely needful and this development: it has added to the existing poetry the origins of rhetoric and prose.............)[২]

বিষয় বৈচিত্র্য গৌরবে কুরআন শরীফ পৃথিবীর অতুলনীয় গ্রন্থ। পৃথিবীর কোন গ্রন্থই এর সমকক্ষ নয়। কুরআন শরীফ ধর্মের মূলনীতিসমূহের উপর আলোকপাত করে। অস্তিত্ব ও একত্ব বিধিবিধানসমূহ ছাড়াও সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন, পার্থিব জীবনের জটিলতম সমস্যাসমূহের সমাধান, ঐতিহ্য ও পারত্রিক জীবনের সর্ববিধ সমস্যা সমাধানার্থে মূলনীতি প্রদান কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এর প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয় যুক্তি সহকারে প্রমাণের ভিত্তিতে এবং সংশয়াতীত রূপে বর্ণিত হয়েছে। এর কোথাও গোঁজামিলের কোন চিহ্ন নেই।

---

১. Mohammad Ali, Op.cit, P. 50
২. Ibid, P. 52

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন শরীফের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব জগতের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়। জগতের ইতিহাসে একখানি গ্রন্থ যে এত বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে এর তুলনা নেই। একটি জাতির জীবনে তেইশ বৎসর অতি সামান্য সময়। এই স্বল্প পরিসরে একটি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, কলহপরায়ণ জাতি তাওহীদের স্পর্শে বলীয়ান হয়ে জীবন জগতের রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই জাতি কুরআনের শিক্ষার যাদু স্পর্শে বিশ্বের বুক থেকে অন্ধকার দূরীভূত করে সেখানে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। ইসলামী সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর ইতিহাসে যে অবিস্মরণীয় দান রেখে গেছে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের যে স্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছে তা কুরআনের শিক্ষারই পরিণতি। অন্যদিকে একটি নিঃস্ব নবজাত জাতির সম্মুখে তদানীন্তন পরাক্রমশালী জাতিসমূহ যে ধুল্যবলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল তারও মূলে ছিল কুরআনের তাওহিদী শক্তি। কুরআনের নৈতিক শিক্ষাই মুসলিম জাতিকে পৃথিবীর দুর্বার শক্তিতে পরিণত করেছিল। অল্প কথায়, মুসলমান জাতির পার্থিব ও আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক ও আত্মিক উন্নতির মূলশক্তি, মূলপ্রেরণা মহাগ্রন্থ কুরআন। আল্লাহর কালাম কুরআন জাহান হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন সাধনা, জাতীয় জীবনে কুরআনীয় শিক্ষার প্রতিফলন।

আল-হাদীস:

কুরআনুল কারীমের পর ইসলামী শরী'আত তথা ইসলামী শিক্ষার দ্বিতীয় মূল হচ্ছে আল-হাদীস। এটি হযরত মুহাম্মদ (স.) জীবদ্দশায় শাস্ত্র বা গ্রন্থাকারে রচিত হয়নি। তখন রাসূল (স.) কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য হাদীসমূহে লিখতে বা গ্রন্থাকারে একত্র করতে নিষেধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাসূল (স.) সাহাবীগণকে বলতেন: এরূপ লেখার নিয়ম তোমরা ত্যাগ করে; কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ কর। এর সাথে অন্য কিছু মিলিও না। তদুপরী সাহাবীগণের তীক্ষ্ণ মেধা ও হিফজের ক্ষমতা গ্রন্থাগারে রক্ষিত রাখার মতই হাদীসের ভান্ডার রক্ষিত থেকে যায়। তাছাড়া কতিপয় সাহাবী নবীপ্রেমের অংশ হিসেবে গোপনে বহু হাদীস লিখে রেখেছেন, যেগুলোর সংখ্যাও পরিমাণ ছিল বিপুল। হযরত আলী (রা.) আবু হুরায়রার (রা.) নিকট এরূপ অনেক হাদীসের ভান্ডার সুরক্ষিত ছিল।

রাসূল (স.) সাহাবায়ে কিরামকে হাদীস শ্রবণ ও তা মুখস্ত করতে জোর তাগিদ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বাসিত করে দেবেন, যে আমার কথা শুনে তা স্মরণ করে নিল, পুনঃ তাকে হিফাজত করল, অপরের নিকট তা পৌঁছে দিল। অনেক জ্ঞান বহনকারী লোক এমন ব্যক্তির নিকট তা পৌঁছে দেয় যে তা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।"[১]

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে "যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মতের দ্বীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করবে আল্লাহতা'আলা তাকে একজন ফিকহবিদ বানিয়ে দেবেন এবং আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হব।"[২]

---

১. বায়হাকী, ১ম খ. দিল্লী, (তা.বি.), পৃ.৩৫০
২. মিশকাতুল মাসাবীহ, দিল্লী, (তা.বি) পৃ.৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচার ও প্রসার করার নিমিত্তে সাহাবীগণ ব্যাপক সাধনা করেন। কুরআনের সাথে সাথে হাদীসের প্রচার করতে দেদেশ দেশে তাঁরা বের হয়ে পড়েন, হাদীস শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। হযরত আবু ইদরীস খাওলানী (রা.) হিমস শহরে হাদিস শিক্ষা দান করেন। হযরত আয়িশা (রা.) মদীনায় হাদীস শিক্ষা দান করতেন। বহু মহিলা ও সাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা.) আমার ইবনুল আস (রা.) এবং হুযায়ফা ইবন ইয়ামান প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কুফা নগরে নিয়মিত হাদীস শিক্ষা দিতেন। তাঁর নিকট চার হাজার শ্রোতা ও ছাত্র হাদীস শিক্ষা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ইলমে হাদীসের বিরাট ভান্ডার আয়ত্ব করেছিলেন। রাসূলে (স.) ইন্তিকালের পর তিনি তা লক্ষ লক্ষ জ্ঞানপিপাসুর নিকট পৌঁছিয়াছিলেন। এভাবে হাদীসের দারস ও প্রচার কাজ আরব তথা অনারব এলাকায় খুলাফায়ে রাশিদার সময়কালে পৌঁছে যায়।

সাহাবায়ে কিরাম যেমনিভাবে নবী করীম (স.) এর কাছ থেকে কুরআন ও হাদীস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো লাভ করেছিলেন, সাহাবীগণও তাঁদের পরবর্তীদের জন্য এমন ধরণের ইলম চর্চার ধারাবাহিকতা রেখে গেছেন। পরবর্তী পর্যায়ের মুসলমানগণ তাবেয়ী নামে খ্যাত হন। তাবিয়ীগণ বিভিন্ন সাহবীগণের ছাত্র হিসেবে হাদীস শিক্ষা করতেন। হাদীসের লিখন ও পঠন উভয় পদ্ধতিতে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

বশীর ইবন নুহাইক (রা.) হাব্বান ইবন মুনাব্বাই ইয়ামীনী, সায়াদ ইবন জুবাইর তাবেয়ী, সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ্ হুযুর ইবন আদী, আবদুল আলা ইবনে আমর, ইমাম জাফর সাদিক, ইমাম বাকির, আল-মারওয়ান ইবন হাকাম, সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনে যুবাইর, আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ, উবায়দুল্লাহ ইবনুল হারিস, উবায়দুল্লাহ ইবন উতবা, সুলায়মান ইবন ইয়ামান, কাসেম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর, ইকরামা মাওলা ইবন আব্বাস, আতা ইবন আবু রিবাহ, ইব্রাহিম নাখয়ী, আলকামা ইবন কায়স ইবন আবুল হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইবন সারিন, কাতাদাহ ইবন দাআমাতা আদ দওসী, উমর ইবন আব্দুল আযীয, ইয়াজীদ ইবন আবু হাবীব, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বাই তাবেয়ীগণের মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনগণের যামানায় ব্যাপকভাবে হাদীসের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। মোয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে আহমদ ও মসনদে ইমাম আযম প্রসিদ্ধ তিনটি গ্রন্থ। এগুলো হচ্ছে-

(১) সহীহুল বুখারীঃ ইমাম বুখারী (র.)[১] কর্তৃক সংকলিত। এতে মোট ৭২৭৫ টি হাদীস রয়েছে যা ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাইকৃত।

---

১. ইমাম বোখারী (র.) তাঁর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবন ইব্রাহিম। তিনি বর্তমান মধ্য এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বুখারা নগরে ১৯৪ হিজরী সনে ১৩ শাওয়াল শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই গ্রামের মকতবে লেখাপড়া করার সময়েই তিনি হাদীস মুখস্ত কারণে অভ্যস্থ হন। ষোল বছর বয়সে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন মুবরক ও ইমাম অকী'র নিকট হাদীস মুখস্থ করেন। একাধারে ছয় বছর কাল দিনি হিজায এলাকায় হাদীসের সন্ধানে কাটান। আঠারো বছর বয়সে তিনি হাদীসের জটিল সমস্যা সমাধানে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২১০ হিজরী সনে হজ্বে গমন করে রাসূলুল্লাহ (স.) এর রওজার পাশে বসে বসে 'আত-তারীখুল কাবীর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীসের সন্ধানে বহু মুহাদ্দিসের নিকট এবং বহু এলাকায় গমন করেন। হিজরী সনের ৩০ রজব ৬২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, (ইফাবা ১৯৮৬খৃ.) পৃ.৪৭৭-৪৭৯)

Dhaka University Institutional Repository

(২) সহীহ মুসলিম শরীফ: ইমাম মুসলিম (র.)[১] কর্তৃক সংকলিত। এতে ৪০০০ হাদীস সংযোজিত হয়েছে যা তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাইকৃত।

(৩) সুনানে নাসায়ী: ইমাম নাসায়ী (র.)[২] কর্তৃক সংকলিত। প্রথমে তিনি সানুনুল কুবরা, পরে আস সুনানুস নুগরা এবং সর্বশেষ 'মুজতবা' রচনা করেন।

(৩) সুনানে আবু দাউদ: ইমাম আবু দাউদ[৩] কর্তৃক সংকলিত, এর হাদীসের সংখ্যা ৪৮০০টি।

(৫) জামে তিরমিযী: ইমাম তিরমিযী[৪] কর্তৃক সংকলিত। তাঁর গ্রন্থে ১৬০০ হাদীস স্থান পেয়েছে, যা পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাইকৃত। এতে তিনি ব্যবহারিক হাদীস বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, তা ব্যাপকভাবে মুহাদ্দিসগণের নিকট সমাদৃত হয়। একে জামে ও সুনান দু'নামেই অভিহিত করা হয়।

(৬) সুনানে ইবন মাযাহ: ইমাম ইবন মাযাহ[৫] কর্তৃক ৪০০০ হাদীস সম্বলিত এ গ্রন্থ প্রণীত। অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক নিয়ে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে যেমন: সঞ্চয়ন সৌন্দর্য, পুনারাবৃত্তিহীন, একের পর এক বর্ণনা, সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ ইত্যাদি। ৩২টি পরিচ্ছেদ, ১৫০০ অধ্যায় দ্বারা অতি সুনিপুণভাবে তিনি একে বিন্যস্ত করেছেন।

---

১. ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর পুরো নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন-নিশাপুরী, ২০৪ হিজরীতে খুরাসান অন্তবর্তী নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে তিনি নিশাপুরে ইন্তিকাল করেন। (মুফতী আমিমুল ইহসান, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামী একাডেমী (ঢাকা-১৪১১ হিজরী), পৃ-৫৮-৬১)

২. ইমাম নাসায়ী (র.) তাঁর পুরো নাম আবদুর রহমান আহমদ ইবন শোয়াইব ইবন আলী ইবন বাহর ইবন মান্না ইবন দীনার আন নাসায়ী, খুরাসান এর অন্তগর্ত নাসা নামক শহরে ২১৫ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৩০৩ হিজরী সনে ৮৯ বছর বয়সে তিনি দামেশকে ইন্তিকাল করেন। (মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ-৪৮২-৮৮৩)

৩. ইমাম আবু দাউদ (র.) তাঁর পুরো নাম সুলাইমান ইবনুর আশযাম ইবনে ইসহাক আল আজাদী আল সিজিস্তনী কান্দাহার এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শিক্ষার মহান লক্ষ্যে মিশর, সিরিয়া, হিযায এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল উসমান ইবন আবু সাইবা, কুতাইবা ইবনে সায়ীদ তাঁর হাদীস শিক্ষা দানের উস্তাদ। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী হাদীস শিক্ষায় তাঁর ছাত্র। ২৭৫ হিজরী সনের ১৬শাওয়াল বসার নগরে তিনি ইন্তিকাল করেন। (মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮৩)

৪. ইমান তিরমিযী (র.) তাঁর পুরো আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ইসা ইবন সাওরাতা ইবন মুসা ইবন জুহাকুস সুলামী আত-তিরমিযী। তিনি জীহুন নদীর বেলাভূমে অবস্থিত তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী তাঁর চর্চার প্রশংসা করেছেন। তিরমিযী শরীফ ছাড়াও তাঁর রচিত গ্রন্থ কিতাবুল আসমা, শামায়িলুত তিরমিযী, তাওয়ারীখ ও কিতাবুল জুহদ অন্যতম। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিফে ফেলেন। ২৭৯ হিজরী সনে তিরমীয শহরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। (প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮৫)

৫. ইমাম ইবন মাযাহ (র.থ) তাঁর নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মাযাহ আল কাজভীনি। তিনি একজন বড় মাপের মাহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন। ২০৯ হিজরী সনে (৮০৮ খৃ.) কাজভান শহরে তাঁর জন্মঃ। নিজ শহরে তিনি হাদীস শিক্ষা দান করতেন। হাদীস শিক্ষায় তাঁর ওস্তাদের সংখ্যা অগণিত। অপর দিকে তাঁর ছাত্রের সংখ্যাও প্রচুর। হাদীস গ্রন্থ ছাড়া তিনি তাফসীর গ্রন্থও রচনা করেন। ২৭৩ হিজরী সনে ৬৪ বছর বয়সে তিনি (৮৮৬খৃ.) ইন্তিকাল করেন। (মুফতী আমিমুল ইহসান, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম, অষ্টম ও তৎপরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীস চর্চা শুরু হয়। অবশ্য এর আগেই হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ভারত বিশেষ করে উত্তর ভারত ও লাহোরসহ ভারত উপমাহদেশের কয়েকটি এলাকায় হাদীসের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়, সপ্তম ও অষ্টম হিজরী সালে তা পূর্ণতা লাভ করে। ভারত উপমাদেশের তৎকারীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ হচ্ছেন, শায়খ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুযানী, বুরহান উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আবুল খায়ের আসাদ বলখী, কামালুদ্দীন জাহিদ, শরফুদ্দীন বুদায়ানী অন্যতম।

তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনগণের অনেকেই হাদীসের উপর ছোট বড় গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া হাদীসের জলকরণ, সহীহ হাদীস বের করার পদ্ধতি, আসমাউর রিজাল, বর্ণনাকরীর শ্রেণী বিভাগ, বিভিন্ন প্রকার হাদীস ও গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গ্রন্থ প্রণীত হয়। পলে হাদীস শাস্ত্র মুসলমাদের মধ্যে একটি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অগ্রগতির পথেয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাদীসের গুরুত্ব

মুসলমানদের ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। আল-কুরআনে ইসলামের মূলণীতিসমূহ বিবৃত হয়েছে। হাদীসে এই সব মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। কাজেই হাদীস শরীফকে কুরআনের সর্বোত্তম তফসীল ও ভাষ্য বলা হয়। ইসলামের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও অনুশাসন, ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

হাদীস শরীফ আল-কুরআনের পরিপূরক। আল-কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে যার আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিংবা ইঙ্গিতধর্মী। এমন বিষয় আছে যা কুরআনে মোটেই আলোচিত হয়নি তা হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) আলোচনা করেছেন। হাদীস একাধারে কুরআনের ইঙ্গিতধর্মী, সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহের বিস্তারিত আলোচনা এবং যেসব বিষয় কুরআনে সম্পষ্ট উল্লেখ নাই এমন জরুরী বিষয়ের নির্দেশনামা। অল্পকথায়, হাদীস মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, আন্ত জাতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। কাজেই কুরআনের মত হাদীস শরীফ মুসলমানদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

হাদীস শরীফ হজরতের জীবনের কার্যাবলীর ইতিহাস। হযরতের জীবনে যা ঘটেছে, যেসব ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম-সাধনা, হর্ষ-বিষাদ, সফলতার মধ্য দিয়ে হযরতের জীবনের পথ পরিক্রমা চলেছে হাদীসে সে সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হযরতের জীবনের শিক্ষা-দিক্ষা সবই নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সহিদ হাদীসে বিধৃত হয়েছে। কাজেই হাদীস হযরতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনালেখ্য; এটা ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম উৎস।

আরবী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে হাদীস এক অভাবনীয়দ গতিবেগ সঞ্চার করে। হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ফলে এক দিকে যেমন হাদীস সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি আরবী ভাষায় বিভিন্নমুখী অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হয়। হাদীস সাহিত্য মুখ্যভাবে জীবনী সাহিত্যের জন্মদান করে।

---

১. Prof. Kazi Ayub Ali, An Introduction to Islamic Culture, P.16

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্যের হাদীসের সত্যতা যাচাই করার জন্য হাদীস বর্ণনাকারী হাজার হাজার রাবীর জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের চরিত্র আলোচিত হয়েছিল। এইভাবে 'আসমাউর রিজাল' নামে এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। এছাড়া, আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা-তত্ত্বের ক্ষেত্রে হাদীস সংগ্রহ প্রচেষ্টা এক বিপুল কর্মচঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

হাদীস চর্চার পদ্ধতি পরবর্তীকালে ইতিহাস রচনার পদ্ধতির উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। সুবিখ্যাত সিহাহ্ সিত্তার সংকলয়িতাগণ নির্ভুলভবে হাদীস পরিবেশণার যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকগণও সেইরূপ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন। যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মুহাদ্দিসীনগণের জীবনকে গৌরবান্বিত করেছিল, জ্ঞানানুরাগ ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা মুহাদ্দিসীনগণকে আজীবন দু:খ কষ্টের পথে অবিচল রেখেছিল মানুষের জ্ঞানার্জনের ইতিহাসে তা এক পরম আদর্শ হিসেবে অনুসৃত হয়। বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিকগণও মুহাদ্দিসীনদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কাজেই দেখা যাচ্ছে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের পদ্ধতিসমূহ পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাস তথা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস রচকদের সুষ্ঠুকার্য পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

ইসলামের গতিশীলতার আদর্শ:

ইসলামের কিছু ব্যবস্থা আছ যা শিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম ও সংগঠনমূলক নীতি নির্ধারণে সহায়ক। বস্তুত ইসলাম একটি গতিশীল (Dynamic) সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রবর্তক। শিক্ষার সকল ব্যাপারে কুরআন, হাদীস যথেষ্ট নাও হতে পারে। সামাজিক, মানবিক কল্যাণ ও জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে অনেক নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামী শিক্ষায় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত কমিটি বা শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উৎস ও নির্দেশনার কাজ করবে। এর জন্য নিদর্শন রয়েছে ইতিহাসে। প্রথমে আসে ইজতিহাদ। ইজতিহাদকে বরেছেন গতিশীলতার নীতি। শিক্ষার উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহর পরই এর স্থান হতে পারে। যেসব বিষয়ে কুরআন হাদীসে কোন নির্দেশনা সেই সেসব বিষয়ে রাসূল (স.) নিজেই ব্যক্তিগত বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। মুয়ায ইবন জাবালকে ইয়ামেনের গভর্ণর নিয়োগের সময় রাসূল (স.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন কোন সমস্যা আসলে কিভাবে সমাধান করবে? মুয়ায এর উত্তরে বলেন, প্রথমে কুরআন, পরে সুন্নাহ এবং শেষে নিজের বিবেচনায়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তাছাড়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যে কোন সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে না পেলে কিয়াস (কুরআন সুন্নাহর সদৃশ্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত), ইজমা (জ্ঞানীদের সম্মিলিত মতামত), ইসতিহসান (কোন জিনিস ভালো বিবেচনা করে) প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সমাধান দেবেন। কাজেই সমাজ, জাতি ও সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা পকিল্পনায় কুরআন ও হাদীস সমাধান না দিলে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিয়াস, ইজমা, ইজতিহাদ প্রভৃতির সহায়তায় অগ্রসর হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে ইজতিহাদ অর্থে বুঝায় করআন হাদীসে যে সকল সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান নেই। তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট রায় কায়েম করার জন্য আইনবিদের মানসিক শক্তি প্রয়োগ। আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদকে ইসলামের গতিশীলতার নীতি (Principale of Movement in Islam) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কোন আইন বিষয়ক সমস্যার সমাধানকল্পে স্বাধীন মতামত গঠন অর্থে তিনি শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। জনৈক আধুনিক পন্ডিতের মতে, কোন বিশেষ অবস্থায় কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সুষ্ঠু প্রয়োগ আবিস্কার করাই ইজতিহাদ বা গবেষণা। কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ ইজতিহাদের ভিত্তি। কুরআন ও হাদীসের মূলণীতি সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইজতিহাদ বা গবেষণা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যারা আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণা করেন তাদেরকে মুজতাহিদ বলা হয়ে থাকে।

ধর্মীয় ও আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে গবেষণা করা ইসলাম ধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এবং কুরআন ও হাদীসে গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "ভুমন্ডল ও নভোমন্ডলের স্বজনে, দিনরাত্রির আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত নিহিত আছে। (তাহারাই জ্ঞানবান) যাহারা দাড়াইয়া, বসিয়া বা শুইয়া শুইয়া আল্লাহর স্মরণ ভজন করে এবং পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের সৃষ্টি রহস্যের চিন্তা করে।

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে, দিনরাত্রির পর্যায়ক্রমে অনুগমনে, মানুষের লাভজনক বাণজ্য-সম্বারপূর্ণ সমুদ্রগামী জলযানসমূহ, আকাশ হইতে বৃষ্টিরূপে আল্লাহ যাহা বর্ষণ করিয়া মৃত ধরণীকে সঞ্জীবিত করেন তাহাতে, ভূপৃষ্ঠ ব্যাপিয়া জীব জন্তুর সম্প্রসারণে, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে এবং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থলে মেঘ সম্ভারের সুনিয়ন্ত্রিত সঞ্চরণে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতময় নিদর্শনসমূহ নিহিত রহিয়াছে।" [৩]

"আল্লাহর রাস্তায় যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত সেইরূপ প্রয়াসই করিবে। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং ধর্ম অনুশীলনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন দুরূহভাব ন্যস্ত করেন নাই।"[৪]

"আর যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সাধনা করে নিশ্চয় আমার পথেই তাহাদিগকে চালিত করি। নিশ্চয় আল্লাহ স্বীকৃতিকারীদের সাথেই আছেন।"

হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁর উম্মতদেরকে ইজতিহাদের পথে উৎসাহিত করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আমর এবং আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী বললেণ, "যখন কোন বিচারক বিচারকালে ইজতিহাদ করেন এবং তা শুদ্ধ হয়, তিনি দু'টি পুরস্কার পান, আর যদি ভুল ইজতিহাদ করেন, তবে তার জন্য একটি মাত্র পুরস্কার। "

---

১. Sir Mohammad Iqbal, The Reconstruction of Religions Thought in Islam, Labore, Pakistan, P.148.
২. আল-কুরআন-৩:১৯০-৯১
৩. আল-কুরআন-২:১৬৪
৪. আল-কুরআন-২২:৭৮
৫. আল-কুরআন-২১:৬৯
৬. মিশকাত শরীফ, পৃ.৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

ইজতিহাদ বা গবেষণার প্রচলন হযরতের জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু তখনও তা ততোধিক মুখ্য হয়ে উঠেনি এবং উঠার তত প্রয়োজনও ছিল না। হযরতের পরেই ইজতিহাদের প্রসার ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট অনুভূত হয়। কেনান তখন বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির লোক ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হতে থাকে এবং অনেক নূতন সমস্যার সূত্রপাত হয়। খুলাফা-ই-রাশদীন নিজেদের উপর সমস্যা সমাধানের ভার না নিয়ে দেশের শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের উপর সমস্যা সমাধানের ভার না নিয়ে দেশের শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের উপর নির্ভর করতেন। ঐতিহাসিক জালাল উদ্দীন সুয়ুতির "তারীখুল খোলাফা" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবুবকর (রা.) এর নিকট কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে কুরআন শরীফে তার সমাধান খুঁজতেন। যদি সমাধান পেতেন তবে সেই অনুসারে কাজ করতেন। কুরআনে কোনরূপ সমাধান না পেলে হযরতের সুন্নাহ মুতাবিক কাজ করতেন। হযরতের সুন্নাহর মধ্যে কোন সমাধান না পেলে হযরতের সাহাবাদেরকে আহবান করতেন এবং তাঁদের সাথে সে ব্যাপারে আলোচনা করতেন এবং সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অনুযায়ী কার্য করতেন।[১] হযরত ওমর (রা.) ইজতিহাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করা হত যে ইজতিহাদ বা গবেষণারীতি যেন কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী না হয়।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফকিহগণ ইসলামী কানুন পণয়ন করেন। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী ও ইমাম আহমদ হাম্বল যাথক্রমে হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাবের প্রতিষ্ঠা করেন। এই চারজন সুবিখ্যাত ইমাম ইসলামী কানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন সমগ্র সুন্নী মুসলমান সমাজ এই চার মাজহাবের যে কোন একটি মাজহাবের অন্তর্ভুক্ত।

এখন প্রশ্ন উঠেঃ ইসলামে কি ইজতিহাদের পথ একেবারে রুদ্ধ কিংবা ইজতিহাদের পথ এখনও খোলা আছে? এ ব্যাপারে মুসলিম সমাজ দুইটি শিবিরে বিভক্ত। একদল মনে করেন যে চারি মাজহাবের পরে মুসলিম সমাজে ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, অন্যদল মনে করেন যে, ইজতিহাদের পৃথ এখনও মুসলমানদের জন্য উম্মুক্ত আছে। এই দলের একজন প্রধান প্রবক্তা হলেন আল্লামা ইকবাল। ইজতিহাদ সমর্থনকারী দলের অভিমত এই যে কুরআন ও হাদীসে ইজতিহাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে এবং হযরজ মুহম্মদ (স.) বলেননি যে কোন বিশেষ সময়ের পর ইজতিহাদের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁর কোন সাহাবা কিংবা কোন বিখ্যাত মুজতাহিদ।

---

১. Ibid, P.99

Dhaka University Institutional Repository

(গবেষক) ইজতিহাদের সমাপ্তি ঘোষণা করেননি। গতিশীল জাতির জীবনের প্রত্যেক স্তরে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলামের সর্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতা ইজতিহাদের নির্দেশ দেয়। কাজেই মুসলিম সমাজকে জীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থায় সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নিরন্তর গবেষণা কার্য চালিয়ে যেতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন কানুন রচনার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের মূলনীতিসমূহের কোন বরখেলাপ না হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাবে ইবনে তায়মিয়া ইজতিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে একে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হন। তিনি সে যুগের মুসলমাদিগকে কুরআনও হাদীসের আলোকে নূতনভাবে ইজতিহাদ করতে আহবান করেন এবং যুগ সমস্যার সমাধান করতে নির্দেশ দেন। তিনি চার মাজহাবের শেষ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে আল সুয়ুতি (Al-suyuti) তায়মিয়া আদর্শ অনুসরণ করে নুতনভাবে ইজতিহাদ আরম্ভ করতে আহবান জানান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে তায়মিয়ার আদর্শে পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে। নেজদের আবদুল ওহাব এই আন্দোলনকে পরিচালিত করেন। নূতন ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জাগরণই তাঁর কাম্য ছিল। ইকবাল বলেন, It is really the first throb of life in modern islam. To the insrpirationof this movement are traceable directly or indirectly, really all the great modern movements of Muslim Asia and Africa, i.e the sennusi Movement, the Pan-Islamic movement and the Babi Movement.

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম চিন্তানায়ক আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Reconstruction of Religious Thought in Islam, এ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামের মূলণীতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানকরেন, এবং মুসলমানদেরকে ইজতিহাদের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বলেন, "অন্তর্ভেদী চিন্তা ও নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে মুসলিম জাহানের উচিত সম্মুখবর্তী পুনগর্ঠন ক্রিয়া সম্পাদনে অকুতোভয়ে এগিয়ে যাওয়া। ... আজিকার মুসলিম জাতি তাহাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করুন এবং পরম-নীতির আলোকে তাদের সামাজিক পুনগর্ঠন করুন এবং ইসলামের অদ্যাবধি আংশিক বিকশিত লক্ষ্য হতে সেই আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের উন্মোধন করুন যা ইসলামের পরম লক্ষ্য। ("Equipped with penetrative thought and fresh experience the world of Islam should courageously proceed to the work of reconstruction before them" Ibid-178....... "Let the Muslim of today appreciate his social life in the light of ultimate principales and evolve, out of hither to parially revealed purpose of Islam that spiritual democracy which is the ultimate aim of Islam.")

আধুনিক মুসলিক জাহানের অন্যতম চিন্তাবিদ মৌলানা মুহম্মদ আলীও আজিকার পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য মুসলমানদিগকে ইজতিহাদের অনুসরণ করতে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, Under present circumstance, when conditions have quite changed and the world has been moving on for a thousand years, while the muslims have more or less stagnated, it is the duty of Muslim states and Muslim

---

১. Sir Muhammad Iqbal, Opcit. P. 152

২. Ibid, P.180

Dhaka University Institutional Repository

peopels to apply own judgement to the changed condtions and find out the ways and means for their temporal salvation.

মোটের উপর সার্বজনীন ধর্ম, বিশ্বমানবের কল্যাণকর পথের নির্দেশনামা স্থান-কলের গন্ডী অতিক্রম করে মানব-জাতির কাফেলা চলেছে নতুনের অভিসারে। এই চলার পথে কত নূতন সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ইসলামকে সর্বকালের উপযোগী হতে হলে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা চাই। তাই কুরআন ও হাদীস মানব জীবনের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সাথে মুকাবিলা করার জন্য ইজতিহাদের তাগিদ দেয়। ইসলামের মূলনীতিসমূহ সর্বজনীন, প্রাকৃতিক নিয়মের মত অপরিবর্তনীয়, অথচ সর্বকালের উপযোগী। তবে নবোদ্ভূত সমস্যার আলোকে এই সমস্ত নীতির ব্যাখ্যা করা চাই। জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের তাৎপর্য উদঘাটিত হয়, জীবনের রহস্য উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে এর নীতিসমূহের ব্যঞ্জন বেড়ে যায়। তাই গতিশীল জাগ্রত জাতির জীবনে ইজতিহাদ বা গবেষণা অপরিহার্য।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক গতিশীলতার বিকাশে মহানবী (স.) এর শিক্ষাদর্শন

বহু শতক ব্যাপী অজ্ঞানতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত একটি জাতি তথা মানব সমাজকে নৈতিক শিক্ষার পবিত্র স্পর্শে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে যে মহামানব এগ্রিয় এসেছিলেন, তিনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। মানব জাতিকে উন্নত ও সভ্য করার লক্ষ্যে ওহী ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে উজ্জীবিত করে এবং মাননের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের সে অন্ধকার যুগে জীবন ও আলোর পাতাকা উত্তোলন করার প্রয়াসে তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ওহী ভিত্তিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা আরবের বুকে প্রচলন করেছিলেন, একমাত্র সে শিক্ষার স্পর্শেই মানুষ তার আকাঙ্খিত শান্তি ও প্রগতির সন্ধান পেতে পারে এবং আদর্শবান, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারীঃ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যার উজ্জ্বল নমুনা ও অনুপম দৃষ্টান্ত মহানবী (স.) এর সাহাবায়ে কিরাম।[৩]

মহানবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের কোন পথ অবলম্বন করে তার দ্বারা আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে তার মর্ম আলোচনা করে, তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে দেয় তাদেরকে আল্লাহর রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাকুল। তা ছাড়া আল্লাহ তাঁর কাচে ফেরেশতাদের নিকট পরিবেষ্টিত কথা আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।[৪]

জ্ঞানের পথে অভিযাত্রী শিক্ষার্থীর জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতী আনন্দলোকে উচ্চ আসনের ব্যবস্থা করবেন, শিক্ষার্থীর প্রতিটি পদক্ষেপই পবিত্র এবং তার লব্ধ প্রতিটি পাঠের জন্যই পুরস্কার নির্দিষ্ট রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আকাশের ফেরেশতারা ও পৃথিবীর অধিবাসীরা,

১. Mohammad Ali, Opcit. P.115
২. মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মুস্তফা নূর-উল ইসলাম অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, ঢাকা, পৃ-৩
৩. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, হযরত (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৭বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, জানু-মার্চ ১৯৮৮, ইফাবা, ঢাকা-পৃ-৩১৬
৪. আল-হাদীস (মুসলিম) মিশকাত, মওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী, ২য় খন্ড, ১৯৭৯ এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার, ঢাকা-পৃ.৭

গর্তের পিপীলিকা এবং পানির মৎসকুল পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণকর শিক্ষাদান করে।[১]

তিনি আরো বলেছেন, রাতে এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাতের নফল ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।[২]

মহানবী (সা.) শিক্ষা অর্জন করাকে প্রত্যেক নরনারী নির্বিশেষে সকলের জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন।[৩]

শুধু তাই নয়ম, শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিদ্যানের কলমের কালিকে শহীদের রক্তের চেয়েও মূলবান বলা হয়েছে।

শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞানান্বেষণের পথে যাত্রা করা আল্লাহর পথে যাত্রা করার সমতুল্য বলে ঘোষণা করায় ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজে আবিদ হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে। মনানবী (স.) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞান অর্জনে নর-নারী নির্বিশেষে উৎসাহ সঞ্চারের ফলেই পরবর্তী যুগে অসংখ্য মুসলিম শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, গাণিতিক, কবি প্রভৃতি মণীষীল মাধ্যমে মুসলিম সমাজ আজও স্মৃতির শীষে মর্যাদার সাথে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাদেরই নীরব অনুপ্রেরণায় ক্রুসেডোত্তর যুগে পাশ্চাত্য জাতি শিক্ষা ও জ্ঞানের ভুবনে রেনোসা আনতে সক্ষম হয়েছে ঃ

পৃথিবীতে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমন হয়েছিল মানুষকে ঐ শিক্ষা দিতে যে শিক্ষা দ্বারা মানুষ পৃথিবীর বুকে আদর্শ হতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলা নৈকট্য লাভ করতে পারে। সৃষ্ট খেলাচ্ছলে পৃথিবী সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টির মূলে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ তাঁরই ইবাদত ও গুণগান করবে। তাঁর প্রিয় হাবীবকে এজন্য রহমত স্বরূপ এবং বিশ্ববাসীর শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.) শুধু বক্তব্য রেখে মানুষ তেরী করেননি মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল। সে বাণী, সে হুকুম বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি জীবনের বিভিন্ন স্তরে কাজ দ্বারা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কুরআননে প্রতীক, কুরআনের আদর্শ, কুরআনের প্রতিটি বাণী নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে বিবিধ শিক্ষা তিনি মানুষকে দিয়েছিলেন, যে শিক্ষা দ্বারা মানব দেহ, মানব মন ও মানবাত্মার উৎকর্ষ লাভ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়।

---

১. আল-হাদীস, তিরমিযী, বাবুল ইড কোম্পানী, ১৯৮৫, দেওবন্দ পৃ-৯৮
২. আল-হাদীস, (দারেমী)
৩. আল-হাদীস, সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল ইলম, ইন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, সং-১৯৮৫, পৃ-২০
৪. আল-হাদীস।
৫.আল-হাদীস, তিরমিযী দেওবন্দ, ভারত, ১৯৮৫, পৃ-৯৩
৬. শেখ ফজলুর রহমান, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স.) সীরাতুন নবি (স.)স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ-১৯,
৭. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত পৃ.৯৪

Dhaka University Institutional Repository

নবুওয়াত পূর্ব সময়ে আরবদের শিক্ষা:

আরবদের মুখের ভাষা আরবী এবং এটা চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। আরবী হরফ লেখা শুরু হয় হযরত আবু সুফিয়ানের পিতা হারব এর আমলে। মক্কার লোকেরা এই প্রথম আরবীর লিখিত রূপ দেখতে পায়। নবী করীম (স.) তখন যুবক। ঐতিহাসিকদের মতে, ইরাকের অন্তর্গত হিরার একজন অধিবাসী মক্কায় আসে এবং হারবের কন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সে হারবকে একটি গোপন সূত্রের সন্ধান দেয়। সে বলে, গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত তথ্য বা ঘটনা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলো লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এ কৌশল শেখার জন্য সে হারবকে পরামর্শ দেয়। কুদামাহ ইব্‌ন জাফর রচিত কিতাবুল খারাজ, বালাযুরীর ফুতুহুল বুলদান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে এ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) এর নবুওয়াত লাভের অল্প কিছুকাল পূর্বে মক্কা শহরে পড়ালেখার ব্যবস্থা চালু হয়।

মহানবী (স.) এর নবুওয়াতের পূর্বেই বেশ কিছু মহিলা লেখাপড়ার কৌশল রফ্‌ত করেছিলেন। এমনি এক শিক্ষিত মহিলার নাম শাফাদ। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহর কন্যা এবং ওমর (রা.) এর আত্মীয়া। এ শিক্ষাগত যোগ্যতার সুবাদেই মদীনার এক বাণিজ্যিক অফিসের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। ইব্‌ন হাজারের বর্ণনা মতে, তাঁর এ দায়িত্ব ছিল মদীনার একটি বাজার কেন্দ্রিক, যেখানে মহিলারা বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী নিয়ে বাজারে আসত। সম্ভবত: তাদের বাণিজ্য তদারক করাই ছিল শাফাদের দায়িত্ব।[১]

এতে প্রতীয়মান হয়, পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবে লেখাপড়ার ইতিহাস ছিল খুবই স্বল্প সময়ের। বলতে গেলে লেখাপড়ার চর্চা তেমন একটা প্রসার লাভ করেনি। কুরআন শরীফকেই বলা যেতে পারে আরবী ভাষায় প্রথম লিখিত কিতাব।

শুধুমাত্র সাবা মুয়াল্লাকাত[২] এর মতো কিছু কিছু লিখিত বিষয় ছিল এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এগুলো কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হত। সম্ভবত: কিছু চুক্তিপত্রও লিখিতভাবে সম্পন্ন হত। ইবন আল-নাদিম আল ফেরেশতায় উল্লেখ করেছেন, খলীফা আল মামুনের দরবারে একখান পাণ্ডুলিপি ছিল। পাণ্ডুলিপি মানে একপ্রস্থ কাগজ। পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষরও ছিল খুবই নিম্নমানের। বলা হয়ে থাকে যে, এটা ছিল আবদুল মুত্তালিবের লেখা একখানা পত্র।[৩]

এটা স্পষ্ট যে, মহানবী (স.) এর নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত একটি কলা হিসেবে আরবী লেখা একেবারেই নতুন ছিল এবং এর তেমন কোন প্রসার লাভ ঘটেনি। সম্ভবত: এর একটা কারণ এই, হিরা থেকে আসা লোকটি তার দেশের প্রচলিত হস্তাক্ষরের আদলেই আরবী লিখন পদ্ধতি লিখিয়ে ছিল। হিরার লেখাপড়া হত ২৪ বর্ণে, তদস্থলে আরবী বর্ণ হলো ২৮টি। সুতরাং এটা স্পষ্ট, হিরার লিখনকৌশল ছিল অপর্যাপ্ত।

বিভিন্ন আরবী বর্ণমালার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে একমাত্র পথ হলো নুকতা বা ফোঁটার ব্যবহার। খতীব আল-বাগদাদীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ ত্রুটি অপনোদনকল্পে নবী করীম (স.) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.) একদিন উবায়দ

---

১. নবীযুগে শিক্ষাব্যবস্থা, মূল: ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, অনুবাদ: মুহাম্মদ লুৎফুল হক, অগ্রপথিক, ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা জুলাই, ১৯৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ১৪৯-১৮৯

২. আস-সাবউল মুয়াল্লাকাত-জাহিলিয়া যুগে রচিত আস-সাবউল মুআল্লাকাত বা ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তকের প্রাচীনতম কবি হচ্ছেন ইমরুল কায়েস ইবন হাজার ইবন ওমর কিন্দী (৪৮০-৫৪০ খৃ.)। ইমরুল কায়েসসহ ত্বরফা, যুবাইর, লবীদ, আনতারাহ, আমর ইবন কুলসুম এবং হারিস ইবন হিল্লাজাহ রচিত কবিতাটি সাবআ মুআল্লাকাত বা ঝুলন্ত গীতি সপ্তক নামে অভিহিত করা হয়।

৩. নবী যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা, অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

আল-খাসানী নামের একজন লিপিকারকে ডেকে পাঠালেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দানের পর বললেন, এটাকে 'রাক্‌শ' করে নাও। লিপিকার উবায়দ বললেন, রাক্‌শ আবার কি" মৃদু হেসে তিনি বললেন, তিনি নিজেও নবীজীর একজন লিপিকার ছিলেন। একদিন নবীজী তাঁকে কিছু লিখতে বলার পর বললেন, এটাকে রাক্‌শ করে নাও। তিনি তখন নবী (স.) কে রাক্‌শ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নবীজী বললেন, এটা হলো শ্রুতলিপি বা নুকতা দেয়ার প্রক্রিয়া। সুতরাং এটা প্রমাণিত, নবীযুগে আরবী লিখন প্রক্রিয়ায় ফোঁটা বা নুকতা প্রদানের প্রথা চালু হয়। তায়েফের শহরতলীতে আনুমানিক পঞ্চাশ হিজরীর একটি উৎকীর্ণ লিপি আবিস্কৃত হয়েছে। হযরত মুআবিয়ার শাসনামলে তায়েফের গর্ভনর যে সংগ্রহশালা তৈরি করেছিলেন, উৎকীর্ণ লিপিটিও সেই সংগ্রহের মধ্যে ছিল। আবিস্কৃত এই উৎকীর্ণ লিপির কিছু বর্ণে নুকতা দেয়া ছিল। তুলনামূলকভাবে এ আবিষ্কারের ঘটনাটি বেশ পুরাতন।

সম্প্রতি এ সংক্রান্ত আরো কিছু প্রমাণপঞ্জি পাওয়া গেছে। এগুলো সিদ্ধান্তমূলক। মিসরে কাগজ হিসেবে ব্যবহৃত কিছু চামড়া পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে বাইশ হিজরীতে হযরত উমর (রা.) এর লেখা দু'খানা পত্রও রয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি তখন মুসলিম জাহানের সম্মানিত খলীফা। এই পত্র দুখানাতেই নুকতার ব্যবহার ছিল। এ সমস্ত আবিষ্কার থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে, হযরত উমর (রা.) এর খিলাফত কালেই আরবী বর্ণমালার নুকতা ব্যবহারের বিষয়টি বেশ প্রসার লাভ করে। এতে প্রমাণিত হয়, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এর শাসনামল বা তারও পরবর্তী সময়ে আরবী বর্ণমালায় নুকতা প্রদানের রীতি চালু হওয়া সম্পর্কে যে কথা আছে, তা ঠিক নয়। হযরত নবী করীম (স.) কোন পত্র লেখার পরপরই তা ভাঁজ না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। বরং লেখাটি প্রথমে শুকাতে হবে এবং তারপরই তা ভাঁজ করতে হবে। নবী করীম (স.) তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ কখনো এমন হয় যে, লেখার সঙ্গে সঙ্গে কালি শুকায় না। লেখার পরপরই চিঠি ভাঁজ করলে কালি লেপটে যায়। ফলে লেখা অস্পষ্ট বা অপাঠ্য হয়ে পড়ে।

ইবল আল-আসীরের সূত্রেও গুরুত্বপূর্ণ আরেকখানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেমনঃ নবী করীম (স.) সীন অক্ষর লিখতে দাঁত বা শিঙ্গা বিশিষ্ট করার পরামর্শ দিয়েছে। তা না করে সরল রেখা বা অন্য কোনভাবে লেখা হলেই বিভ্রান্তির আশংকা থাকবে। হস্তলিপি সংক্রান্ত আরও কতক হাদীস রয়েছে। একজন তুর্কী পণ্ডিত এরূপ চল্লিশখানা হাদীস সংগ্রহ করেছেন। নবী করীম (স.) প্রতিষ্ঠিত আস সুফফায় নিয়োগকৃত শিক্ষকগণ তাঁদের ছাত্রদের আরবী লেখার মাধ্যমে ইলম শিক্ষা দিতেন এবং ক্যালিওগ্রাফি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতেন। তাছাড়া, নবী করীম (স.) এর মক্কা অবস্থান কালে তাঁকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু দলিলপত্র লিখিতভাবে সম্পাদিত হয়েছে।[১]

মহানবী (সা.) এর যুগে পবিত্র মক্কায় শিক্ষা বিস্তারঃ

মহানবী (স.) এর প্রতি আল্লাহর সর্বপ্রথম বাণী 'পড়ুন' অর্থাৎ 'জ্ঞান অন্বেষণ করুন।'[২] রাসূল-ই-করীম (স.) স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।[৩] তোমাদের

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২
২. আল-কুরআন, ৯৬:১
৩. আল-হাদীস, (দারেমী) মিশকাত, পৃ.৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সবচেয়ে ভালো সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।[১] তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করে তার অতীতের দোষ-ত্রুটি মুছে যায়।[২] মহানবী (স.) উদ্বুদ্ধ করেছেন এই বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।[৩]

মহানবী (স.) হেরা গুহা থেকে ফিরে এসে হযরত খাদীজা (রা.) কে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির শিক্ষা প্রদান করেন। তারপর তাঁর পরিচালক যায়দ ইব হারিসা, চাচাত ভাই আলী, বন্ধু আবু বকর প্রমুখকে তাঁর প্রতি ওহী ভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষা প্রদান করেন। প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন। যার ফলে সাফা পর্বতের পাদদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] মহানবী (স.) এর অন্যতম কর্তব্য ছিল মুমিনদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। তবে হিজরতের পূর্বে নিরাপদে বসে নিশ্চিন্তে কুরআন শিক্ষাদানে স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ তখন নির্যাতন নিপীড়ন অহরহই চলছিল। সুতরাং মহানবী (স.) এর সহচর্য ছিল এ যুগের সার্বক্ষণিক ভ্রাম্যমান শিক্ষাকেন্দ্র। এ সময়ে সাহাবাগণ তাঁর সান্নিধ্যে এসে কুরআন শিক্ষা করতেন এবং অন্যদের শিক্ষা দিতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) আবু বকর (রা.), খাব্বার ইবনুল আরাত (রা.) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন এ যুগের শিক্ষক।

মক্কায় প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উপস্থাপন করা যায়, মহানবী (স.) এর সময়ে শিক্ষার যেসব কেন্দ্রবিন্দু গড়ে উঠেছিলঃ

(১) মসজিদে আবূ বকর (রা.) সালাত আদায় করতেন এবং সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এটি ছিল একটি উন্মুক্ত স্থান। আবু বকর (রা.) যখন এখানে বসে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়তেন, তখন মুশরিকদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ছুটে আসত এবং মুগ্ধ হয়ে কুরআন শুনত। এতে মুশরিকরা ক্ষেপে উঠে। তারা আবু বকর (রা.) এর উপর চাপ সৃষ্টি করে। তিনি বাসস্থান ত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি গুহাভ্যন্তরে সালাত ও কুরআন পড়া শুরু করেন। আবারো তাঁর কণ্ঠে কুরআন শুনার জন্য মুশরিকদের স্ত্রী বা বালক-বালিকাদের ভীড় জমতে থাকে।

(২) বায়তে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবঃ ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ইবন নাওফিল ছিলেন হযরত উমর (রা.) এর বোন। তিনি এবং তাঁর স্বামী সাঈদ ইবন যায়দ গোড়ার দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজ গৃহে হযরত খাব্বার ইবন আরাত (রা.) এর কাছে কুরআন শিক্ষা করতেন। হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তরবারী হাতে বোনের বাড়ি গিয়ে তাঁর বোন এবং ভগ্নিপতিকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় দেখতে পান। সীরাতে ইবন হিশামে আছে, তাঁদের কাছে খাব্বার ইবন আরাত উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছে একখানা সহীফা ছিল। তাতে সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল এবং তিনি তা তাঁদেরকে পড়াচ্ছিলেন। সীরাত

---

১. আল-হাদীস, বুখারী, কিতাবুল ইলম সং, ১৯৮৫, ইত্ত কোম্পানী, দেওবন্দ, পৃ. ১৭
২. আল-হাদীস, তিরমিযী, বাবুল ইলম এণ্ড কোম্পানী, সং- ১৯৮৫, দেওবন্দ, পৃ. ৯৭
৩. আল-হাদীস, (বুখারী-মুসলিম) মিশকাত ২য় খণ্ড মাওঃনূর মোহাম্মদ আজমী, পৃ. ৬
৪. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

হালবিয়াহ গ্রন্থে হযরত উমর (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স.) আমার বোনের বাড়িতে দু'জন মুসলিমের খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাদের একজনের নাম খাব্বাব ইবন আরাত। অপর জনের নাম আমার জানা নেই। খাব্বাব ইবন আরাত আমার ভগ্নির বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন এবং তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। সুতরাং এই বায়তে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবকে কুরআন পাঠ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র বলা যেতে পারে।

(৩) **দারুল আরকাম:** হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা.) প্রথম সারির মুসলিমদের একজন। মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাড়ি ছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই বাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দারুল আরকাম নামে খ্যাত। নবুওয়াতের পঞ্চম সালে বহু মুসলিম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। যাঁরা মক্কায় ছিলেন, তাঁরাও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। নবুওয়াতের ষষ্ঠ সালে রাসূলুল্লাহ (স.) সহ সাহাবীগণ দারুল আরকামে আশ্রয় নেন। এখানে অবস্থান করেই তাঁরা ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন। তাবাকাতে ইবন সা'দ এবং মুসতাদরাকে হাকিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (স.) গোড়ার দিকে এ বাড়িতে থাকতেন এবং এখান থেকেই মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। এখানে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। দারুল আরকামে নও মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দেয়া হত। ইমাম আবুল ওয়ালীদ আযরাকী লিখেছেন, এ বাড়িতে রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ একত্রিত হতেন এবং কুরআন অধ্যয়ন করতেন। দাওয়াতের ফলে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে কোন অবস্থানসম্পন্ন মুসলিমের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হত। তিনি সেখানে অবস্থান করতেন এবং আহার করতেন। (সীরাত হালবিয়াহ ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১)

দারুল আরকাম দারুল ইসলাম এবং দারুল মুরতাবী নামেও খ্যাত ছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবাগণ প্রায় এক মাসকাল অবস্থান করেন এবং দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। এটি ছিল একাধারে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস। এখানে এসেই হযরত উমর (রা.) মহানবী (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তারা কা'বায় নামাজ পড়তে আরম্ভ করেন। হযরত আরকাম বাড়িটি তাঁর পুত্রের নামে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর পৌত্র আবদুল্লাহ ইবন আম্মান ইবন আরকাম নিজের অংশ খলীফা আবু জাফর আল-মানসূরের কাছে সতের হাজার দীনারের মিনিময়ে বিক্রি করে দেন, খলীফা মাহদী তাঁর দু'পুত্র মূসা ও হারুনের নামে তাঁদের জননী খাযরানকে এটি দিয়ে দেন। তখন এটি পুনঃনির্মিত হয় এবং বায়তুল খাযরান নামে খ্যাত হয়। অতঃপর খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর স্ত্রী যুবায়দার নামে ক্রয় করে বাড়িটি ওয়াক্ফ করে দেন। এবার এটির নাম হয় দারুয্ যুবায়দা। স্থানটি মক্কার অন্যতম দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়।

(৪) **শিয়াবে আবু তালিব:** শিয়াবে আবু তালিব নামক স্থানে একাধারে তিন বছর অবরুদ্ধ থাকাকালেও রাসূলুল্লাহ (স.) কুরআন শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছিলেন। সেখানে আবু তালিব পরিবারের বাইরের লোকও অবস্থান নিয়েছিলেন।[১]

---

১. লুৎফর রহমান ফারুকী, হিজরতের পূর্বে মক্কার কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র, মাসিক পৃথিবী, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৯, জুন ১৯৯২, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃ. ২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) এর যুগে মদীনায় শিক্ষা বিস্তার:

নবুওয়াতের দশম সালে হজ্জের মওসুমে মদীনার খাজরায গোত্রের ছয়জন সম্মানিত আনসার মক্কায় এসে ইসলাম কবুল করে মদীনায় ফিরে যান। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের ১১শ সাল মদীনার আউস গোত্রের মোট ১২জন আনসার মক্কায় এসে বিশ্বনবী (স.) এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। এটা ছিল আকাবার প্রথম বায়আত। তাঁরা মহানবী (স.) কে জানান, মদীনায় ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছে। কিন্তু এ কাজও ইসলাম প্রচার দ্রুত এগিয়ে নেবার জন্য পবিত্র কুরআন এবং ইসলামী নীতি আদর্শ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁদের একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। তাঁদের এ আকাঙ্ক্ষা ও আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত মুসআব ইবন উমায়রকে মনোনীত করেন।

হযরত মুসআব ইবন উমায়র ছিলেন হাশিম ইবন আবদে মানাফের প্রপৌত্র এবং একজন প্রথম সারির মুসলমান। মুসআব ইবন উমায়র ছিলেন মহানবী (স.) এর মনোনীত মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক। তিনি বায়আতে আকাবায়ে উলার সদস্যগণের সাথে মদীনায় চলে আসেন এবং মদীনার তখনকার ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আসওয়াদ ইবন জুরারাহ (রা.) এর গৃহে অবস্থান করেন। এটা ছিল মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে যে ধরণের ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রা.) প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন এবং কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত (মহানবী (স.) এর প্রতি নাযিলকৃত অংশ) পাঠ করে শোনাতেন। কুরআন যেহেতু তাঁদের মাতৃভাষা আরবীতে নাযিল হয়েছে, যেহেতু তাঁরা কুরআনের অর্থ ও মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারতেন। ফলে প্রতিদিন ২/৩ জন করে ইসলাম কবুল করতে লাগলেন। এভাবে মদীনায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠা জোরদার হয়েছিল।[১]

হিজরতের পর মহানবী (স.) মদীনার মসজিদে সহাবীগণকে শিক্ষা প্রদান করতেন। যাঁরা প্রিয় নবী (স.) এর মুখ নিঃসৃত কুরআনের পবিত্র বাণী লিপিভুক্ত করতেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মুআবিয়া (রা.) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওহী নাযিলের সাথে সাথে যে সমস্ত সাহাবায়ি কিরাম তা লিপিবদ্ধ করতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪২। মহানবী (স.) কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য মদীনা থেকে বিভিন্ন গোত্রের নিকট শিক্ষক প্রেরণ করতেন।[২]

মহানবী (স.) এর আমলে শিক্ষা সূচি:

মাওলানা আবদুস সাত্তার 'তারিখে আলীয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তৎকালীন শিক্ষাসূচিতে কুরআন, হাদীস, অংক, ফারায়িয, বংশতালিকা ও তাজবীদ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে শিক্ষক যে বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকতেন, তিনি সে বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। ব্যায়ম সম্পর্কেও তখন শিক্ষাদান করা হত।[৩] ব্যায়ামের পাশাপাশি অশ্বারোহণ, তীরন্দাজী ও

---

১. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামিক নলেজ এণ্ড ডায়েরী, ১২ নভেম্বর ১৯৯৪, ঢাকা, পৃ. ১২২

২. মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মো: সোহাব উদ্দীন, ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি, পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স, ৩০ আগষ্ট ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ১৫০

৩. M.A. Sattar, Tarikh-I-Madrasah-I-Alia, Research Publication Section, Madrasah-I-Aliah, Dacca, 1957, P. 141

অভিযানমূলক কসরতও শিখানো হত।[১] নবী করিম (স.) অবশ্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ ছিলেন। নবীজী (স.) এটাই চাইতেন, মুসলমানরা এসব বিষয়ে শিক্ষালাভ করবে। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে একখানা কিতাবকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেবেন আর তা হলো আল-কুরআন। যার যে বিষয়ে আগ্রহ থাকুক না কেন, প্রত্যেকেই এ কিতাব অধ্যয়ন করবে। কেউ যদি কুরআনুল কারীম বারবার অধ্যয়ন করে, তাহলে সে যেমন নিজের আগ্রহের বিষয়টি জ্ঞান লাভ করবে, আবার স্বল্প কলে হলেও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও জানতে পারবে। হতে পারে যে, সে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান তার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়; তবুও এ জ্ঞান বিভিন্নভাবে কাজে আসতে পারে।

কুরআন কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদাত-বন্দেগী বা নীতি সম্বলিত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে কুরআন মজীদে। এখানে ইতিহাস সম্পর্কে যেমন আলোচনা রয়েছে, তেমনি বর্ণনা রয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে। বিজ্ঞানের বিষয়সূচির মধ্যে জীববিদ্যা, সমুদ্রবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, স্ত্রীরোগ বিজ্ঞান ইত্যাদি। কুরআন থেকে সমুদ্রের ঝড়, জাহাজের পাল, গভীর সমুদ্রের মণিমুক্তা ও প্রবাল ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়।

একজন মানুষের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকতে পারে। তবে প্রত্যেক মুসলমানকেই মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এটাই ছিল মহানবী (স.) এর স্থির নির্দেশ। আল-কুরআনের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে, সেহেতু আল-কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে।

নবী করীম (স.) এর আমলে করা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ততটা বিকাশ ঘটেনি। তবে আবশ্যকীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষের ঠিকই ধারণা ছিল এবং এসব ক্রমবিকাশের ধারায় যথারীতি এগিয়ে যাচ্ছিল। এরকম একটি বিষয় ছিল চিকিৎসাবিদ্যা।[২]

হাদীসে এসেছে, একবার একজন সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম (স.) তাঁকে দেখতে যান এবং আশে-পাশে কোন চিকিৎসক পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে জানতে চান। তাঁকে দু'জন ডাক্তারের নাম বলা হলো। দু'জনের মধ্যে ডাক্তার হিসেবে যিনি ভালো ও অভিজ্ঞ নবীজী (স.) তাঁকে ডাকতে বললেন।[৩]

কুরআন মজীদে জ্যোতির্বিদ্যার উল্লেখ রয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যেই একজন পর্যটক রাতের বেলা পথ চলতে পারেন। এ বিদ্যার সাহায্যেই হজ্জের মৌসুম ও সময় নির্ধারণ করা যায়। নবী করীম (স.)ও এ বিষয়ে যথেষ্ট জানতেন। হিজরতের পর কুবার মসজিদে নির্মাণকালে কিবলা নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা হলে রাসূল (স.) এর সমাধান দেন।[৪]

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মরুভূমির বেদুঈন ও সভ্য নাগরিক ক্রমান্বয়ে হতে থাকলো ইসলাম ধর্মে বায়আতপ্রাপ্ত। ইসলামের ক্রমবর্ধমান

---

১. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮
২. নবীযুগে শিক্ষাব্যবস্থা, অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৪. নবীযুগে শিক্ষাব্যবস্থা, অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

জনশক্তি বৃদ্ধির সাথে এ শিক্ষাও দ্রুত চারদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মহানবী (স.) এর জীবনের শেষ অধ্যায়ে আরব ভূখণ্ডের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষার জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি সুষ্ঠু কাঠামো তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ পরিকল্পনাধীনে প্রত্যেক গোত্রের লোকদের কুরআন হাদীস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।[১]

এ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য দু'টি পন্থা অবলম্বন করা হয়।

প্রথমত: মহানবী (স.) শিক্ষিত সাহাবাগণের মধ্য থেকে কতককে আরবের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণরকে তাঁদের নিক এলাকার জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কে মহানবী (স.) এর দরবার থেকে হযরত উমর ইবন হাযমকে যে সারগর্ভ নির্দেশ দান করা হয়েছিল, শিক্ষা বিস্তারের দিক নির্দেশনায় তা অদ্যাবধি ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

শিক্ষাসূচির অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে কুরআন শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক ছিল। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে অন্য বিষয়ের পঠন-পাঠনে অগ্রসর হতেন। মহানবী (স.) তাঁর সহচরদের বিশেষ বিশেষ দক্ষতা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করতেন।[২]

তাঁর যুগে সাহাবী হযরত যায়দ ইবন সাবিত অংক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ভাষা শিক্ষায় তাঁরা শুধু আরবীকেই প্রাধান্য দিত না বরং আরব দেশের বাইরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাঁরা অন্যান্য ভাষাও শিখতেন এবং এটা রাজনৈতিক কারণেও প্রয়োজন ছিল।[৩]

মহানবী (স.) এর যুগে প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

মদীনায় পৌঁছার পরক্ষণেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল একখানা মসজিদ নির্মাণ। কুবায় পৌঁছার পরপরই তিনি সেখানে একখানা মসজিদ নির্মাণ করেন। এই কুবা ছিল আওস গোত্রের একটি এলাকা। কুবা ছেড়ে যখন তিনি নাজ্জার (খাজরায গোত্রের শাখা) এলাকায় প্রবেশ করেন, তখন পুরাতন মসজিদের আরো সম্প্রসারণ করেন। মসজিদের সঙ্গেই ছিল নবীজীর আবাস ব্যবস্থা। মসজিদের এক অংশকে লেখাপড়ার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মসজিদ-ই-নববী সংলগ্ন। এ শিক্ষায়তনকেই মাদ্রাসা-ই-সুফফা বলা হয়। সুফফা অর্থ প্লাটফরম। দিনের বেলা এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হত। আর যে সমস্ত ছাত্রের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা ছিল না, তারা এখানেই রাত্রি যাপন করতেন। সুফফায় স্থানীয় গরীব ছাত্র এবং বহিরাগত ছাত্রদের আবাসিক বন্দোবস্ত ছিল। বস্তুতপক্ষে এটাই ছিল ইসলামের প্রথম আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আবাসিক সুযোগ-সুবিধার জন্য ভর্তুকি দেয়া হত। ভর্তুকির অর্থ আসত রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ও ব্যক্তিগত অনুদান থেকে। তাছাড়া জনগণ এতে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। যেমন ফসল কাটার সময় প্রত্যেক আনসারী সাহাবী এক কাঁদি খেজুর দান করতেন। আস সুফ্ফার একটি উঁচু স্থানে এগুলো ঝুলিয়ে রাখা হত। যখন খেজুর পাকত এবং নিচে ঝরে পড়ত, তখন আস-সুফ্ফার বসবাসকারী গরীব।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
২. নবীযুগে শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
৩. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্ররা এগুলো কুড়িয়ে খেত। খেজুরের কাঁদিগুলো পাহারা দেয়ার জন্য একজন লোকও নিয়োগ করা হয়েছিল। মুআজ ইবন জাবাল (রা.) নামের একজন খ্যাতিমান সাহাবী এ দায়িত্ব পালন করতেন।[১]

আস-সুফ্ফায় দু'ধরণের ছাত্র ছিলেন। প্রথমত: সার্বক্ষণিক ছাত্রবৃন্দ, দ্বিতীয়ত: এমন কিছু ছাত্র যারা আশ্রয়হীন হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে এখানে থাকতেন। এদের সংখ্যা কখনো কমে যেত; কখনো আবার বেড়ে যেতো। খলীফা উমর (রা.) এর পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.) ও ছিলেন এরকম একজন ছাত্র। আস-সুফ্ফার ছাত্রগণ অধ্যয়নের পাশাপাশি কাজও করতেন।[২] অধ্যয়নের সাথে সাথে নিজের প্রয়োজনীয় আর্থিক খরচ মেটানোর জন্য উপার্জনও করতে হবে; রাসূলুল্লাহ (স.) এর এ শিক্ষা সবাইকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফরয ইবাদতের পর হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা আর আরেকটি ফরয।[৩] আধুনিক বিশ্বে কর্মমুখী শিক্ষা নামে যে শিক্ষা বহুলভাবে প্রচলিত মহানবী (স.) এ বিষয়ে শিক্ষার প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আস-সুফ্ফায় কুরআন হাদীস ও মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা দেয়া হত। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কারো দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের লিখতে ও পড়তে শেখানো। যাঁদের লেখা ও পড়ার কৌশল শেখা হয়ে যেত, তাঁদের বলা হত অন্যদের ইতোমধ্যে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতসমূহ শেখাতে।[৪] সম্ভবত কাউকে কাউকে ইসলামের বিধি-বিধান সুন্নত, সালাত, ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য বলা হত।[৫]

মহানবী (স.) এর সহচরবৃন্দ যদিও জিহাদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন, তথাপি তাঁরা প্রত্যেকেই জ্ঞান চর্চায় সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন।[৬] তাঁদের মধ্যে যিনি যে শিক্ষা অর্জন করতেন তা প্রচার করা এবং এর প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট করা নিজেদের প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

হাদীসে এসেছে, একবার নবী করীম (স.) তাঁর ব্যক্তিগত নিবাস থেকে মসজিদে এসে সেখানে দু'টো দল দেখতে পেলেন। একদল তাসবীহ্ পড়ছেন, অন্য দল বিদ্যা চর্চা করছেন। নবীজী (স.) বললেন, দুটি দলই বন্দেগীতে মশগুল রয়েছে। তবে যে দল বিদ্যাচর্চায় মগ্ন, সেটি অপেক্ষাকৃত উত্তম। একথা বলে নবীজীও সে দলে যোগ দিলেন।[৭]

হযরত আবু হুরায়রা, হযরত মুআয ইবন জাবাল, হযরত আবু যার গিফারী (রা.) প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী সাহাবী ছিলেন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেরা ছাত্র। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে এসে শিক্ষা লাভ করতেন এবং পুনরায় দেশে ফিরে যেতেন। নও মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই বসবাস করতেন মদীনার বাইরে। তাঁরা মাঝে মধ্যেই মদীনা আসতেন। তখন তাঁদের প্রশিক্ষণের জন্য

---

১. History of Muslim Education, Vol. II, Karachi, 1967, P. 22
২. The Islamic University Studies, Vol-I, No-1, June1990, Kustia, P. 38
৩. নবীযুগে শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২
৪. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮
৫. আল-হাদীস, (দারেমী) মিশকাত, পৃ. ৩৬
৬. নবী যুগে শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৭. সাহাবা কাহিনী, মূলঃ শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া, অনুবাদঃ মোজাফ্ফার হোছাইনও মোঃ মোছলেহুদ্দীন, ৩০ মার্চ, ১৯৭৯, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। এভাবে সুফ্ফা মদীনার কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। শিক্ষা সমাপ্তির পর এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হত এবং তাঁরা বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে গিয়ে গিয়ে দীনিয়াত ও কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা সুফ্ফায় লেখাপড়া করার জন্য তাদের অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিও প্রেরণ করতেন। তাঁরা এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে যেতেন এবং তাদেরকে লেখাপড়া শিখাতেন।[১]

মহানবী (স.) এর যুগে মসজিদভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

আস-সুফ্ফা চালু হওয়ার পরপরই নবীজী আরও কতক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বালাযুরী উল্লেখ করেছেন, নবীজীর আমলে মদীনায় নয়খানা মসজিদ ছিল, সেসব মসজিদ একই সাথে শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হত। সুফ্ফার সন্নিকটে অপর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ইবন হাম্বল তাঁর মুসনাদে হযরত আনাস (রা.) থেকে একখানা হাদীস উদ্বৃত করেছেন, সুফ্ফার ছাত্রদের থেকে সত্তর জন ছাত্র মদীনার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে পড়াশোনা করাতেন এবং তাঁরা সেখানে সকাল পর্যন্ত থাকতেন। ইবন সা'দ মদীনায় দারুল কুররাহ্ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন মহানবী (স.) এ করার ঘোষণা প্রদান করেন, তোমরা স্থানীয়রা মসজিদে যাবে এবং প্রতিবেশীদের নিকট লেখাপড়া শিখবে। তোমাদের ব্যাপক হারে কেন্দ্রীয় মসজিদে আসা অনাবশ্যক।[২]

সম্ভবত আস-সুফ্ফায় ছাত্রসংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি এরূপ করেছিলেন। কারণ এর ফলে তাদের প্রত্যেকের লেখাপড়া বিঘ্নিত হবে। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে শিশুরা বঞ্চিত হবে শিক্ষার সুযোগ থেকে। সম্ভবত এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরিবহন ও যোগাযোগ সমস্যা।[৩]

যুদ্ধবন্দী কর্তৃক মদীনায় শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা:

বদর যুদ্ধের সময় ৭০ জন মুশরিককে বন্দী করা হয়। নবী করীম (স.) শিক্ষিত বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ দাবী করেননি। বরং মুক্তিপণের পরিবর্তে তাদের প্রত্যেককে দশ জন করে মুসলমান শিশুকে লেখাপড়া শেখানোর শর্ত আরোপ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এতে প্রতীয়মান হয়, অমুসলিমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করা বিধিসম্মত এবং ইসলামী বিধান মতে একজন মুসলমানদের জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায় কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।[৪]

ইয়েমেনের গর্ভণরের প্রতি শিক্ষা প্রসারের নির্দেশ:

তাবারী লিখেছেন, মুআয ইবন জাবাল ছিলেন ইয়েমেনের গর্ভণর। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল অন্যতম দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলা সফর করার জন্যও তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। আমর ইবন হাযমকে ইয়েমেনের

---

১. আল-হাদীস, (দারেমী), মিশকাত, পৃ. ৩৬
২. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
৩. Ibn-I-Sad, Tabaqat-I-Kuabre V/IN, D.P. 150
৪. Islamic Culture Centre (Hydrabad Deccan) Vol. XII, 1993, P. 48

Dhaka University Institutional Repository

গর্ভণর হিসেবে নিয়োগ দানের সময়ও অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। এ জাতীয় নির্দেশনামা থেকে এটা স্পষ্ট, নিজ নিজ কর্ম এলাকায় জনগণের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া একজন গর্ভণরের দায়িত্ব। স্বাভাবিকভাবেই এটা হবে ইসলামী শিক্ষা এবং মুসলমানরা হবে শিক্ষার্থী।[১]

অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

নবী করীম (স.) যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে অমুসলিমরা পূর্ণ স্বাধিকার ভোগ করত। একজন খ্রিস্টান ছাত্র একটি বিদ্যালয়ে কুরআন শেখার জন্য ভালো শিক্ষক পেত। কিন্তু বাইবেল শেখার জন্য একজন ভালো শিক্ষক হয়ত পেত না। সে কারণে অমুসলিমদের স্বার্থেই তাদের স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার ছিল। অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি প্রদানের লক্ষ্যেই স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, কখনো কখনো ইয়াহুদীরা নবীজীর কাছে আসত এবং ধর্মীয় বিষয় আলোচনায় লিপ্ত হত। এ ধরণের আলোচনার ফলাফল মাঝে মধ্যে প্রকৃত অর্থেই ফলপ্রসু হত।[২]

সমস্ত বিশ্ব যখন অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার আর অজ্ঞতার তিমিরে নিমগ্ন ছিল, মহানবী (স.) তখন জ্ঞাচর্চাকে মানব জাতির জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা আসে না। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে মহানবী (স.) নারীকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন; শুধু অধিকার নয়, অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নারীকে আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের উপর মহানবী (স.) অতীব গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[৩]

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি মহানবী নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাঁদের নানাবিদ প্রশ্নের উত্তর দিতেন। মহানবী (স.) সম্ভ্রান্ত মহিলাদের এবং দাসীদেরও শিক্ষা দান করার আদেশ করেছেন।[৪]

রাসূলে করীম (স.) এর সময়ে যে জ্ঞান চর্চার মজলিস অনুষ্ঠিত হত, মহিলারা অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তা থেকে যথেষ্ট উপকার লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব মজলিসে তাঁদের উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য। অনেক মহিলা এমনও ছিলেন, যাঁরা রাসূল (স.) এর মুখে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্ত করে ফেলতেন। রাসূলে করীম (স.) নিজেও মহিলাদের দীন ইসলাম শিক্ষা লাভের বিশেষ চিন্তা বিবেচনা করতেন এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কোন সময় মহিলারা ঠিকমত শুনতে পারেননি মনে করলে একবার বলা কথা মহিলাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি পুনরায় পুনরাবৃত্তি করতেন।[৫]

---

১. নবীযুগে শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৪. Muhammad Kutub, Islam and Women, Adhunik Prokashoni, Dhaka, 1988, P. 22
5. Bukhari, (K. Ilm) Maktaba-i-Rashida, Delhi, P. 20

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের যে দীন সম্পর্কে সুশিক্ষিকা করে তোলার ব্যবস্থা করা সমাজ প্রধানদের দায়িত্ব, তাতে সন্দেহ নেই। তাই সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য যথেষ্ট মনে না হলে রাসূলে করীম (স.) তাঁদের জন্য অনেক সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। মহিলারাই একবার রাসূলে করীম (স.) এর নিকট অভিযোগ করলেন ও অবেদন জানালেন এই বলে যে, আপনার দরবারে সবসময় কেবল পুরুষদের ভীড় জমে থাকে, আমরা আপনার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহনের কোন সুযোগ পাই না। কাজেই আমাদের শিক্ষাদানের জন্য ভিন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তাঁদের আবেদন অনুযায়ী তা-ই করেছিলেন।[১]

ইমাম আবু দাউদ একখানা হাদীসে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (স.) এর স্ত্রীর হযরত হাফসা (রা.) জনৈক মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন।[২] বালাযুরী বলেন, আবদুল্লাহর কন্যা আশ-শাফিয়া ইসলামের পুর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছেন। [৩] তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিক কালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন তাঁদের মধ্যে ৫জন মহিলা ছিলেন।[৪] মহানবী (স.) এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা.) ২২১০ খানা হাদীস মুখস্ত করেছিলেন।[৫]

তিনি শুধু নারীরের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। [৬] স'াদ এর কন্যা আয়শা তাঁর পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।[৭]

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচেছ তাঁর ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাঁদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত: পিতামাতা ও স্বামীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। রাসূলে করীম (স.) এর এ পর্যায়ের এক নির্দেশের ভাষা এই , তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গেল নিকট চলে যাও, তাদের মধ্যে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদের আদেশ কর।[৮]

আল-কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ ভাবে ঘরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী করীম (স.) পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম সমাজের মহিলারা দীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুন-রাসূলে করীম (স.) এর এই ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল না; সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল অনিবার্য ভাবে। এজন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশ জরুরী দ্বীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করেন, তা হলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভ করার সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এপথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের জন্য যাথেষ্ট নয়, তাদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে

---

১. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, নারী, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ.৫০-৫১
২. প্রাগুক্ত, পৃ-৫১
৩. Abu Daud, Sunnan, (K. Tibb) B. Ruqai Quran Mazid-O-Islami Kutub Khana, Deuband, P.180
৪. Baladhuri, Fathul Buldan, First Edition, Cairo, P.472
৫. Shibli, Allama, Siratunnabi (Urdu Tex) Azamgarh (1375H)
৬. Amimul Ahsan, Mufti, Tarikh-i-Hadith, Mufti Manzil, Dacca, P.21
৭. দেলওয়ার হোসাইন, ইসলাম পূর্ণঙ্গ বিধান, আল হেরা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯২, ঢাকা, পৃ.৪৮
৮. Tuta Khalil, The Contribution of the Arabs to Education New York, 1926 P.79

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নব নব সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করা ইসলামী সমাজের কর্তব্য।[১] মহানবী (সা.) নারীদের জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেননি। আল্লাহতাআলা ঘোষণা করেছেন, "যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও বিদ্বান, তারা বলেন, আমরা উহার (কুরআন) প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য কথা এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল কোন জিনিস (এখানে কুরআন বুঝানো হয়েছে) হতে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"[২] সুতরাং আল্লাহর বাণী তথা কুরাআন বুঝার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের বিদ্যা অর্জন করতে হবে। এখানে মহানবী (সা.) নারী শিক্ষার উপর অনন্য গুরুত্বারোপ করেছেন।

শিক্ষকদের বেতন:

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু মহানবী (স.) এর সময়ে শিক্ষকদের নির্ধারিত বেতন ছিল কি না, তা অস্পষ্ট। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, সেকালে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত কোন বেতন ছিল না। আবু দাউদ শরীফে হযরত উবাদা ইবন সামিত থেকে বর্ণিত একখান হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি সুফফার শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি কুরআন পঠন ও লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। তাঁর একজন ছাত্র তাঁকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছিল। গোল্ডজিহার মন্তব্য করেন, যেহেতু তৎকালে লেখাপড়া কোন পার্থিব উন্নতির জন্য করা হত না, তাই বেতনের প্রশ্নই উঠত না।[৩]

প্রত্যয়ন:

মহানবী (স.) এর যুগে সনদ প্রদান সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।[৪] জাহিলিয়া যুগে যারা মক্তবে লেখাপড়া শেষ করতেন তাঁদেরকে 'কামিল' বলা হত। রাফি ইবন মালিককে কামিল বলা হত; কিন্তু এটা তাদের কোন সনদ ছিল না,[৫] উপাধি ছিল মাত্র। উল্লেখ করা যেতে পারে, মহানবী (স.) এর সময়ে যাঁরা লেখাপড়া শিখতেন তাঁদের পার্থিব লাভের আশা ছিল না বরং তাঁরা পারলৌকিক পরিত্রাণের আশায় লেখাপড়া শিখতেন। সুতরাং সনদ পাওয়ার প্রশ্ন উঠত না। অতঃপর পরবর্তী যুগে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য যখন পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে উঠে, তখন সনদের প্রয়োজন দেখা দেয়।[৬]

মহানবী (স.) এর সময়ে আধুনিক কালের মত কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে উম্মী হয়েও শিক্ষার জন্য যে ভুমিকা রেছে গেছেন, তা অনন্তকাল পর্যন্ত মানুষকে প্রেরণা দিতে থাকবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছেঃ আধুনিক এবং সনাতন। কিন্তু মহানবী (স.) এর সময়ে কোন দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। শুধু এক ধরনের শিক্ষাই প্রচলিত ছিল, যেখানে ধর্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ একই সাথে পড়ানো হত। তখন বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারটিও ছিল ধর্মীয় আদলে।

---

১. আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫১
২. আবদুর রহীম প্রাগুক্ত, পৃ.৫১-৫২
৩. Abu Daud Sunan, Vol-II (K. Bayo) Quran Mazid-O-Islamic Kutubkhana, Deuband, P.129
৪. Encyclopedia of Religion and Eghics (Gold Ziher), Vol-V, Edinburgh, P.202
৫. Dr. Hamiduaddin, History of Muslim Education, Bairut, 1954, P.147
৬. Islam War Asr-I- Jadeed Zamiah Bagar, New Delhi, Vol-II 1970, P.45

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের নিকট এমন কোন প্রমাণপঞ্জি নেই যে, মহানবী (স.) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া শিখেছিলেন। তবু তিনি নিজেই নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, আমাকে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।[১]

বাহিক্যভাবে নিরক্ষর মহানবী (স.) এর শিক্ষানীতি পৃথিবীর সকল মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। অমুসলিমরা পর্যন্ত তাঁর শিক্ষানীতির প্রতি সম্মান জানিয়েছেন। আমেরিকান চিন্তাবিদ ফ্রান্স রোমাদীন বলেছেন, "The acquisation of knowledge has been a mainstay of Islamic faith since its enuncition by the prophet Muhammad (Sm.) nearly 1400 years ago."

মহানবী হযরত মুহাম্ম (স.) মৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যা শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোন মহাপুরুষের এ ধরনের উদাহরণ বিরল।[৩]

---

১. P.K. Hitti, Hisory of the Arabs, Tenth Edition London, 1970.
২. Mishkat (K.IIm) Chapter III, Mataba-i-Rashidia, Delhi, 1967, P.16
৩. Hamid Uddin Khan, History of Muslim Education, Karachi, 1967, P.16

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা-ই-রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওফাতের পর থেকেই নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম জাহানের যে চারজন খলিফা পরপর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁদেরকেই খুলাফা ই রাশেদীন বলা হয়। এ চারজন খলিফা হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উমার ফারুক (রা.) ওসমান (রা.) ও আলী (রা.)।

ইসলামের মর্মবানী সম্বলিত আল-কুরআন এবং আল-হাদীসের নীতি নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে এ চার কর্ণধার ইসলামী ভাবধারাকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মহাগ্রন্থ আর-কুরআন ও আল-হাদীসের বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে তাঁদেরকে শিক্ষা বিস্তারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করতে হয়েছিল।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জনকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। নির্জন হেরা পর্বতের গুহায়[১] ধ্যানমগ্ন নবী করীম (স.) এর উপর আল্লাহর তরফ থেকে যে প্রথম ওহী নাযিল হয় তা হচ্ছে 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ করুন।[২] এর আলোকে চার খলিফা মুসলিম সাম্রাজ্যে বিদ্যা শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন।

খুলাফা-ই-রাশেদীনের আমলে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সকল মুসলমান ও সাহাবীরা ছিল এক ধরণের অমোঘ টান। কুরআন মাজীদ বা শিক্ষামূলক যে কোন জ্ঞানকে তাঁরা প্রতি দ্বারে দ্বারে পৌছি দিয়ে যেতেন অকাতরে। এখানে অবশ্য একটা কথা স্বীকার করতে হয় যে, শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যে সুষ্ঠু, সুন্দুর ও অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন সে ধরণের পরিবেশ খুলাফা-ই-রাশেদীনের আমলে ছিল না। তখন তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়। আরবীয় গোত্রকলহ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধীতা ও ইহুদীদের 'ষড়যন্ত' ইত্যাদির মোকাবিলা করতে গিয়ে এ চার খলিফাকে সার্বক্ষণিক তৎপর থাকতে হয়েছিল।[৩] এভাবে নিজেরে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে তারা ইসলামের আদর্শ মোতাবেক দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সুসংগঠিত করার জন্য যথেষ্ট তৎপরতা চালিয়ে গেছেন।

খুলাফা-ই-রাশেদীনের আমলে কুরআন ও হাদীসের চর্চা ও গবেষণা শুরু হলেও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষাদানের ব্যাপারে কোন রকম মূল্যবোধ তখনো সৃষ্টি হয়নি। ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষা বিস্তারের এ সময়টি একটি ক্রান্তিকাল। ঐতিহাসিকগণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা বিস্তারের এ সময়কে একটি যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ইসলামের উন্মোষকাল থেকে উমাইয়া খলিফাদের প্রাথমিককাল পর্যন্ত বিস্তৃত শিক্ষার এই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খলিফাদের নিকট মহানবী মুহাম্মদ (স.) এর বাণী ছিল আবেহায়াত স্বরূপ। তাই তাঁদের আমলে শিক্ষা বিস্তারের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং এর পরিমন্ডল আরও সম্প্রসারিত হয়।[৫] মহানবী (স.) বলেন বাল্লিগু, আননি ওয়ালাউ আয়াতন।

---

১. মাও. মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, বিশ্বনবীর জীবনী, সোলেমানিয়া বুক হাউ, ঢাকাঃ ১৯৮৮, পৃ.৬৩

২. ইকরাঃ মহান আল্লাহ ত'আলার সর্বপ্রথম ওহীঃ 'পড়ুন (হে নবী) আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক থেকে, পড়ুন এবং আপনার রব বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানত না।, সূরা আলাকঃ ১-৫

৩. ইসলামী মোস্তফা ইফাবা-১৯৮৬, ১ম খন্ড পৃ. ৫৮৯-৫৯০।

৪. মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল, হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খুলাফা ই রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৭বর্ষ, ২৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ-৩২০।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩২০

Dhaka University Institutional Repository

আমার পক্ষ হতে মানুষকে পৌছাতে থাক যদিও একটি মাত্র আয়াত বা পংক্তি হয়।[১] এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করে এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা প্রচারকে আরও ব্যাপকতর করেন এবং ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বেলে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের আশংকা ছিল শিক্ষার প্রতি অবহেলার মাধ্যমে অন্যান্য জাতির মত তাদের ওপর শাস্তি নেমে না আসে।[২]

খলিফাগণ মুসলিম জাহানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। খুলাফা-ই-রাশেদীনের সময় হযরত আলী (রা.), ইবন আব্বাস (রা.) প্রমুখ জ্ঞান সাধনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিনে। তাঁরা উভয়ই কবিতা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, অংকশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়েদ অভিজ্ঞ ছিলেন। এসময় হস্তলিপি চর্চা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল।[৩]

ইসলামের সোলঅনী যুগে পাঠবিষয় ছিল আল্লাহর পবিত্র বাণী কুরআনুল কারীম এবং তার বাস্তবা অনুশীলণ মহানবী (স.) এর হাদীস। আর এর দ্বারাই মানুষের সকল সমস্যার সামাধান হত।

আবু বকর (রা.) এর আমলেঃ

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) খুলাফা-ই-রাশেদীনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব[৪] ইসলামের জন্য তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ও আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

আবু বকর (রা.) মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা চালু করেন এবং বায়তুলমাল থেকেই ঐ সকল শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদেরকে প্রদান করেন। তখনকার আমলে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিস্তারের ক্ষেত্রে মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, "খৃষ্টানদের গীর্জা যেমন ধর্মীয় শিক্ষাদানে যত্নশীল মুসলমানদের মসজিদগুলো তেমন নয়। মসজিদ শুধু উপাসনার স্থান নয় এটা হচ্ছে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রও। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলমানগণ মসজিদকে কাজে লাগতে কুণ্ঠিত হতেন না। ঐ সময় মসজিদগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হলেও বহির্বিশ্বের জ্ঞান সাধণার কিছু কিছু বিষয় শিক্ষার্থীদেরকে শিখানো হত। তখন মসজিদে চলত কাব্য চর্চার আসর এবং স্বরচিত কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতা।[৫] বিভিন্ন উপাখ্যান সম্বলিত ঐ সকল কবিতা সে যুগের পাঠক ও শ্রোতাদেরকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করত। এখানে শিক্ষার্থীদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হত। আবু বকর (রা.) তাই মুসলিম বিজিত রাজ্যসমূহে নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং পুরনো মসজিদগুলোকে সংস্কার করার কাজে বিশেষ যত্নবান হন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদে জ্ঞান বিস্তারের জন্য অনেক ব্যক্তি প্রেরণ করেন।

---

১. জামে তিরমিযী, দেওবন্দ ১৯৮৫, ২য় জিলদ, পৃ.৯৫

২. ড. মোঃ আহার আলী, শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকাঃ ১৯৮৬, পৃ. ১৯৩

৩. মোহাম্মদ নূরুল করিম, ইসলাম ও জীবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৫, পৃ. ১৪২

৪. হযরত আবু বকর (রা.) ৬৩২খৃ. থেকে ৬৩৪ খৃ. পর্যন্ত দুই বৎসর তিন মাস সফলতার সাথে খিলাফতের অবাঞ্চিত ও পালন করেন। তিনি কঠোরভাবে অরাজতা ও বিদ্রোহ দমন করেন। নব দীক্ষিত মুসলিম যারা পূর্বেকার অনাঙ্কিত ও লাগামহীন জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছিল তাদেরকে দমন করেন। তিনি ভন্ড নবী ও প্রতারক ধর্মত্যঅগীদের বিদ্রোহ সফলতার সাথে নির্মূল করেন। (সায়্যিদ আতহার হোসেন, অনুবাদঃ মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান, গৌরবময় খিলাফত, ঢাকাঃ ২০০০, পৃ. ২০, ২০৮

৫. রাসূলুল্লাহ (স.) কবিতা প্রসঙ্গে বলেন, "কবিতা সুসামঞ্জস্য কথামালা, যে কবিতা সত্যনিষ্ঠা, সে কবিতাই সুন্দর আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে, সে কবিতায় কোন মঙ্গল নেই।

৬. তিনি (স.) আরও বলেছেনঃ "কবিতা কথার মতই। ভাল কথা যেমন সুন্দর, ভাল কবিতাও তেমনি সুন্দর; তার মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ।" (মুহাম্মদ মু'নিম খান, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৮বর্ষ, সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

যেমন মুসলিম ঐতিহ্যের একজন প্রখ্যাত ধারক মুয়ায় ইবন জাবাল (রা.) কে খলিফা আবু বকর (রা.) সিরিয়া প্রেরণ করেন। সেখনে বিভিন্ন মসজিদে বক্তৃতা দানের মাধ্যমে দেশের অশিক্ষিত মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করতেন।

যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্যও তিনি বায়তুলমাল থেকে ব্যয় করেন। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যার সাক্ষীরূপে মদীনা শরীফে মাদরাসাই আবি বকর যুগ যুদ ধরে বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে প্রাপ্ত আল্লাহর বাণীসমূহ পাথর, হাড়, কাপড়, কাঠ, চামড়া ও পাতা ইত্যাদির ওপর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় লিপিবদ্ধ ছিল। খলিফা আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম এগুলোকে সুবিন্যস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[২]

উমার (রা.) ইসলামের ইতিহাসে অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিধি-বিধান রচনা ও প্রর্তিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁকে আজকের আধুনিক বিশ্ব অনুসরণ করে চলেছে। তিনি যেভাবে দেশ শাসন করার জন্য আনি বিভাগ, বিচার বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তেমনিভাবে শিক্ষা বিভাগেও তিনি সকলের জন্য আদর্শ শাসক হিসাবে অম্লান হয়ে রয়েছেন।

খলিফা উমার (রা.) এর সময় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন মসজিদে ইসলামী শিক্ষার উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দানেরদজন্য কুফা, বসরা, দামেষ্ক প্রভৃতি স্থানে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলেন। সপ্তদশ হিজরীতে তিনি কুরআনের বিজ্ঞ ব্যাখ্যাদানকারীগণকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তারা প্রতি শনিবার জনগণের মধ্যে বক্তৃতা রাখতেন। তাঁদের সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ ভাষণ শোনার জন্য মসজিদে অগণিত মানুষের সমাগম হত।

উমার (রা.) রাজ্যের সর্বত্র মক্তব্য প্রতিষ্ঠা করে তাতে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং বায়তুলমাল থেকে তাদের বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করেন। মদীনা শহরে শিশুদের কুরআন শেখানোর জন্য মক্তব্যগুলোতে কুরআন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লিখন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও ছিল। উমার (রা. শিশুদের অশ্ব চালনা ও লিখন শিক্ষা দেয়ার জন্য সমগ্র রাজ্যে বাধ্যতাতমূলক করে দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে সিরিয়ার এক বিদ্যালয়ে ১৬০০ ছাত্র অধ্যয়ন করত।[৩] বিদ্যালয়ে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হত। এ সময় গণিত ও পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, উমার (রা.) কোথাও সৈন্য প্রেরণকালে হাদীস ও ফিকহ এর অভিজ্ঞ আলিম দেখে তার অধিনায়ক নিযুক্ত করতেন। ইলমে দীনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সেনপতি নিয়োজিত করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা।[৪]

---

১. মুয়ায বিন জাবাল (রা.) এর উপনাম আবু আবদিল্লাহ অথবা আবু আবদির রহমান। মুয়ায খায়রাজ গোত্রীয় একজন আনসার সাহাবী। নবুওয়াতের দ্বাদশ সনে যখন মদীনায় ইসলাম প্রচার শুরু হয় তখন তিনি ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। আকাবায়ে মানিয়াতে যখন ৭জন আনসারের সাথে রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে দেখতে পান, তখন তিনি (সা.) বলেন: 'মুয়ায কতনা উত্তম পুরুষ!। তিনি ১৮ হিজরীতে ৩৮ বছর বয়সে তাউনা আমওয়াস নামক মহামারীতে ইন্তেকাল করেন। (রাবি বিন হাদি উমায়র আল মাদখালী, মাযাক্কিরাতুল হাদীসিন নবুবী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব: ১৪১৮ হিজরী, পৃ.১৪)

২. ফজলুর রহমান খান, ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থা ও বাংলাদেশ, ৪২/২, আজীমপুর, ঢাকা ১৯৯২, পৃ.৭৫।

৩. আল্লামা শিবলী নে'মানী, আল-ফারুক, মুহিউদ্দীন খান, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা: ১৯৮০ পৃ. ২৫৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০

উমার (রা)এর পুত্র আবদুল্লাহ সাহিত্যের প্রতি খুবই অনুরাগ প্রদর্শন করেন।[১] উমার (রা.) এর সময় নবী করিম (স.) এর চাচাত ভাই অবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হাদীস ও আইন শাস্ত্রীয় জ্ঞানের জন্য এবং কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন।[২] উমার (রা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ইসলামের মূলনীতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সামরিক অভিযানের সময় তিনি হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে অধিনায়ক রূপে নিয়োগ করেতেন, একই সাথে সাম্রাজ্য বিস্তার ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের তৎপর ছিলেন।

মরুবাসী বেদুঈনদের জন্য তিনি কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তাদের শিক্ষার কাজ তদারকী করার জন্য আবু সুফিয়ান নামে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা করা হয়েছিল। সাম্রাজের দূরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সূরাগুলো শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক ঘোষনা করেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

খলিফা উমার (রা.) এর আমলে কুরআন বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও উচ্চারণ শেখানোর ওপর বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা-শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠে সহায়ক বিধায় উমার (রা.) ব্যাপকভাবে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ কুরআন শিক্ষাদান করতে পারবেনা।

তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য জয় করে আরবে ও আযমে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেন। তাঁর আমলে বিভিন্ন ভাষা থেকে আরবী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক অনুবাদের সূচনা করা হয়। তিনি বায়তুলমাল থেকে শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয় করেন।

ইসলামের মহান দানবীর উসমান (রা.) এর আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিহাসে ভাস্কর হয়ে থাকবে। বিশেষত কুরআন শরীফ নিয়ে যখন বিরাট সমস্যা দেখা দেয় তখন তিনি কুরআন শরীফ হিফাজতের জন্য মহানবী (স.) এর সংরক্ষিত পান্ডুলিপি যা হাফসা (রা.) এর নিকট ছিল, তা সংগ্রহ করে চিরদিনের জন্য সাজিয়ে সংকলন করেন আর অন্যান্য পান্ডুলিপি জ্বালিয়ে দেন। যাতে করে বনী ইসরাঈলের মত আসমানী কিতাবের কোন রকম পার্থক্য ও পরিবর্তন করার অবকাশ না থাকে।[৩] তিনি মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটান। তিনি পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন যার মধ্যে আজও মদীনা শরীফে মাদরাসা-ই-উসমান (রা.) তাঁর স্মৃতিবহন করছে।

তিনি মক্কা, মদীনা, কুফা বসরা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করেন এবং তথায় জ্ঞানী ব্যক্তিদের বক্তৃতা বিবৃতি ইত্যাদি মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের আয়োজন করেন। এ সময় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিষয় শিক্ষা দেয়া ছাড়াও কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা -১৯৮৬, পৃ-৫৬৯-৫৭০
২. তাহযীব আত-তাহযীব, ৪র্থ খন্ড, পৃ-.৩৫৬-..৫৮
৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪১

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে ব্যপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাঁর আমলে কাব্য চর্চা বেশ সমাদর লাভ করে। তখন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে কাব্য চর্চার আসর বসত এবং মাঝে মাঝে কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতা চলত।[১]

হযরত আলী (রা.)এর আমলঃ

হযরত আলী (রা.) এর নাম শিক্ষার ইতিহাস স্বার্ণক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি ছিলেন শরীয়তের বিধান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনার অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর খিলাফতের যুগটি গৃহবিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ ও নানা প্রকার অশান্তিতে ভরপুর হলেও তাঁরই সাধনার ফলে 'জামে মসিজদ' ইলম বা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠে। জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীগণ বহুদুর দূরান্ত; হতে কুফা নগরীতে আগমন করে তাদের জ্ঞানের অদম্য পিপাসা নিবারণ করত। কখনও কখনও ফজরের সালাতের পর আবার কখনও বা আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীগণ তাঁর সামনে এসে বসত। তিনি যাবতীয় কাজ ভুলে গিয়ে একাগ্র চিত্তে শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন, হাদীস ও তাফসীর শিক্ষাদান করতেন। তিনি আল-কুরআনে প্রতিটি শব্দ, বাক্যও সূরার ব্যাখ্যাদানে দক্ষ ছিলেন। তাঁর আমলে সর্বপ্রথম হাদীস সংকলণের কাজ শুরু হয়।

হযরত আলী (রা.) আরবী গদ্যের জনক ছিলেন। তাঁর হাতেই আরবী গদ্য রচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। শুধু তাই নয় তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিও ছিলেন। তাঁর রচিত 'দীওয়ান-ই-আলী' আরবী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।[২] দশম শতাব্দীতে শরীফ রাযী নামক এক ব্যক্তি আলী (রা.) এর কিছু ভাষণ, খুৎবা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে সংগ্রহ করে একটি পুস্তক সংকলিত করেন। এই পুস্তকটির নাম হলো 'নাহজুল বালাগা' এটি বিষয়ভিত্তিক বই নয়; এতে উপদেশে, খুৎবা বিচারের রায়, সাক্ষ্য, আইন, বেচা-কেনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সনস্তত্ব ইত্যাদি বিষয় রয়েছে।

দীনের মূল উৎস যে পবিত্র কুরআন এবং তার শিক্ষাই যে প্রকৃত শিক্ষা একথা সকলেই যে যুগে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। আমীরুল মু'মিনীন আলী(রা.) এসব কারণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআন শরীফের শিক্ষা প্রসারেরর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মসজিদে কুরআন শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ এর মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন উপায়ে তিনি কুরআন শিক্ষা গ্রহণের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতেন। যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত তিনি তাকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। তিনি দুই হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থীকে কুরআন শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করেছিলেন।[৩]

১.অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব ও এ.এস. এম আলাউদ্দীন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকাঃ ১৯৯৯, পৃ.২২

২. দীওয়ানা-ই-আলীঃ হাদীস, লুগাত ও আদবের কিতাবে হযরত আলী (রা.) এর যে সব কবিতা পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে সেগুলো তাঁর রচিত। বাকীগুলো সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য করা যায় না। আলী (রা.) এর দীওয়ানের প্রথম কবিতা সম্পর্কে 'আব্দুল কাদির জুরজানী বলেছেন, এটি মুহাম্মদ বিন রবী বিন রবী মুসীলী কর্তৃক রচিত। আসরারুল বালাগাহ, পৃ. ২১৪; সিয়ারে আনসার, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪১।

৩. প্রাগুক্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, পৃ. ৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর যুগে কুরআন শরীফের পদ্ধতিতে মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন তিনি আবুল আসওয়াদ আদ দু'আলী (রা.) এর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরই নেতৃত্বে আরবী ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন এবং এর নিরিখে বিরোধ সমাধান করেন। তিনি মদীনা ও মক্কা শরীফ ব্যতিরেকে কুফাতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সেখানে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কে শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত করেন। [১] যা মাদরাসা-ই-আলী (রা.) বলে খ্যাতি অর্জন করে। তায়েফে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) মদীনায় আবু হুরাইয়া (রা.) আয়িশা (রা.) ও মক্কা শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেণ। ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশের পথ তাদের দ্বারাই উম্মোচিত হয়।

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা: ১৯৮৬, ১ম খন্ড, ৫৭৯-৫৮১

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া আমলে শিক্ষাব্যবস্থা

এ সময়ে উমাইয়া বংশের খলিফাগণ বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় ও আভ্যন্তরীণ শাসনে বিশেষ মনোযোগদান এবং বিশৃঙ্খলা ও গোলমান দমনে ব্যস্ত থাক সত্ত্বেও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

উমাইয়া যুগে সাম্রাজ্যের মসজিদগুলো ছিল শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র। কুরআন হাদীসকে ভিত্তি করে এ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ সময় মক্কা, মাদীনা কুফা, বসরা এবং মিশর ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে।

উমাইয়া যুগে বহুসংখ্যক সাহাবা জীবিত ছিলেন। রাসুল (সা.) এর প্রত্যেক সাহাবাই ছিলেন জ্ঞানের মশাল ও হিদায়েতের আলোক বর্তিত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) (মৃ. ৬৮ মতান্তরে ৬৯ হিজরী) 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) (মৃ. ৭৪ হিজরী) যায়িদ ইবন সাবিত (রা.), আবূ হুরায়রা (রা), (মৃ.৫৭/৫৮/৫৯ হিজরী), আমর ইবনুল আস (রা.), আবূ সঈদ খুদরী (রা.) এবং আনাস ইবন মালেক (রা.) (মৃ. ১৭৯ হিজরী)। তাবিয়ীগণ এ সকল বড় বড় সাহাবার কাছে হতে ইসলামী জ্ঞানার্জন করে শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। তাবিয়ীদের মধ্যে যারা শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান গরিমায় বিশিষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে কাজী শুরাইহ, সাঈদ ইবন মুসাইয়িব, ইকরামা, নাফি, হাসান বসরী এবং ইব্রাহীম নাখয়ী (রা.) ছিলেন অন্যতম।

শিক্ষা জন্য গ্রামে গ্রামে এমনকি সম্ভ্রান্ত বাড়িতেও মক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোকে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বলা যায়। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এ ধরণের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কোন কোন স্থানে এ সকল বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হত। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ মক্তব প্রতিষ্ঠান করেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য মসজিদ সংলগ্ন স্থানে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হত। ইমাইয়া যুগের প্রথম দিকে সিরিয়অর 'বাদিয়া' নামক স্থানে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। উমায়িা-খলীফা আমীর উমরাহগণ শিক্ষক শিক্ষিকা রেখে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। গৃহ শিক্ষকগণ উত্ম চরিত্রের অধিকারী হতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা শিক্ষার্থীর ভাল-মন্দ নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করতেন।[২]

সার্থক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসারীদের সক্ষম করে তোলার জন্য মানব জীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত ইসলামে রয়েছে। মানুষের জীবনে অজ্ঞতা একটি বিরাট সমস্যা। জ্ঞান মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর পথে এগিয়ে নেয়, জ্ঞান মানুষের বিবেককে শাণিত করেঃ মানুষকে করে জাগ্রতঃ সমাজ জীবনকে করে সুন্দর ও সুশোভিত। তা যথার্থ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মানব জীবন যাতে সুখী ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সে জন্যই ইসলাম শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

---

১. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান সম্পাদিত, মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, রাজশাহীঃ সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড ১৯৮৯, পৃ. ৮৯।

২. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ এস এম আলাউদ্দিন, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ.২৫।

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়া যুগের শিক্ষা বিস্তৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। শিক্ষা কার্যক্রমের লালন ও সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।[১]

পবিত্র কুরআনের বিখ্যাত আটজন ক্বারীই ছিলেন উমাইয়া যুগের। এ যুগেই ফরাযদাক, জারীর ও আখতালের মত বিখ্যাত কবিরা বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ সময়ে নাহু সরফ শাস্ত্রের উৎপত্তি হয় এবং মুতাজিলাদের তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলনও এ যুগেই শুরু হয়। খলীল ইবন আহমাদ বাসরী 'ইলমে উরুজ এবং সায়বুরিয়া' আরবী ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন। এ ব্যবস্থাসহ সারা দেশে হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্বাসীয় যুগে ইসলামী শিক্ষা:

ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 'আব্বাসীয় যুগের অবদান অনন্য সাধারণ। মুসলিম শাসনামলের মধ্যে 'আব্বাসীয় যুগেই জ্ঞানানুশীল এবং শিল্প সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সর্বাধিক হয়েছিল। এ করণে ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন। উমাইয়া খলিফাগণ দেশ জয়ের কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে তারা শিক্ষার দিকে তেমন নজর দিতে পারেননি। 'আব্বাসীয় খলিফাগণ দেশ বিজয়াভিযান পরিত্যাগ করে জ্ঞান আহরণের সুদূরপ্রসারী অভিযান শুরু করেন।[২] তাদের পৃষ্ঠপোষকতার এ সময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তারা ধ্বংস ও বিলুপ্ত প্রায় ইরাক, মিশর, পারস্য ও গ্রীসের প্রাচীন সাহিত্য সভ্যতা ও কৃষ্টিকে শুধু রক্ষাই করেননি, বরং তাকে জীবনীশক্তি দান করে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলেন। এ সময়ে মুসলমানদের জ্ঞান চর্চার স্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, তাঁরা প্রাচীন গ্রীক, মিশরীয় এমনকি ভারতীয়দের নিকট হতে জ্ঞান আহরণ করতে সংকোচনবোধ করতেন না। এ যুগে 'আব্বাসীয় খলিফাগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতার মুসলিম পণ্ডিতগণ চিকিৎসা, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, ফলিত, জ্যোতিষ্ক শাস্ত্র, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা চালিয়ে বহু নতুন নতুন দিক আবিষ্কার করে মানবীয় জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করেন।[৩]

শিক্ষার স্তর বিন্যাস:

'আব্বাসীয় যুগে মুসলমানদের শিক্ষার দু'টি স্তর ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। এসকল বিদ্যালয় মসজিদ ও ব্যক্তিগত গৃহে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া অনেক মক্তব ছিল যেগুলোর মান ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত।

---

১. ইলমে কির'আতের আটজন খ্যাতনামা ইমাম: নাফে ইবন কাসীর, আবু আমর, ইবন আমের, আসেম, হামজা, আল কিসায়ী ও ইয়াকুব হাদরামী। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তাদের সংখ্যা সাতজন এবং ইলম কিরআতে সাতটি প্রসিদ্ধ পঠন পদ্ধতি তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তারা ইয়াকুব হাদরামীর নাম উল্লেখ করেন নি। (বি:দ্র: বায়যাবী, তাফসীরে বায়যাবী, ঢাকা: দি হলি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ৮

২. পি.কে. হিট্টি, আরব জাতির ইতিহাস, কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ৪৬৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১

স্কুলের পাঠ্য তালিকা:

পঠন, লিখন, ব্যাকরণ, হাদীস, প্রাথমিক গণিত, কিছু ভাবমুলক কবিতা পাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত ছিল। এ সময় মুখস্ত করার উপর বেশি জোর দেয়া হত। উচ্চ শ্রেণির ছাত্ররা কুরআনের ব্যাখ্যা ও গবেষণামূলক সমালোচনা, রাসূল (স.) এর হাদীসের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা, আইন শাস্ত্র, ধর্ম তত্ত্ব, ছন্দ ও সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করত। উচ্চ স্তরের শিক্ষার্থীগণ জ্যোতিস্কশাস্ত্র দর্শন ও সঙ্গীতবিদ্যা অধ্যয়ন করত।[১]

শিশু শ্রেণিতে সহশিক্ষা:

'আব্বাসীয় আমলে গৃহেই শিশুদের শিক্ষা শুরু হত। ছয় বছর বয়সে বালক-বালিকারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হত। হযরত ইমাম গাযযালী (রা.) এর মত মনীষীগণও ছয় বছর বয়সে অধ্যয়ন শুরু করেন। বালিকারা কুরআন শরীফ পাঠ ও ইসলামী জ্ঞান আহরণ করত। যেসব লোক অধ্যয়নের মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করত, তারা শিক্ষাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করত।[২]

গৃহ শিক্ষক নিয়োগ:

'আব্বাসীয় যুগে গৃহ শিক্ষক নিয়োগের প্রথা চালু ছিল। সমাজের ধনাঢ্য লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন খালদুনের এক বর্ণনা থেকে 'আমরাহ' নামক এক বিখ্যাত মহিলার কথা জানা যায় যিনি তার নিজ গৃহকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতেন।

যে যুগে শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ধনাঢ্য দরিদ্র সকলেই শিক্ষা লাভে সমর্থ ছিল। শিক্ষার ব্যয় খুবই স্বল্প হওয়ার কারণে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাও শিক্ষার আলো লাভে সমর্থ হত। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দাসগণও স্কুলে ভর্তি হতে পারত।[৩]

শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থান ও বেতন ভাতা:

শিক্ষকগণ যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। শিক্ষকগণ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। যে সকল শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন তাদের 'মুয়াল্লিম' বলা হত। ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন কোন সময় তাদেরকে 'ফকীহ' বলা হত। মুয়াল্লিমদের সামাজিক মর্যাদা অন্যান্যদের চেয়ে নিম্নমানের ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষকগণকে বলা হত 'মুয়াদ্দিব'। এ শ্রেণির শিক্ষকগণ সমাজের মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তারা খলিফার সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

তৃতীয় শ্রেণিতে ছিলেন অধ্যাপকবৃন্দ। তারা উচ্চ শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। ন্যায়, শাস্ত্র, গণিত, ছন্দ ও আইনশাস্ত্র শিক্ষাদানে নিযুক্ত অধ্যাপকগণকে জনসাধারণ খুবই শ্রদ্ধা করত। অধ্যাপকবৃন্দ নিজ নিজ বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[৪]

---

১. অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, শিক্ষার ইতিহাস, রহমান আর্ট প্রেস, ঢাকা-১৯৮০, পৃ.৪৯

২. পি.কে.হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.

৪. পি.কে.হিট্টি, পৃ.৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমদিকে শিক্ষকদের বেতন খুব কম ছিল। অনেকে নিয়মিত বেতন পেতেন না। সাধারণ শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকগণ যে বেতন পেতেন, তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম হওয়ায় তারা জীবিকা নির্বাহের খাতিরে রোজগারের জন্য অন্য কিছু করতেন। কবিতা ও গুনকীর্তন বাচক গীতি রচনাই ছিল আয়ের সবচেয়ে সহজ উপায়। খলিফাদের অনেক বেতনভোগী স্তুতি রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু যার উপর শাহজাদাদের শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত হত, তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান। কালক্রমে শিক্ষকদের বেতন নিয়মিত হয়ে ওঠে এবং সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পায়। তাঁদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক ১৫ দিনারে দাঁড়ায়।[১] শিক্ষক ও ছাত্ররা মসজিদ, পবিত্র স্থান, হাসপাতালের আয় এবং ধনী সম্প্রদায়ের চাঁদা হতে সাহায্য লাভ করতেন। তাদের কেউ কেউ সরকারি কোষাগার থেকেও ভাতা পেতেন।

পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের পর পনের বছর বয়স্ক ছাত্ররা সাধারণত উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে যেত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা অনুসরণের কোন ধরা বাধা নিয়ম ছিল না। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক খোদা বখস বলেন, 'নিয়মিত কোন শিক্ষা পদ্ধতি কিংবা নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যতালিকা ছিল না। প্রত্যেক শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যতালিকা ছিল। শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার থাকলেও শিক্ষা পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীণতা শিক্ষকগণ ভোগ করতেন।

শাসক গোষ্ঠীর গদী ও ধর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদাপন্ন হত না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা শিক্ষকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক নির্দিষ্ট কোন ছুটি ছিল না। পাঠ্যপুস্তক অধ্যায় শেষ না হলে সাধারণত ছুটি দেয়া হত না।[২]

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

'আব্বাসীয় যুগে শিক্ষা কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। খলিফা আল মামুন উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর রাজধানীতে বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অনুবাদ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্র ও সাধারণ পাঠাগার হিসেবে কাজ করত। এর সাথে একটি মসজিদও যুক্ত ছিল। এই কলেজের অধ্যক্ষ সালামকে খলিফা গ্রীক ভাষায় মূল্যবান গ্রন্থসমূহ আরবীতে অনুবাদ করার জন্য গ্রীসে পাঠিয়েছিলেন।

বায়তুল হিকমাহ ও নিযামিয়া মাদ্রাসা:

বায়তুল হিকমাহ মধ্যযুগ ও আধুনিক বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব দাবী করতে পারে। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্যারিস, অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজের বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছিল। বায়তুল হিকমার সাথে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। এ গ্রন্থাগারিক ছিলেন আল খারিযমী, তিনি একজন বিখ্যাত অংক শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। আত তাবারী, মাসউদী ও ইয়াকুবীর মত অনেক পণ্ডিত ও মনীষী বাগদাদের এ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন। সর্ব সাধারণের মধ্যে জ্ঞান চর্চা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বাগদাদে সে সময় একশত গ্রন্থ বিপণী হতে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ বিক্রয় হত।[৩]

---

১. পি.কে.হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২
২. পি.কে.হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২
৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেলজুক সুলতান আলাপ আর সালান ও মালিক শাহের আমলে প্রখ্যাত মন্ত্রী নিজামুল মূলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নিযামিয়া' ছিল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ নিযামিয়াই পরবর্তীকালে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে নিযামুল মূলকই প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন ছিল যে, জনসাধারণ ইচ্ছা করলে বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেত। নিযামুল মূলক একটি ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সরকারি আনুকূল্যে অনেক মাদ্রাসা-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অভিজ্ঞ, উচ্চ শিক্ষিত ও যোগ্যতা দার্শনিক ইমাম গাযালীও (১০১৯-৯৫) দীর্ঘ চার বছর নিযামিয়ার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১]

---

১. ঐ, পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মহানবী (স.) এর শিক্ষাব্যবস্থায় নারী সমাজের অবস্থান

* ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ

* নারী শিক্ষায় মহানবী (স.)

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) এর শিক্ষাব্যবস্থায় নারী সমাজের অবস্থান

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষঃ

কোন ব্যক্তির প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক ও সহজাত প্রকৃতির কতগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে তা যদি অস্বীকার করা হয় তাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান মানবতা ও সাধারণ গুণাবলিগুলো অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির স্বাধীনতা, কাজ ও চিন্তার স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, বিচার ও আইনগত স্বাধীনতা। কোন মানুষকেই তার গায়ের রং, স্ত্রী-পরুষ ভেদে, সামাজিক অবস্থান, জাতীয়তা ও জ্ঞানগত অবস্থার জন্য এসব অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবেনা, সাদা-কালো, নারী-পুরুষ, রাজা-প্রজা, প্রাচ্য-পশ্চাত্য, শহুরে-গ্রাম্য অথবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাইকে এ অধিকার ভোগ করার সুযোগ দিতে হবে। এভাবে প্রাচীন সভ্যতায় দেখ যায় যে, সমাজে বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য। এদের জন্য মালিকানা, স্বাধীনতা, শিক্ষা, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রাধান্যও বিবেচনা করা হত। ঐ সব সভ্যতায় নারীকে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে অথবা দাসী হিসেবেই রাখাত হত। পুরুষদের জন্য ইহকার ও পরকালে বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত ছিল। মূলতঃ এর সবগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বিপরীত।[১]

ইসলাম মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে বরাবরই নারী ও পুরুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। এটা উভয়ের জন্য শুধুমাত্র মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং সম অধিকার ও সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়তসমূহ এ সত্যেরই স্বীকৃতি প্রদানকরে যেমন-"হে মানুষ! তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তর জুড়ি তৈরী করেছেন। আর এ উভয় হতে বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[২]

"হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হতে দৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠি বানিয়ে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তু আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন।"[৩]

"আমি তোমাদের মধ্যে কারও কাজকে বিনষ্ট করে দিব না, পুরুষ হোক কি স্ত্রী তোমরা সকলেই সমজাতের লোক"।[৪]

"ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে-অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুঃ কেননা তারা পরস্পরকে সুকৃতির জন্য আদেশ করে দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখে; আর তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং এসবের মাধ্যমে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) এর আনুগত্য করে। এসব লোকদের প্রতিই আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন।"[৫]

---

১. মোহাম্মদী তাকী মেসবাহ, 'ইসলামে নারীর মর্যাদা, ইসলামী প্রজাতন্ত, ইরানের সাংকৃতিক কেন্দ্র, ধানমন্ডি, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ১৫
২. আল-কুরআন, ৪:১
৩. আল-কুরআন, ৪৯:১৩
৪. আল-কুরআন, ৩:১৯৫
৫. আল-কুরআন, ৯:৭১

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয়ই মুসলামান পুরুষ ও মুসলামন নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজ পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহর সঠিক জিকিরকারী পুরুষ ও নারীর জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।"[১]

"হে ঈমানদার লোকেরা! না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তিদের বিদ্রুপ করতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভাল হবে। আর না মহিলারা অন্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে- হতে পারে যে, সে তাদের ছেয়ে উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিস্পাত কর না, না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে।"[২]

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৩]

"তারা তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পরিচ্ছদ বিশেষ।"[৪]

"পুরুষদের জন্য সে ধন সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন এবং স্ত্রীলোকদের জন্যও সে ধন সম্পদে অংশ রয়েছে, যা মা-বাবা ও আত্মীয় স্বজন রেখে যায়।"[৫]

"যা পুরুষরা অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে, তদানুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট।"[৬]

"ব্যভিচারি নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশাসী হয়ে থাক।"[৭]

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে। ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।"[৮]

"যে পুরুষ এবং নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের শাস্তি হিসাবে। এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষে থেকে।"

এ আয়াতগুলো উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হল, নারী-পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত। এ ছাড়া শত শত আয়াত রয়েছে যেগুলোতে সম্বোধনকরা হয়েছে, "ওহে মানব জাতি" অথবা "হে বিশ্বাসীগণ" আর এ সমস্ত আয়াত নারী-পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। উপরোক্ত আয়াতসমূহে সংক্ষেপে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলঃ নারী ও পুরুষ উভয়ই মানুষ, প্রত্যেককে ইসলামের

---

১. আল-কুরআন, ১৬:৩৫
২. আল-কুরআন, ৪৯:১১
৩. আল-কুরআন, ৩০:১৪
৪. আল-কুরআন, ২:১৮৭
৫. আল-কুরআন, ৪:৭
৬. আল-কুরআন, ৪:৩২
৭. আল-কুরআন, ২৪:২
৮. আল-কুরআন, ২৪:৩০-৩১
৯. আল-কুরআন, ৫:৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণ করতে ও যথা বিশ্বাসী ও অনুগত হতে বলা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষে হতে দুনিয়ার জীবনের কর্মফলের ভিত্তিতে উভয়কেই জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করা হয়েছে। উভয়ের প্রতি একই দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়েছে, যেমন-নামাজ, রোজা পালন, যাকাত প্রদান, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ। তাদের উন্নত মর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে তাকওয়া পরহেজগারীর ভিত্তিতে। উভয়ের নিকট হতে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, মহত্ব, সত্যবাদিতা, দারিদ্র্যের সহায়তা ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলী প্রত্যাশিত। প্রত্যেককে নৈতিক পবিত্রতা ও দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অশ্লীল কার্যক্রম, পরনিন্দা, বিরূপ উপহাসের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী। সম্পদ উপার্জন ও ব্যবহারের অধিকার উভয়কেই দেয়া হয়েছে। পিতা-মাতা উভয়ই পরম শ্রদ্ধেয়। নারী-পুরুষ উভয়েই নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী আর এগুলোর কোনটাই জওয়অবদিহিবিহীন থাকবে না। আইনের দৃষ্টিতে উভয়ের মর্যাদা সমান, অপরাধের জন্য উভয়কেই শাস্তি পেতে হবে। সর্বশেষে বলা যায়, যদি কোন ক্ষেত্রে নারী আইনানুগভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকে তাহলে আইনই অন্য ক্ষেত্রে সে ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থা করেছে।

কুরআনে কোন কোন আয়াতে স্বতন্ত্রভাবে নারীর অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে এবং পুরুষকে সে সীমা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীর প্রতি যে নির্যাতন চালানো হত কুরআন তার কঠোর সমালোচনা করেছে। উদাহরনস্বরূপ: একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে কন্যা শিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে মারার ঘটনার তিরস্কার করা হয়েছে-

"যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছিল?"[১]

এছাড়া কুরআন ধর্মীয় ইতিহাসের কতিপয় সুপরিচিত মহিলা সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং বর্ণনা করেছে তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ও বিভাগ। কুরআনে বর্ণিত এ ধরণের মহিলার সংখ্যা হচেছ ১২জন। এমনকি কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুন্ নিসা অর্থাৎ নারীদের সূরা। আর এ সূরায় নারী জাতির মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নারী-পুরুষের সমতা নিরূপণে দৃষ্টিভঙ্গি নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

নারী শিক্ষায় মহানবী(স.)ঃ

ইসলামে নারীর সার্বিক মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ সমাজে তাদের জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা গ্রহণের পথ সুপ্রশস্ত হয়েছে। কেনান, ইসলামই সকল নর-নারীর উপর একমাত্র অর্জন বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলামের প্রথম পর্যায় কঠোর পর্দা প্রথার প্রচলন থাকলেও মক্তবগুলোতে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা সুযোগ ছিল। ফলে মেয়েরাও মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে পারত। সে সময় একই সঙ্গে নারী-পুরুষ মসজিদে নামায আদায় করার ব্যবস্থা ছিল। ইসলামের এই উদারনীতির ফলে হযরত মুহাম্মদ (স.) হতে সমগ্র মধ্যযুগ পর্যন্ত সমসাময়িককালে নারী শিক্ষার প্রভূত উন্নতিসাধিত হয়। অনেক জ্ঞান সাধনায় ও সৃজনশীল প্রতিভায় অসামান্য কৃতিত্ব স্বরূপ অনেকেদ পন্ডিত ও কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। পরবর্তীকালে পর্দা প্রথা কঠোর অনুসরণ ও

---

১. আল-কুরআন, সূরা তাকভীর ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

সমাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে নারী শিক্ষার সুযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত ও সীমিত হয়ে পড়ে। তথাপি তৎকালীন সমাজে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা মেয়েদের শিক্ষার জন্য অন্দরমহলে গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলামের সাম্যের বাণী প্রচার করে নারী জাতির দূর্দশা দুর করে নারী ও পুরুষকে সমমর্যাদা দানকরেন এবং নারীদেরকে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সমাজে নারী পুরুষদের বৈষম্য দূর করেন।

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা ইসলামের পাঁচটি ধর্মীয় উপদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল কুরআন পাঠ করা, কুরআন সম্পর্কে জানা প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের অবশ্যই পালনীয় হল এর বাণী অন্যদের কাছে পৌছানো এবং সর্বোপরি কুরআনের অনুলিপি তৈরী করে অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করা। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, খুব শীঘ্রই সমাজে বহু লেখকের সৃষ্টি হল এবং কুরআনের হাজর হাজার কপি তৈরী হয়। পবিত্র কুরআনের বাণী অন্যের কাছে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ার ফলে প্রয়োজন হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জ্ঞানী সমাজ বা জ্ঞানী উলামার। হযরত ওমর (রা.) কুফা, বসরা ও দামেস্কে তৈরী করলেন মসজিদ তথা ইসলামে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মোহাম্মদ আলী The Religion of Islam গ্রন্থে লিখেছেন, "মুসলমানদের প্রথম এবং প্রধান লিখিত সাহিত্য এবং ইসলামী সভ্যতার প্রাথমিক বুণিয়াদ।"[১] এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হল জ্ঞানী উলেমা কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য। ক্রমান্বয়ে মক্তব্য, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যুক্ত হল মসজিদের (প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) সঙ্গে। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একত্রিত হল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এবং পর্যায়ক্রমে উদ্ভব হল স্থায়ী আরবী সাহিত্য । ক্রমান্বয়ে মানুষের মধ্যে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বাড়তে থাকল। আর এর উপর ভিত্তি করে জনসন এবং হ্যারিস বলেছেন, "সামরিক শাক্তিতে ইসলাম প্রধানত বিস্তার লাভ করলেও কোন কোন মুসলিম নেতা মনে করতেন যে, কুরআন ছাড়া আর কোন বইয়ের দরকার নেই, তবু সার্বিক বিচারে ইসলামী দুনিয়া পুস্তকপ্রিয় সমাজ বলে পরিচিত ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে বইয়ের এত উঁচু সমাদর বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।"[২] এ সম্পর্কে মোঃ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম লিখেছেন, "ইসলামে শিক্ষার অর্থ, লক্ষ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্যা বাণী রয়েছে। যা সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম ও উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করছে।"[৩]

নর-নারী উভয়েরেই বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞার্নাজনের অধিকার অবশ্যই আছে। তারা উভয়েই আদি নর হযরত আদম (আ.) ও আদি নারী হযরত (আ.) এর বংশধর। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন যা মানুষের সকল কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখেই জগতিক উন্নতি ও কল্যাণ অর্জনের জন্য সে বিদ্যা ও জ্ঞান ওই আদি নর নারীকে দেয়া হয়েছিল। তার উপর ভিত্তি

---

১. Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam: a Comprehensive Discussion of the sources, Principles and Practices of Islam, 1950, P.17.
২. Johnson, E.D. and Harris: M.H History of Libraries in the Western World, 3rd Edn. Metuchen Scarecrow Press, 1976, P.84.
৩. মোঃ আজহার আলী, শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাবু বাজার, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ.১

করে চিন্তা, গবেষণা ও অনুশীলনের দ্বারা উত্তম জ্ঞান বুদ্ধিকে উত্তম কাজে লাগানোর স্বত্বাধিকার উভয়েরই আছে। বিদ্যা ও জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এমনকি এটা ছাড়া মানুষ স্বীয় ধর্মও সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। তাই উত্তম বিদ্যা ও জ্ঞানের বিষয় যদি সুদূর কোন দেশেও থাকে, তবে সেখানে গিয়ে হলেও তা অর্জন করার তাকীদ রয়েছে। বিদ্যা ও জ্ঞান ছাড়া কোন মানুষই উন্নতি করতে পারে না। সাধারণতঃ কৃষ্টি হতে মানুষ যা অবগত হয়, সে অবগতি যতটুকু হৃদয়ে স্থান দখল করে রাখে, তাই জ্ঞান বলে অভিহিত হয়।[১] আর দীনের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ দীনের ইলম যারা হাসিল করেনি তাদের আমলও সঠিক নয়।"[২]

পরকালে নিজেদের জীবনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য ইলমে দীন শিক্ষা করা ফরয। কেননা কেবল নিজেদের জন্য হলেও ইসলামী আহকাম ও আরকান প্রত্যেক নর-নারীর জন্য শিক্ষা করা দরকার। যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আহকাম পালনে নারী-পুরুষ কোনরূপ ভেদাভেদ করা হয়নি। অতএব এই সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য 'ফরয-ই-আইন।'

কুরআন ও হাদীসে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সমস্ত বিশ্ব যখন অশিক্ষা, কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার তিমিরে নিমগ্ন ছিল, ইসলাম সে সময়ে জ্ঞান চর্চাকে মানব জাতির জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে। জ্ঞান ছাড়া ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা আসে না। ইসলাম নারীকে শুধু অধিকার নয়, অগ্রাধিকার দিয়েছে। নারীকে আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য হিসেবেই দৈহিক বিকাশের পাশাপাশি তার বিবেকী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের উপর ইসলাম এমন গুরুত্ব দিয়েছে।[৩]

শিক্ষা গ্রহণ সকল নর-নারীর অবশ্যই কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েরাও অধ্যয়ন করতেন। মসজিদে স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে নামাজ পড়তেন। পরে অবশ্য বিভিন্ন যুক্তি সঙ্গত পর্দাপথা হয়। তখনও অবস্থাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন।[৪]

অজ্ঞতার যুগে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হত। তাই লেখাপড়া শেখানো ছিল কল্পনাতীত। হযরত মুহাম্মদ (স.) নবুওয়াত লাভের পর সর্বপ্রথম আরব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার শোচনীয় রূপ তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। সমাজে ন্যায়পরায়ণতার অভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি সমাজের শান্তি সমূলে বিনষ্ট করেছিল। সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে মনে করা হত। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর অনুপম দরদী মন মানুষের এই শোচনীয় অবস্থায় ব্যাকুল হয়ে উঠে।

---

১. মোঃ আবদুল গণি, নারীদের শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানার্জনের জন্য যথাযথ পরিবেশের প্রয়োজন, মাসিক মদীনা, আক্টোবর ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ২৮

২. বাংলাদেশ মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩. মোহাম্মদ কুতুব, মুহাম্মদ, ইসলাম ও নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৮, পৃ. ২৩

৪. শিক্ষার ইতিহাস, খান বাহাদুর আহছান উল্লা টিটি কলেজ, ঢাকা, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মানুষের জন্য মুক্তির পথ খুঁজতে শুরু করেন। দীর্ঘ পনের বছর হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। সেখানেই মানুষের জন্য মুক্তির পথের সন্ধান পান।[১] মানুষের জন্য এই মুক্তির পথই 'ইসলাম'। নবী করীম (স.) মানুষের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য বা ভেদের প্রাচীরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে আমাদের নবী যে সাম্যের বাণী মানুষের মাঝে পৌছিয়েছেন, তাতে নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষকে সমাজে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। সমাজের এক অংশকে বাদ দিয়ে অন্য অংশ কোনদিনই উন্নত হতে পারে না এ সত্য মানুষ অনুধাবন করতে শুরু করে। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইহ জীবনকালে মানুষের মাঝে সত্যের এই উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করে গেছেন। জিহাদ, সমাজসেবা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী জাতির অংশগ্রহণ সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার উদাহরণ তিনি দেখতে পান। এখানেই ইসলামের সার্থকতা আমাদের নবী করীম (স.) এর বিরাট বিজয়। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র সুশিক্ষা ও অনুপ্রেরণায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামের সূচনা থেকেই বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করে মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়েই আরব সমাজে সম্মানিত স্থান দখল করেন।[২]

সমস্ত বিশ্ব যখন অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার তিমিরে নিমগ্ন ছিল মহানবী (স.) এমন সময়ে জ্ঞানচর্চাকে মানব জাতির জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি সত্তার পূর্ণতা আসে না। এ পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে মহানবী (স.) শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন।[৩]

মহানবী (স.) নারী পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরয বলে ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। মহিলাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের মাঠে দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।[৪]

---

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, ''আল্লাহর তরফ হতে রাসূলে করীম (স.) এর প্রতি ওয়াহয়ি প্রেরণের সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের আকারে। তিনি যে স্বপ্ন দর্শন করতেন তা ছিল প্রত্যুষের বিকীর্ণ আলোকের ধারার ন্যায় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। ইহার পর তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি হেরা গুহায় নির্জন সাধনায় আত্ম সমাহিত হতেন, গুহা হতে স্বীয় গৃহে আসতেন; আহার্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে আবার হেরা গুহায় নির্জন সাধনায় আত্ম সমাহিত হতেন, গুহা হতে স্বীয় গৃহে আসতেন; আহার্য বস্তু সঙ্গে নিয়ে আবার হেরা গুহায় গমন করতেন। রাসূল তখন হেরা গুহায়। ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.) আবির্ভূত হলেন। বললেন, 'পড়ুন'। হযরত (স.) বললেন, ''আমি তো পড়তে জানি না।'' রাসূলে করীম (স.) স্বয়ং তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বললেন, ''জিব্রাঈল (আ.) আমাকে তাঁর দিকে টেনে নিলেন এবং আমাকে তাঁর আলিঙ্গণে আবদ্ধ করে তাঁর দেহের সাথে জোরে চাপ দিলেন। এত জোরে চাপ দিলেন যে, আমি ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হয়ে পড়লাম। তিনি তখন আমাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে বললেন, ''এখন পড়ুন''। ''আমি তো পড়তে জানিনা''। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে বহু বেষ্টনে চেপে ধরলেন। সেই চাপে আমি পুনঃ ঘর্মাক্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলে বললেন, ''এখন পড়ুন''। ''আমি তো পড়তে জানি না''। এরপর তিনি তৃতীয়বার তাঁর বাহু বেষ্টন হতে মুক্ত করে এই পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন, ''অর্থাৎ 'পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পাঠ কর, বস্তুত তোমার প্রতিপালক প্রভু হচ্ছেন অতীব দয়ালু, অত্যন্ত করুণাময়, যিনি শিক্ষা দেন কলমের দ্বারা। মানুষকে তাই শিক্ষা দেন যা সে জানেনা।''

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১০
২. ড. মো: আযহার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৩. মুহাম্মদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৪. ড. মো: আযহার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। শুধু আযাদ মহিলাই নয় ঘরের দাসী-বাঁদীরাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকেনি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, উত্তম চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (স.), কেউ যদি দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দু'জনের জন্য এরূপ করলেও হবে।[১] যে যুগের শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) এর নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[২] তিনি কুরআন-হাদীস, ইসলামী আই প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আটজন সাহাবা সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) তৃতীয়া। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'আসমাউর রিজাল'[৩] নামক গ্রন্থগুলোতে মহানবী (স.) এর লক্ষাধিক সহাবার মধ্যে এক হাজার সাহাবার জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৫০ মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।[৪]

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি মহানবী (স.) নারী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই। এমনকি দাসীদেরকেও শিক্ষা দান করার জন্য মহানবী (স.) আদেশ করেছেন।[৫]

রাসূলে করীম (স.) এর সময়ে যে সমস্ত জ্ঞান চর্চার মজলিসে অনুষ্ঠিত হত মহিলারা অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তার উপকার লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এ সব মজলিসে তাঁদের উপস্থিতি হওয়ার উদ্দেশ্য। অনেক মহিলা ছিলেন, যাঁরা রাসূল (স.) এর মুখে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্ত করে ফেলতেন। কোন সময় যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা তাঁর কথা ঠিকমত শুনতে পাননি, তা হলে একবার বলা কথা তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন।

---

১. আল-হাদীস, শরহুস সুন্নাহ।
২. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ইসলামী জ্ঞানে ছিলেন অদ্বিতীয়া। এমনকি প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। হযরত উরওয়া বলেন, তাঁর মত অধিক কবিতা মুখস্তকারী আমি আরবে আর কাউকে দেখিনি। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে দ্বিতীয়া। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০। (আসমাউর রিজাল, আল-বারাকা লাইব্রেরি, পৃ. ২২-২৩)
৩. একে ইলমুর রিজালির হাদীস বলা হয়। অর্থাৎ "হাদীস গ্রহণ বা বর্জন করার দিক থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া।" বর্ণনাকারীদের অবস্থা দ্বারা বলা হচ্ছে তাঁদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ, তাঁদের নাম, উপনাম, উপাধি, বংশ, দেশ, সফর, উস্তাদ ও ছাত্র সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তাঁদের বিশ্বস্ততা-অবিশ্বস্ত তা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়া।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৫. আল-হাদীস বুখারী, কিতাবুল ইলম, মাকতাবা-ই-রাশিদিয়া, দিল্লী, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মহিলাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মানে না হলে রাসূলে করীম (স.) তাঁদের জন্য অনেক সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। মহিলারাই একবার রাসূলে করীম (স.) এর নিকট আবেদন করলেন ও দাবী জানালেন এই বলে যে, "পুরুষেরা আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার বিষয়ে আমাদের উপর অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কাজেই আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাঁদেরকে একটা দিনের ওয়াদা করেন। সেই দিনে তিনি তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে উপদেশ ও আদেশ দিতেন।[১]

আবু দাউদ একখানা হাদীসে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (স.) এর স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.) জনৈক মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন।[২]

বালাযুরী বলেন, আবদুল্লাহর কন্যা আল শাফিয়া ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছেন।[৩] তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিক কালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন।[৪] মহানবী (স.) এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ২২১০ খান হাদীস মুখস্ত করেছিলেন।[৫] তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষায়িত্রী ছিলেন এবং বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরি মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে "আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোন সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম লাভ করেছি।"[৬]

অপর একজন আয়েশা যিনি সাদের কন্যা ছিলেন, তিনি তাঁর পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।[৭]

মহিলাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমতঃ পিতামাতা ও স্বামীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স.) এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই, অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সাথে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদের আদেশ কর।"[৮]

আল-কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষভাবে ঘরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী করীম (স.) পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের মহিলারা দীন সম্পর্কে জরুরি জ্ঞান লাভ করুক রাসূল (স.) এর এই ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল অনিবার্যভাবে।

---

১. আল-হাদীস, সহীহ্ আল-বুখারী ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০
২. আবু দাউদ, সুনান (কি. তিব্ব) ইসলামী কুতুবখানা, দেওবন্দ, পৃ. ১৮০
৩. বালাযুরী, ফতহুল বুলদান, ১ম সং, কায়রো, পৃ. ৪৭২
৪ আল্লামা শিবলী, সিরাতুন্নবী (উর্দু টেক্সট), ২য় খণ্ড, আজমগড়, ১৩৭৫ হিজরী, পৃ. ৪০৯
৫. মুফতী আমীমুল আহসান, তারিখুল ইলমুল হাদীস, মুফতি মঞ্জিল, ঢাকা, পৃ. ২১
৬. আল-হাদীস, মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৫৩৪
৭. Tuta Khalil, The Contribution of the Arabs to Education, New York, 1926, P. 79
৮. আবদুর রহীম, মুহাম্মদ, নারী, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৮৮ইং, পৃ. ৫০-৫১

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরি দ্বীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে, তাহলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভ করার সুযোগ মহিলাদের দিতে হবে, এই হচ্ছে ইসলামী আইনের বিধান। দ্বীনি জ্ঞান লাভের জন্য নারীকে সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নব নব সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী সমাজের কর্তব্য।[১]

মহানবী (স.) নারীর জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেননি। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, "যারা জ্ঞানী ও বিদ্বান তারা বলেন, আমরা উহার (কুরআন) প্রতি ঈমান এনেছি এবং সত্য কথা এই যে, জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই কেবল কোন জিনিস (এখানে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে) হতে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।"[২] সুতরাং আল্লাহর বাণী কুরআনকে বুঝবার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এখানে মহানবী (স.) নারী পুরুষের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স.) নারী শিক্ষার উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন।"

মহানবী (স.) এর পুণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিতা ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো বাকি মুসলিম মহিলাদের আন্তরকে আলোকিত করে। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[৩]

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর তিরোধানের পর তাঁর অনুসারীগণ, ইসলামের খলীফাগণও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরান্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাঁদের কর্তব্য পালনের ব্রত গ্রহণ করেন।[৪]

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী হয়ে কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তরকারাজি তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাঁদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীরাও শিক্ষিতা হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।[৫]

---

১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২
২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত-৭
৩. ফজলুর রহমান খান, ইসলামে শিক্ষা ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ, ১ম সং, জানুয়ারি ১৯৯২, ৪২/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা, পৃ. ৮১
৪. ড. মোঃ আযহার আলী, শিক্ষার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৫. ফজলুর রহমান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতির ক্ষেত্রে আরব জাহানে ইসলামের অনেক প্রতিভাবতী মহিলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) অন্যতম। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ও ফারূকে আযম (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) এর সিদ্ধান্তকে হযরত উমর (রা.) অনুমোদন করতেন। তিনি অধিকাংশ সরকারি কেনাকাটা কাজের দায়িত্ব হযরত শিফা (রা.) কে দেন।[১]

পবিত্র কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও মহানবী (স.) এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সমস্ত মহিলা সাহাবী (রা.) দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফিকহ বিদ্যায় হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে যা একত্রিত করলে কয়েকখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে।[২]

হযরত উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহ একত্রিত করলেও একখানা পুস্তক হতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.) ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস, ফিক্হ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।

হিন্দু বিনতে উবায়েদ, উম্মে হিমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সাদ ইবনে রবী (রা.) প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশির ভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআন পাক দরস দিতেন। সহীহ্ মুসলিমের শেষাংশে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৩]

এতদ্ব্যতীত হযরত উম্মে সালমা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত সাফিয়া (রা.), হযরত হাবিবা (রা.), জাওয়াইয়েরা (রা.), হযরতময়মুনা (রা.), হযরত ফাতিমা যোহরা (রা.) এবং উম্মে শুরাইয়া (রা.), উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, লায়লা বিনতে কায়েস, খাওলা বিনতে তবীব, উম্মে দারদা, আতিকা বিনতে যায়দ, সাহলা বিনতে সুহাইল, ফাতিমা বিনতে কায়েস, যায়নাব বিনতে আবু সালমা, উম্মে আয়মন, উম্মে ইউসুফ (রা.) প্রমুখ যথাক্রমে পুণ্যশীলা মুসলিম জননীগণ, খাতুনে জান্নাত এবং মহিলা সাহাবীগণও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা একত্রিত করলে কয়েকখানা সুবৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) ইলমে মারিফাত সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। মজলিসে বয়ান ও বক্তৃতায় আসমা বিনতে সাকান (রা.) যশস্বী ছিলেন।

---

১. শিফা বিনতে আবদুল্লাহ রাসূল (স.) এর বিশিষ্ট সাহবিয়াদের অন্যতম। তিনি কুরায়েশদের আদি খান্দানের উজ্জ্বল রত্ন। ইমাম আহমদ বিন সালেহ মিসরী বলেছেন, তাঁর প্রকৃত নাম লায়লা, এটি তাঁর উপাধি। হিজরতের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি বিশিষ্ট বুদ্ধিমতি রমণীদের একজন। আল্লাহর রাসূল (স.) এর দরবারে শিফা (রা.) এর নৈকট্য থাকার কারণে সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি খিলাফত লাভের পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁর রায়ের ভুয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি তাঁকে বাজার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। (মিশকাতুল মাসাবীহ্), পৃ. ৬০০ এবং সংগ্রামী নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯০, পৃ. ৩৩৪-৩৩৬

২. ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬

৩. উসুদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আসমা বিনতে উমায়েশ (রা.) অন্যান্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.), সাদ বিনতে আবদুল্লাহ (রা.), উম্মে কুলসুম বিনতে উকাবা (রা.), করীমা বিনতে আল মিকদাদ (রা.) ভালো লেখাপড়া জানতেন এবং তাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন।[১]

মুসলিম মহিলাগণ সাহিত্যচর্চায়ও অগ্রগামী হয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য ইসলামী যুগ থেকে আরবের নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। সেখানে জাঁকজমকের সাথে কবিতা পাঠের মজলিস বসত। হযরত আবু বকর (রা.) নিজে কবিদের আসরে প্রধান অতিথি হতেন অথবা সভাপতির আসন গ্রহণ করে আসরে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) কবিতা রচনা করতেন। তিনি বহু কবিতা কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। অন্যদের মধ্যে হযরত খানসা, সওদা, সুফিয়া, আতিকা, ইমামা মুরীদিয়া, হিন্দ বিনতে হারিস, যয়নাব বিনতে আওয়াম উদী, আতিকা বিনতে যায়েদ, হিন্দ বিনতে আনসো, উম্মে আয়েমন, করিলা, আবদরিয়া, কাবসা বিনতে রাফে, মায়মুনা, বালাবিয়া, নেয়াম, রুকাইয়া (রা.) প্রমুখ মহিলা কবিতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। খানসা (রা.) এর মত প্রতিভা সম্পন্ন মহিলা কবি সেই যুগে পৃথিবীর বুকে বিরল। তাঁর কবিতা পুস্তককারে ছাপানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বিদুষী কবি, ঐতিহাসিক এবং একজন শক্তিশালী বক্তা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা থেকে নিয়ে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।[২]

মুসলিম নারী ও পুরুষগণ উভয়েই সাধারণ শিক্ষার পর অনেকেই কারিগরী বিদ্যার বিভিন্ন শিল্প কাজে ও বাণিজ্যে, সেলাইয়ের কাজে, দ্রব্যশিল্পে, চামড়া রং এর কাজে, পশুপালনে, এমনকি হিসাব-কিতাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময়ে প্রায় সকল আরব মহিলা সাধারণভাবে নিজ নিজ ঘরে কাপড় বুনতেন যা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রয়োজন হত। চামড়া রং করার কাজে মুসলিম মহিলারা অভিজ্ঞ ছিলেন। মুসলিম জননী হযরত সওদা (রা.) তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানতেন।[৩]

মুসলিম মহিলাগণ নিজ গৃহে সেলাইয়ের কাজ করতেন। যাঁরা বাণিজ্য করতেন, তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রা.) অন্যতম ছিলেন। শাম (সিরিয়া) দেশের সঙ্গে তাঁর বড় ধরণের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। হযরত খাওলা মালিকা, সাকাফিয়া এবং বিনতে মাখরার আতর খুশবুর ব্যবসা করতেন। মদীনাবাসী সকলে কৃষিকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মক্কা হতে যারা হিজরত করে মদীনায় আগমন করেছিলেন, তাঁরা প্রধানত ব্যবসায়ী আর মদীনাবাসীরা ছিলেন কৃষিজীবী। চাষাবাদ করে তাঁদের বেশির ভাগ লোক জীবন ধারণ করতেন। মদীনা ও অন্যান্য কৃষিযোগ্য এলাকায় যাঁরা বাস করতেন ক্ষেত-খামারে কাজ করার মত যোগ্যতা তাঁদের ছিল। সঙ্গে মদীনার আনসার মহিলাগণ কৃষি কাজ করতেন।[৪]

---

১. বালাযূরী, ফতহুল বুলদান, ১ম সংস্করণ, কায়রো, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮
২. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫
৩. আহমদ আল-মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৬
৪. সহীহ বুখারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮২

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম মহিলাগণ আরবের ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার জানতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে স্বর্গ, রৌপ্য, তাম্র ও লোহার কাজ করতেন। তাঁরা ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তরল করে ব্যবহার করার পদ্ধতি জানতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (স.) এর কাছ থেকে এ কাজ শিখেছিলেন, বিজ্ঞানের বিশেষ করে ইলমুল কীমীয়া অর্থাৎ রসায়ন বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ইলমুত তিব্ব অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পারদর্শিতায় তিনি সে যুগে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রসায়ন যেভাবে বর্তমান যুগে উন্নতি লাভ করেছে রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগে তদ্রূপ ছিল না। মহানবী (স.) এর কাছ থেকে হযরত আয়েশা (রা.) এ বিদ্যার আদি ও মূল তথ্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে কিরূপে পরিবর্তন করতে হয় তা তিনি নিজে পরীক্ষা করে দেখতেন ও রাসূলুল্লাহ (স.) কে দেখাতেন। তাম্রকে কিভাবে স্বর্ণে পরিণত করা যেতে পারে, রৌপ্যের উপর কিভাবে স্বর্ণের রং দিয়ে শুভ্র রৌপ্যকে সুবর্ণ রং করা যায়, তা তিনি নবী করীম (স.) এর নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এর উপর গবেষণা চালিয়ে ও পরীক্ষা করে তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে শিক্ষা দেন।

কাপড়ে নানা প্রকার রং করার পদ্ধতিও আয়েশা (রা.) নবী (স.) এর নিকট হতে শিখেছিলেন। তিনি এ সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীকালে এই বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আমীর মুআবিয়ার নাম প্রসিদ্ধ। খালিদ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর নিকট রসায়ন বিদ্যার যে তথ্য পেয়েছিলেন, সেগুলো একত্রিত করে তাঁর রচিত 'ফিরদাউসুল হিকমাত' পুস্তকে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাবির ইবনে হাইয়্যানের লেখা 'ইলমুল কীমীয়া' দ্বারা রসায়ন বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা তখন থেকে আজও রসায়নের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও আদৃত হয়ে আসছে। মুসলিম জননী হযরত যয়নাব (রা.) ও সোনা চাঁদীর কাজ করতেন আর রসায়ন বিদ্যায় আয়েশা (রা.) এর অবদান অমর হয়ে আছে।

নবী করীম (স.) অসুস্থ হলে আরবের প্রায় সমস্ত তীব্ব বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা এসে তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে যা আলোচনা করতেন, আয়েশা (রা.) তাই মনে রাখতেন। এই সময়ে হারিম ইবনে বালদা আরবের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ছাড়া আরও চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা গাছ-গাছড়া, শিকড়, লতা-পাতা দ্বারা বর্তমান যুগের কবিরাজ হেকিমদের মত রোগের চিকিৎসা করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোন কোন বিশেষ রোগের চিকিৎসা জানাতেন। রাসূল (স.) এর পবিত্র সংশ্রবে থেকে মুসলিম জননী হযরত আয়েশা (রা.) বিভিন্ন রোগের ঔষধ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীকালে তা মুসলিম মহিলাগণকে শিক্ষা দেন। মহিলাগণ যাঁরা ইলমে তীব্ব ও রোগীর শুশ্রূষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তাঁদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদ সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার কাজেও নিয়োগ করা হত।[১] সাহাবী হযরত ওরওয়া (রা.) বলেছেন, "আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে অন্য কোন মহিলাকে উলমে তীব্ব ও অস্ত্রোপাচার (Surgery) বিদ্যায় অতীব পারদর্শী হতে দেখিনি।[২]

---

১. ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫
২. ইবনে সাদ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫

হযরত ফাতিমা (রা.) নবীর দুহিতা। তিনি কবিতা রচনায় দক্ষতা প্রদর্শন করেন। পূত পবিত্র চরিত্রের জন্য ইসলাম জগতের তিনি মাতৃস্থানীয়া। তিনি তৎকালীন ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ রমণী ছিলেন। হযরত আলীর স্ত্রী, অত্যন্ত বিদুষী ও দয়াবতী ছিল। তাঁর অনেক খ্যাতি ছিল বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য। মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে তিনি সিফসিনের যুদ্ধে অংশ নেন।[১]

খানসা নাম্নী শ্রেষ্ঠ মহিলা কবির জন্ম হয় কবি ইমরুল কায়েসের বংশে। গোত্রীয় যুদ্ধে তাঁর দুই ছেলে নিহত হওয়ার দুঃখে রচিত কবিতা, শোকগাথা, মর্সিয়া, প্রভৃতি রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, পারস্যের বিরুদ্ধে বিখ্যাত কাদিসিয়ার যুদ্ধে। তাঁর চার ছেলে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর কবিতার একটি সংকলন আলজেরিয়া হতে প্রকাশিত ও ফারসী ভাষায় অনুদিত হয়।[২]

অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) এর কন্যা জারকা সুবক্তাও কবি ছিলেন।[৩] হুসায়েন (রা.) এর কন্যা হযরত আলী (রা.) পৌত্রী সাকীনা ছিলেন তাঁর যুগের সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে সুকৃতি সম্পনা, সবচেয়ে সদগুণবতী মহিলা, অতি কোমল স্বভাবা, সুষমাময়ী, মহিমান্বিতা, বহুগুণে গুণান্বিত এক দীপ্তিময়ী নারী, তিনি ছিলেন অত্যন্ত পাণ্ডিত্যের অধিকারিনী, তিনি জ্ঞানী-গুণীজনের জ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করতেন।[৪]

ইয়াজিদ আনসারী তনয়া আসমা সুবক্তা ও কবি ছিলেন। হামজার ভগ্নি সুফিয়া অনেক মর্সিয়া এবং হযরত রাসূলের (স.) মৃত্যুকে স্মরণ করে কবিতা ও শোকগাঁথা লিখেন। ফাতিমা বিনতে শায়খ আলাউদ্দিন ফিকাহ্ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দক্ষতা অর্জন করে।[৫]

খলীফা মামুনের স্ত্রী বুরান, হযরত আলী (রা.) এর বংশধর অষ্টম ইমামের সঙ্গে বিবাহিতা আল মামুনের ভগ্নি উম্মুল ফযল, আল-মামুনের কন্যা উম্মুল হাবীব সকলেই পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।[৬]

মদীনার একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন কিরিয়া বিনতে আহমদ, যার কাছে ফাতিমা বিনতে শায়খ খতীব আল-বাগদাদী বুখারী শরীফ অধ্যায়ন করেন। তাছাড়া অনেক মহিলা ছিলেন যারা সুবক্তা, শিক্ষিতা ও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এরা হলেন জয়নব, উম্মুল ফাতাহ্, করিমা, নায়লা এবং হামিদার নাম অন্যতম।[৭]

উমাইয়া যুগে মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এক নতুন যুগের অধ্যায় সূচনা করতে পেরেছিলেন রোম ও পারস্য শাসকদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে। কাব্য, গীতিকাব্যে উমাইয়ারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। উমাইয়া যুগে মুসলমানরা ইতিহাস, হাদীস, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এরাই সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন। উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করা হয়।

---

১. আ.খা. আবদুল মান্নান, শিক্ষার ইতিহাস, খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৫১
২. আ.খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৩. আ.খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৪. সায়্যিদ আমীর আলী, (অনু. দরবেশ আলী খান), দি স্পিরিট অব ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ২৭৯
৫. আ.খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৬. সায়্যিদ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩
৭. আ. খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এ যুগের নারীরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে খ্যাতি অর্জন করেন। খলীফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের আমলে পর্দা প্রথা কড়াকড়ি দেখা দিলেও নারীদের সম্মান ছিল। হযরত ইমাম হুসাইনের কন্যা সাকীনা খ্যাতনামা গায়িকা ও বিদূষী রমণী ছিলেন। বংশ মর্যাদা, জাঁকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

হযরত মুসায়াবের স্ত্রী আয়েশা বিনতে তালহা জ্যোতির্বিদ ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে এতখানি বিশিষ্টতা লাভ করেন যে একবার হিশাম ইবনে আবদুল মালেক তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সাকীনা বিনতে হুসাইন কবিতা ও সাহিত্যের এত উঁচুদরের সমালোচক ছিলেন যে ফারাযদাকের মত কবিও তাঁর প্রশংসা করেছেন। আবদুল মালেকের জ্ঞান প্রীতির কারণে তাদের বাড়িতে জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিক এবং ফকীহদের আনাগোনা লেগে থাকত।[১]

মুয়াবিয়ার কন্যা আতিকা, আব্দুল্লাহর কন্যা লায়াল, ওয়ালিদের স্ত্রী উম্মুল বানিন স্বামীর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন এবং প্রজাদের মঙ্গলকাঙ্খী ছিলেন।

অসামান্য ধার্মিক ও পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হযরত হাসান বসরী ছিলেন এ যুগের মহিলাকূল শিরোমণি। কুরআন-হাদীস ও ফিক্হ্ শাস্ত্রে তাঁর অগাত জ্ঞান ছিল। আল্লাহর প্রতি ভক্তিমূলক কবিতার জন্য তিনি বিখ্যাত তখনকার সাধক ও সূফীদের কাছে তিনি ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।[২]

আব্বাসীয় শাসনামল মুসলিম জাহানে স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত। কেননা উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে ও দর্শনে যে বীজ অঙ্কুরিত করা হয়েছিল তা পূর্ণ্যতা লাভ করেছে আব্বাসীয় যুগে। এ সমাদর শুধু এ যুগের নয়, পরবর্তীকালে ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের দ্বার উদঘাটন করেছিল। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আব্বাসীয় খলীফাদের অবদান অনস্বীকার্য। কেননা এ সময় ইসলামে সহশিক্ষা অর্থাৎ ছয় বছরের বালক-বালিকা স্কুলে গিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেত। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা এ তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় এ যুগে। এ সময় সনদপ্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী নিজস্ব যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পেত। এ যুগে মুসলিম নারীরা শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন খলীফা হারুন-অর-রশীদের মাতা ও মাহদীর স্ত্রী খাইজুরান রাজ্যের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী মহিলা ছিলেন। স্বামী ও পুত্রের রাজত্বকালে প্রজাগণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।[৩] খলীফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী যুবাইদা, খলীফা মামুনের স্ত্রী বুরযান প্রমুখ মহিলা রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা এবং রাজনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। খলীফা মুতাসিমের সময় বেগম যুবাইদা অসাধারণ প্রতিভা ও কবিতার জন্য জাতীয় গৌরবে ভূষিত হন। যুবাইদা একজন গায়িকা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁকে কিতাবুল আগাণী এর লেখক সুশ্রী গুণবতী ও প্রতিভাময়ী মহিলা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪] তিনি নতুন নতুন সাজসজ্জা উদ্ভাবন করেন। প্রজাদের সুবিধার্থে তিনি যে খাল খনন করেন তা নাহারে যোবায়দা নামে খ্যাত।[৫]

---

১. আ. খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
২. আ. খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৩. আ. খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৪. মোঃ আজহার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৫. আ. খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন অন্য দু'জন বিখ্যাত মহিলা ছিলেন খুনজয়ী ও উবায়দা। কিতাবুল আগাণী থেকে জানা যায় যে, অসামান্য প্রতিভাময়ী ও সঙ্গীতজ্ঞ, খুনজয়ী ও তলবা (তাম্বুরা) বিশারদ উবায়দা খলীফা মামুনের ও মুতাসিমের রাজত্বকালে সংগীত জগতের উজ্জ্বল তারকা হিসেবে বিরাজমান ছিলেন। উবায়দার উপাধী ছিল আততাম্বুরীয়া। মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালে একজন বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন উম্মুল ফজল। তিনি খলীফা মামুনের ভগ্নি। খলীফা মামুনের কন্যা উম্মুল হাবীব ফুফুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একজন পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[১]

বাগদাদের খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা শায়েখ শুইদা ইতিহাস ও সাহিত্য বক্তৃতা দিতেন রম্য রচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি বাগদাদের জামে মসজিদে সাহিত্য, ছন্দ ও কবিতা আলোচনা করতেন। বাগদাদের আইন শিক্ষিকা উম্মুল মুয়াইদা তৎকালীন বিখ্যাত আইনজ্ঞদের ছাত্রী ছিলেন। মামুনের স্ত্রী বুরান বাগদাদে অনেক চিকিৎসালয় ও মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রজা সাধারণের মঙ্গল সাধন করেন।[২]

স্পেনে মুসলিম শাসনামলে মেয়েরা জ্ঞানের জগতে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্পেনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করে নাজহুন, জয়নাব, হামদা, হাফসা, আল-আলাইয়া, সেভিয়া, মেরিয়া প্রমুখ বিদূষী মহিলা। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করেন। নারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাহিত্যিক, কবি, চিকিৎসক এবং ধাত্রী সুলভ সেবায় পারদর্শী ও শিক্ষিকা। সাহিত্য ও ইতিহাসের দক্ষতা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি ছিল কবি নাজহানের। গ্রানাদার প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ীর কন্যা জয়নব হামদা খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। তাঁদের অমায়িক ব্যবহার এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য 'তাহফাতুল কাদিম' এর লেখক ইবরুল আব্বার তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সেভিলের অধিবাসী মহিলা কবি সাফিয়া বক্তৃতায় পারদর্শী এবং হস্ত লিপি (Calliography) বিশারদ ছিলেন। অন্যান্য মহিলা কবিদের মধ্যে আয়েশার যথেষ্ট সুনাম ছিল। সেভিল শহরের খ্যাতনামা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মরিয়ম। আন্দালুসিয়ার ধীশক্তি সম্পন্ন কবি ওয়ালিদার খ্যাতি লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য খ্যাতনামা মহিলা কবি-সাহিত্যিকদের অন্তর্গত ছিলেন আসমা আর-আমায়িবা উম্মুল হীনা, ইতিমাদ আর রামিক্কিয়া এবং বুসিনা। ভ্যালেন্সিয়া আল-আরুজিয়া ব্যাকরণবিদ ও অলংকার শাস্ত্রবিদ ছিলেন।[৩]

উপযুক্ত পর্যালোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে নারীর মর্যাদা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। সে সময়ে সাধারণ নারী প্রথমে মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদিতে জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হন। উচ্চ শ্রেণির মেয়েরা গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। অনেক বিদূষী মহিলা অন্দর মহলে সাধারণ মহিলাদের জ্ঞানচর্চা করাতেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজে জ্ঞান চর্চাকে বাড়িয়ে দেয়ার পেছনে মহানবী (স.) এর দান সর্বাগ্রে। কারণ তিনি এ লাঞ্ছিত, অবহেলিত এবং নির্যাতিত নারী জাতিকে সমাজে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন।

---

১. মোঃ আজহার আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২. আ.খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৩. আ.খা. আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ধারা ও নারী সমাজ (১২০৪-১৭৬৫)

* বাংলাদেশের ইসলামের আবির্ভাব
* বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ গঠন
* শিক্ষার বিকাশ
* শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতি
* সুলতানি আমলে নারী শিক্ষা
* শিক্ষা ব্যবস্থা
* মুঘল যুগে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা
* শিক্ষার স্তর
* শিক্ষা ক্যারিকুলাম
* বিদ্যালয়ের শ্রেণিবিন্যাস
* শিক্ষার মাধ্যম
* শিক্ষা ব্যবস্থাপনা
* পরীক্ষা পদ্ধতি
* শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা
* মুঘল যুগে নারী শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাবঃ

৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপনের ফলে প্রাচ্য ও ভারতের সঙ্গে আরব বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। বাণিজ্য ব্যাপকদেশে কিছুসংখ্যক আরব বণিক সিংহল ও মালাবার অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন করে। আরব বণিকদের প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্য এত বেশি প্রসার লাভ করে যে, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর আরব জলাশয়ে পরিণত হয়। অজ্ঞতার যুগ হতেই আরব বণিকগণ সমুদ্র পথে চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়াতেন এবং এখানে পণ্য বিনিময় করতেন। সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে দক্ষিণ চীনে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় খ্রিষ্টীয় ৮ম শতকে এবং হিজরী প্রথম শতকে এবং হিজরী প্রথম শতকে সম্ভবত হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনকালেই আরবের মুসলিম বণিকগণ ও ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক এদেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয়।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সময় ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরসমূহে ইসলামের আবির্ভাব, সে সময়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামী ভাবধারার আগমন ও প্রসার ঘটে। চট্টগ্রাম বন্দরে আরবীয় বণিকদের যাতায়াত ছিল। বিশেষ করে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরে ছিল তাদের সমুদ্রপথ পূর্বদিকে যাতায়াতের একমাত্র পথ। আরব বণিকদের মাধ্যমে এ দেশ থেকে মসলা, মিহি সূতী ও রেশমী বস্ত্র, হাতির দাঁত, নানাবিধ রত্ন এসব সামগ্রী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানী হত।[১] ইসলামের আবির্ভাব তখন সমগ্র আরবে একটা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই এমন একটা সাড়া জাগানো খবর বণিকদের মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আরবীয় উপনিবেশগুলোতে পৌছেছে, তা সহজেই অনুমেয়। খ্রিষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেই আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম চট্টগ্রাম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[২]

ব্যবসা-বাণিজ্যই এসব বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে বাণিজ্যিক পণ্যের সাথে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে ইসলামের আদর্শ ও নবীর সুন্নাহ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাচ্যের দেশগুলোতে, বিশেষত, জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও সুদূর চীন দেশে। ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় বাংলাদেশের দিকে। তারা মনে করেছিলেন প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে ইসলাম প্রচার করতে পারলে দেশের অপরাপর অঞ্চলেও তা আপনাআপনি ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় কোন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাগত ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি এবং এদেশের নিজস্ব অধিবাসীদের অনার্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ হয়েছিল বহু দিন ধরেই। কিন্তু তাদের সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জীবন ও সমাজ সৃষ্টি হয়নি। ছিল গ্রাম্য সভ্যতা; যেখানে আপন ধারায়, বহু বিচিত্র আচার-ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সমাজ চালু ছিল। এই গ্রাম্য সমাজের কর্তা ছিল হিন্দুগণ। সমাজের মধ্যে বর্ণবৈষম্য প্রচলিত ছিল। সেন আমলে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি হওয়ায় তা নূতন ও আদর্শ সমাজ সংগঠনের পথে প্রবল বাধা ও অন্তরায় ছিল। সেখানে জাত্যাভিমান ও বহিরাগত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং যুক্তিহীন আত্মসর্বস্বতা তাদের জীবনকে অধিকার করেছিল এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের উপর প্রভূত্ব করত।

---

১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) প্রাচীন যুগ, কলকাতা-১৯৮১, পৃ. ৫২

২. Richard Saymonds, The Making of Pakistan, P. 197

Dhaka University Institutional Repository

সর্বক্ষেত্রে সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণকে বঞ্চিত ও পদানত করে রাখার প্রচেষ্টা চলত। কঠোরতার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ বরাবরই অবহেলিত হয়ে এসেছে।[১] বাংলাদেশের জনমানস ও চিন্তাধারায় যখন এমন একটা শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়, তখন অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হন। খ্রিষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলে আরবীয় বণিক ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তা এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর দরবেশ ও সূফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[২] তাঁরা ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। ইসলামের প্রচারকাজে তাঁদের একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতার ফলেই জাতি, বর্ণ ও ধর্মভেদ জর্জরিত এ দেশের জনসমাজের সম্মুখে এক নবদিগন্তের উন্মোষ ঘটে। ক্রমে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এতে নিরবে ইসলাম প্রচারের জন্য এক সামাজিক ও সংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠে।[৩]

সুতরাং খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবীয় মুসলমানদের যে প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন অষ্টম শতাব্দীতে বহু আরব বণিক দলে দলে বাণিজ্যপোত চালনা করে বিভিন্ন দেশে গমনাগমন করতেন এবং এভাবে ভারতের সঙ্গেও তাঁদের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাঁরা তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে উপনিবেশ গড়ে তোলেন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের (সোমপুর বিহার) ধ্বংসস্তুপে আবিস্কৃত একটি মুদ্রা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটি আরবীয় খলীফা হারুন-অর-রশীদের শাসনামলে (৭৮৬-৮০৯ খ্রিঃ) ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে আল-মুহাম্মদিয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল।[৪] ড. মুহাম্মদ এনামুল হক এর উপর ভিত্তি করে বলেছেন, "পাহাড়পুরে আবিস্কৃত খলীফার মুদ্রাটি অন্ততঃ খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের সহিত ইসলামের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে।[৫] কিন্তু ড. আব্দুল করিম ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার নানা যুক্তি দেখিয়ে ড. হকের প্রাপ্ত মুদ্রা সম্পর্কীয় এ ধারণাকে মেনে নিতে পারেননি।[৬]

---

১. আল-বেরুনী, ভারতবর্ষ ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩, উদ্বৃতঃ গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ১৯-২০

২. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ১৬-২০

৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশঃ কিছু ভাবনা, অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯

4. K.N. Dikshit, Memories of the Archaeological Suvery of India, No. 55

৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬. ড. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৫১-৫২

৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ভৌগোলিক ও পর্যটকদের মধ্যে সুলায়মান (জ. ৮১৫ খ্রি.) আবু জায়দুল হাসান (সুলায়মানের সমসাময়িক), ইবনে খুরদাদবা (মৃ. ৯১২ খ্রি.), আল মাসুদ (মৃ. ৯৫৬ খ্রি.) ইবনে হাওকাল (৯৭৬ খ্রি.), আল-ইদরিসী প্রমুখের বর্ণনা মতে আরাকান হতে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল। এসব আরব ভৌগোলিক ও পর্যটকগণ তাঁদের বর্ণনায় এমন একটি দেশে ও বন্দরের নাম উল্লেখ করেছেন, যে দেশকে বাংলাদেশ হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে এবং বন্দরকে বাংলাদেশের উপকূলের একটি বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাঁরা এদেশকে 'রুহমী' বা 'রাহমী' নামে এবং চট্টগ্রাম বন্দরকে 'সমন্দর' নামে অভিহিত করতেন। ড. এ. এইচ. দানী[১], ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম[২], ড. আবদুল করিম[৩] বহু যুক্তি প্রমাণের আলোকে আরব ভৌগোলিকদের বর্ণিত উক্ত 'রাহমী' দেশকে বাংলাদেশ এবং 'সমন্দর' বন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন।

আরাকান রাজবংশীয় উপাখ্যান 'রাদজাতুয়ে' একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এতে বলা হয়েছে, ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের আরাকানের রাজা সুলতইঙ্গ চন্দ্রয়ত সুরতন জয় করে সে দেশে একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয় চেত্তাগৌং অর্থাৎ যুদ্ধ করা অনুচিত।[৪] এখন প্রশ্ন হল, আরাকান রাজা কাদের সাথে যুদ্ধ করা সমীচিন নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন? মুসলমানদের সাথে? চট্টগ্রামে কি তখন আরবীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কি আরাকান রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছিল? এ সম্ভাবনা একেবারে অমূলক বলে মনে হয় না। তাই পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' শব্দের আরাকানী রূপ এবং তদনুসারে তাঁরা বলেন, চট্টগ্রামে এ সময়ে মুসলমানরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন।[৫] কিন্তু এ ব্যাপারে ড. আবদুল করিম নেতিবাচক মন্তব্য করে বলেছেন, "চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরব মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমানেরা আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল বলা অতিরঞ্জন বৈ নয়। একটি মাত্র শব্দ 'সুরতন' যাহার অর্থ পরিষ্কার নয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, আরাকান বংশাবলী পড়িয়া মনে হয় 'সুরতন' শব্দটি সুলতানের বিকৃত রূপ নয়, বরং ইহা অধুনালুপ্ত কোন এক স্থানের নাম বহন করে।[৬]

উপরন্তু ইসলামের আবির্ভাবের যুগের পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহানবী (স.) এর জীবনকালেই তাঁর মাতুল সাহাবী আবু ওয়াক্কাস (রা.) (যিনি ইসলাম গ্রহণকারী নবম ব্যক্তি) সমুদ্রপথে বাংলাদেশে পদার্পণ করেন।[৭] ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী কায়স ইবন হুযায়ফ (রা.), উরওয়া ইবন আছাছা (রা.) এবং আবু কায়িস ইবন হারিস (রা.)। আবু ওয়াক্কাসের (রা.)

---

১. Dr. A. H. Dani, Proceding of the Pakistan Conference, 1st Session, Karachi, 1951, P. 191

২. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম (অনু. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান), বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ৩২-৩৪

৩. ড. আবদুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম-১৯৮০, পৃ. ৩২, ৩৩

৪. ড. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, কলকাতা-১৯৩৫, পৃ. ৪৫

৬. ড. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ. ৬২

৭. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের অবদান (১৭৫৭-১৮৫৭), পিএইচ-ডি থিসিস, ঢাবি., পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে দলটি আবিসিনিয়ার হাবশা হতে যাত্রা করার পর অন্যূন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে সময় অতিবাহিত করে চীন পদার্পণ করেন। তিনি চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থানকালে যে কোয়াংটা মসজিদ নির্মাণ করেন, কালের নিরব সাক্ষী হিসেবে তা আজও বিদ্যমান রয়েছে।[১] চীনে পদার্পণ করার পূর্বে তিনি যে নয় বছর পথিমধ্যে অতিবাহিত করেন, এ সময় তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম (সমন্দর) বন্দরেও অবস্থান করেছিলেন, ঘটনা প্রবাহ সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

যা হোক, হযরত উমর ফারুক (রা.) এর খিলাফতকালে (খ্রি. ৭ম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মুবাল্লিগ) বাংলাদেশে আসেন। এঁদের নেতা ছিলেন হযরত মামুদ ও মুহামিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন হযরত হামিদ উদ্দিন (রা.), হযরত হোসেন উদ্দিন (রা.), হযরত মুর্তয়া (রা.), হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ও হযরত আবু তালিব (রা.)। এই রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র বা বই-কিতাব থাকত না। তাঁরা রাজ ক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তাঁরা এ দেশের প্রচলিত ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন।.........''এঁরা গ্রামে বাস করতেন এবং সফর করে ধর্ম প্রচার করা এঁদের প্রধান কাজ ছিল। এরপর আরও পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এঁদের বলা হত আবিদ। এঁরা বিভিন্ন স্থানে খানকা বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচার কার্য চালিয়ে যেতেন।[২] এরপর ইসলাম প্রচারের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রচারকদের আগমন অব্যাহত থাকে। এ উপমহাদেশে বর্ণপ্রথা ও সামন্ত শাসকদের অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষের মুক্তিদানে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যর্থতার ফলে ইসলামের আহ্বান আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। সুতরাং দেখা যায়, খ্রিষ্টীয় ৭ম থেকে ১০ম শতকের বাংলাদেশ ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। তবে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যের অভাবে কখন, কারা, কীভাবে এদেশের ইসলাম প্রচার করেন, তাঁদের সকলের নিশ্চিত বিবরণ জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও একাদশ শতকের আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচারের উপযুক্ত একটা পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

যে কোন জনপদে ইসলামের বাণী প্রচার করা প্রতিটি জ্ঞানবান মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব, তাতে কেউ তাঁকে সাহায্য করুক বা না করুক। সে হিসেবে আরবীয় মুসলিমগণ প্রত্যেকেই ইসলামের প্রচারক ছিলেন। আল-কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ''তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হউক যারা সবাইকে আহ্বান করবে কল্যাণের দিকে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।[৩] নবী করীম (স.) এরও নির্দেশ, ''বাল্লিগু আননী ওলাও আয়াতান'' (একটি আয়াত হলেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে তা প্রচার কর)। আল-কুরআন ও মহানবী (স.) এর নির্দেশ আরবীয় মুসলিমগণ নিষ্ঠাপূর্ণভাবেই পালন করেছিলেন। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়েই সে যুগের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ইসলাম প্রচারার্থে বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। সুদূর সেই মহাচীনেও গিয়েছিলেন, যার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল সেই সপ্তম শতকে। ভারতীয় বণিকগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে বাণিজ্যের সঙ্গে ইসলাম প্রচারেও মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামে বায়আত দিয়ে স্থানীয় রমণীদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

---

১. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

২. ড. হাসান জামান, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ২১২

৩. আল-কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-১০৫

Dhaka University Institutional Repository

এসব বণিকদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম সূফীও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশের বিভিন্ন স্থানে আগমন করেন।

বাংলায় বিদেশাগত সূফী দরবেশগণের আগমনের ধারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। (ক) মুসলিম বিজয়ের পূর্বকার (খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শায়খ পর্যায়) (খ) মুসলিম বিজয় থেকে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস পর্যন্ত অর্থাৎ ১২০১ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। (গ) ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীকাল। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে যেসব সর্বত্যাগী ওলীগণ সত্য প্রচারের অদম্য বাসনা নিয়ে বাংলায় আগমন করেন, তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন, কখনো বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসতি স্থাপন করে আল্লাহ্ ও রাসূলের সত্য বাণী জনসমাজে প্রচার করেন। নিজেদের চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে স্থানীয় লোকের হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করেন। ধীরে ধীরে দরবেশগণের আদর্শ জীবনধারার প্রতি জনসাধারণের মতে শ্রদ্ধা জাগে। কেউ কেউ ইসলামের সহজ সরল উন্নততর শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে কোন দরবেশের প্রতি অনুরাগী হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। স্থল বিশেষে স্থানীয় রাজা উপাধিধারী কোন প্রতাপশালী ভূস্বামী আতঙ্কিত হয়ে ইসলাম প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, দরবেশগণের উপর উৎপীড়ন চালান। দরবেশগণ আগত্যা আত্মরক্ষার্থে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শহীদ হন, কোন কোন ক্ষেত্রে জয়ী হন। সেখানে এরূপ প্রচারের ধারা স্বাভাবিক ছিল বলে মনে হয়। ধর্মপ্রচারকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও পুণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। প্রয়োজন হলে এরূপ কাজে শহীদ হওয়াকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে বিশ্বাস করতেন এবং পরকালে অনন্ত সুখের জীবন লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করতেন। ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় প্রকারের মহত্তম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী রাজশক্তি বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন।

মুসলিম বিজয়ের পূর্ব যুগে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার রামপাল ও হরিরামনগর, বগুড়া জেলার মহাস্থান ও উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া, দেবকোট প্রভৃতি স্থানে ইসলাম যে প্রচারিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন সূফী দরবেশের জীবন সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত লোক-কাহিনী ও কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া আক্রমণের পূর্বে এসব সূফী দরবেশ বাংলাদেশে এসে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে যেসব সূফী দরবেশ বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়, তাঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের রামপালের বাবা আদম শহীদ, ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মদনপুরের শাহ সুলতান রুমী, বগুড়া জেলার মহাস্থানের শাহ্ সুলতান মাহী সাওয়ার এবং পাবনা জেলার শাহজাদপুরের মাখদুম শাহদৌলা শহীদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] মুসলিম বিজয়ের অব্যবহতি পরে ৫০/৬০ বছরের ভেতরে বাংলাদেশে কোন বিদেশী সূফী দরবেশ এসে থাকলেও তাঁদের পরিচয় জানা যায় না।

---

১. এ সকল সূফী সাধক সম্বন্ধে জানার জন্য দ্রষ্টব্য

* ড. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পৃ. ৬২-৬৭
* Abdul Karim, Society History of Muslim in Bengali, Chittagong-1985
* Dr. Md. Enamul Haq. A History of Sufism in Bengal, Dhaka-1975
* Dr. Md. Abdur Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Karachi, 1963

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি বাগদাদ ধ্বংসের পূর্বে সমগ্র উপমহাদেশে সূফী প্রভাব অতি ক্ষীণ ছিল, যদিও খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশে সূফী প্রভাবের স্রোত অবাধ গতিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এ সময়েই আরব, পারস্য, ইরাক, ইয়ামন ও মধ্য এশিয়ার সূফী-দরবেশগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশেও এসব ধারাই সম্প্রসারিত হয়। বস্তুত: বাংলা অঞ্চলের সূফী মতকে উত্তর ভারতীয় সূফী মতবাদের শাখাস্রোত বলা হয়।[১]

মানুষের মধ্যে যাঁরা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী তাঁরাই 'সূফী' নামে পরিচিত। সূফীগণ নির্জনবাস এবং দারিদ্র পছন্দ করতেন এবং নিভৃত সাধনা ও কুরআন মজীদের মর্ম উদঘাটনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতেন। সুতরাং সূফীগণ তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করেন আল-কুরআন থেকেই। তাঁরা কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেন মারিফাত বা গুপ্তজ্ঞানের আলোকে। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "তিনিই তোমাদের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন (মুহকাম); এগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো রূপক (মুতাশাবিহ)।[২]

সূফীমতে ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য হল আত্মার সংযম, কেবলমাত্র কতকগুলো বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। 'আততাসাউফ' বা সূফীবাদ হচ্ছে স্রষ্টার জন্য গভীর ও তীব্র ভালোবাসার মাধ্যমে আত্মার উন্নয়ন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনা। সূফীদের মতে, জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তি সত্তার চেতনার বিলোপ এবং পবিত্র সত্তায় অব্যাহত অস্তিত্ব লাভ।

সূফীগণ শুধু সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না, বরং নিজের আত্মার দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করতেন। সুতরাং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আত্মার পরিশুদ্ধি মারফত আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। সূফীগণ জীবন সাধনার পথকে প্রধানত: দু'ভাগে ভাগ করতেন। (ক) শরী'আত বা প্রকাশ্য ইবাদত, (খ) তরীকত বা গুপ্ত ইবাদত। ইসলামে প্রকাশ্য বিধি-নিষেধ সম্বলিত আইন-কানুন মেনে চলাই শরীআত। তরীকতের পথে উপযুক্ত নিকটবর্তী মুর্শিদের নিকট বায়'আত নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুশীলনের দ্বারা সাধনা করতে হয়। তরীকতের যাত্রাপথ যিনি গ্রহণ করেন, তিনি সালিক বা পথিক। যাত্রাপথে পথিককে উন্নতির বিভিন্ন স্তর (মকাম) ও অবস্থা (হাল) পাড়ি দিতে হয়। এই স্তর বা মাকামসমূহ হল মারিফাত বা আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞান ও হাকীকাত বা আল্লাহর প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি। তরীকাতের বিশেষ শিক্ষালাভ করেই আল্লাহর মা'আরিফাত অর্জন করতে হয়। মা'আরিফাত দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে মিলন হয়। সূফীগণ মনে করেন, মানুষ জীবিতাবস্থায় আল্লাহর অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে পারে। আবার পরলোকেও আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। বস্তুত মানবাত্মা পরমাত্মা থেকে উদ্ভব হয়েছে; সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে মিলন অবশ্যম্ভাবী। পরমাত্মার অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব মিশে যাওয়াকে কোন কোন সূফী বলেছেন, 'বাকাবিল্লাহ'। তাঁরা মনে করেন, বাকাবিল্লাহ হলো অহংলোপ; কিন্তু 'বাকাবিল্লাহ' অর্থে বুঝায় পরমাত্মার সাথে স্থায়ীভাবে বিলীন হওয়া। ফানাফিল্লাহর শায়খ পরিণতিই হলো বাকাবিল্লাহর (আল্লাহ স্থায়িত্ব প্রাপ্তি)।[৩]

---

১. ড. কাজী দীন মুহম্মদ প্রমুখ, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা-১৯৬৯, পৃ. ২০৯
২. আল-কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-৭
৩. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলকাতা, ১৩৩৫ বাং, পৃ. ১৮-৩১

Dhaka University Institutional Repository

সূফীগণ ইসলাম প্রচার ও মানব সেবার ব্রত গ্রহণ করেন। মানব সেবাকেই তাঁরা স্রষ্টার গভীর নিষ্ঠা ও প্রেমরূপে বিবেচনা করে থাকেন। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবতার কল্যাণে তাঁরা সেই পরম সত্তার সান্নিধ্যে যেতে চান যেখান থেকে তাঁরা এসেছেন। বাস্তবিকই কবি শায়খ সাদী বলেছেন, "সৃষ্টি জীবের সেবা ছাড়া তরীকত নিস্ফল, শুধু খিরকাই তসবীহ্ ও জায়নামাযে তরিকত হয় না।"[১] মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (র.) বলেছেন, "মানুষের চিত্ত জয় করাই মহোত্তম তীর্থযাত্রা এবং একটি হৃদয় সহস্র কাবার চেয়েও শ্রেয়ঃ। কাবা তো কেবল ইব্রাহীমের গৃহ, কিন্তু হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র আবাস।"[২] ধর্ম প্রচার ও মানব কল্যাণকর কার্যাবলীর এই সমুদয় আদর্শ নিয়েই ইসলামের প্রথম যুগের সূফীগণ বাংলাদেশ তথা ভারথীয় উপমহাদেশে আগমন করেছিলেন।

ইসলাম অধ্যুষিত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময়ে শত শত সূফী দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করেন। সূফীগণ অনেক তরীকাতে বিভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাইরের দেশ থেকে আগমন ঘটলেও বাংলাদেশ সূফীবাদ বিস্তারে উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়। সূফীবাদ সমগ্র বাংলাদেশ এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খানকাহ্ ও দরগাহ্ দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের মাটিতে সূফীবাদ এত বেশি প্রসার লাভ করে যে, কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালি সূফীর শিক্ষার ভিত্তিতে এখানে কয়েকটি নতুন মরমী সম্প্রদায়ের বিকাশ হয়।[৩]

বাংলাদেশে যেসব তরীকার সূফীগণ আগমন করেন এবং ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত হন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। পঞ্চদশ শতকের জৌনপুরের বিখ্যাত সূফী মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (র.) কর্তৃক জৌনপুরের শার্কী সুলতান ইব্রাহীম শার্কীর নিকট লিখিত একখানি চিঠিতে বাংলাদেশের কয়েকটি সূফী তরীকার নাম পাওয়া যায়। রাজা গণেশের নির্যাতনের হাত থেকে বাংলাদেশের সূফীদিগকে রক্ষার জন্য এই চিঠি খানি লিখিত হয়। তিনি বলেন, "God be praised! What a good land is that of Bengal, where numerous saints and ascetics came from many directions and made it their habitation and home. For example, at Devgaon seventy leading disciples of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suharawardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrawardi order are lying buried in Mahison and this is the case with the saints of Jalalia order in Deotola. In Narkoti some of the best companions of the Shaikh of Shaikh Ahmed Damisque are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadarkhani order, whose cheif pupil was Hazrat Shaikh Sharfuddin Maniri is lying buried at Sonargaon. And then there was Hazrat Badr Alam and Badr Alam Zahidi. In short in the country of Bengal what to speak of the cities there is no town and no village where holy saint did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrawardia order are dead and gone earth but those still alive are also infairly large numbers.4

---

১. ড. কাজী দীন মুহম্মদ প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
২. ড. আব্দুর রহিম, পৃ. ৬৯
৩. ড. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ১৮৫-১৮৬
4. Prof. Hasan Askari, Bengal-Past and Present Vol. Lxvii, Serial No. 130, 1988, P. 35-36

Dhaka University Institutional Repository

সব প্রশংসাই আল্লাহর! কি চমৎকার দেশ এই বাংলা, যেখানে অসংখ্য সাধু-দরবেশ ও তাপসগণ বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেন এবং বাংলাকেই তাদের দেশ ও বসবাসের স্থান হিসেবে বেছে নেন। উদাহরণ স্বরূপ পীরানা পীর হযরত শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর সত্তরজন নেতৃস্থানীয় মুরীদ দেবগায়ে চির শান্তির ক্রোড়ে শায়িত আছেন। সোহরাওয়ার্দী তরীকার কয়েকজন সূফী পুরুষ মহীসুনে এবং জালালীয়া সম্প্রদায়ের সূফীরা দেওতলায় সমাহিত আছেন। শায়ক আহমদ দামিস্কীর কয়েকজন প্রধান শিষ্য আছেন নারকোটিতে। 'কদরখানী' দ্বাদশ সূফীদের অন্যতম হযরত শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁরই প্রধান মুরীদ ছিলেন হযরত শায়খ শারফুদ্দীন মানেরী। এছাড়া হযরত বদর আলম এবং বদর আলম জাহেদী ছিলেন। মোট কথা বাংলাদেশে শুধু বড় বড় শহরের কথা বলি কেন, এমন কোন গ্রাম বা শহর নেই যেখানে পুণ্যাত্মা সূফী পুরুষগণ গমন করেননি ও বসতি স্থাপন করেননি। সোহরাওয়ার্দীয়া সম্প্রদায়ের সিদ্ধ পুরুষদের অনেকেই বিগত কিন্তু যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের সংখ্যাও অনেক।

সুতরাং দেখা যায়, সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকাভুক্ত সূফীগণ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের কর্মতৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ বাহাউদ্দীন যিকরীয়া মুলতানী। তিনি সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার আদি পুরুষ শিহাবুদ্দীন আবু আমর সোহরাওয়ার্দীর খলিফা ছিলেন। তিনি মুলতানে ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর মুরীদগণ ভারতীয় উপমহাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে চিশতীয়া পন্থীদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সোহরাওয়ার্দীয়া পন্থীদের পর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে যাঁদের আগমন ঘটে এবং অসামান্য অবদান রাখেন, তাঁরা হলেন চিশতীয়াপন্থী সূফীগণ। উপমহাদেশের চিশতীয়া সম্প্রদায়ের অগ্রদূত ছিলেন ভারতের বিখ্যাত সাধক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) (১১৪২-১২৩৬ খ্রি.)। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে নবীন রাজশক্তির সঙ্গে নতুন ভাবধারা প্রচলনের অগ্রদূত। তাঁর ইন্তেকালের পর ভারতের নানা স্থানে চিশতীয়াপন্থী সূফী দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মুঘল যুগে দিল্লী এই চিশতীয়াপন্থীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১]

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশে আর কোন নূতন সূফীগণের আগমনের সংবাদ পাওয়া যায় না। অতঃপর নূতন এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে কাদিরিয়া পন্থীদের। বাগদাদের জিলান নগরের অধিবাসী শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.) (১০৭৮-১১৫৬ খ্রি.) এ তরীকা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কোনদিন ভারতে আসেননি বটে; কিন্তু তদ্বংশজাত সৈয়দ মুহাম্মদ গাউস জিলানী ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এসে এ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি ভারতের রাজপুতনায় 'উচ' নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[২]

১. Sayed Athar Abbas Rezvi, A History of Sufism in India, Vol-2, New Delhi, 1983, P. 279
২. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

কলন্দরীয়া তরীকাপন্থীগণ সম্ভবত: চিশতীয়াপন্থীদের পর বাংলাদেশে আগমন করেন। কেউ কেউ কলন্দরীয়া সম্প্রদায়কে চিশতীয়াপন্থীদের শাখা হিসেবে গণ্য করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তা ঠিক নয়। এটা একটা নতুন তরীকা। বু আলী শাহ্ কলন্দর এ সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ। তিনি ছিলেন স্পেন দেশীয়। তিনি প্রথম চিশতিয়াপন্থী হলেও পরে এ সম্প্রদায়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুসারে নিজস্ব একটি মতবাদ গড়ে তোলেন এবং তাকে সংগঠিত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের র তিনি ভারতে এসে উপস্থিত হন এবং দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথ নামক স্থানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি ১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১] বাংলাদেশে উত্তর ভারতীয় কলন্দর আখ্যাধারী দরবেশগণ চতুর্দশ শতাব্দীর শায়খ শতাব্দীর শায়খভাগ থেকে বিশেষভাবে আসতে থাকেন বলে প্রকাশ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁরা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ 'কলন্দর' শব্দ দ্বারা সর্বশ্রেণির সূফী দরবেশকে অভিহিত করতেন। তার প্রমাণ চট্টগ্রাম থেকে আবিস্কৃত ও আরবী হরফে 'যোগ কলন্দর' নামক কতকগুলো বাংলা পুঁথি।[২]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে উপমহাদেশে নক্শবন্দীয়াপন্থীগণ প্রবেশ করেন। এ তরীকার আদি পুরুষ তুর্কীস্তানের অধিবাসী খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দীয়া। ভারতের এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা খাজা মুহাম্মদ বাকীবিল্লাহ। তিনি তুর্কীস্তান থেকে এ মতবাদ ভারতে আনয়ন করেন। ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী প্রবর্তিত সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকা ও হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.) প্রবর্তিত চিশতীয়া তরীকার অনুসারী সূফী দরবেশগণ অদ্বৈতবাদে। (ওয়াহদাতুল অজুদ) বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাথমিক যুগের সূফী দরবেশগণের প্রায় সবই এ দুই তরীকাপন্থী। কাজেই তাঁরা অদ্বৈতবাদের অনুসারী ছিলেন। পাক-ভারত বাংলাদেশের মানসক্ষেত্রে এ মতবাদ অনুকূল ছিল বলে এই দুই পন্থীদের মতবাদ এদেশে সহজেই স্থায়ী আসন লাভ সমর্থ হয়। আনুষ্ঠানিক ইসলামে এ মতাবাদ কখনও স্থান পায়নি।[৩]

হযরত শায়খ আবদুল জিলানী (রা.) প্রবর্তিত কাদিরীয়া তরীকায় ও হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ প্রচলিত নকশবন্দীয়া তরীকায়ে দ্বৈততা অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টি পার্থক্য স্বীকার করা হয়। এ দুই পন্থীদের মতবাদ অতি ধীরে এদেশের মাটিতে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তায় সোহরাওয়ার্দীয়া ও চিশতিয়া মতবাদকে স্থানচ্যুত করতে পারেননি; বরং তাদের প্রভাবে উপমহাদেশে ইসলামী শরী'আতের মূল পর্যন্ত নড়ে উঠে। এ অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে অসাধারণ প্রতিভা ও প্রতিপত্তির অধিকারী বিজ্ঞ আলিম নকশবন্দিয়া তরীকাপন্থী হযরত শায়খ আহমাদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক) ষোল শতকে বিরাট সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। এই সংস্কারের ফলে কাদিরীয়া ও নকশবন্দীয়া পন্থীগণ উপমহাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশে এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা য়া। এ সময় থেকে সংস্কৃত নকশবন্দীয়া 'মুজাদ্দিদিয়া' নামে পরিচিত হয়।[৪]

---

১. Dr. T.S. Titus এর গ্রন্থ India Islam এর বরাত দিয়ে উদ্বৃত: ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০, ৪৫, ৫৯
৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০
৪. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ প্রমুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বাংলায় ইসলামের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে যারা সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করেন, তাঁরা হলেন,[১] হযরত মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী (মোঙ্গলকোর্ট), হযরত জালাল উদ্দিন তাবরিজী (লখনৌতি ও পন্ডুয়া ১২১৬ খ্রী.) হযরত মাহমুদ তকি উদ্দিন আরাবী (রাজশাহী ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে), শায়খ শরফুদ্দীন আবুতওয়ামা (সোনারগাঁও ১২৭৮ খ্রি.) শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মনেরী (সোনারগাঁও ১২৭৮ খ্রি.) শাহ্ সূফী শহীদ (হুগলী ১২৯০ খ্রি.) জাফর খাঁ গাজী (উত্তর দক্ষিন ও পশ্চিমবঙ্গ ১২৯৮ খ্রি.), সৈয়দ নাসির উদ্দিনশাহ নেকমর্দান (দিনাজপুর ১৩০২ খ্রি.), শাহজালাল (পূর্ববঙ্গ ও আসাম, ১৩০৩ খ্রি.) সৈয়দ আহমদ তানুরী ওরফেমীরান শাহ (ফেনী, ১৩০৩ খ্রি.) মাওলানা আতা (দিনাজপুর ১৩০৫-১৩৫০ খ্রি.) মাখদুম শাহ জালাল উদ্দিন জাঁহাগাশত বুখারী, (রংপুর ১৩০৭ খ্রি.) সাইয়্যিদ আব্বাস আলী মক্কী ও রওশন আরা (চব্বিশ পরগণা ও খুলনা ১৩২৪ খ্রি.) শায়খ আঁখি সিরাজ উদ্দিন(গৌড় ও পান্ডুয়া ১৩২৫ খ্রি.) শায়খ আলাউল হক, (পান্ডুয়া, ১৩২৫ খ্রি.) সাইয়্যিদ আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, শায়খ হুসাইন যোককারপোশ ও শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ (পান্ডুয়া ১৩২৫খ্রি.) শাহ মোল্লা মিশকীন, শাহ্ নূর, শাহ্ আশরাপ কাবুলী, শাহ্ মান্দারী শাহ্ ও শাহ্ মুবারক আলী (চট্টগ্রাম ১৩৪০ খ্রি.) সাইয়্যিদ রিয়অ ইয়ামনী (উত্তরবঙ্গ ১৩৪২-১৩৮৮খ্রি.) রাসতিশাহ্ ও শাহ্ মুহাম্মদ বাগদাদী (কুমিল্লা ও নোয়াখালী ১৩৫১-১৩৮৮খ্রি.) শায়খ নুর-কুতবুল আলম, শায়খ আনোয়ার শহীদ, শায়খ জাহিদ, (উত্তর ও পূর্ববঙ্গ১৩৫০-১৪৪৭খ্রি.) সাইয়্যিদ আরিফীন, হযরত আরিফীন, (পটুয়াখালী ১৩৫০-১৪০০ ক্রিস্টাব্দের মধ্যে), শাহ্ লঙ্গর, (ঢাকা ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের পুর্বে), শায়খ জয়নুদ্দীন বাগদাদী ও চেহেল গাজী (রংপুর-দিনাজপুর, চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি), হযরত খান জাহান আলী (রা.) (যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও বরিশাল, ১৩৭৯-১৪৫৯খ্রি.), হযরত বড় খান গাজী (যশোর, খুলনা, তেরশা খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে), পীর আলী মুহাম্মদ তাহির, হযরত গরীব শাহ্ হযরত আহরাম শাহ্ পীর বুরহান খাঁ, (যশোর, খুলনা ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি), বদরুদ্দীন বদরে আলম শাহিদী ও শাহ্ মজলিস (১৪৪০ খ্রি.), শায়খ হুসাম উদ্দীন মানিকপুরী, (১৪৭৭খ্রি.) হাজী বাবা সালেহ (নারায়ণগঞ্জ, পনের শতকের শয়খভাগে) শাহ্ সাল্লাহ (সোনারগাঁও ১৪৮২-১৫৬০ খ্রি.) শাহ্ আলী বাগদাদী (ফরিদপুর ও ঢাকা ১৪৯৮ খ্রি.) একদিন শাহ্ (চব্বিশ পরগণা, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) শাহ্ মুয়াজ্জম হুসাইন দানিশমন্দ (রাজশাহী ১৫১৯-১৫৪৫ খ্রি.) শাহ্ জামাল (জামালপুর ১৫৫৬-১৬০৫খ্রি.) হাজী বাহরাম সাক্কা (পশ্চিমবঙ্গ), খাজা শরফুদ্দীন চিশতী (ঢাকা ১৫৫৬-১৬০৬খ্রি.) প্রমুখ। এছাড়া বাংলায় ইসলামের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের আরো কয়েকজন ইসলাম প্রচারকের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেনঃ বায়জিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম মৃ. ৮৭৪ খ্রি.) শাহ্ সুলতান বলখী মাহী সওয়ার (ঢাকা ও বগুড়া, ১০৪৮ খ্রি.) শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (নেত্রকোণা ১০৫৩ খ্রি.), বাবা আদম শহীদ বগুড়া ও বিক্রমপুর ১১৭৯খ্রি.) মাখদুম শাহ্ দৌলা শহীদ (পাবনা, ১২৪০ খ্রি.) শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (ঢাকা), শাহ্ মাখদুম রুপোশ (রাজশাহী ১১৮৪ খ্রি.) ফরিদ উদ্দিন শক্করগঞ্জ, (চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর ১২৬৯ খ্রি.) প্রমুখ।

১. Ibid, P.76

Dhaka University Institutional Repository

সূফী-দরবেশগণের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের কার্যাবলী শুধু তাদের খানকার চার দেয়ালের মধ্যেগ্য সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁরা জনগণের মন ও সমাজের ওপরও প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আরব-পারস্য এবং মধ্য এশিয়া থেকে এসে মুসলমানগণ যখন এ দেশে জয় করেছিলেন, তাঁদের বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক আগমন করে নব সমজা গঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বাংলার জনমানস ও চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ জনসমাজ মননে ও চিন্তায় মুসলিম সুফী-সাধক ও পরী-দরবেশগণের নিকট থেকে অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনাচরণের আদর্শ লাভ করল যা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব ও বিস্ময়কর। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম পীর-ফকীরগণ ইসলামরে মহিমা ও ঐশ্বর্য অনাড়ম্বরভাবে তুলে ধরায় এবং জনসাধারণের ব্যথা-বেদনা বিষাদের অংশ নিজেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা য বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ অসস্কোচে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন হয়। ভারতীয় উপমাহদেশের সর্বত্রই তাঁদের আবাসস্থল ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর দৃশ্যস্থান রয়েছে। সর্বত্র তাঁরা তাঁদের চরিত্র ও কাজের প্রভাব রেখে গেছেন। নানাভাবে তাঁরা ইসলাম ও সমাজের সেবা করেন এবং মুসলিম সামজের উন্নতিকল্পে তাঁরা মুসলিম বিজেতা, সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের অপেক্ষা অধিক স্থায়ী অবদান রেখে যান। আরব, ইরাক, মিসর, আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারতের যে সকল পরী-দরবেশ আমাদের দেশে এসে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, The Sufis or Pirs played and important role in consolidating Muslim power and infusing culture among the masses. The biographical sketch of the sufis reveal that their activities were confined not only within the four walls of their khanqahs, rather they exerted a great influence in the peoples mind and in the society. They come from established khanqahs impeted instructions, while some of them settled and died in this country .... their dargahs and tombs are visited and venerated by hundreds of people even today.

ইসলাম প্রচারের যুগে এদেশে আগমনকরী পীর-দরবেশগণ নীতির ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন। একটি হল আবিদ এবং অপরটি হল মু'মিন। আবিদ শ্রেণীর প্রচারকরা ছিলেন নীরব সাধক এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন আলিম। প্রেম-ভালবাসার নীতির মাধ্যমে ইসলামের মূল আদর্শ ও সৌন্দর্য প্রচার করে লোকদের তাঁরা আকৃষ্ট করতেন। কিন্তু মু'মিন শ্রেণীর ইসলাম প্রচারকগণ প্রত্যেকেই ছিলেন অভিজ্ঞ আলিম, যোদ্ধা। তাঁরা প্রয়োজনের সময় অমুসলিম শাসক বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে এদেশে ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি আমাদের দেশের ইতিহাসে এ শ্রেণীর ইসলাম প্রচারকগণ 'গাযী' হিসেবে অমর হয়ে আছেন।[২]

---

১. Amiya Kumar Banarjee. West Bengal District Gazetters (Howrah). Calcutta, 1922, P.128.

২. মেহরাব আলী, পীর চিহিল গাযী, দিনাজপুর, ১৯৬৮, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সময়ে দেশত্যাগী সূফী-দরবেশগণ এদেশে আসতেন এবং খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের চারপাশে মুরীদ জড়ো করে শিক্ষাদান করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। যে সকল সূফী এদেশে জন্মেছিলেন ও লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাঁরাও একই সাংস্কৃতিক বৃত্তিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এভাবে সূফীগণ মুসলিম সমাজে শাসক শ্রেণী ও আলিমগণের সঙ্গে আরও একটি শক্তির সংযোজন ঘটিয়েছিলেন।[১] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেছেন, "বিভিন্ন সময় শত শত সূফী-দরবেশ ও তাঁদের অনুগামী শিষ্যরা বাংলায় আগমন করেন এবং বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে এমনকি প্রদেশের নিভৃততম কোণেও সাধন করেন। এভাবে তাঁরা মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করেন। তাঁদের আদর্শ, চরিত্র অসামান্য নৈতিক এবং দুঃস্থ মানবতার জন্যে তাঁদের গভীর সহানুভূতি ও সেবা অমুসলমান জনসাধারণকেও তাঁদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসলামের উদারতা ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য, যা সূফী পুরুষগণ তৎকারীন আদর্শ অনুসন্ধানকারী ও সমাজের নির্যাতিত ও অধঃপতিত মানুষের নিকট তুলে ধরেছিলেন। [২] সুতরাং এ সকল আর্শবান পুরুষের প্রচারকাজ অমুসলমান, বৌদ্ধ ও সমভাবে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণকে ইসলামের ছায়াতলে আকৃষ্ট করেছিল। তার নিজেদের মুসলমান বলে আখ্যায়িত করত। আবার সে সাথে তাদের কিছু ধর্মবিশ্বাস ও ক্রিয়াপদ্ধতি অটুট থেকে যেত; অবশ্য নাম বদলে যেত। এরকম পরিবর্তনের কথাই শুন্যপুরানে 'নিরঞ্জনের রুস্মা'য় বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] বাংলায় সত্যপীর এর জনপ্রিয়তার মূলে ছিল এই ব্যাপক পরিবর্তন। সত্যপীর কোন ওলী ছিলেন না। সম্ভবত কল্পনা থেকে তার উদ্ভব। তাকে কেন্দ্র করে পরীসুলভ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে নানা জায়গায় তাঁর দরগাহ্ দেখা যায় এবং বহু লোকগাঁথায় তঁর নাম উল্লেখ শুনতে পাওয়া যায়।[৪]

সূফীগণের দরগাহ্গুলোর শুধু অবস্থান বিবেচনা করা হলে দেখা যায় সূফীগণ শুধু প্রধান শহরগুলোয়ই জড়ো জননি, পূর্বদিকে চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে পশ্চিমে মঙ্গলকোট ও পূর্ণিয়া এবং দক্ষিণে বাগেরহাট ও ছোট পান্ডুয়া থেকে উত্তরে কান্তাদুয়ার ও রংপুর পর্যন্ত সারাদেশে তাঁরা ছড়িয়েছিলেন। জীবনকালে তাঁরা জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং আজও শত শত মানুষ তাঁদের দরগাহ্ ও সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসে।[৫] এক কথায় বলা যায়, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারায় পীর-ফকীর ও সূফীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দরবেশগণই বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতার প্রকৃত মশালবাহী। ইসলামে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিধর্মীদের মধ্যে সত্যধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য এই সব পরী দরবেশ আরব ও মধ্য এশিয়ার দূর-দূরান্ত থেকে সুদূর বাংলায় আগমন করেন।

---

১. ড. আবদুল করিম, (অনু. মোহাম্মদ মোকাদ্দেসুর রহমান), বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,পৃ.১৭৬
২. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২০
৩. সি.সি. ব্যানার্জী (সম্পা.) রামাই পন্ডিত,শূণ্যপুরান, কলকাতা-১৩৩৫ বাং, পৃ. ৩৫
৪. ড. আহমদ হাসান দানী, মাহে নও, ১৯৫৩, ফেব্রুয়ারী, পৃ. ৪
৫. ড. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ড. এনামুল হকের ভাষায়,ম "Infact, by the continued activites of the sufis or men imbued with the sufistic ideas, bengal was once so overflooded that the visible effect of that influence can still be marked in many beleifs, practices, songs and outpourings of the Bengali hearts like the silt deposited on a paddy field after a flood From these things we can only imagine, how vast and deep was the magnitude of the influence of the sufis on Bengal.[১]

এভাবে সর্বশ্রেণীর জনসমাজেই সূফী-দরবেশগণের প্রভাব ছিল বিপুল। গলি থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁদের প্রবাব সমভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তৎকালীন সমাজে সূফীবাদ একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সুফী দরবেশগণ এদেশে আগমন করে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় খানকা নির্মাণ করতেন, সেখানে তাঁদের চতুস্পার্শ্বে ভক্ত ও শিষ্যগণ এসে উপস্থিত হতেন। এতে শিষ্যদিগকে নান রকমের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নির্দেশ দেয়া হত। সূফীগণ জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামের যে সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শ তুলে ধরলেন, তা সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃতপক্ষে এ সকর সাধু-দরবেশগণের সাধুতা, নিষ্ঠা এদেশের অসংখ্য শান্তিকামী মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যার্থীগণ এসে সূফী-দরবেশগণের নিকট উপস্থিত হতেন। তাঁদের কেউ কেউ পীরের খানকাহব নিকটেই ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে বাস করতেন এবং সেখানেই তাঁদের ইন্তেকাল হত।

সূফী-দরবেশগণ এ দেশে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে প্রধানত দেশীয় ভাষায় বাংলা ব্যবহার করেছেন। অমুলিম জনসাধারণ আরবী ফারসী ভাষায় বুঝতে না পারার কারণে পীর-দরবেশগণ এদেশের লোকজনের আঞ্চলিক ভাষায় আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন। কুরআন-হাদীসের বিষয়বস্তু আরবী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নও মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে সূফী-দরবেশগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। ফলে বাংলা ভাষার ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য- The teahing and preaching of Islam to the common people gave impetus to the Bengali Language. The sufis and mystics preached the religion in local language, the dialect of the people, because it was through this medium that the could come in direct contact with them. Many literate muslims felt that the converted muslims in general did not understand Arabic and Persian and they were not properly acquainted with the teachings of Islam. They though it their only to write books appertaining to Islamic sociology and religion in Bengali, so that the common mlulims might understand them and regulate their life in accordance with the teachings of their religion.[২]

---

১. Dr. Md. Enamul Haq.Opcit, P.260-61
২. Dr. Md. Abdur Rahim, Socail and Cultural History of Bengal, Vol-1, Karachi-1963, P.76.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ গঠন:

বাংলার মুসলিম সমাজ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক পর্যায়ে যাদের দ্বারা মুসলিম সমাজ গঠিত হয়, তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন তুরস্ক, পারস্য ও আরব বংশোদ্ভূত।[১] তারা অব্যাহত ধারায় বিজেতা, শাসক ও ভাগ্যান্বেষী হিসাবে এ অঞ্চলে আসেন।[২] এঁদের সকলেই ছিলেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী ও আদর্শের বাহক। তাদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

তেরো শতকের প্রথমদিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের পর বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলিমরা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। সে সময়ে বাংলায় ধর্মান্তরিত মুসলিমদের চাইতে তারা ছিল সংখ্যায় বেশী। বাংলায় এ মুসলিম অভিবাসীদেরকে কেন্দ্র করেই মুসলিম সমাজ নির্দিষ্ট রূপ। মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী' থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার খলজী বিহার বিজয়ের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে খলজী বংশের বহু ভাগ্যান্বেষী লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়।[৩] তবকাত-ই-নাসিরী' থেকে আরও জানা যায় যে, বখলিতয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানের প্রাক্কালে তাঁর তিনজন ঘনিষ্ট সহচর মুহাম্মদ শীরন খলজী, হুসমাউদ্দিন ইওয়াজ খলজী ও আলী মর্দান খলজীকে র‍্যাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক সৈন মোতায়েন করেন। অত:পর তিনি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিব্বত অভিযানের বের হন। তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে, বখতিয়ার খলজীর অধীনে বেশ কয়েক হাজার সৈন্য বাংলায় এসেছিল এবং তারা বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিল।[৪]

উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মোঙ্গলরা মধ্য এশিয়া ও ইরানে নির্বিচারে আক্রমণ ও লুণ্ঠন শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে বহু পরিবার বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যবসায়ী, পন্ডিত কারিগর ও শ্রমশিল্পী আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে উত্তর ভারত ও বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয়ের অব্যবহিত পরে মধ্যে এশিয়া ও ইরান থেকে বেশ সংখ্যক মুসলিম পন্ডিত, সূফী সাধক ও পেশাজীবি বাংলায় এসে বসবাস করেন।[৫] বখতিয়ার খলজী লখনৌতিতে মুসলিম রাজ্য স্থাপন করে তাদের প্রয়োজনে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ তৈরী করেন। এভাবে বাংলায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বখতিয়ার খলজীর পর তাঁর তিনি ঘনিষ্ঠ সহচর বাংলায় নিজ নিজ বৃদ্ধিকল্পে বাইর থেকে অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেন।

ইতোমধ্যে আলী মর্দান খলজী বাংলায় নিজ ক্ষমাত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান ইলতুৎমিশের সমর্থন লাভের আশায় দিল্লি যান। ১২০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাংলায় ফিরে আসেন। এভাবে বখতিয়ার খলজীর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও মুসলিম বাংলায়

---

১. আবু উমর মিনহাজুদ্দীন উসমান বিন সিরাজুদ্দীন আল-জুজানী, তবকাত-ই-নাসিরী, কলকাতা-১৮৬৪, পৃ.১৪৭, ১৫৭, ১৫৯-১৬০
২. Refiquddin Ahmad (ed), Islam in Bangladesh, Dhaka, 1983, P.31
৩. মিনহাজ, তবকাত-ই-নাসিরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৭, ১৫২
৪. Dr. M.A rahim, Social & Cultural History of Bangladesh, Karachi, 1985, P. 62
৫. Abdul Karim, Social & Cultural History of Bangladesh, Karachi, 1985, p.61

Dhaka University Institutional Repository

আসেন।[১] শাসনামলে কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দী লখনৌতিতে আসলে আলী মর্দান খলজী তাঁকে লখনৌতির কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। মিনহাজের 'তবকত-ই-নাসিরী' থেকে জানা যায় যে, আলী মর্দান খলজীর সময়ে লখনৌতিতে একজন পারস্য দেশীয় ব্যবসায়ী বিপন্ন অবস্থায় বাংলার শাসকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। [২] এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে এদেশের পারস্য দেশের বণিকও এসেছিলেন।

আলী মর্দান খলজী খুব বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। তাঁর পরবর্তী শাসনকর্তা হুসামুদ্দীন ইওয়াজ খলজী তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে এদেশে আসেন। বাংলার ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সমময়ে মুসলিম রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম শাসন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে মোঙ্গল সেনাপতি চেঙ্গিস খানর আক্রমনে মধ্য এশিয়ার বহু শহর বিধ্বস্ত হয়। ফরে সে সব অঞ্চল থেকে অনেক মুসলিম আলিম ও সুফী বাংলায় চলে আসেন। ইওয়াজ খলজী তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেন।[৩] এরা মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন।

১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইওয়াজ খলজীর মৃত্যু হয়। তাঁরপর থেকে প্রায় ষাট বছরকাল (১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) সাধারণভাবে লখনৌতি দিল্লির সুলতানের অধীনে ছিল। তখন দিল্লি থেকে নতুন করে মুসলিম কর্মচারীদের বাংলায় আগমন ঘটে। এ সময়ে দিল্লী কর্তৃক নিয়োজিত বাংলার শাসনকর্তা তুগরল তুগান খান (১২৩৬ খ্রি.) অযোধ্যার তমর খান (১২৫৪ খ্রি.) বাংলা অধিকারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরুদ্দীন ও বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর ও অনুসারীরা বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনেরমনোনীত শাসক মুগিসুদ্দিন তুগরিলের সংগে বেশ কিছু সংখ্যক ইলবারি তুর্কি বাংলায় আসে। সুলতান বলবান নিজেও তুগরিলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার সময় প্রায় তিন লক্ষ সৈন্যর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাংলায় আসেন। বিদ্রোহ দমনের পর বলবান তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বুগরা খানের নিজেরই বেশ কিছু সৈন্য ছিল এবং তাঁর পিতাও সম্বত তাঁর কর্তৃত্ব সুসংহত করার জন্য তাঁকে একটি শক্তিশালী সৈন্যদল সরবরাহ করে থাকবেন। বুগরা খানের শাসনামলে ১৫০০০ ইলবারি তুর্কি সপরিবারে বাংলায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। [৪]

১২৯০ খ্রিস্টাব্দে খলজীরা দিল্লির সিংহাসন দখল করার পর ইলবারি তুর্কিদের অনেকেই খলজীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দিল্লি ত্যাগ করে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের অনেকে আবার খলজীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েও বাংলায় আসেন। জিয়াউদ্দীন বরণির মতে জালালুদ্দীন ফিরুজ খলজী এক হাজার ইলবারি তুর্কিকে বাংলায় পাঠিয়ে দেন।[৫] এ সময়ে বাংলার

---

১. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ঢাকা-১৯৭৭, পৃ. ৯১
২. মিনহাজ, তবকাত-ই-নাসিরী, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক বাংলায় অনূদিত, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ. ৫২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৪. জিয়াউদ্দীন বরণী, তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী, কলকাতা, ১৮৬২, পৃ.৯২
৫. জিয়াউদ্দীন বরণী, তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী, কলকাতা, ১৮৬২, পৃ.১৪১

Dhaka University Institutional Repository

সীমান্তে বিপুল সংখ্যক মুসলিমের সমাগম হয়। এদের মধ্যে অনেকে সূফী ও গাজী ছিলেন। বাংলার সুলতান এসকল মুসলিমকে বিদেশী হিসেবে সৈন্যদলভুক্ত করে তাদের সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত করেন।[১] এ সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বেশ কিছু সংখ্যক যুবরাজ এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকও বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউস (১২৯০-১৩০১ খ্রি.) তুর্কি ও পারস্যের 'রাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন।[২] রুকনুদ্দীন কায়কাউসের নয় বছরের শাসনকালে দিল্লি খলজী শাসকদের বাংলার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই স্বাধীন সুলতান হিসেবে কায়কাউস বাংলায় তার রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর সময়ে মুসলিম রাজ্য চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। এ কারণেই বহু স্থান থেকে মুসলিমগণ এখানে এসে বসতি স্থাপনে আকৃষ্ট হয়। তুগলকগণ ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে খলজীর ক্ষমতাচ্যুত করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। ফলে দিল্লি থেকে পুনরায় খলজী বংশীয় তুর্কি অভিজাতদের অনেকেই বাংলায় আসেন। তুগলকদের অন্তর্বিরোধের কারণেও বহু লোক বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মদ বিন তুগলক সিংহাসনে আরোহণ করার পর অনেক আমীর দিল্লির সুলতানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া উদ্দেশ্যে বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের (১৩০১-১৩২২ খ্রি.) দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৩]
দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলক ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা অধিকার করে বাংলার মুসলিম রাজ্যক লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও এ তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে পুনর্গঠিত করেন।[৪] এরপর তিনি নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিমকে লখনৌতির ভ্রাং রাহরাম খানকে সাতগাঁও ও সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বাংলার নতুন প্রশাসনের অধিকাংশই ছিল বহিরাগত মুসলিম।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করার পর বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল করেন। তিনি দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও প্রশাসক বাংলায় পাঠান। তিনি প্রশাসনিক বিভাগে শাসনকর্তার সংগে যুগ্ম প্রশাসক নিয়োগেরও ব্যবস্থা করেন।[৫]

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও দিল্লি এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেশ কিছু লোক বাংলায় আসেন। মুহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বকালের শায়খ দিকে দুবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় শহরের ত্রাণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে জনগণের দুর্দশা বেড়ে যায়। ফলে বহুলোক তাদে রপরিবার ও পরিজনসহ বাংলায় চলে আসে।[৬] অযোধ্যার শাসনকর্তা ইয়ামিন-উল-মুলক তুগলকের দিল্লি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে তাঁর সৈন্য বাহিনীর বহু সৈন্য ও তাঁর সমর্থকরা সুলতানের রোষ থেকে রক্ষ পাওয়ার জন্য বাংলায় চলে আসেন।[৭]

---

১. JASB, Vol-18, P.1922, P.41 414-15
২. JASB Vol-18, P. 1873 P.247-48
৩. ইবনে বতুতা, দি রেহলা, বৈরুত, ১৯৬৪, পৃ. ৪৩৯
৪. জিয়াউদ্দিন বরণী তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী, কলকাতা, ১৮৬২, পৃ. ৪৫৪, ৪৬১
৫. Mohar Ali, History of The Muslim of Bengal, Vol-1, Ryath, 1885, P.768
৬. Ibid, P.768
৭. আবুল কাসিম হিন্দু শাহ ফিরিশতাহ, তারিখ-ই-ফিরিশতাহ নেওয়াল কিশোর সংস্করণ, ১৮৮৪, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে খলজী ও তুগলক সুলতানদের রাজত্বকারে মসলিমদের বাংলায় আগমন ঘটে। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার শুরু হয়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শায়খ পর্যন্ত হাজী ইলিয়াস শাহ সাফল্য লাভ করেন এবং তিনি বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস শাহ ছিলেন পারস্যের সিজিস্তানের অধিবাসী।[১] তাঁর সংগেও বহু মুসলিম বাংলায় এসেছিলেন।

তুলনামূলক বিচারে দিল্লি সালতানাত অপেক্ষা ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলায় অধিক শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। এ সময়ে তৈমূল লঙ দিল্লি আক্রমণ করে (১৩৯৮ খ্রি.) চারদিকে লুটতরাজ এবং পুরুষ এ মহিলাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকেন। এভাবে তিনি দিল্লিতে এক ত্রাস সৃষ্টি করেন। এ অরাজক পরিস্থিতির জের সৈয়দ এবঙ লুদীদের শাসনকালেও চলতে থাকে। ফলে বহুলোক দিল্লি থেকে বাংলায় চলে আসেন। এ কারণে ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইবনে বতুতা তাঁর গ্রন্থে বাংলায় বিপুল সংখ্যক ফকীরের কথা উল্লেখ করেছেন।[২] তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সুলতান ফখরুদ্দীন শায়েদা নামে একজন ফরীরকে চট্টগ্রামে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। শায়েদা অন্যান্য ফকীরের সাহায্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে (১৩৫৮-১৩৯০ খ্রি.) বিখ্যাত সুফী শায়খ আলা ইল হক পান্ডুয়ার ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে যে, তিনি এত অর্থ ব্যয় করতেন যে, তা সুলতানের পক্ষেও ব্যয় করা সম্ভব ছিল না। তাই সুলতান তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং তাঁর জনপ্রিয়তায় শঙ্কিত হয়ে শায়খ আলা-উল হককে পান্ডুয়া ছেড়ে পূর্ব বাংলায় সোনারগাঁওয়ে যেতে বাধ্য করেন।[৩] দুবছর পর সুলতান পুনরায় তাঁকে রাজধানীতে ফিরে আনেন। শায়খ আলউল হক তাঁর বাকী জীবন রাজধানীতেই অতিবাহিত করেছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহও (১৩৯০-১৪১১ খ্রি.) পন্ডিত ও সূফী সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁদেরকে তাঁর রাজ্যে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করতেন। গুলাম আলী আজাদ বিলগ্রামীর বিবরণ তেকে জানা যায় যে, তাঁর রাজত্বকালে আবিসিনিয়া থেকেও কিছু সংখ্যক মুসলিম বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৪]

রাজা গণেশের ক্ষমতা দখল এবং পরবর্তী সময়ে শায়খ নূর কুতুব আলমের হস্তক্ষেপে গণেশের পুত্রের ইসলাম র্ধম গ্রহণে বোঝা যায় সে, সময় বাংলায় মুসলিমগণএক শক্তিশালী সমাজ্যে পরিণত হয়। ফলে রাজনীতিতেও তাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পরীবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানরা বাংলার বিভিন্নস্থানে মুসলিম বসতি স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে ক্রমে ক্রমে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের রাজ্যকালে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে খান জাহান আলীর প্রচেষ্টায় বর্তমান খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সময়ে বরিশাল জেলায়ও মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়।[৫] বারবক শাহ অন্যান্য বিভাগসহ সেনা বিভাগে প্রায় ৮০০০

১. আল-সাখাভী, আল-জউল-লামি, পর্ব-২, কায়রো, ১৩০৩ হিজরি, পৃ. ১৩৩
২. ইবনে বতুতা, দি রেহলা, বৈরুতে, ১৯৬৪ পৃ. ৬১৫
৩. শায়খ আবদুল হক দেহলভী, আখবার-উল-আখিয়ার ফী আসরার-উল্ আবরার, দিল্লী-১৩৩২, পৃ. ১৪৩
৪. Islamic Culture, Vol-32, Hydrabad, 1958, P.200
৫. JASB, 1960, P.407.

Dhaka University Institutional Repository

আবিসিনিয়ার অধিবাসীদের নিয়েগ করেন। এ সময় কিছু সংখ্যক আরবও বাংলায় আসে। জানা যায় যে, কুরাই বংশীয় নেতা শাহ ইসমাঈল গাজী তাঁর একশত বিশজন অনুসারী নিয়ে হুগলি (মান্দারান) ও রংপুরে (কান্তাদুয়ারে) বসতি স্থাপন করেন। ফলে বহিরাগত মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এমনকি, এক পর্যায়ে হাবশীরা ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন। হাবশী সুলতানগণ প্রায় ছয় বছর (১৪৮৭-১৪৯৩খ্রি.) রাজত্ব করেন। ইতোমধ্যে আরবদেশীয় মুসলিমদের প্রাধান্য বিস্তার পেলে হুসেন শাহ হাবশীদের ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলার সিংহাসনে বসেন (১৪৯৩ খ্রি.)।

পুতর্গিজ সূত্রে জানা যায় যে, হুসেন শহ পাঁচশ অনুসারী নিয়ে বাংলায় আসেন। আরাকানিদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান কারে চট্টগ্রামে বসবাসরত ধনাঢ্য আরব ব্যবসায়ী আলফা হুসাইনি তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বিনিময়ে সুলতান তাঁর মেয়েকে আলফা হুসাইনির সংঙ্গে বিবাহ দেন। এরপর থেকে আলপা হুসাইনি চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করেন। মরহুম মীর ইয়াহিয়া ইসলাবাবাদি, মোল্লা মুঈনুদ্দীন সন্দ্বীপি প্রমুখ তাঁর বংশধর বলে দাবি করেন।[১]

হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হুসেন শাহ তাঁর বিভিন্ন বিভাগে সৈয়দ, মুগল ও আফগানদের চাকরীতে নিয়োগ করেন। তারা সম্ভবত দিল্লিতে সৈয়দ বংশ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলায় আসেন। হুসেন শাহী আমলে, বিশেষকরে আলউদ্দীন হসেন শাহের সময়ে বাংলায় বহু মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়। এতে অনুমতি হয় যে, সে সময়ে বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাঁর সময়ে লুদিদের আক্রমণে জৈন্যপুরের সুলতান শাহ শর্কী বিপুল সংখ্যক অনুসারীসহ বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লুদি পরাজিত হলে লুদিরা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং তাদের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। ফলে তাদের অনেকেই বাংলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বাংলার সুলতান নুসরাত শঅহ তাদের যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুযায়ী বিপুল পরিমান জমিজমা দান করেন।[২] নবাগত আফগানদের সঙ্গে ইবরাহিম লুদির কন্যাও বাংলায় আসেন। নুসরত শাহ্ তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৩]

আফগান শাসকদের সময়েও বাংলায় মুসলিমদের আগমন অব্যাহত থাকে। আফগান নেতা শেরশাহ বাংলাকে ১৯টি প্রশাসনিক এলাকায় (সরকারে) বিভক্ত করেন। তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদের অনেককে তিনি এ সব এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জয়গীরগুলো পরবর্তীকোলে সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহঙ্গীরের সময়ে মুগল বিরোধী বিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৪] এভাবে জায়গীর সৃষ্টির ফলে বেশ কিছু শক্তিশালী মুসলিম জমিদারীর উৎপত্তি হয়। বাংলার শায়খ আফগান শাসক দাউদ খান কররনীর সৈন্যদলে ৪০, ০০০ অশ্বারোহী, ৩.৩০০ হাতি ও ১৪০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। এছাড়াও তাঁর বহু আত্মীয়-স্বজন ও ভৃত্য ছিল। দাউদ খানের পতনের পর তাদের অধিকাংশই বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।[৫]

---

১. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1872, P.336
২. গোলাম হুসানি সেলিম, রিয়াজ-উস-সালাতীন, কলকাতা-১৮৯৮, পৃ. ১৩৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২
৪. জে.এল. সরকার (সম্পাদিত), হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম-২, পৃ.১৭৭
৫. Mohar Ali, Opcit, P.769

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় সুমলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে থেকে যে সকল মুসলিম সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচারকরাও ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এদেঁরই সমাধিসেধসমূহ কিংবা সমসাময়িককালে বা পরবর্তী সময়ে এসব সমাধি সৌধের সাথে বা নিকটবর্তী স্থানে নির্মিত সমজিদসমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখে। কালের পরিক্রমায় ধর্মপ্রচারকরা কাল্পনিক ব্যক্তি হিসেবে প রিচিতি লাভ করেন। কিন্তু তাদের সমাধিসৌধসমূহে প্রাপ্ত শিলাপিতে দেখা যায় যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁরা প্রত্যেকই তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বাংলায় আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন। বাংলার মুসলিম সমাজ গঠনে তাঁদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় মুসলিমশাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে যে সকল ধর্মপ্রচারক বাংলায় আসেন, তাঁদের মধ্যে শায়খ জালাল মুহম্মদ তবরীজী ছিলেন অন্যতম। তিনি পারস্যের তবরীজ শহরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর মুরশিদ ছিলেন বিখ্যাত সূফী শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী। শায়খ জালাল দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে বাংলায় আসেন (১২১০-১২৩৬ খ্রি.) বাংলার রাজধানী পাভুয়া শহরের বিভিন্ন অট্টালিকা, সমাধিসৌধ ও জামে মসজিদের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বহু অনুসারী ছিল এবং তিনি তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তাঁর নাম অনুসারে দেওতলা এলাকায় তবরীজাবাদ শহর গড়ে উঠে।[২] এখানে জালালিয়া তরীকার বহু সুফীও বসবাস করতেন। এখানে তাঁদের অনেকেই সমাধি রয়েছে। বাংলায় ক্ষমতা দখলের পর মুসলিমদের ওপর রাজ গণেশের অত্যাচার শুরু হলে, দেওতলার সূফীদের অনুরোধে শায়খ নূর কুতুব আলম জৌনপুরে সুলতান ইবরাহিম শর্কীকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান। এতে বোঝা যায় যে, মুসলিম শাসনামলে দেওতলা একটি মুসলিম এলাকা ছিল। তবরীজাবাদ সম্পর্কে তথ্যাদি সম্বলিত চারটি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে।[৩]

শাহ সফীউদ্দীন বাংলায় মুসলিম ভূবাসনকারীদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন। জানা যায় যে, তিনি ছিলেন দিল্লী দরবারের অমাত্য বরখুরদানের পুত্র। তিনি বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১-১৩২২খ্রী.) বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তিনি এখানে স্থানীয় এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে বাংলার সুলতান তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। তিনি এ ধরণের আরও কয়েকটি যুদ্ধ করেন এবং শায়খ পর্যন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্বজনেরা তাঁকে পাভুয়ায় সমাধিস্থ করে পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অল্পকালের মধ্যে পাভুয়ায় তাঁর বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৪]

সমসাময়িক আরেকজন ধর্মপ্রচারক জাফর খান গাজীর নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউস ও শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহের রজত্বকালে (১২৯৮-১৩১৩ খ্রি.) হুগলি অঞ্চলে মুসলিম বসতি বিস্তারে সুচেষ্ট হন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ (৬৯৭হি./১২৯খ্রি.) ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।[৫] প্রায় একই সময়ে শায়খ শাহ জাহালালের নেতৃত্বে সিলেটের মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়। শাহ জালাল ছিলেন একজন বিখ্যাত সূফী-সাধক। সিলেট ও উত্তর পূর্বে বঙ্গে ইসলাম বিস্তারের কৃতিত্ব তাঁরই। শিলালিপিতে ও 'গুলজার-ই-আবরার' গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য আছে যে,

১. আবদুল হক প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪
২. Mohar Ali, Opcit, P.773
৩. JASB 1960, P.296
৪. Proceding to the Asiatic Society of Bengal, 1870, P.124-125.
৫. JASB, 1873, P.287

Dhaka University Institutional Repository

শাহজালাল ছিলেন তুরস্কের (এশিয়া মাইনর) কুনিয়া শহরের অধিবাসী। [১] আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের পর তিনি তাঁর মুরশিদ সৈয়দ আহমদ ইয়অসভীর এর অনুমতি নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু ানুসারীসেহ কুর্নিয়া ত্যাগ করেন। দিল্লিতে পৌছে তিনি শায়খ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অতঃপর তিনি ৩১৩ জন অনুসারীরসহ বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে সিলেটে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি স্থানীয় হিন্দু রাজ গৌরগবিন্দর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হন। আরও জানা যায় যে, শাহজালাল মুসলিম সেনাপতি সিকান্দার খান গাজীকে সিলেট বিজয়ে সাহায্য করেন। [২] সিলেট বিজয়ের পর শাহজালাল সেখানেই ধর্মপ্রচারে ও সামাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় উক্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। সিলেটে নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে ভক্তি করত এবং নানা প্রকার সামগ্রী উপহার দিত। এগুলো সমবেত লোকজন ও অতিথিদের আপ্যায়ণে ব্যবহৃত হত। [৩] তাঁর প্রচেষ্টায়ই সিলেট অঞ্চল বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত হয়।

সিলেটের হযরত শাহজালাল (র.) এর কাছাকাছি সময়ে শায়খ আতা দিনাজপুর অঞ্চলে মুসলিম সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের শায়খ আতার সমাধি আছে। শিলালিপির তথ্যাদি অনুসারে শায়খ আতা ছিলেন একজন মহান সূফী দরবেশ এবং তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। শিলালিপি থেকে আরও জানা যায় যে, সুলতান সিকান্দার শাহ ও শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ উভয়েই শায়খ আতাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

উত্তর বঙ্গে মুসলিম সমাজ গঠনে মখদুম শাহদৌলাহ শহীদের নাম ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন পাবনা জেলার শাহজাদপুর একশ জন মুরীদসহ তাঁর সমাধি রয়েছে। জানা যায় যে, মখদুম শাহ দৌলাহ বহু সংখ্যক মুরীদ ও আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে সুদূর ইয়ামন থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন এবং শাহজাদপুরে বসতি স্থাপন করেন। [৪] কিংবদন্তী অনুসারে মখদুম শাহ তুর্কি আক্রমণের পূর্বে বাংলায় এসেছিলেন। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে তিনি তুর্কি আক্রমণের পর বাংলায় এসেছিলেন। [৫] এতে মনে হয়, তিনি তেরো শতকের শায়খ দিকে কিংবা চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় আসেন। [৬]

ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় বৃহত্তম ঢাকা জেলার বিক্রমপুরস্থ রামপালেও মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাবা আদম শহীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামপালে তাঁর সমাধি আছে। তাঁর সমাধির সাথে একটি মসজিদের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। বাবা আদম শহীদ মক্কা থেকে বিপুল সংখ্যক মুরীদসহ বাংলায় আসেন এবং রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। তখন থেকে রামপালে মুসলিম বসতির সূচনা হয়। [৭]

১. গাউরী মুহম্মদ, গুলজার-ই-আবরার, ১০২২হিজরী/১৬১৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পান্ডুলিপি-২৫৯
২. JASB, 1873, P.813
৩. ইবনে বতুতা, দি রেহলা, বৈরুত, ১৯৬৪, পৃ. ৬১১-৬১৩
৪. Mohar Ali Opcit, P.778
৫. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯-৬০
৬. মুহম্মদ মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৮
৭. JASB, 1873, P.285

Dhaka University Institutional Repository

বাবা আদম শহীদের সমাধির নিকট অবস্থিত মসজিদটি বাবা আদম শহীদের মসজিদ বলে পরিচিত। জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে মারিক কাফুর নামে তাঁর একজন আবিসিনিয়ান কর্মচারী ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে (রজব ৮৮৮ হিজরী) এ মসজিদ নির্মাণ করেন। রামপালের পাশাপাশি গ্রামে আরও দু'টি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। [১] এতে অনুমিত হয় যে, নবম হিজরীর (পনেরো শতকে) শেষের দিকে রামপাল একটি সমৃদ্ধ এলাকা ছিল। এভাবে ধর্মপ্রচারকদের সহায়তায় বাংলার আরও অনেক স্থানে মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়। এ সব ধর্মপ্রচারকের মধ্যে শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার, খান জাহান, মজলিস সাহেব, বদর সাহেব, পীর বদরুদ্দীন, শাহ জালাল দকিনী, শাহ আলী বাগদাদী, শাহ মোয়াজ্জম দানিশমান্দ (শাহ্ দৌলাহ) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার বলখের যুবরাজ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনেও অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু রাজকীয় জাঁকজমক ও আরাম আয়েশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে সূফী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মুরশিদ দামেস্কের শায়খ তওফীকের নির্দেশে তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য সমুদ্র পথে সন্দ্বীপ হয়ে বাংলায় আসেন তিনি বাখরগঞ্জ জেলার হরিরাম নগরে উপস্থিত হলে সেখানকার হিন্দু রাজা বলরাম তাঁকে বাঁধা দেন। যুদ্ধে বলরাম নিহত হলে তাঁর মন্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে বগুড়া জেলার মহাস্থানে যান। সেখানে রাজা পরশুরাম ও তার ভগ্নী শিলা দেবী তাঁকে বাঁধা দেন। যুদ্ধে রাজা পরশুরাম নিহত এবং শিলা দেবী করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[২] শাহ সুলতান মাহিসাওয়ারের সমাধি মহাস্থানে আছে। কথিত আছে যে, তিনি মাছের পিঠে চড়ে বাংলায় আসেন। এজন্য তাঁকে 'মাহিসাওয়ার' বলা হয়।

ঐহিত্য (tradition) থেকেও আভাস পাওয়া যায় যে, মাহিসাওয়ারের সময়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজনৈতিক অরাজতার কারণে বেশ সংখ্যক যুবরাজ পদব্রজে বাংলায় আসেন। পরবর্তীই সময়ে ১৬৮৫ খ্রিআব্দে সম্রাট আওরঙ্গজের কর্তৃক প্রদত্ত সনদে মাহিসাওয়ারের দরগাহ সংলগ্ন লাখেরাজ সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সনদে শাহ সুলতান মাহিসাওয়ারের জমির কোন ক্ষতি সাধন না করার জন্য কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।[৩]

খানজাহান বাংলার মুজাহিদ দরবেশদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বাংলায় মুসলিম শাসন সম্প্রসারণ ও ইসলাম ধর্ম বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রি.) খুলনা জেলায় মুসলিম বসতি গড়ে তোলেন এবং সেখানে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাগেরহাটে সমাহিত আছেন এবং তাঁর সমাধিক উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে। [৪]

১. JASB, 1873, P.284
২. এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলকাতা-১৯৩৫, পৃ.১৪০-১৪১
৩. JASB, 1878, P.92-93
৪. A.H. Dani, Muslim inscription of Bengal No.28.

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায় যে, বদর সাহেব ও তাঁর ভাই মজলিস সাহেব ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। [১] দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে পরী বদর আলমের সমাধি আছে। সে সময়ে সে অঞ্চলের রাজা ছিলেন মহেশ। কথিত আছে যে, মহেশের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পীর বদর আলম সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহেব নিকট সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠান। সুলতান তাঁকে সাহায্য করেন। ফলে হিন্দু রাজা মহেশ পরাজিত হন। এরপর বিনা বাঁধায় পীর বদল আলম হেমতাবাদে মুসলিম উপনিবেশ গড়ে তোলেন।[২]

শাহজালাল দকিনী পনেরো শতকে (নয় হিজরী) ইসলাম প্রচারের জন্য বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে বাংলায় এসে ঢাকার মতিঝিল এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। [৩] একই সময়ে শাহ আলী বাগদাদীও এদেশে এসে ঢাকার মিরপুর বসতি স্থাপন করেন। ঢাকার মতিঝিল ও মিরপুরে উভয়ের মাজার রয়েছে। [৪]

রাজশাহী জেলার বাঘার সমাহিত আছেন শাহ্ মুয়াজ্জম দানিশমান্দ। তিনি 'শহদৌলাহ' নামে সমধিক পরিচিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি খলিফা হারুন-অর-রশিদের বংশধর।[৫] তিনি সুলতান নুসরত শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.) বাগদাদ থেকে প্রথমে রাজশাহীর বাঘার নিকটবর্তী মখদুমপুরে আসেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে প্রভাবশালী আমীর আলা বখশ বরখুরদার লস্করীর কন্যাকে বিয়ে করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাঘার এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি একটি খানকাহ্ নির্মাণ করেন। সুলতান নুসরত শাহ বাঘায় একটি খানকাহ নির্মাণ করেন। ফলে ক্রামান্বয়ে বাঘা প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। বাঘায় শাহদৌলাহর সমাধির নিকটে নুসরত শাহের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। [৬]

পরবর্তী সময়ে বাঘা অঞ্চলের প্রতি মুসলিম শাসকদেরও সুনজর ছিল। কথিত আছে যে, গৌড়ের রাজা শাহদৌলাহকে লখেরাজ জমি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শাহদৌলাহ এ দান গ্রহণ করেননি। পরে শাহদৌলাহর পুত্র হমিদ দানিশ মান্দ গৌড়ের আর এক রাজার নিকট থেকে বাইশটি গ্রাম দান হিসেবে গ্রহণ করেন। মুগল সম্রাট শাহজাহান হামিদ দানিশমান্দের পুত্র আবদুল ওয়াহবকে বিয়াল্লিশটি গ্রাম দান করেছিলেন। [৭] ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে পরিব্রাজক আবদুল লতিফ বাঘায় আসেন। তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে জানা যায় যে, হাওদা মিয়া নামে জনৈক দরবেশ বাঘায় একটি বড় মাদ্রাসা পরিচালনা করেন এবং সেখানে বংশধর ও শিক্ষার্থীগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য গ্রামের চতুস্পার্শ্বস্থ জমি প্রদান করা হয়েছিল। [৮] খানকাহ, মাদ্রাসা ও মসজিদকে কেন্দ্র করে বাঘা দ্রুত উন্নতি লাভ করে।

---

১. এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, কলকাতা-১৯৩৫, পৃ.১৩২-১৩৩
২. বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, দিনাজপুর, ১৯১২, পৃ.২০
৩. আবদুল হক, প্রাগুক্ত।
৪. এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃ. ১৪৩
৫. JASB, 1908, P. 113
৬. Ibid, P. 113
৭. Ibid P. 113
৮. H. Askari, Bengal, Past & Present, Vol-35, 1928, P. 143-46

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, সমাধি ও খানকাহ্‌সমূহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যে সকল সূফী সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কেহ গাজী এবং অন্যরা শহীদ বলে উল্লেখিত। তাঁরা বিপুল সংখ্যক শিষ্য সমভিব্যাহারে বাংলায় এসেছিলেন। এভাবে দীর্ঘদিন যাবত বাংলায় বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ইসলাম প্রচারে সূফী সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণ অবদান রাখায় সমাজে তাঁদের সমাদর ছিল। শাসকগণও তাঁদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদেরকে লাখেরাজ জমি দান করতেন। এতে তাদের পক্ষে মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনসেবামুলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সুবিধা হত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সুবিধা হত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামের বিভিন্ন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হতো।[১] ধর্ম প্রচারকালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের ফলে জনগণের মধ্যে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু ধর্মান্তরিতকরণের গতি ছিল মন্থর। সে সময়ের সাহিত্য কিংবা অন্য কোন উপাদানে বাংলায় ব্যাপক ধর্মান্তরিতকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ধর্মান্তরিতদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় উত্তর বাংলার মেচ উপজাতির একজন নেতার। ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজীর তিব্বত অভিযানের সময় তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'আলী' নাম ধারণ করেন। তিনি কিছুকাল বখতিয়ার সেনা বাহিনীর পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। 'অমৃতকুন্ড' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, 'ভোজর' নামক জনৈক বেদান্ত ব্রাহ্মন আলী মর্দান খলজীর শাসনামলে (১২০১-১২১২খ্রি.) লক্ষ্ণনাবতীতে আসেন। তিনি কাজী রুকনুদ্দীন সমরকন্দীর সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন এবং এ ধর্মের মহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[২] ভোজর ব্রাহ্মণের ইসলাম গ্রহণ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলার মুসলিমদের আগমনের অল্পকালেরদ মধ্যেই হিন্দু নেতৃবৃন্দের মনে ইসলাম ধর্মদ বিশেষ কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত বাংলার মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে দুরবর্তী কামরূপের একজন ব্রাহ্মন বাংলার রাজধানীতে এসে ইসলাম সম্পর্কে নির্দ্বিধায় উন্মুক্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এতে শাসকদের ধর্মীয় উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, এতে আরও বোঝা যায় যে, বাংলার মুসলিম প্রতিষ্ঠার পর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে ধমৃ বিষয়ে মুসলিমদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ কারণে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণে উদ্বুদ্ধ করা সহজ হয়।[৩]

ভোজর ব্রাহ্মনের প্রভাব সম্ভবত তাঁর সহেযোগীদের ওপরও পড়েছিল। কারণ এ সময়ে অন্ত্রাবনাথ নামে কামরূপের আরও একজন ব্রাহ্মণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪] হলায়ুধ মিশ্র 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্ম প্রচারক শায়খ জালালুদ্দীন তাবরীজীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ ধর্মীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করনে এবং পরে এক পর্যায়ে তারা সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৫]

---

১. JASB, 1874, P.296
২. JAPHS, 1953, Vol. Part-
৩. Ibid, P.453
৪. Ibid, P.451
৫. আবদুল করিম, সোশ্যাল হিস্টরি অব দি মুসলিম ইন বেঙ্গল, পৃ.৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ বহু উদাহরণ দেয়া যায় যে, হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এর অন্যতম উদাহরণ রাজাগণেশের পুত্র যদুর ইসলাম গ্রহণ।[১] যদু প্রতিপত্তিশালী ও অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে জালালুদ্দীন নাম ধারণ করে ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। ইসলাম ধর্মে তাঁর দীক্ষা এবং সিংহাসন লাভ এ ধর্মের প্রসারে ও মুসলিম শক্তির বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখে। তার ইসলাম গ্রহণ শুধু রাজ পরিবারেই নয়, সার্বিকভাবে হিন্দু সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরের শাহ সুলতান রুমীর নিকট কোচ উপজাতির রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ সময়ে সন্দ্বীপের এক স্থানীয় রাজার মন্ত্রীও শাহ সুলতান মাহিসাওয়ারের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।[২] বাগেরহাটের খান জাহান আলীর অনুপ্রেরণায় প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ পরিবারের এক সদস্যও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ তাহির। তিনি পীর আলী নামে সমধিক পরিচিত।[৩] খান জাহান আলী তাকে উজির নিযুক্ত করেন। পীর আলীর প্রেরণায় যশোরের আরওে যে দু'জন ব্রাহ্মণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাদের নাম রাখা হয় কামালুদ্দীন চৌধুরী ও জামালুদ্দীন চৌধুরী। পরে তারা যাশোর জেলার সিংঘাটিয়ার জমিদারী লাভ করেন। [৪] 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৫] শায়খ চান্দের 'রসূল বিজয়' কাব্যে তিনজন ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরও এ ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেন।[৬]

সুলায়মান কররানী ও দাউদ খান কররানীর সেনাপতি কালাপাহাড় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে কায়স্থ ছিলেন। বাংলার বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খানের পিতা কালিদাস গজদানী ছিলেন হুসেন শাহী সুলতানদের রাজকার্যে নিযুক্ত একজন রাজপুত ক্ষত্রিয়। ইসরাম ধর্ম গ্রহণের পর তিনি সুলায়মান নাম ধারণ করেন। "বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে" উল্লেখ আছে যে, পাবনা জেলার শাহজাদপুরের জমিদার রাজা রায়ের পুত্র রঘুরায় ইসলাম খানের সময়ে ইসলাম দীক্ষিত হন। [৭]

মিশ্র বিবাহের ফলেও বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের নানা কারণে মুসলিম শাসকদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। ক্রমে তাদের মধ্যে সামাজিক অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায় এবং এতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের অন্যতম স্ত্রী ফুলমতী বেগম একজন বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন।৪ বেগম ফুলমতীর গর্ভে সুলতানের কয়েকজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। [৮] বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ থেকে জানা যায়।

---

১. এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃ.১৩৮-১৪১
২. JASB, 1874, P.1867-132
৩. M.A Rahim, Opcit, P.65.
৪. Ibid, P. 65
৫. বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যভগবত, আদি, চতুর্দশ, অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, ৩য় সংরক্করণ, চৈতন্যাব্দ ৪৫২
৬. শায়খ চান্দ, রসূল বিজয়, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১০৪৩ বঙ্গাব্দ, ৩য় খন্ড, পৃ.১০০-১০১
৭. মির্জা নাথান, বাহারিস্তান-ই-গায়েবী, ইংরেজী অনুবাদ এম,আই, বোরাহ, গৌহাটি, ১৯৩৬, পৃ.৩২
৮. এন.কে. ভট্টশালী, কয়েন্স এ্যান্ড কোনোলজি অব দি আর্লি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সুলতানস্ অব বেঙ্গল ক্যাম্ব্রিজ, ১৯২২, পৃ. ৮৩.

Dhaka University Institutional Repository

যে, সুলতানী আমলে জনৈক কাজী উচ্চ শ্রেণীর এক হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ করেন এবং তাদের কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মে।[১] কবি মুহাম্মদ খান লিখেছেন যে, তার প্রপিতামহ মাহিসাওয়ার একজন ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। এ পরিবারে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী আমলে বেশ কয়েকজন শাসনকর্তা জন্মগ্রহণ করেন।[২] মুসলিম শাসক ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সাহচর্যের কারণে অনেক ব্রাহ্মন ও কায়স্থ পরিবার সমাজচ্যুত হওয়ার আশংকায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হন।[৩] সময়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং এদের অনেকেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

ইবনে বতুতার বিবরণে পাওয়া যায় যে, সিলেটের হযরত শাহজালালের অনুপ্রেরণায় স্থানীয় অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৪] রুকনুদ্দীন কায়কাউসের শিলালিপিতে আভাস পাওয়া যায় যে, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল। আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আমলে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। সুলতান তার শাসনকালে ইসলামের প্রসার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়।[৫] পতুর্গিজ বণিক বারবাসো বলেন, "রাজা একজন মুর; তিনি অতিশয় ধনী এবং মহান শাসক। তিনি হিন্দু অধ্যুষিত একটি বিরাট দেশের মালিক। হিন্দুদের অনেকেই রাজা ও শাসনকর্তাদের অনুগ্রহ লাভের অভিপ্রায়ে প্রতিদিন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে।[৬] এ সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেশ সংখ্যক বৌদ্ধও মুসলিমদের স্বাগত জানায় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৭] বাংলার নব গঠিত মুসলিম সমাজ বাংলায় বসতি স্থাপনকারী এবং ধর্মান্তরিত মুসলিমদের সমন্বয়ে গর্বিত। ধর্মান্তরিত মুসলিমদের মধ্যে সকল শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ছিলেন।

সুলতানী আমলে সুলতানই ছিলেন বাংলার মুসলিম সমাজের প্রধান। বস্তুত, তিনি ছিলেন মুসলিম রাজ্যের সর্বময় কর্তা ও সমাজের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রজারা তাঁর এ সামাজিক সর্বময় ও প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন। তারা মুসলিম শাসকদের সাধারণভাবে তাদের অভিভাবক মনে করত।[৮] শাসক ও সমাজের প্রধানরূপে সুলতানের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের অবস্থান সমাজের উচ্চ স্তরে ছিল। সংখ্যায় অধিক না হলেও তারা সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং বিশেষ সুবিধাদি ভোগ করতেন।

নবগঠিত ক্রমবর্ধমান মুসলিম সমাজের প্রতি সুলতানের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। মুসলিমদের ধর্মবিশ্বাস রক্ষা, তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালনাকে তিনি তাঁর অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করতেন। মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বাংলার বিভিন্ন স্থানে সুলতানগণ মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ এবং উলাম, শায়খ, ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এছাড়া এও লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা এমন কোন কাজ করতেন না, যাতে অমুসলিম প্রজাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। বরং তাঁরা সকলের উন্নতির জন্য নানাভাবে সহায়তা করতেন।[৯]

---

১. বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, পৃ.৫৬
২. আবদুল করিম, বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, পর্ব-১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, অতিরিক্ত সংখ্যা-১৩১০, বাংলা সন, পৃ.১৫৯
৩. M.A Rahim, Opcit, P. 67
৪. ইবনে বতুতা, দি রেহলা, পৃ. ৬১২
৫. মোঃ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা-১৯৫৫, পৃ. ৫৯-৬১, ৬৮, ৯০, ৯২-৯৫, ১১৩
৬. ওয়াকিল আহমদ, মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, ঢাকা-১৯৬৮, পৃ. ৫৮
৭. রামাই পন্ডিত, শুন্য পুরাণ, সি.সি. বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত কলকাতা, ১৩৩৬ বাংলা সন।
৮. বড় চন্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বসন্ত রঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত, ২য় সংরক্ষরণ, কলকাতা, ১৩৪২ বাংলা সন, পৃ.১৪, ৩১, ৫৮
৯. ABM Shamsuddin Ahmad Bengal Under The early Ilyas Shahi Dynarti P. 138-39

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার বিকাশ:

মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মুসলমান, সৈনিক, কর্মচারী ও অনান্যাদের সমাবেশ হয়। এই বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক পীর-দরবেশ, উলামা, শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক বাংলায় আগমন করেন এবং তারা ধর্মীয় প্রচারমূলক কার্যাবলীর পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এভাবে এই বিজয় সুফিদের প্রচার কার্যের জন্য ব্যাপক সুযোগ এনে দেয়। ফলে, তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের প্রজাসাধারণর মধ্যে ধর্মপ্রচাররে নিজেদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট করেন নি সত্য, কিন্তু তারা পীর-দরবেশদেরকে সর্বরকম সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন এবং সকল সম্ভাব্য উপায়ে উলামা ও ধর্মপ্রচারকদরে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। ধর্মের প্রতি শাসনকর্তাগণ নিজেরা অনুরক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতই তারা তাদের নিজ নিজ এলকায় এর উন্নতি বিধান করতে আগ্রহী ছিলেন। তারা অনুভব করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় বাংলাদেশে শক্তিশালী থাকলে তা প্রদেশে মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে একটা সমর্থনের উৎস হবে এবং একে শক্তি জোগাবে। সুতরাং তাঁরা উলামা ও পীর দরবেশদেরকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন এবং ইসলামের উন্নতিকল্পে তাদেরকে সমর্থন দান করতেন।

পীর-দরবেশ ও উলামার প্রতি বাঙালি মুসলমান শাসনকর্তাদের সম্মান প্রদর্শন এবং বাংলাদেশে পীরদের প্রচারমূলক কার্যাবলীর প্রতি তাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। মুসলমান বিজয়ী ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন-বখতিয়ার খলজী শায়খদের জন্য অনেক খানকাহ্ নির্মাণ করেন এবং তার এই দৃষ্টান্ত আমির ওমরাহও অনুসরণ করেন। [১] মিনহাজের মতে, গিয়াসউদ্দিন আওয়াজ খলজী পীর-দরবেশদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলার শাসনকর্তারূপে তিনি শায়খ ও উলামার প্রতি অনুরূপভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং এভাবে মুসলমানদেরকেও উদ্ধুদ্ধ করেন। মিনহাজের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সুফি-দরবেশদেরকে বৃত্তি ও ভাতাদানের ব্যাপারে আওয়াজ খুব উদার ছিলেন।[২]

সুলতান বলবনের সময়ে, বাংলার শাসনবর্তা মুগীসুদ্দিন তুগ্রিল পীর-দরবেশদের প্রত এতবেশি অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের দরবেশদেরকে তিনমণ স্বর্ণ দান করেন। [৩] ইবনে বতুতার মতে, ফকির ও সুফি-দরবেশদের প্রতি ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের গভীর ভক্তি ছিল। এই মুরদেশীয় পরিব্রাজক মন্তব্য করেন, "ফকিদের প্রতি ফকরুদ্দিনের এত বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি সৈয়দনা নামে একজন কলন্দর দরবেশকে 'সাদাকাওয়ানে' (চট্টগ্রামে) তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তিনি ফকিরদের ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করেন এবং ভ্রমণকালে তাদের ভরণপোষণেরও ব্যবস্থা করেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন, "সুলতান ফখরুদ্দিন নির্দেশ দেন যে, নদীপথে ফকিরদের নিকট থেকে কোনরূপ ভাড়া নেয়া হবে না এবং যাদের নিকট কোনো কিছু নেই তাদেরকে ভ্রমণ পথে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। যখন কোন ফকির গ্রামে আগমন করেন, তখন তাঁকে অর্ধ দিনার দেয়া হয়।"[৪]

---

১. তাবকৎ-ই-নাসিরী প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩
৩. জিয়াউদ্দীন বারণী, পৃ.৯১।
৪. Ibn Battuta, N.K. Battasali, Coins and Chronology etc. P. 136-43

Dhaka University Institutional Repository

ধার্মিক সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ পীর-দরবেশকে খুব সম্মান করতেন। যখন তিনি গোরক্ষপুর অঞ্চল জয় করেন তখন তিনি বাহরাইচে অবস্থিত শায়খ মাসুদ গাজীর মাজার শরীফ জিয়ারত করেন। সে সময়ে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, যদি তিনি দিল্লি শহর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন তাহলে তিনি শায়খ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার 'দরগাহ' জিয়ারত করবেন এবং এই বিখ্যাত দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। যখন সুলতান ইলিয়াস শাহ সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক 'একঢালা দুর্গে অবরুদ্ধ হন, সে সময় পাণ্ডুয়ায় শায়খ রাজা বিয়াবানী মৃত্যুবরণ করেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ এই দরবেশের খুব অনুরক্ত ছিলেন। দরবেশের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইলিয়াস শাহ ফকিরের ছদ্মবেশে একডালা দুর্গ থেকে বের হয়ে আসেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি প্রিয় শায়খের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।[১]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের ধর্মানুরাগ, পাণ্ডিত্য এবং পীর-দরবেশদের প্রতি প্রীতির জন্য খ্যাতি ছিল। তিনি নূর কুতুব আলমকে খুব সম্মান করতেন। সুলতান বাল্যকালে তার সহপাঠি ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে শায়খ নূর কুতুব আলমকে উপহার ও আহার্য সামগ্রী পাঠাতেন। এই সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই পণ্ডিত কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর আরবি ও ফারসি ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী বিষয়সমূহ জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় তার "ইউসুফ-জুলেখা" কাব্য রচনা করেন। জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ শায়খদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি নির্বাসিত সূফী-দরবেশ শায়খ জাহিদকে সোনারগাঁও থেকে পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়ে আনেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে তিনি প্রায়ই নিজে পীরের নিকট হাজির হতেন। বাংলার আফগান শাসক সুলেমান কররানী ১৫০ জন শায়খ ও উলামার সঙ্গে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় সারারাত কাটিয়ে দিতেন। সম্রাট আকবর তার ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় এই আফগান শাসকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।[২]

মুসলমান সভাসদবর্গ ও রাজকর্মচারীগণ শায়খদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে শাসনকর্তা ও সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। পীর-দরবেশদের মাজার জিয়ারতের ব্রত গ্রহণ করা তাদের মধ্যে খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। 'বাহারিস্তান' থেকে জানা যায় যে, মীর্জা নাথন 'তার পিতার অসুস্থ অবস্থায়' শপথ করেন যে, তার রোগমুক্তির পর তিনি পবিত্র সূফী দরবেশ শায়খ নূর কুতুব আলমের মাজার শরীফ পরিদর্শন করবেন।" ঘোড়াঘাট থেকে মীর্জা নাথন পাণ্ডুয়ায় গমন করেন এবং প্রথমেই তিনি 'শাহ মুকাম' নামে পরিচিত কুতুব আলমের বংশধর ও উত্তরাধিকারী 'শায়খ আল-ইসলাম আল-মুসলেমীন' মিয়ান শায়খ মা'সুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি প্রথম দিন শায়খ নূর কুতুব আলমের মাজার জিয়ারত করেন। সেখানে তিনি আরও দুটো দিন অবস্থান করেন এবং তৃতীয় দিনে তিনি ভোজের ব্যবস্থা করেন এবং দান-খয়রাত করেন। এ কয়দিনে তিনি দিনে দু'বার এবং রাত্রে একবার মাজার জিয়ারতে যেতেন। এভাবে তিনি তার অকৃত্রিম ভক্তি ও নিষ্ঠার দ্বারা পরম আশীর্বাদ লাভ করেন।[৩]

---

১. গোলাম হুসায়ন সলিম, রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃ. ৯৭
২. বাদায়ুনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০০
৩. বাহারিস্তান (অনুবাদ), পৃ. ৪২-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সূফীদের প্রতি শাসক, আমির ও কর্মচারীদের অনুরূপ ভক্তি শ্রদ্ধার আরও বহু দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। তারা পীর-দরবেশদের মাজারে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের দরগাহ ও লঙ্গরখানাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাখেরাজ জমি ইত্যাদির সংস্থান করেছেন।

শায়খ ও উলেমার প্রতি শাসনকর্তাদের ভক্তির ফলে, তাঁদের পক্ষে এই নব বিজিত প্রদেশে ধর্মীয় প্রচারমূলক কার্যাবলী পরিচালনার পক্ষে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়। মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করে এবং তাদের মধ্যে ধর্ম ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেয়।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মত, শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১ খ্রি.) ধর্মানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা ও শরীয়তের প্রতি নিষ্ঠার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ফিরিস্তা অনুসারে, সুলতান আলিমদের রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান এবং ধর্মীয় প্রশ্নে ন্যায় ও নিরপেক্ষ রায় দানের জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, যদি তারা সঠিকভাবে তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। প্রায় বেশিরভাগ কঠিন মামলাসমূহ (অভিযোগ) সুলতান স্বয়ং নিষ্পত্তি করতেন-বিশেষত সেই সমস্ত মুকদ্দমা যা' কাজীর পক্ষে মীমাংসা করা সম্ভব হত না।[১] সমসাময়িক কালের একজন কবি জৈনুদ্দিন এই সুলতানের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কবি বলেন, ''বহু সম্মানিত ইউসুফ খান সকল জ্ঞানে পারদর্শী। তিনি 'রসূল' বিজয়ের বর্ণনা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করেন।[২]

বাঙালি মুসলমান শাসকগণ তাদের ধর্মনিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব এবং শরীয়াতের অনুশাসনের প্রতি অনুরাগের দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তারা তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ধর্মীয় চরিত্রের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা এবং কায়রোর সুলতানের প্রতি তাদের আনুগত্য থেকে বুঝা যায় যে, বাংলার মুসলমান সমাজ দুনিয়ার বিশাল মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং এর প্রধান ছিলেন খলিফা। বাঙালি সুলতানদের কারো কারো মুদ্রায় এর সাক্ষ্য বহন করছে।[৩] সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ কায়রোতে খলিফার নিকট উপহার প্রেরণ করে তাঁর নিকট থেকে খেতাব লাভ করেছিলেন।[৪]

সুলতানগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতেও নেতৃত্ব দান করতেন এবং এভাবে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টিতে সহায়তা করতেন। তারা মক্কা-মদিনার পবিত্র শহরগুলোতে নিয়মিতভাবে উপহার উপঢৌকন প্রেরণ করতেন এবং হজ্জ্ব পালনের জন্যে লোকদেরকে সুযোগ-সুবিধা দান করতেন। বিহারের বিখ্যাত সূফী পুরুষ মখদুম শায়খ শরফউদ্দিন এহিয়া মানেরীর শিষ্য মাওলানা মুজাফফর শামস বলখী কর্তৃক সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের নিকট লিখিত কয়েকটি পত্র থেকে জানা যায় যে, সুলতান হজ্জের জন্য কয়েকখানি জাহাজের ব্যবস্থা করতেন। এসব জাহাজ হজ্জ্ব যাত্রীদেরকে চট্টগ্রাম থেকে আরবে নিয়ে যেত। এমনকি, অন্যান্য স্থানের যেমন বিহার ইত্যাদি অঞ্চলের মুসলমানরাও মক্কায় হজ্জ্বে যাওয়ার জন্যে সুলতানের দেয়া এ সকল সুযোগ-সুবিধা লাভে সমর্থ হত।

---

১. ফিরিস্তা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৮
২. এ.হক.কর্তৃক উদ্ধৃত, মুসলিম বাংলার সাহিত্য, পৃ. ৬১
৩. JASB, 1875, P. 263
৪. E. Derison Ross Arabic History of Guzrat, Vol-3, P. 179

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানের নিকট একটি পত্রে মাওলানা মুজাফফর শামস লিখেন, "এখন হজ্জের মৌসুম আসছে; মক্কায় যাবার উদ্দেশ্য গরীব-দরবেশদের একটি দল আমার নিকট জমায়েত হয়েছে; তাদেরকে প্রথম জাহাজেই জায়গা দানের নির্দেশ দিয়ে চাটগায়ের কর্মচারীর (কারকুন) নিকট অনুগ্রহপূর্বক একটি ফরমান জারি করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।"[১] আর একটি পত্রে মাওলানা প্রথম হজ্জ যাত্রীবাহী জাহাজে দরবেশদের জায়গায় বন্দোবস্ত করার জন্যে চট্টগ্রামে কর্মচারীদেরকে আর্শীবাদ করেন।[২]

বাংলার বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানগণ যে বিপুল সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করেছেন সেগুলোতে তাদের ধর্মীয় আবেগ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টিতে তাদের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমান শাসকগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতিতে মসজিদগুলোর গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সুলতানদের এই মহৎ দৃষ্টান্ত আমির-ওমরা, রাজকর্মচারীগণ এবং এমনকি, অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ অনুসরণ করে চলেন। অসংখ্য মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বহু শহর ও গ্রামে আবিস্কৃত হয়েছে। মুসলমান শাসনকর্তাদের গভীর ধর্মীয় আবেগের প্রমাণস্বরূপ প্রথম যুগে নির্মিত কিছু সংখ্যক মসজিদ ধর্মীয় কেন্দ্রের গুরুত্ব নিয়ে আজও বিদ্যমান আছে। মসজিদগুলোতে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নির্মাতাগণ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও মুসলমানদের সংহতির উদ্দেশ্যে এগুলো নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্যেকটি উৎকীর্ণ শিলালিপি কুরআনের আয়াত অথবা রাসূলের বাণী উদ্ধৃত্ত ধর্মোপদেশ বহন করেছে। ১৩৬৪-১৩৭৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সুলতান সিকান্দার শাহ কর্তৃক পাণ্ডুয়ার আদিনায় নির্মিত বিরাট মসজিদটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৫০৭$\frac{1}{2}$ ফুট দীর্ঘ এবং ২৮৫$\frac{1}{2}$ ফুট প্রস্থ বিশাল চিত্তাকর্ষক মসজিদটি এ উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ভবন। আদিনা মসজিদটি এ উপমহাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ভবন। আদিনা মসজিদ সুলতান সিকান্দার শাহের ধর্মীয় আবেগের মূর্ত প্রতীক এভং বিরাট জামাতের নামাজের মাধ্যমে মুসলমানদের সংহতির জন্য তাঁর আগ্রহের বাহ্যিক প্রকাশ পায়। ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে মালদহের ফিরোজপুরে সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার একটি উৎকীর্ণ লিপি মুসলমানদেরকে শিক্ষা সম্বন্ধে রাসূলের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়, "জ্ঞানান্বেষণ কর, সেজন্য যদি সুদূর চীনেও যেতে হয়।" এই উৎকীর্ণ লিপিতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ধর্মবিজ্ঞান বিষয়াদির অনুশীলন ও শিক্ষাদান-আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এবং তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের একটি পন্থা।[৩] ত্রিবেনীতে ৬৯৮ হিজরী (১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান রুকনউদ্দিন কাউসের জনৈক রাজকর্মচারী কাজী নাসিরউদ্দিন কর্তৃক নির্মিত একটি মাদ্রাসায় অন্য আর একটি শিলালিপিতে এই একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই উৎকীর্ণ লিপিতে রাসূলুল্লাহর বাণী উদ্বৃত্ত করা হয়েছে, "তোমাদের জ্ঞানার্জন করা উচিত, কেননা, জ্ঞানার্জনই সত্যিকারের আত্মনিবেদন, এর অনুসন্ধানই ভক্তি এবং এর আলোচনাতেই গৌরব।[৪]

---

১. গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী, 'খাজিনাত-ই-আমিরাহা, নওল কিশোর প্রেস, পৃ. ১৮৩-৮৪
২. অধ্যাপক এইচ. আসকারী কর্তৃক 'বিহার রিসার্চ সোসাইটি' পত্রিকায় প্রকাশিত, সংখ্যা-৪২, দ্বিতীয় খণ্ড, ১-১৯
৩. JASB, 1973, P. 282
৪. JASB, 1874, P. 303

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ভাবধারা বিকাশে মাদ্রাসা ও মহাবিদ্যালয়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং এদের উন্নয়নের ব্যাপারে মুসলমান শাসক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন, কারণ তারা মনে করতেন যে, মুসলমানদের উন্নতির জন্য এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন। মিনহাজ বলেন, মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। সুলতান রুকনউদ্দিন কাউকাউসের রাজত্বকালে কাজী আল-নাসির মুহাম্মদ ৬৯৮ হিজরীতে (১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) ত্রিবেণীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং শিক্ষার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। জাফর খান কর্তৃক ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে) ত্রিবেণীতে আর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি 'দারুল খায়রাত' নামে পরিচিত হয়। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মালদহের ফিরূজপুরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।১

এন.এল.ল.ই মত পোষণ করেন যে, গিয়াসউদ্দিন আয়াজ খলজী লক্ষ্মণাবতীতে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাংলার বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সময়ে শাসক, সুলতান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ আরও অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। 'শিক্ষা' বিষয়ক অধ্যায়ে মাদ্রাসা ও মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্ত ারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, বিদ্যোৎসাহী বাঙালি সুলতানগণ এই প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরক্কীর জন্যে বহু মাদ্রাসা ও কলেজ স্থাপন করেন। সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের ধর্ম ও ইসলামি শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন। এমনকি মক্কায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জানা যায় যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ প্রচুর ব্যয়ে মক্কায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তিনি মদিনাতেও আর একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং এর ব্যয় নির্বাহের বন্দোবস্ত করেন।[২] আরও জানা যায় যে, সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহও মক্কায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩]

শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতিঃ

ইসলাম সত্যিকারভাবে মানব জীবনে অগ্রগতির ধর্ম। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ইসলাম নতুন চিন্ত াধারা ও মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে। ইসলাম সমানভাবে মানব ইতিহাসে একটি বিরাট বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিরও সৃষ্টি করেছে। ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেরূপ জোর তাগিদ দিয়েছে, বোধ হয় আর কোনো ধর্মে সেরূপ দেয়া হয়নি। মানুষের দেহ ও মন উভয়ের উন্নতি, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব অগ্রগতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের উপরও ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে।

রসূলের বাণীতে দেখা যায়, শিক্ষালাভ করাকে তিনি প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্যরূপে, এমনকি, আল্লাহর প্রতি গভীর অনুরাগ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মুসলমানগণ তাদের মহানবীর শিক্ষা অনুসরণ করে চলেছে। মুসলমানদের গৌরবদীপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি এই সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।

১. JASB, P. 303
২. শামসুউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল-সাখারী 'আল-দাও আল-লামী' (কায়রো ১৩০৩ হিজরী) দ্বিতীয় অধ্যায়, এবং গুলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী-ই-আমিরাহ' (নওল কিশোর প্রেস), পৃ. ১৮৩
৩. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওমর আল মক্কী ওরফে হাজী দবীর 'জাফর আল-অলিহ বিন মুজাফফর অলিহ' (Arabic History of Guzrati); স্যার মেনিসন রোস কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানরা খিলাফত যুগের পূর্বসূরিদের নিকট থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। যেখানেই তারা গিয়েছে, সেখানেই তারা শিক্ষা ও জ্ঞানের ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে গেছে। রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে, উপমহাদেশে তারা তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাও নিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানগণ এ উপমহাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বজনীনতা ও উদারতার আদর্শ তুলে ধরে। এমনকি, ভারতে মুসলমান সূফি-দরবেশগণও যারা কেবল মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তারাও তাদের শিষ্যদের শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন এবং যথার্থভাবে শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁর শিষ্যত্বে বরণ করেননি। শায়খ আঁখী সিরাজ উসমানকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করার সময়ে শায়খ নিজামউদ্দিন আওলিয়ার মন্তব্য এর সাক্ষ্য বহন করে।[১] শিক্ষা ও জ্ঞানের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা মুসলমানদের পার্থিব ও পারমার্থিব প্রয়োজনের জন্য সকল যুগে সকল দেশে স্বীকৃত হয়েছিল, এতে তাই প্রমাণ হয়।[২]

বাংলার মুসলমানগণ তাদের প্রথম যুগের মুসলমানদের শিক্ষা আদর্শ অনুসরণ করে। যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সাফল্য তাদের পূর্বসূরীদের মত অতটা উল্লেখ্যযোগ্য ছিলনা, তথাপি তারা যে, তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্যবান মনে করত এবং তাদের জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল। তার প্রমাণ আছে। মুসলমান শাসনকর্তাগণ, আমির ওমরাহ, রাজ কর্মচারী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং সর্ব উপায়ে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। উলেমা ও সূফী-দরবেশগণ বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি বিধান করেন। ফলে, শহরে এবং প্রধান প্রধান স্থানসমূহে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা, শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যালয় গড়ে উঠে। মুসলমানদেরকে তাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতিতে শিক্ষার গুরুত্ব অবহিত করার জন্য রাসূলের বাণী খোদিত করে দেয়া হয়েছিল।

শায়খ ও উলেমার ধর্মপ্রচার এবং মাদ্রাসা ও মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই উপলব্ধির সঞ্চার করে যে, শিক্ষা একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং নৈতিক ও পার্থিব প্রয়োজনের নিমিত্ত একান্ত দরকার। অতএব দেখা যায় যে, এমনকি বাংলার সাধারণ মুসলমানরাও তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করে। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে, ঐ যুগের সমাজে শিক্ষা ও শিক্ষিতদেরকে উচ্চ সম্মান দেয়া হত। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের অলংকাররূপে পরিগণিত হতেন। শিক্ষা ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা হত না।

এই সত্য ষোড়শ শতকের একজন মুসলমান কবির রচনায় বিধৃত হয়েছে। কবি তার 'লায়লী মজনু' নামক বাংলা কাব্যে লিখেছেন যে, পিতা নিজেকে একজন সম্মানিত ব্যক্তি মনে করতেন যদি তার পুত্র জ্ঞানের সকল শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করত। শিক্ষাকে মানব জীবনের অলংকার, তার গলার হার ও মাথার পাগড়ী স্বরূপ গণ্য করা হত। বিদ্যাহীন একজন সুপুরুষকেও অযোগ্য ব্যক্তি মনে করা হত।[৩] শিক্ষার প্রতি এরূপ স্পৃহা এদেশে মুসলমান শাসনামলে বাঙালি মুসলমান সমাজকে পরিচালিত করেছে। যে যুগের সমাজ জীবনে শিক্ষার এত উচ্চ মর্যাদা ছিল, সেই যুগের প্রত্যেক পিতামাতা স্বাভাবিকভাবেই তার ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী ছিল।

---

১. আখবারুল আখিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
2. JASB, 1870, P. 285
৩. ড. আহমদ শরীফ (সম্পা.), লায়লী মজনু, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ শতকে মুসলমান পণ্ডিত কবি আলাওলও বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রতি লোকের গভীর অনুরাগের কথা উল্লেখ করেছেন। কবি তাঁর 'তোহফাহ' নামক গ্রন্থে লিখেছে,

"শিক্ষক যখন শিশুকে 'বিসমিল্লাহ' শিক্ষা দেন, তখন শিক্ষক, পিতামাতা ও শিশুর নিকট বেহেস্তের দুয়ার খুলে যায়।[১] কবি আরও বলেন, 'হাজার ভঙ্গের চেয়ে একজন বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেয়। শয়তান বিদ্বান ব্যক্তির ভয়ে এত বেশি ভীত যে, সে তার সম্মুখে আসতে সাহস পায়না; অথচ বহু অশিক্ষিত লোককে শয়তান বিভ্রান্ত করে ও কুপথে নিয়ে যায়। রাসূলের হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যিনি সাতদিন কোন বিদ্বান ব্যক্তির সেবা করেন, তিনি স্রষ্টার নিকট এবং হাজার শহীদের পূণ্য অর্জন করেন। একজন তাপস কেবল স্বীয় মুক্তি সাধন করেন; কিন্তু একজন বিদ্বান ব্যক্তির সান্নিধ্যে শত শত লোক তাদের মুক্তি খুঁজে পায়। অতএব, তোমাদের উচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্বানের সেবা করা। এর দ্বারা তোমরা নরক থেকে রক্ষা পাবে এবং বেহেস্তে দাখিল হবে।[২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালি মুসলমানগণ শিক্ষাকে খুব গুরুত্ব দিতেন, কেননা এতে তারা ধর্মীয় কর্তব্যের একটি অংশ, একে একটি অনুধ্যান এবং স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার ও মুক্তি লাভের পন্থা হিসেবে গণ্য করত। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার প্রতি তারা বিরাট সামাজিক সম্মান দান করত। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে পরিবারের সম্মান বৃদ্ধি করতেন। মুসলিম সমাজ কর্তৃক জ্ঞানার্জনকে এরূপ বিশেষ গুরুত্ব দান করার আরও কারণ ছিল। এ জগতে উন্নতির সোপান হল শিক্ষা। বাংলায় মুসলমানদের শাসনামলে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল। সে যুগে প্রত্যেক মুসলমান যুবকেরই চাকুরি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তা কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতার দ্বারাই সম্ভব হত।

সর্বোপরি, ঐ যুগের মুসলমানরা ছিল তুলনামূলকভাবে অধিক ধনী ও সমৃদ্ধশালী। ফলে, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও সেই পরিমাণে বেশি ছিল। এসব কারণে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্য তালিকাসমূহ এখানে প্রবর্তন করেন। তারা প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা রদবদল করে কিংবা না করেই মাদ্রাসা শিক্ষায় সর্বত্র তা অনুসরণ করেন। বাংলার মুসলমান শাসনকর্তাগণ ও উলামা সম্প্রদায়, যারা এই একই শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেছিলেন স্বভাতই তাঁরা তা বাংলাদেশেও প্রবর্তন করেন। বোখারা থেকে আগত শরফুদ্দিন বাবু তাওয়ামা সোনার্গাও শিক্ষাকেন্দ্রে তার ছাত্রদেরকে ধর্মীয় ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মুসলিম শাসনামলে এদেশে পীর-দরবেশ, উলামা ও শিক্ষকদের অধিকাংশই আরব ও পারস্য থেকে এসেছিলেন।

উচ্চশিক্ষা পর্যালোচনা করতে গিয়ে এটা উল্লেখযোগ্য যে, এ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মত বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও লোকায়ত বিজ্ঞান বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া হত। এই প্রদেশে 'গ্রীক' ও 'ইরানী' চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়ন করা হত এবং এই শাস্ত্রমতে চিকিৎসা চালান হত। 'শরফনামা' গ্রন্থে আমির সাহাবুদ্দিন হাকিম কিরমানী নামক চতুর্দশ শতকের

---

১. আলাওল, তোহফা, পৃ. ১৩৯
২. ঐ, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

একজন বিশিষ্ট বাঙালি চিকিৎসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিকিৎসা বিদ্যায় বিপুল খ্যাতি অর্জন করায় তিনি 'চিকিৎসকদের গৌরব' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন। সুলতান জামালউদ্দিন ফতেহ শাহ্ চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।[১] মীর্জা নাথনের সময়ে কবিরাজ শ্রেণির চিকিৎসক ছাড়াও, বহু চিকিৎসককে এই প্রদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় নিয়োজিত দেখা যায়। বাহারিস্থানের লেখক বলেন যে, তার পিতা হাতিমাম খান ঘোড়াঘাটে দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার নিরাময়ের জন্যে বহু চিকিৎসক ডাকা হয়।[২] মুহাম্মদ সাদিকের 'সুব-ই-সাদিক' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মীর আলাউল মূলক চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়াদিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং উল্লেখিত গ্রন্থাকারের সময়ে তিনি জাহাঙ্গীর নগরের অধিবাসী ছিলেন।

---

১. JASB, 1873, P. 282-286
২. বাহারিস্তান (অনুবাদ), পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

উলামাগণ ইসলামী শিক্ষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সাধারণত তাঁরা শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকতেন। শাসকবর্গ এবং জনসাধারণের কাছে তাঁদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। উলামাগণ ধর্মীয় শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলে তাঁদের মধ্য থেকে কাজী, সদর, মুফতী, মীর, আদল ও মুহতাসিব নিয়োগ করা হত।[১]

সূফীগণ ইসলামী ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন এবং তাঁদের অনুসারীদের আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা দিতেন। তাঁদের খানকাহ ছিল আধ্যাত্মিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। তাঁরা জনগণকে ধর্মীয় উপদেশ দিতেন এবং শাসকবর্গকে ধর্মীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। এছাড়া তাঁরা স্থানীয় জনগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতেন। সূফীগণ আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকতেন।[২]

বিদেশ থেকে আগত সূফী দরবেশগণের মধ্যে অনেকে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলিম ছিলেন। সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশে প্রথম আগমনকাল থেকেই লোকদের শিক্ষাদানের দিকে মনসংযোগ করেন। সেজন্য খানকাহর সঙ্গে তাঁরা মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারা গণশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সেজন্য খানকাহগুলো ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানের কেন্দ্র। এসব শিক্ষা কেন্দ্র চতুর্দিক থেকে শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। কিছু সংখ্যক ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লে করা যায় যেগুলো সূফী-দরবেশগণের খানকায় গড়ে উঠেছিল এবং এগুলোর বিচ্ছুরিত জ্ঞানালোকে বাংলা ও উত্তর ভারত আলোকিত হয়েছিল। এ শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত ছিল।

কাজী রুকনুদ্দীন সমরকান্দী (মৃত. ১২১৮ খ্রিঃ) বঙ্গে মুসলিম শাসনের প্রথম যুগের একজন খ্যাতনাম পণ্ডিত। তিনি ছিলেন আলী মর্দান খিলজীর (১২১০-১৩ খ্রিঃ) রাজত্বকালে লক্ষণাবর্তীর কাযী তাঁকে সমরকন্দে বিখ্যাত হানাফী আইনজ্ঞ ও সূফী কাযী রুকনুদ্দীন মতে, "তিনি হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলীর সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয়। ব্লকম্যানের মতে, "তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষণাবর্তী বা গৌড়ের কাযী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন 'কিতাবুল ইরশাদের লেখক এবং 'আল খিলাফি ওয়াল জাদাল' (দার্শনিক বিরোধিতা) বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। ইতি ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দে বুখারায় মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

কামরূপে ভোজের ব্রাহ্মণ নামে একজন যোগি লক্ষণাবতী আসেন এবং তার সাথে ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনায় পরাস্ত হন। ইসলামের উচ্চতর আদর্শ অনুধান করে এই হিন্দুযোগি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে এতবেশি পারদর্শীতা লাভ করেন যে, মুসলিম ধর্মবেত্তাগণ তাঁকে মুফতীর মর্যাদা দেন এবং ধর্ম বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার অনুমতিও প্রদান করেন। তিনি কাযী রুকনুদ্দীনকে 'অমৃতকাণ্ড' নামক একখানা গ্রন্থ উপহার দেন, যা হিন্দু মরমীবাদের উপর লিখিত। এই যোগির সহযোগিতায় কাযী রুকনুদ্দীন 'অমৃতকাণ্ড' গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি নিজেও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন অভ্যাস করেন।[৪]

---

১. ফিরিশতাহ্, তারিখ-ই-ফিরিশতাহ, পর্ব-২, পৃ. ২৯৮
২. আব্দুল করিম, সোশ্যাল হিস্টরি অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, পৃ. ১২৪-১৩৯, ১৫২
৩. Historial Society, 1953, Vol-1, P. 86
৪. Ibid, P. 46

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে অম্ভাহনাথ নামে আরেক জন ব্রাহ্মণযোগির সহায়তায় জনৈক অজ্ঞাতনামা[১] লোক কর্তৃক 'অমৃতকাণ্ড' পুনরায় আরবীতে অনূদিত হয়। এ যোগি ও ভোজর ব্রাহ্মণের ন্যায় কামরূপের অধিবাসী ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন, "মরমীবাদ সম্পর্কিত এই সংস্কৃত পুস্তকের আরবি ও ফারসি অনুবাদ মুসলিম বাংলার সাহিত্যে ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাস্তবিকই এটি আরবি ও ফারসি ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় এই অনুবাদ কার্যের মধ্যে অন্য জাতির জ্ঞানের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু মরমিয়া চিন্তাধারা যে মুসলিম সূফীবাদে সঞ্চারিত হয়েছে। অমৃতকাণ্ডের অনুবাদের দ্বারা তা প্রকাশ পেয়েছে। এই সংস্কৃতি গ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে যে ঘটনাটি জড়িত আছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু ঋষি ও দার্শনিকগণ ইসলামের মহান আদর্শ বুঝতে পেরেছিলেন এবং এর ফলে তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। দু'জন ব্রাহ্মণ যোগি ও পণ্ডিতের ইসলাম গ্রহণ এই সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।[২]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও দরবেশ হলেন শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ইসলামী শিক্ষা ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সোনারগাঁয়ে একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল তৎকালের এক বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি উত্তর ভারত থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে এসে সমবেত হতেন। আবু তাওয়ামা 'মাকামাত' নামে তাসাওউফ বা ইসলামী মরমীবাদের উপর একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী শিক্ষিত মহলে মাকামাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। এই গ্রন্থের চাহিদা লাহোরের মত সুদূর অঞ্চলে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে।[৩] সোনারগাঁও থেকে ফিকহ্ শাস্ত্রের উপর লিখিত 'নাম-ই-হক' গ্রন্থটি সমগ্র উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে স্বীকৃত।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা খ্যাতনামা শিষ্য ও জামাতা মাখদূম শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী কর্তৃক ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব ও তাসাওউফের উপর বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। শায়খ মুনায়রী এসব গ্রন্থ সোনারগাঁয়ের শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকের নিকট থেকে অর্জিত মূল্যবান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন।[৪]

শায়খ আলাউল হকের শিষ্য সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সীমনানী ছিলেন বাংলার আর এক মূল্যবান সৃষ্টি। তাঁর শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ফার্সী ভাষায় সূফীবাদ সংক্রান্ত বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ 'লাতাইফ-ই-আশরাফী' সংকলন করেন তারই শিষ্য হাজী গরীব ইয়েমেনী। তাঁর মাকতুবাত (চিঠিপত্র) সংকলন করেন আবদুর রাজ্জাক ১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। এতে তাঁর সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ব ও মরমী বিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় চতুর্দশ শতকের প্রথমে 'কামাল-ই-করিম' রচিত 'মাজমু-ই-খানি ফী আয়নাল মাআনী' নামে ফিকহ্ শাস্ত্রের উপর একাখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় সংকলিত হয়।[৫]

---

১. ব্লকম্যানের মতে, এই অজ্ঞাতনামা লোকটি দামেস্কের বিখ্যাত দার্শনিক ইবনুল আরাবী।
২. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-৫৪
৩. JASB, 1923, P. 274-77
৪. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও মুহাম্মদ আবুল বাসার, 'শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনায়রীঃ জীবন ও কর্ম, বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ষষ্ঠদশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৪০৫, পৃ. ২১-২২
5. Prof. Hasan Askari, Bengal, Past & Present, 1948

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু তাওয়ামা (রা.) প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁয়ের মত আরও অনেক উঁচু মানের শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লক্ষণাবর্তীতে, বর্তমান রাজশাহী জেলার মাহীসুনে, সাতগাঁও এ, নগোর-এ মান্দারণে, পাণ্ডুয়ায়, বাঘায়, রংপুরে ও চট্টগ্রামে।[১] শায়খ আঁখি সিরাজ, শায়খ আলাউল হক এবং নূর কুতুব আলম এরা সকলেই তাদের বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তারেই নয়, সাধারণ শিক্ষা বিস্তারেও সমান আগ্রহী ছিলেন। নূর কুতুব আলম একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং পরবর্তী সময়ে সুলতান হোসেন শাহ্ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। এই খ্যাতনামা সূফী পুরুষ ও পণ্ডিতদের খ্যাতি উত্তর ভারত ও বাংলায় সর্বত্র থেকে শিষ্য ও শিক্ষার্থীদেরকে আকৃষ্ট করে। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, শায়খ নাসির উদ্দীন মানিকপুরী, শায়খ হোসেন যুক্কারপোশ এবং উত্তর ভারতের আরও অনেকে শায়খ আলাউল হকের নিকট তাঁর পাণ্ডুয়া শিক্ষাকেন্দ্রে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করেন। হুশামুদ্দীন মানিকপুরী, শায়খ কাকো ও অন্যান্যরা হযরত নূর কুতুব আলমের যে সামান্য কয়েকটি পত্র পাওয়া গেছে তাতে তাঁর ইসলামী মরমীবাদ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। এসব পত্রাদির কিছু সংখ্যক দরবেশ, উলামা ও শিষ্যদের নিকট লিখিত হয়েছিল।[২] তাঁর রচিত 'আনিসুল গুরাবা' হাদীসের ব্যাখ্যাসহ একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এতে তাঁর কুরআন, ইসলামী শিক্ষা ও ফারসী ভাষায় গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। নূর কুতুব আলম ফারসী ভাষায় একজন ভালো কবিও ছিলেন। তাঁর কিছু কিছু কবিতা 'সুবহ-ই-গুলশানে' প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

এ সময়ে মুসলমানদের সাহিত্যিক প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করে ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেছেন, "এ সময়ে মুসলমানদের উদ্যোগে বাংলাপদ্যে কয়েকখানা ধর্মীয় ও সূফীবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এই সব গ্রন্থকারদের আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষতা ও ইসলামী বিষয়াদিতে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়ায়। গ্রন্থকারগণ কুরআন, হাদিস এবং ধর্মীয় ও মরমী বিষয়ক গ্রন্থগুলোকে তাদের সংকলনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকেরা যাতে সহজে বুঝতে পারে তার জন্য ধর্মীয় বিষয়াদি তারা বাংলায় লিখেন। তাদের লেখার প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকারণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলিম সমাজে বিভিন্ন রকম মিশ্র ভাবধারার অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্যে ইসলামী ভাবধারা জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। ইসলামের বিধি ব্যবস্থা সঠিকভাবে তুলে ধরে মুসলমানদের সংহতি বজায় রাখা এবং তাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করার ব্রত তারা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রচনায় এটাও প্রতিফলিত হয়েছে যে, সমসাময়িক মুসলিম সমাজ রক্ষণশীল ছিল এবং সমাজে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ধর্মীয় বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করার চিন্তা করেন। প্রতিভাশালী কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর যিনি গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১০৮৯-১৪০৯ খ্রিঃ) রাজত্বকালে আর্ভিভূত হয়েছিলেন তিনি এ ভাবধারাই রূপদান করেছেন। তিনি তাঁর 'ইউসুফ-জুলেখা' নামক গ্রন্থে বলেন যে, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধর্মীয় বিষয় বাংলায় লিখলে অপরাধ হয় এরকম চিন্তা করার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। তিনি বরং বাংলায় ধর্মের বিষয় লেখা পূণ্যের কাজ বলে মনে করেন। কেননা, এর ফলে মুসলমানদের অতীতের মহান ঐতিহ্য সাধারণ মুসলমানের ভাষা বাংলায় তার স্মরণীয় গ্রন্থ 'ইউসুফ-জুলেখা' রচনা করেন।[৪]

---

১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-৭২
২. Prof. Hasan Askari, Opcit, P. 38
৩. S. Hossain, East Bengal Culture, P. 12 হতে উদ্বৃতঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান তথা শাসক ও সূফী-দরবেশদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শিক্ষার জাগরণ অনুভূত হয়েছিল। এছাড়া জ্ঞান অর্জন ও সামাজিক সম্মান লাভের উপায় হিসেবে শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।[১] মুসলিমগণ তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা গ্রহণ ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন।[২]

মুসলমান ছেলে-মেয়েরা মক্তবে শিক্ষা শুরু করত। এসব মক্তবের অধিকাংশ ছিল মসজিদভিত্তিক। প্রত্যেক শহরে বহু মসজিদ ছিল। এমনকি ক্ষুদ্র গ্রামে যেখানে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ছিল সেখানেও অন্তত একটি মসজিদ পাওয়া যেত। প্রতিটি মসজিদেই মক্তব থাকত। মসজিদ ছাড়া শিয়া মুসলমানদের ইমাম বাড়াগুলোতেও মক্তব পরিচালিত হত। অনেক স্থানে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি সংলগ্ন মক্তব চালু থাকত। কবি মুকুন্দরামের কাব্যে পাওয়া যায়, হিন্দু এলাকার ক্ষুদ্র মুসলমান পাড়াতেও মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মক্তব ছিল। সেখানে ধর্মপ্রাণ মৌলবীগণ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতেন।[৩] সেকালে গরীব শ্রেণির পিতা-মাতার মনেও তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষাদানের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত নিবিড় ছিল।[৪]

সুলতানী আমলের মক্তব মানের শিক্ষালয়গুলোকে বাংলাতে পাঠশালা নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। সাহিত্যিক সূত্রে আমরা অবগত হই যে, তৎকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার প্রচলন ছিল। বালক-বালিকারা একত্রে একই বিদ্যালয় পাঠ গ্রহণ করত। অবশ্য সেকালে নিয়মিত বালিকা বিদ্যালয়ও ছিল।[৫] সেখানে পৃথকভাবে লেখাপড়া করত।

প্রাথমিক পর্যায়ে মক্তব বা পাঠশালাগুলোতে বালক-বালিকাদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের প্রচলন ছিল। শিক্ষার্থীকে প্রথমেই শুদ্ধ উচ্চারণ, যতি বিন্যাস ও শ্বাসাঘাত বর্ণ শিক্ষা দেয়া হত। এগুলো শায়খানোর পর শব্দ গঠন শিক্ষা চলত। অতঃপর ছোট বাক্য তৈরির অনুশীলন হত। বাক্য গঠনের সাথে সাথে লিখবার অভ্যাস করানো হত। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ বর্ণমালা, যুক্তাক্ষর, একই অর্থপদ শ্লোক বা দ্বিচরণ শ্লোক ও পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি এই চারটি অনুশীলন দিতেন।[৬] ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষকগণ অংক শায়খাতেন। ক্লাসের সকল ছাত্রকে যৌথভাবে 'পাহারা' বলে অভিহিত 'নামতা' মখস্ত করানোর একটা সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল।[৭]

পাঁচ বছর বয়সে বালক-বালিকাদের শিক্ষা জীবন শুরু হত।[৮] অনেকে বেশি বয়সে পড়তে যেত। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের বালকের সাধারণত পাঁচ কিংবা ছয় বছর

---

১. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ঢাকা-১৯৭৭, পৃ. ২৬৪
২. আলাওল, তোহফা, গোলাম সামদানী কোরায়শী সম্পাদিত, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ. ৪২৪৩
৩. মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, চণ্ডিমঙ্গল, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত, কলিকাতা-১৯৫২, পৃ. ৩৩৪
৪. William Adam, Report on the state of Education in Bengal (1835-1838), Calcutta-1941, P. 78-79
৫. S.M. Jaffar, Education in Muslim India, Delhi-1972, P. 190
৬. Abul Fazl, Ain-i-Akbri, Vol-II, tr. Jarret and Sarkar, Calcutta-1948, P. 78-79
৭. ইউসুফ হোসেন, মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি, ফারুক আহমদ অনুদিত, ঢাকাঃ ১৯৬৭, পৃ. ১০৫
৮. দোনাগাজী, সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামান, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

বয়:ক্রমকালে শিক্ষা জীবন শুরু করত।[১] কিন্তু মুসলমানদের বিশেষত উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চার বছর চার মাস চারদিন বয়সে শিক্ষা শুরু করার প্রচলন ছিল।[২] শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুদের এই আনুষ্ঠানিক প্রবেশ 'বিসমিল্লাহখানি' বা 'মক্তব উৎসব' নামে অভিহিত হত।[৩] একজন জ্যোতিষীর সাথে পরামর্শ করে একটি বিশেষ নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকের নিকট শিশু তার প্রথম পাঠ গ্রহণ করত।[৪] শিক্ষক কুরআন শরীফ থেকে নির্ধারিত একটি আয়াত[৫] পাঠ করতেন এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত।[৬] এই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হত। ভোজ-পায়েস-সিন্নি-গুড়-বাতাসা-মিষ্টি ও পানযোগে অভ্যাসগতদের আপ্যায়নের চল ছিল।[৭]

বালকদের মত বালিকাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আয়োজন হত। বালিকাদের মক্তবে যাওয়ার প্রাক্কালে একখানা রঙিন কাগজে মেয়েদের আর্শীবাদ করে কিছু লেখা থাকত। যা 'জরফেশানী' নামে পরিচিত।[৮] এ সময় মাতা-পিতা অভিভাবকরা শিক্ষককে আপ্যায়ন ও উপঢৌকন দ্বারা ভূষিত করতেন।[৯] এ জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে মক্তব অর্ধদিবস বন্ধ থাকত।[১০]

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত UNESCO এর Studies on compulsory education এ উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিম শাসনকালে শিক্ষা ও ধর্মকে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিবেচনা করা হত।[১১] বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেককে ইসলাম ধর্মের মূলনীতিসমূহ ছাড়া পৃথকভাবে নৈতিক শিক্ষা দেয়ার রীতি অটুট ছিল। মুসলমান ছেলে-মেয়েরা মক্তবে মৌলবীর নিকট যেত।[১২] সেখানে তাদের ওযু ও নামাজ পড়া শায়খানো হত।[১৩] এছাড়া শিশুকে কালিমা, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান করা হত।[১৪]

---

১. M.A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol-II, Karchi-1967, P. 308
২. Jafar Sharif, Islam in India or the Qanun-i-Islam, tr. GA Harklots (india Reprint, New Delhi-1972, P. 43
৩. Ibid, P. 44
৪. S.M. Jaffar, Opcit, P. 152-153
৫. Quran, Sura, Xcvi, I
৬. উদ্বৃত, Binod Kumar Sahay, Education and Learning Under the great Maghal, Bombay, N.dp. P. 32
৭. আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৮. S.M. Jaffar, Opcit, P. 190-191
৯. Ibid, P. 191
১০. Ibid, P. 191
১১. উদ্বৃত, মুহাম্মদ আলমগীর, ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ৯৪
১২. মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪
১৩. বিপ্রদাস পিপলাই, মনসা বিজয়, সুকুমার সেন সম্পাদিত, কলিকাতা-১৯৫৩, পৃ.৬৭
১৪. M.A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol-II, Karchi-1963, P. 153

Dhaka University Institutional Repository

মক্তব পর্যায়ের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে কুরআন মুখস্থ করানো হত। এগুলো হেফজখানা নামে পরিচিত ছিল। এখানে বালকেরা কুরআন শরীফ মুখস্থ করত।[১] মুখস্থ শেষে তারা 'হাফেজ' উপাধি পেত। শমসের গাজীর পুঁথিতে হাফেজের উল্লেখ মেলে।[২] তারা সুরেলা কণ্ঠে কুরআন শরীফ পড়ত। এছাড়া মক্তবগুলোতে 'মিয়ান', 'মুনসাইব', 'মাসাদির', ও 'মিফতাহুল লুগাত' পড়ানো হত।[৩] আগ্রহী পিতা-মাতার ইচ্ছানুযায়ী অনেক সময় মোল্লাদের নিকট মসজিদে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দলভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিত।[৪]

আরবী ছাড়া মক্তবগুলোতে ফার্সী এবং বাংলা শায়খানো হত। সুলতানী আমলে ফার্সী ছিল রাজদরবারের ভাষা ও শিক্ষার বাহন। ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য সাদীর 'কারীমা' ও আত্তারের 'পান্দনামা' প্রভৃতি পাঠ্যভুক্ত ছিল।[৫] চৈনিক দূতদের বর্ণনায় তৎকালীন বাংলায় ফার্সী ও বাংলা ভাষার উল্লেখ আছে।[৬] শমসের গাজীর পুঁথিতে অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭] মক্তবগুলোতে আরবী, ফার্সী ও বাংলা গদ্য-পদ্য, ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হত।[৮] প্রাথমিক শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় অংশ ছিল অংক শাস্ত্র। অংক শাস্ত্রের বিভিন্ন উপাদান যেমন- যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শায়খানো হত।[৯] জমি মাপের সাথে সম্পর্ক যুক্ত কড়িকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকালি ও বিঘাকালি প্রভৃতি মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা দেয়ার প্রচলন ছিল।[১০] উল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়া পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষা দেয়া হত।[১১]

সেকালে সুন্দর হস্তশিল্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল।[১২] মসজিদ বা সৌধসমূহের উৎকীর্ণ লিপি দৃষ্টে তা অনুমান করা চলে। তখন ছাপাখানার বহুল প্রচলন ছিল না। ছাপাখানা অভাবে গ্রন্থাদি সাধারণত হাতেই লিখতে হত।[১৩] এ কারণে লিখন শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

---

১. M.L. Bhagi, Mediaval Indian Culture and Thought, Amballa Cantt-1965, P. 358
২. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা-১৯১৪, পৃ.১৯৮৫
৩. M.L. Bhagi, Opcit, P. 353
৪. উদ্ধৃত, M.L. Bhagi, Opcit, P. 360
৫. Ibid, P. 356
৬. P.C. Bagchi `Political Relations Between Bengal and China in the Pathan Period, `Visva Bharti Annals, Vol-I, Calcutta, 1945, P. 113
৭. দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫৪
৮. M.A. Rahim, Opcit, Vol-I, P. 193
৯. Ibid, P. 310
১০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, পৃ. ১৩৪৬
১১. M.A. Rahim, Opcit, Vol-I, P. 310
১২. S.M. Jaffar, Opcit, P. 12
১৩. A.K.M Yaqub Ali, `Education for Muslims Under the Bengal Sultanate, Islamic Studies, Vol-XXIV, No-4, Islamabad-1985, P. 433

Dhaka University Institutional Repository

মক্তবসহ সকল স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা ছিল। মক্তবে মেয়েদেরকে রন্ধন, সেলাই, ভেলভেট জুতা ও তুণীর তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হত।[১]

মুসলমান নিয়ন্ত্রিত বাসগৃহ সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মক্তবগুলোতে হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কায়স্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রায়শ মৌলবীদের নিকট মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করতে যেত। তাদের পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃত অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতেরা সেখানে শিক্ষা দান করত।[২]

সুলতানী আমলে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষাঙ্গণ গুলোতে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। কারণ এ দুটো স্তরের পাঠ অনেক সময় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং একই শিক্ষকের অধীনে পরিচালিত হত। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মসজিদ ও পবিত্র স্থানসমূহে পরিচালিত হত।[৩] অনেক মসজিদে উচ্চস্তরের পাঠদান চলত।[৪] মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় গীর্জার মত প্রায় সব মসজিদই ধর্ম ভিত্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল।[৫] ইমামবাড়া ও মাদ্রাসাগুলোতে মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে পাঠদান চলত। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, কিছু কিছু মসজিদ ও ইমামবাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রূপে উনিশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল।[৬]

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে শায়খ ও উলামাদের খানকাহ ও কতিপয় উচ্চমান সম্পন্ন মাদ্রাসার উল্লেখ আছে। অনেক সময় প্রতিভাবান পণ্ডিতগণ নিজগৃহে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষামূলক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে জ্ঞান বিস্তারে মনোযোগি ছিলেন। সে যুগের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যে, মাদ্রাসার ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় জ্ঞান ও লোকবিজ্ঞান উভয় বিষয়ের পর্যালোচনা ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ধর্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি পদার্থবিদ্যা ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে সমান দক্ষ ছিলেন। ছাত্ররা সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত শিক্ষাকেন্দ্রে উভয় বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।[৭] আবদুল হামিদ লাহোরী ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, আইন ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী এবং মীর আলাউল মূলককে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন।[৮] সেকালে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, আইন, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় বিপুল জ্ঞানের অধিকারী অসংখ্য মনীষীর নাম পাওয়া যায়।[৯] যাঁদের নিষ্ঠা ও আগ্রহের ফলে জ্ঞানের প্রতিটি শাখা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।

---

১. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
২. দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫৪
৩. AR Mallick, Brithish Policy and the Muslim in Bengal, 1961, P. 149, AKM Yaqub Ali, Opcit, P. 422-23
৪. AKM Yaqub Ali, Ibid.
৫. SM Jaffar, Opcit, P. 18
৬. AR Mallick, Opcit, P. 49
৭. MA Rahim, Opcit, Vol-II, P. 296-298
৮. Ibid, P. 297
৯. এঁরা হলেন মৌলভী মুহম্মদ নাসির, জায়েন হোসেন খান, সৈয়দ মীর মুহম্মদ সাজ্জাদ, মুহম্মদ আলী, হাজী বদিউদ্দিন, হাকিম তাজউদ্দিন এবং হাকিম হাদী আলী খান, MA. Rahim, Opcit, Vol-II, P. 297

Dhaka University Institutional Repository

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলতানী বাংলায় আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম চালু ছিল।[১] সে অনুসারে আলীম হতে হলে একজন ব্যক্তিকে তাফসীর (ভাষা ও টীকা), হাদীস (নবীর (স.) বাণী), ফিকাহ্ (ইসলামী আইন), উসুল-উল-ফিকাহ্ (ইসলামী আইনের নীতি), তাসওউফ (অতীন্দ্রিয়বাদ), আদব (সাহিত্য), নাহও (ব্যাকরণ), কালাম (দার্শনিক রীতিনীতি), ও মানবিক (যুক্তিবিদ্যা) বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন করতে হত।[২] সুতরাং বলা চলে যে, উপরোক্ত বিষয়সমূহ উচ্চস্তরে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া মাদ্রাসাসমূহে ইলম-উশ-শরাহ্ (ইসলামী আইন), ও উলম-উদ-দ্বীন (ধর্মবিদ্যা), শিক্ষা দেয়া হত। সে হিসেবে কুরআন, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়াদি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উচ্চস্তরে লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান যেমন- যুক্তিবিদ্যা, জ্যামিতি, ব্যাকরণ ও ভূগোলবিদ্যা অধীত হত।[৩]

আবুল ফজল এর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উচ্চস্তরের পাঠ্যক্রমের কথা জানা যায়। তাতে নৈতিকতা, গণিত, গণিতের বিশষ চিহ্নসমূহ, কৃষি পরিমাপ শাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা, গার্হস্থ্য বিষয়াদি, সরকারি আইন-কানুন, চিকিৎসাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, তাবিয়ী,[৪] রিয়াজী[৫] ইলাহী শাস্ত্র[৬] এবং ইতিহাসের উল্লেখ মেলে।[৭] এভাবে দেখা যায় যে, জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখা পাঠ্যভুক্ত ছিল। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকাতে অনুরূপ প্রমাণ মেলে। গ্রন্থটিতে 'চৌদ্দটি' এলেমের উল্লেখ আছে।[৮]

এ্যাডামের বর্ণনায় তৎকালীন বাংলার পাঠ্যক্রমের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের সপ্রশংসা বর্ণনা মেলে। সেখানে আরবী বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক ধরণের পাঠ্যতালিকার উল্লেখ আছে। এতে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ, ছন্দের পূর্ণ তালিকা, তর্কশাস্ত্র ও আইন, বাহ্যিক পর্যবেক্ষণসমূহের অধ্যয়ন এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোন কোন বিদ্যায়তনে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও টলেমীর জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অনূদিত হয়ে প্রাকৃতিক দর্শন ও সাধারণ শাস্ত্রের উপর নিবন্ধসমূহের সাথে একত্রে পঠিত হত।[৯]

প্রতিষ্ঠানের বাইরে গার্হস্থ্য রীতিতে বিদ্যার্থীরা গুরুগৃহে গিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করত। বৈঠকী আলোচনা, কবিয়াল, কথকতা ও রূপকথাভিত্তিক অনুষ্ঠানের নারী পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ পেত। দুই ঈদ, জুম'আর খুতবাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খতিবদের বক্তৃতার দ্বারা অল্প শিক্ষিত ও নবদীক্ষিত মুসলমানেরা জ্ঞান লাভ করত।

---

১. MA Rahim, Opcit, Vol-I, P. 197
২. K.A. Nazami, Some Aspects of Religion and Politics in India During the Thirteenth Century, Aligrah-1961, P. 151
৩. M.L. Bhagi, Opcit, P. 258
৪. শরীরবিদ্যা বিষয়ক
৫. সংখ্যাবিজ্ঞান, অংক, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সঙ্গীত ও বলবিদ্যা
৬. ধর্মবিদ্যা বিষয়ক
৭. ইউসুফ হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা-১৯৭১, পৃ. ১০৮
৯. উদ্বৃত, AR Mallick, Opcit, P. 153

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী বাংলায় তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এটি সে আমলের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। গুরুগৃহে অথবা কারখানায় প্রয়োগিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষানবিশগণ দক্ষ কারিগর হয়ে উঠত। স্বনির্ভর অর্থনীতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনানুষ্ঠানিক কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর ছিল। সে সময় চারু ও কারু শিল্পের ব্যাপক চর্চা ছিল।

শিক্ষা বিস্তার সাধনে সুলতান-শাসকদের অসামান্য অবদান ছিল। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ইসলামী ভাবধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সূফী-সাধকদের খানকাহ্গুলো জ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞান বিতরণে খানকাহ্গুলো খ্রিষ্টীয় মঠের অনুরূপ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্রমোচ্চ পর্যায়ের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করত। ফলে প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চ স্তর পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিষয় অধীত হত।

উল্লেখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী আমলে বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। একদিকে সুলতান-শাসকদের আগ্রহাতিশয্যে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষায়তন গড়ে উঠে, অন্যদিকে জনসাধারণ জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে নিজেরাই উৎসাহী হয়ে শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। ফলে সুলতানী বাংলায় আনুষ্ঠানিক-উপানুষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিপ্লব সূচিত হয়। প্রচলিত দেশীয় সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা কাঠামোর পাশাপাশি ইসলামী ভাবধারা প্রসূত ধর্মভিত্তিক অথচ সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী যুগে নারী শিক্ষা:

মুলমানগণ তাদের মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করেন। যাতে বালিকারা তাদের ধর্মের মূলনীতি, কুরআন পাঠ ও ধর্মের ক্রিয়া-কর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সে জন্যে পিতা-কন্যাদের শিক্ষিত করে তোলা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। বালিকাদেরও বালকদের 'সিমিল্লাহখানি' অনুষ্ঠান দ্বারা অক্ষর-পরিচয় শুরু হত এবং তারা একই মক্তবে বালকদের সঙ্গে একত্রে পড়াশোনা করত। এ্যাডামের রিপোর্টে একই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রমাণ মেলে। এ থেকে এই ধারণা জন্মায় যে, স্ত্রী শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

সমাজে পর্দা প্রথার ফলে মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার কোন নিয়মিত পদ্ধতি ছিল না। প্রাথমিক মানের শিক্ষার পর মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শ্রেণি ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বিশেষত যারা এর জন্যে ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিলেন। সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে তাঁর প্রাসাদের রাজ পরিবার ও অভিজাত শ্রেণির মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[১]

এ থেকে অনুমান করা হয় যে, শাসক অভিজাত সম্প্রদায় ও অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা তাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা দেখা গেছে যে, মুসলমান শাসনামলে উচ্চ পরিবারের মেয়েরা সুশিক্ষিতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন। মুঘল সমাজে বহু রমণী ছিলেন, যাঁরা তাঁদের সাহিত্য বিষয়ক কৃতিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাবুরের কন্যা গুলবদন বেগম, হুমায়ুনের ভাগ্নি সেলিমা সুলতানা, আকবরের দুধ-মা মহাম আনাগা, জাহাঙ্গীরের মহিয়ষী নূরজাহান, শাহজাহানের পত্নী মমতাজ মহল, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা ও আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসা।

মুঘল রমণীগণ রাজ-প্রাসাদস্থিত বিদ্যালয়ে বা গৃহে নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রীদের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করতেন। সতীউন্নেসা নামক জনৈকা উচ্চ শিক্ষিতা ও প্রতিভাসম্পন্ন মহিলার নিকট জাহান আরা ও রওশন আরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং আওরঙ্গজেবের অনুগ্রহভাজন খাস মুনসী (সেক্রেটারী) ইনায়েত উল্লাহ কাশ্মিরীর মা হাফিজার নিকট জেবুন্নেসা শিক্ষা লাভ করেন। এ উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলমান রাজ্যে এ ধরণের মহিলা শিক্ষায়িত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। ফিরিস্তা অনুসারে, মালবরাজ সুলতান গিয়াসুদ্দিনের হারেমে (১৪৬৯-১৫০০ খ্রি:) পনের হাজার রমণী ছিলেন এবং এঁদের মধ্যে বহু শিক্ষয়িত্রী, গায়িকা ও অন্যান্য বৃত্তির মহিলা ছিলেন।[২] অবশ্যই শিক্ষয়িত্রীগণ রাজপ্রসাদের মেয়েদের শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী সুলতানগণ, অভিজাত সম্প্রদায় এবং অবস্থাপন্ন লোকেরাও তাদের কন্যাদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত গৃহে বিদ্যালয় এবং শিক্ষয়িত্রী রাখার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি, উনিশ শতকের প্রথম পাদেও এ্যাডাম পাণ্ডুয়ায় অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ কর্তৃক গৃহ শিক্ষয়িত্রী রাখার রীতি লক্ষ্য করেছেন। বাস্তবিকই, এটা ছিল মুসলমান আমলের ঐতিহ্যগত প্রথা। মৌলবীগণ যাঁরা সাধারণত মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন, তাঁরাও তাঁদের অবসর সময়ে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের কন্যাদের শিক্ষাদান করতেন।

১. N.N, Law, Promotion of learning etc, P. 202
২. Ibid, P. 201

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই মুসলমান বালিকারা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। এটি একটি বিশেষ ধরণের বন্দোবস্ত বিধায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী মেয়েদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। উচ্চশিক্ষার জন্য নিয়মিত সুযোগ-সুবিধার অভাববশত মুসলমান মেয়েরা প্রতিভা বিকাশের কোনো বিশেষ পথ পায়নি। এ সত্ত্বেও, বিদ্যাবত্তায় মেয়েদের কৃতিত্ব এবং পুরুষের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্য ও গুণপনার কথা আমরা শুনতে পাই। হাসানহাটির জনৈক কাজীর স্ত্রী হিন্দুশাস্ত্রে খুবই পারদর্শিনী ছিলেন।[১] 'গদাই মল্লিকের পুঁথি' বা 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' (মল্লিকার হাজার প্রশ্ন) নামে অভিহিত কাব্য থেকে জানা যায় যে, মল্লিকা নাম্নী মুসলমান বালিকা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, যে পুরুষ তাকে সাহিত্য-বিষয়ক বিতর্কে অবতীর্ণ হন, কিন্তু সকলেই মল্লিকার নিকট পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে জনৈক সুফী পণ্ডিত আবদুল হাকিম গদা তার হাজার প্রশ্নের উত্তরদান করে তাকে বিতর্কে পরাজিত করেন। অতঃপর মল্লিকা তাঁর বিজয়ীদের বিয়ে করেন।[২] যদিও এটি একটি গল্প মাত্র, তথাপি এতে তৎকালীন সমাজের অবস্থার পরিচয় মেলে যে, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এ রকম বিদুষী রমণী বিরল ছিল না। কবি আবদুল হাকিমের 'সয়ফুল মূলক পুঁথি' নামে অন্য একটি সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থ থেকে এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। এই প্রেম কাব্যের নায়িকা লালমতি (লালবানু) সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন।[৩]

শিক্ষকদের অবস্থাঃ

শিক্ষকরা সমাজে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। পিতামাতা মৌলভী অথবা গুরুর নিকট তাদের ছেলেমেয়েদের পৌঁছে দিয়ে নিজেরা সন্তান-সন্ততির শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। দৌলত উজীর বাহরাম খানের কাব্যগ্রন্থ 'লায়লী মজনু'তে এ মনোভাবই পরিস্ফুট হয়েছে।[৪] শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদেরও গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল এবং ছাত্ররা পরম ভক্তির সঙ্গে গুরুর সেবা করত।[৫] রাজ সরকার ও সমাজ কর্তৃক শিক্ষকদেরকে প্রচুর পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হত। মাদ্রসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে লাখেরাজ সম্পত্তি বা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্র ও অবস্থাপন্ন মুসলমান কর্তৃক প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে মঞ্জুরি দেয়া হত। প্রায় সবগুলো টোলই কোন না কোন উৎস থেকে ভূমি মঞ্জুরি ভোগ করত। আজকের দিনের শিক্ষকদের চেয়ে সে যুগের মক্তব ও পাঠশালার শিক্ষকদের অবস্থা অনেক বেশি স্বচ্ছল ছিল। অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার জন্যে মৌলভী ও মুনশীদেরকে প্রচুর পরিমাণ অর্থদানের ব্যবস্থা করতে পারতেন। নানারকম শস্য, শাক-সবজি ও জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাধারণত শিক্ষকের পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছাত্ররা তার সাংসারিক কাজকর্মেও তাঁকে সাহায্য করত। গ্রাম্য মুসলমানদের ধর্মকর্মে,

---

১. বিজয় গুপ্ত, পদ্মপুরাণ, কলিকাতা, পৃ. ৫৬
২. বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, ১৩২০ বাং, পৃ. ৯০
৩. আব্দুল হালিম, সয়ফুল মূলক, পাণ্ডুলিপি, (ঢা.বি.), পৃ. ৮
৪. দৌলত উজীর, বাহরাম খান, লায়লী মজনু, পৃ. ১৮
৫. ঐ, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে শিক্ষক ছিলেন তাদের পথ-প্রদর্শক ও ইমাম। তিনি বিয়ে-সাদী ইত্যাদি বহু রকম অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এর জন্যে তিনি লোকদের নিকট থেকে উপহার সামগ্রী লাভ করতেন।[১] প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্ররাও গুরুকে উপঢৌকন দিত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা করতেন। অনিয়মিত উপস্থিতি, পাঠে অমনোযোগ, পড়া তৈরি করতে না পারা, বেয়াদবী ও দুষ্টামীর জন্যে ছাত্রদেরকে নানা ধরণের শারীরিক শাস্তি দেয়া হত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভকারীরা বালি ও ধুলার উপর লেখার অভ্যাস করত। এরপর তারা মেঝেতে খড়িমাটি নিয়ে লেখার চেষ্টা করত। পরবর্তী পর্যায়ে তারা তালপাতা, কলাপাতা ও ভোজপাতায় লিখত। খরের না নলখাগড়ার টুকরা, বাঁশের কঞ্চি, পাখি, ময়ূর ও হাঁসের পালক ইত্যাদি কলমরূপে ব্যবহৃত হত। শ্লেট, পেন্সিল ও ব্লাকবোর্ড তখন অজ্ঞাত ছিল। ছাত্ররা মেঝেতে অথবা তাদের নিজেদের আনা মাদুরের উপর উপবেশন করত।[২]

মুসলমানদের প্রথম যুগে বাংলাদেশের কাগজের ব্যবহার প্রথম প্রবর্তিত হয়। এটা ছিল তুলোট অথবা গন্ধকচূর্ণ রঙিন কাগজ। চীনা রাষ্ট্রদূত ও লেখক মাহুয়ান বাঙালিদের কাগজ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, তারা হরিণের চামড়ার মত তেলতেলা মসৃণ এক ধরণের সাদা কাগজ গাছের ছাল থেকে তৈরি করত। গোবিন্দচন্দ্র রাজার গানে লেখ্যবস্তু হিসেবে কাগজে উল্লেখ দেয়া যায়। কাগজ সাধারণত বই-পুস্তক, দলিলপত্রাদি এবং এমনি ধরণের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হত।

ছাত্ররা তাদের নিজেদের কালি নিজেরাই তৈরি করত। হরিতকি ও দেশীয় প্রদীপের নির্বাচিত ফুল দিয়ে কালি বানানো হত। এই কালি অবিশ্বাস্য রকম দীর্ঘস্থায়ী এমনকি কয়েক শতাব্দীকাল ব্যাপী টিকে থাকত।

বাংলার মুসলমানরা যে বিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়। এ উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ও মুসলমানী ভাবধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলমান পীর-দরবেশ ও পণ্ডিতগণ উচ্চ আসন লাভের যোগ্য। তারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবি ও ফারসি ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন যা সমস্ত ভারতব্যাপী আদৃত হয়েছিল। বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলো থেকে বিচ্ছুরিত জ্ঞান রশ্মি সকল অঞ্চলের বহু পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করেছিল। পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বহু পণ্ডিত ও ধর্মনেতা বাংলার সাধু-দরবেশদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন।

মুসলমানামলের শিক্ষা ও জ্ঞান-গরিমা নানাভাবে বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করে তোলে। ফলে, দেশে এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ দেখা দেয়। বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটে। জ্ঞানালোকদীপ্ত মুসলিম শাসন ও শাসকদের উদার শিক্ষানীতির প্রভাবে যুগ যুগ ব্যাপী বন্ধনদশা থেকে নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের বুদ্ধিবৃত্তির মুক্তি সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতিরেকে, মুসলমানগণ বহু নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যার ফলে বাংলাদেশে শিক্ষার দ্রুত উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়। তারাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রবর্তন করেন এবং লেখ্যবস্তুরূপে কাগজের প্রচলন করেন। পুস্তক নকল করে প্রচারের রীতি প্রবর্তন করার জন্য বাংলাদেশে মুসলমানদের নিকট ঋণী।

১. বিজয় গুপ্ত, মনসা মঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬১
২. ডি এন দাস গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃ. ৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল যুগে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

মুঘল শাসনামল ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল যুগ। মুঘল সম্রাটগণ, যুবরাজরা অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও রাজকর্মচারীগণ উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন এবং তাদের দরবারসমূহ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের কেন্দ্রস্থল ছিল। রাজদরবারের বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান প্রভা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলোকে আলোকিত করে তুলেছিল। এক্ষেত্রে বিশেষত বাংলা ছিল ভাগ্যবান। সুবাদার, দিউয়ান, বখশি, সদর, কাজি, ওয়াকিয়ানবিশ, ফৌজদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ যারা এই প্রদেশে আগমন করেন তারা সকলেই শিক্ষা ও সুরুচির ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা এবং পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খান খানান, মুনিম খান, খান জাহান, রাজা মনসিংহ ইসলাম খান, কাসিম খান, ইব্রাহিম খান, ফতেহজঙ্গ, শাহজাদা সুজা, মিরজুমলা, শায়েস্তা খান, যুবরাজ মুহাম্মদ আজম, আজিমউশশান ও আন্যান্য সুবাদারগণ তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তারা জ্ঞান ও প্রতিভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুঘল বিজয়ের ফলে এদেশে উত্তরাঞ্চলীয় শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী, কারিগর ও অন্যান্যের বাংলায় আগমণের পথ উন্মুক্ত হয়। এ সকল লোকের আগমণের ফলে বাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজিত হয়। এমনকি, সাধারণ মুঘল সেনারাও শিক্ষা ও সংস্কৃতির উচ্চমানের প্রতিনিধিত্ব করতেন।

বাংলাদেশ ১৫৭৬-১৭৫৭ সাল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময়ে এদেশের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। শিক্ষার মাধ্যম ছিল প্রধানত ফার্সী। সে সময় শিক্ষা পদ্ধতি 'উলূমুল-নাকলিয়া' ও উলূমুল-আকলিয়া' এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। শিক্ষার সাথে ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এ শিক্ষা লাভ করে একজন যুবক শারী'আ ও ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেশ দক্ষ হয়ে উঠতেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্ডিত, ধর্মবেত্তা, বিচারক, প্রশাসক, প্রকৌশলী, পদার্থবিদ, অধ্যাপকসহ অনেকে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি হতেন, যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বেও নিয়োজিত হতেন।

রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬-৭৭ খ্রিঃ) কররানী সুলতান দাউদ খান (মৃ. ১৫৭৫-৭৭) পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে তেলিয়াগড়ি গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল জনপদ বাংলা নামে পরিচিত ছিল।[১] বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমাংশ শুষ্ক ও কিছুটা উচ্চভূমি। ভূমির এহেন গঠন-প্রকৃতিই তুর্কী বংশোদ্ভূত ঘোড়সওয়ারদের জন্যে এদেশ শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়।[২]

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়,[৩] নবম শতাব্দীরও বহু পূর্বে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ইসলামের বীজ বপন করা হয় বলে ঐতিহাসিক তথ্যও প্রমাণ রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ হতে আগত আরব পারসিক বণিক, মুবাল্লিগ এবং সূফী-সাধকগণ এসময় বাংলায় ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার করেন।[৪]

---

১. ড. এ.কে.এম. আইউব আলী, এডুকেশন ফর মুসলিম আন্ডার মুসলিম সালতানাত, ইসলামিক স্টাডিজ, ১৯৮৫, পাকিস্তান, ইসলামিক রিচার্স ইনস্টিটিউট, পৃ. ৪২০

২. এ.এইচ. দানী, শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, ১৯৫৮, লাহোর।

৩. ড. এ.কে.এম. আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৪. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

১২০৩-১৭৬৫ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ৫৬৫ বছরাধিককাল এদেশে মুসলিম শাসন স্থায়ী হয়। তন্মধ্যে ১৫৭৫-৭৬ হতে ১৭৫৭ পর্যন্ত মুঘল সুবাদারগণ বাংলা শাসন করেন। মুসলিম শাসনের এ সুদীর্ঘ সময় বাংলায় জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।[১] বাংলার পলিগঠিত ভূমি, পর্যাপ্ত উৎপন্ন দ্রব্য এবং সহজলভ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এর অধিবাসীদের জন্যে সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি নিশ্চিত করে। আগন্তুকও অভ্যাসগতগণও সহজলভ্য জীবিকার প্রতিশ্রুতি পান। মুসলিম শাসনের এ সুদীর্ঘ সময় বাংলায় জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল।[৩] বাংলার পলিগঠিত ভূমি, পর্যাপ্ত উৎপন্ন দ্রব্য এবং সহজলভ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এর অধিবাসীদের জন্যে সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি নিশ্চিত করে। আগন্তুক ও অভ্যাসগতগণও সহজলভ্য জীবিকার প্রতিশ্রুতি পান। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে পণ্ডিত, শিক্ষক ও ধর্ম-প্রচারক এবং সিদ্ধ-পুরুষদের এক বিশাল স্রোতধারা এদেশে প্রবেশ করে। এখানকার মুসলিম শাসকবর্গ কলা, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[২] উক্ত সময়কালে (১৫৭৫-৭৬ এবং ১৭৫৭ খ্রি.) বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাও উন্নত ছিল। কেননা সে সময় শিক্ষা রাষ্ট্রীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত।[৩] শিক্ষা ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক এবং শিক্ষা বিতরণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল প্রধানত চার প্রকার।[৪] যেমন- (ক) মসজিদ (খ) মক্তব (গ) হাল্কা ও (ঘ) মাদ্রাসা।

মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল। সর্বশ্রেণির লোক প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত মসজিদে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতেন। মসজিদের ইমাম সমাজের শিক্ষক বলে স্বীকৃত হতেন। বিদ্বান ও পণ্ডিতবর্গ মসজিদের সাথে সংযোগ রাখতেন। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীগণ বৃত্ত গড়ে তুলতেন। "এমন কোন মসজিদ বা ইমাম বাড়া ছিল না; যেখানে 'আরবী ও ফারসি শিক্ষাদানের নিমিত্ত অধ্যাপক নিয়োজিত থাকতেন না।"[৫] প্রতিটি প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও উল্লেখযোগ্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে সুলতান, আমলা অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ স্ব-উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ করতেন।

পাঠশালার অনুকরণের নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে মকতব গড়ে তোলা হয়।[৬] মসজিদেই সচরাচর মকতবের কাজ চলত। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তির বাড়ির দহলিজ, বৈঠক ঘর ও দোকানপাটেও মকতব বসত। মকতব ছিল প্রধানত দু'প্রকার (১) হাফিজিয়া ও (২- ফুরকানিয়া। হাফিজিয়া মকতবে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন মুখস্ত করানো হত আর ফুরকানিয়া মকতবে তাজবীদ সহকারে সপ্ত কিরআতের ভিত্তিতে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠ শায়খানো হত।[৭] এতদ্ব্যতীত মকতবে অংকের প্রাথমিক জ্ঞান, আরবী ব্যাকরণের প্রাথমিক সূত্র ও ইতিহাসের বিষয় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও থাকত।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩. ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ১৯৭৯ সাল, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
৪. এ.এল. তিবওয়ারী, এ্যারাবিক এণ্ড ইসলামিক থিমস, লন্ডন, ১৯৭৬, পৃ. ২১২-২৭
৫. আজিজুর রহমান মল্লিক, ব্রিটিশ পলিসী এণ্ড মুসলিম অব বেঙ্গল, অনুবাদ, দিলওয়ার হোসেন, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১৬৭
৬. আজিজুর রহমান মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
৭. ড. এ.কে.এম. আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

কোন একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিকে কেন্দ্র বা বেষ্টন করে শিক্ষার্থীগণের যে বৃত্ত গড়ে উঠতো তার নাম দেয়া হত হাল্কা। এ হালকা মজলিস নামেও অভিহিত হত। হাদীস, ফিক্হ ও সাহিত্যসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এমনকি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়েও উচ্চতর জ্ঞান হালকার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হত। হালকা সচরাচর মসজিদে বসত, কোন কোন ক্ষেত্রে মসজিদের বাইরে পৃথক স্থানেও বসত বলে জানা যায়।

হালকা বা মজলিসের সম্প্রসারিত রূপ মাদ্রাসা নামে অভিহিত হত। শিক্ষার বিভিন্ন শাখা যেমন- তাফসীর, হাদীস ও ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের চারিপাশে শিক্ষার্থীগণের সমবেত শিক্ষা বা হালকার সমষ্টিই মাদ্রাসা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করত। প্রথম অবস্থায় মাদ্রাসা-মসজিদে কিংবা সংলগ্ন স্থানে বসত। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মাদ্রাসা উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। ৪৫৭/১০৬৫ সালে নিয়ামূলমূলক এর উযীর আল্‌ফ আরসালান সর্বপ্রথম নিযামিয়া মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। গ্রামপ্রধান ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির শিক্ষার পাশাপাশি দরিদ্র ও অস্বচ্ছল প্রতিবেশির সন্তানদের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতেন।[১]

সাধারণ অধিবাসীদের শিক্ষা ও সামাজিক চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ধর্ম ও সাংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ আত্মনির্ভরশীল মাদ্রাসার অস্তিত্ব ছিলনা এমন কোন গ্রাম বা কসবা সে সময় ছিল খুবই বিরল। ভারতের বহু শহর যেমন- গৌড়, পাণ্ডুয়া, অযোধ্যা, গোপমান, কায়রাবাদ, পাটনা, আগ্রা, জৌনপুর, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও সোনারগাঁও এ এমন বিখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ধর্মীয় ও বিশেষ জ্ঞান তালিম দিতেন। আর সেসব স্থানে গড়ে ওঠে বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা, অধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অনুপ্রেরণা দানের উৎস হিসেবে অসংখ্য বিখ্যাত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব বিদ্যাপীঠে ব্যাকরণ, অর্থবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, আইন-শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত। এতদ্ব্যতীত সেসব প্রতিষ্ঠানে আরো বহু আধুনিক বিষয়েও পাঠদান করা হত।[২] খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে তৎকালীন বৃটিশ সরকার একমাত্র বাংলায়ই আশি হাজার মাদ্রাসায় সন্ধান লাভ করেন। এ জরিপের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তখন প্রতি চারশ ব্যক্তির ভাগে একটি করে মাদ্রাসা পড়েছিল।[৩]

উপরোক্ত চারটি প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সূফী-সাধকগণের খানকা এবং শিয়াদের ইমাম বাড়াতেও জ্ঞান বিতরণের কাজ চলত। এসব স্থানে বিশেষ যত্নের সাথে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষাদান এবং কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছতার ভিত্তিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন করা হত। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষ শিক্ষক, আধ্যাত্মিক-সাধক ও ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটত।

এসময়কালে নির্মিত মাদ্রাসা আর টিকে নেই। কালের চক্রে এগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত শিলালিপি আবিস্কৃত হওয়ার ফলে এবং কিছু কিছু লিখিত প্রমাণের দ্বারা কয়েকটি মাদ্রাসার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যেমন-

---

১. আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২. ইম্পিরিয়াল গ্যাজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, ভলুম-১৪, (ই.জি.আই), পৃ. ১৫২
৩. আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন শাহের মাদ্রাসাঃ

গৌড়ের সাগর দীঘির উত্তরাংশে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি মাদ্রাসা ভবন এখনো স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আছে। বর্তমান নিদর্শন হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কালে এ মাদ্রাসা অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ শিক্ষায়তন ছিল। চত্বর এবং দেওয়ালে রকমারী পাথর দেখে একথা প্রমাণিত হয়, গৌড়ের অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে এটাই ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও জৌলুসপূর্ণ। এ ভবনের দেওয়ালে প্রাপ্ত শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে, "এ আলীশান মাদ্রাসা সুলতান হোসেন শাহ আল-মালিকুল হোসাইনী মহানবীর (স.) আদেশক্রমে ১৪৯৩/৯০৭ সালের পহেলা রামাজান স্থাপন করেন।[১]

ঢাকার মাদ্রাসাঃ

আমিরুল উমারা শায়েস্তাখান (সম্রাট আলমগীরের মামা) সম্রাট শাহজাহান ও আলমগীরের আমলের বিশিষ্ট আমীর ছিলেন। তিনি ১৬৬৪-৮০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি ঢাকার সুবাদার ছিলেন। এসময় তিনি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি মাদ্রাসা এবং মসজিদের পত্তন করেন। এ মাদ্রাসা বিগত শতাব্দীর (১৮০০ খ্রি.) মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর কিছুকাল পরিত্যক্ত থাকার পর মাদ্রাসা ভবনে হাসপাতাল চালু করা হয়। বর্তমানে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি ভগ্নঘাট ও একটি মসজিদ তার চিহ্ন বহন করছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণে মসজিদের দেওয়ালে উৎকীর্ণ লেখা বিনষ্ট হয়ে গেছে। তবুও যতটুকু পাঠ উদ্ধার করা যায় তা হতে জানা যায় যে, এ মাদ্রাসা পরিচালনার জন্যে কিছু নির্দিষ্ট আমদানির উৎস ছিল।[২]

খান মুহাম্মদ মাদ্রাসাঃ

ঢাকায় নবাব শায়েস্তা খানের কিল্লার অনতিদূরে একখানি জমকালো মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদকে খান বাহাদূর মূর্ধার মসজিদ বলা হয়। এ ভবনটি দ্বিতল বিশিষ্ট। নিচে অনেক বড় বড় কক্ষ রয়েছে। এই কক্ষগুলো ছাত্রদের হোস্টেল বা ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মসজিদের চারিদিকে খোলা বারান্দা রয়েছে। এ মসজিদের নিচের অংশকে এখনো (১৯৫৯ খ্রি.) মাদ্রাসা হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৩]

আজিমপুর মাদ্রাসাঃ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদ আজম বা আজিমুশশানের নামানুসারে পরিচিত এ মসজিদের দ্বিতলের উত্তর প্রান্তে প্রচুর আলো বাতাস চলাচল করতে পারে এমন কয়েকটি কক্ষ রয়েছে। অদ্যাবধি মসজিদের অংশকে মাদ্রাসা বলা হয়।[৪]

উৎকীর্ণ ফারসি লেখা হতে জানা যায় যে, এ মাদ্রাসা মূলত আত্মশুদ্ধি এবং ইলম বাতিন শিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এ স্থানে আধ্যাত্ম শিক্ষার পাশাপাশি জাহির (সাধারণ ধর্মীয়) শিক্ষা দেয়ার প্রচলন হয়। মসজিদ সংলগ্ন একটি খানকাও হয়েছে। এ খানকাতেও আধ্যাত্ম সাধনা প্রিয় লোকেরা এখনো পূর্ব-ঐতিহ্য অনুযায়ী আধ্যাত্ম সাধনের জন্য বিশেষ সময়ে আসেন। আলমগীরের (১৬৬৫-১৭০৭ খ্রি.) রাজত্বকালে (১১১৬/১৭০৪) সালে এ মসজিদ নির্মিত হয়।

১. এস.এম. জাফর, এডুকেশন ইন মুসলিম ইন্ডিয়া, ১৯৭৩
২. আবদুস সাত্তার, তারিখ-ই-মাদ্রাসা আলীয়া, ১৯৫৯, ঢাকা, পৃ. ৩০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৪. আবুল হাসান আলী নদভী, উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদাবাদে মাদরাসা:

মুর্শিদাবাদে কাটারা মাদরাসা নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব জাফর মুর্শিদকুলী খাঁন এ মাদরাসা পত্তন করেন। [১]

বোহার (বর্ধমান) মাদরাসা:

বর্ধমান জেলার একটি গ্রামের নাম বোহার। এখানকার প্রখ্যাত মজিদার মুনশী সদরউদ্দীন একজন যথার্থ পন্ডিত ও জ্ঞান-তাপস ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণক্রমে লক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত পন্ডিত মাওলানা আবদুল আলী বাহরুল উলূম (বিদ্যাসাগর) বোহারে আগমন করেন। মুনশী সদরউদ্দীন মাওলানার জন্যে বোহারে একটি স্বতন্ত্র মাদরাসা স্থাপন করেন। এ মাদরাসায় তিনিসম্ভবত ১১৭৮/১৭৬৪ সালে শিক্ষকতা করেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল চারশত টাকা। এ মাদরাসার একশত বহিরাগত ছাত্রকেও বৃত্তি (অযিফা) দেয়া হত। বহিরাগত ছাত্রগণ মাওলানার সাথেই লক্ষ্ণৌ হতে আসেন। বর্ধমানের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাইয়্যিদ গোলাম মুস্তফা আবদুল আলীর মুরীদ ছিলেন। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ও বিদ্যোৎসাহী গুণপনার জন্য তাঁকে অটোয়া জেলার মুফতী পদে নিয়োজিত করা হয়। অতঃপর তিনি স্বদেশ বীরভূমে মুফতী হন।[২] কালক্রমে বোহার মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। পরে এ মাদরাসার বৃহৎ কুতুবখানা ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং সমুদয় কিতাবপত্র ও অসংখ্য পান্ডুলিপি কলকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে স্থানান্তর করা হয়। উক্ত লাইব্রেরীর 'বোহার বিভাগ' অদ্যাবধি একথা স্মারণ করিয়ে দেয়।

মঙ্গলকোট মাদরাসা:

মঙ্গল কোটের বিশিষ্ট আলিম মাওলানা হামিদউদ্দীন দানিশমান্দ বাঙ্গালী (র.) এর খানকায় এ মাদরাসা অবস্থিত ছিল। কালক্রমে এখানে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে এবং সে স্থানে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচিত হয়। মাদরাসায় এবং কুতুবখানায় রক্ষিত মূল্যবান সম্পদ ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অব্যবহৃত অবস্থায় বিনষ্ট হবে এ আশঙ্কার বংশধরগণ ১৩৪৭/১৯২৮ সালে মাদরাসা আলিয়া কলকাতায় তা দান করেন। বর্তমানে এই সব গ্রন্থ ঢাকা আলিয়া মাদরাসার লাইব্রেরীতে মঙ্গলকোট বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত। এ বিভাগ ৭০৪ খানা গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে ৪৬০ খানা মুদ্রিত।[৩]

সাহসারামে হযরত শাহ কবীরের খানকা:

এখানে শাহ্ কবীরের (র.) খানকাকে কেন্দ্র করে একটি আযীমুশ্শান মাদরাসা গড়ে ওঠে। মাদরাসার একটা বিশাল কুতুবখানা রয়েছে। যাতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার কিতাব রয়েছে। মাদরাসা ও খানকার জন্য ফররুখসিয়ার (১৭১৩ হিজরী) ও সম্রাট শাহ আলমের শাসনকাল (মৃত. ১৭১২) থেকে বিরাট ভুসম্পত্তি ওয়াকফকৃত রয়েছে। এ মাদরাসা ও খানকা এখনো বিরাট ফয়েজ-বরকতের কেন্দ্র।

দানাপুর মাদরাসা:

নবাব আসফ খান দানাপুরে মসজিদ-মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর সময়ে ইমারতের কাজ সমাপ্ত হয়নি। নবাব হয়বত জঙ্গের শাসনামলে এগুলোর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। সুন্দর নির্মাণ শৈলির জন্যে এ মাদরাসা ইমারত অনন্য ছিল।

---

১. এন.এন.ল. প্রমোশন এন্ড লারনিং ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং মুহাম্মডাল রোল, ১৯৭৩, দিল্লী, দারা-ই-আরাবিয়া।
২. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৩. আবুদস সাত্তার, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ফুলওয়ারী খানকাঃ

নবাব আসফ খান দানাপুরে মসজিদ-মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর সময়ে ইমারতের কাজ সমাপ্ত হয়নি। নবাব হয়বত জঙ্গের শাসনামলে এগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। সুন্দর নির্মাণ শৈলির জন্যে এ মাদরাসার ইমারত অনন্য ছিল।

ফুলওয়ারী খানকাঃ

এখানকাও সাজ্জাদা যাহিরী ও বাতিনী ইলমের কেন্দ্র। এখানকার সাজ্জাদানশীল আলিমগণ দারসও দিতেন। এ খানকায় সব সময় শিক্ষকমন্ডলী জ্ঞান দানে রত ছিলেন বর্তমানেও আছেন। এখানে অধ্যয়নরত ছাত্রগণ ভূ-সম্পত্তি (জায়গীর) লাভ করত।

আযীমাবাদ মাদরাসা-মসজিদঃ

এ মসজিদের ইমরাত এখনো বর্তমান রয়েছে। এর নির্মাণ কাঠামো থেকে বোঝা যায়, ইমারতটি দীর্ঘ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা নদীর তীরে স্থানটি মনোরম এবং মসজিদ অত্যন্ত প্রশস্ত। আশপাশের ইমারতগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্থানে স্থানে প্রাচীরের কিছু কিছু চিহ্ন থাকলেও তদ্দারা মূল ইমারত সম্পর্কে ধারণা করা সহজ নয়। [১]

যে সব শিকষাবিদ, বিদ্বান ও পন্ডিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বা-স্ব ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন-

(১) প্রখ্যঅত জমিদার মুন্‌শী সদরউদ্দীন, (২) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুফ্‌তী সাইয়্যিদ গোলাম মোস্তফা, (৩) কবি মির্জা লুতফুল্লা (মখ্‌সূর) (৪) মাওলানা আবদুল আলী বাহারুল উলূম (৫) শাহনূরী (৬) সাইয়্যিদ গোলাম মোস্তফা (৭) সাইয়িদ পরাণ (১৫৫০-১৬১৫) (৮) নসরুল্লাহ খাঁ (১৫৬০-১৬২৫), (৯) নওয়াজীস খাঁ (১০) অবদুল হাকিম (১১) আমীর হামযা (১২) গোলাম নবী (১৩) মাহমুদ খাঁ (১৪) মোহাম্মদ আকবর ও (১৫) মুত্তালিব (১৫৭৫-১৬৬০) প্রমুখ।[২] এসব পন্ডিত ব্যক্তির অবদান ও বিষয়-বিন্যাস উপ-অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

শিক্ষার স্তরঃ

মুঘল আমলে শিক্ষা প্রধানত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচচ্তর এ তিনটি প্রধান স্তরে বিন্যস্ত ছিল। মসজিদ, দোকান অথবা বাসগৃহে প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্পন্ন করা হত।[৩] মসজিদ-সংলগ্ন পৃথক ঘর অথবা স্বতন্ত্র মাদরাসায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চালু ছিল।

শিক্ষা কারিকুলামঃ

প্রাথমিক স্তর প্রথমে উচ্চারণের সাথে বর্ণমালার জ্ঞান দেয়া হতো। অতঃপর গণনা ও প্রাথমিক পাটিগণিত এবং ছোট ছোট বাক্য পড়া ও লিখার নিয়ম শায়খানো হত। প্রত্যহ পঠিত বিষয়ের কিছু অনুশীলনী দেয়া হত। এজন্যে প্লেট ব্যবহার করা হত। এভাবে শিক্ষার্থীকে লিখা ও পড়ায় অভ্যস্ত করে তোলা

---

১. আবুল হাসান আলী নদভী (রা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

২. এনামূল হক, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, লাইডেন, ১৯৭৯, খন্ড-১২

৩. এস.এম. জাফর,প্রাগুক্ত, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ন্যায়-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, হিসাববিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইতিহাস।

বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিণ্যাসঃ

বিদ্যালয়গুলো সাধারণত মকতব, আরবী মাদরাসা ও ফারসী মাদরাসা এ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলমানদের সন্তান-সন্ততিগণ মকতবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও হিপয করার পাশাপাশি প্রাথমিক জ্ঞানের অন্তভূক্ত অন্যান্য বিষয় পড়ার সুযোগ পেত। আরবী মাদরাসায় ব্যাকরণর বিভিন্ন সূত্র, অলংকারশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, আধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি পড়ানো হত। ফারসী মাদরসার পাঠ্যসূচীতে পধানত প্রাথমিক ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যাকরণ, চিঠিপত্র রচনা, অলংকার-শাস্ত্র, ধর্ম-দর্শন, চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং গল্প কাহিনী অন্তর্ভুক্ত ছিল। [২] সে সময় সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। তাই, হিন্দু-মুসলিম অধিবাসীগণ জীবিকার্জনের তাকীদে অতি আগ্রহের সাথে এ ভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করতেন।[৩] তখনকার শিক্ষানীতিকে কেউ কেউ পাক্-ছাপাখানা যুগের ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার সাথে তুলনা করেছেন।

শিক্ষার মাধ্যমেঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে সময় ফারসী ভাবা সরকারী ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। তাই এ ভাষা তখন শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে সর্বত্র প্রচলিত হয়।

বিষয়-বিন্যাসঃ

সে সময়ে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) উলূমূল নাকলিয়া অন্য অর্থে 'উলূম আল-শরী'আ বা ধমীর্য় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও (২) উলূম আল-আকলিমা বা গবেষণাধর্মী জ্ঞান-বিজ্ঞান। বর্তমানকালে প্রচলিত কলা, নাণিজ্য, বিজ্ঞান, কৃষি ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুষদে গঠিতব্য বিষয়সমূহের সাথে এর মিল খুঁখে পাওয়া যায়।

উলূম-আকলিয়ার আওতায় যেসব বিষয় পড়ে তা হলঃ (১) মান্তিক (যুক্তিবিদ্যা), (২) হিকমাৎ (৩) ফালসফা (দর্শন) (৪) হাইয়্যাত (৫) নযুম (জ্যোতির্বিদ্যা) (৬) হিসাব (অংক), (৭) হিন্দাসা (পদার্থ জীব ও শরীরতত্ত্ব)। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সাথে ধর্ম শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোরর হয়। নিরপক্ষে-বিষয়েও ধর্মের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। [৪] সম্ভ্রান্ত বংশের ললনারাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। অবস্থাশালী পরিবার আতালিক (গৃহশিক্ষক) নিয়োগ করে বয়স্ক কন্যাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হত। সাধারণ পরিবারের মহিলাগণ ইসলামী শরী'আ প্রতিপালন তথা, নামায, রোযা, পাক-পবিত্রতা, সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান-লাভ করত-কঠিন পর্দাপ্রথার অন্তরালে-পরিবারের গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে।

তবে দুঃখের বিষয় হল এই যে, ব্যাপক অনুসন্ধান করেও সে যুগের বাংলায় স্বাক্ষেত্রে প্রতিভাব স্বাক্ষর রক্ষাকারী এমন কোন উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২. আই.জি.বি. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮
৩.ডব্লিউ এ্যাডাম, রিপোর্ট অব দি স্টেট অব এডুকেশন ইন বেঙ্গল, ১৯৩৮, খন্ড-১-২, পৃ. ৮০
৪. আজিজুর রহমান মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক কাঠামোতে গড়ে ওঠা শিক্ষায়তনে শিক্ষিত, নানা ক্ষেত্রে অবদানের গৌরব-দীপ্ত কবি, সাহিত্যিক ও পন্ডিতবর্গের কয়েকজন হলেন-

(১) শায়খ পরাণ (১৫৫০-১৬১৫) 'নাসিহাত নামা' নামক ধর্মীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন।

(২) মুত্তলিব (১৫৭৫-১৬৬০) 'কিফায়াতুল মুসাল্লীন' প্রণয়ন করেন।

(৩) নসরুল্লাহ খাঁ (১৫৬০-১৬২৫) 'শরীয়ত নামা" মুসার সাওয়াল' ও 'হিদায়তুল ইসলাম নামক মূল্যবান ধর্মীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং 'জঙ্গনামা' নামক পুঁথি সাহিত্য রচনা করেন।

(৪) নওয়াজিশ খাঁ, 'হাজার মাসায়েল' (১৬৩৮) প্রণয়ন করেন এবং 'ইয়সুফ-জুলেখা' ও লাল মহি-সাইফুল মুলুক" নামক রোমান্টিক সাহিত্যও রচনা করেন।

(৫) 'আবদুল করিম' 'নাসিহত নামা' ও 'শিহাব উদ্দীন নামা' প্রণয়ন করেন।

(৬) 'আবদুল করিম (১৬২০-১৬৯০ খ্রি.) 'সারসাতর নীতি' প্রণেতা।

(৭) সাইয়েদ সুলতান, মুসলিম পুঁথি সাহিত্যিক। 'রসূল বিজয়' ও 'শবই-মি'রাজ' রচনা করেন (১৫৫০-১৬৪৮)।

(৮) গোলাম নবী, আমীর হামযা' (১৬৪৮) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(৯) হায়াত মাহমুদ, 'আম্বিয়া বাণী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(১০) মহাকবি আলাওল ও (১৬০৭-১৬৮০) এ স্বর্ণময় যুগের অন্যতম পুরোধ হিসাবে গণ্য হতেন।[১] তিনি বিখ্যাত মহাকাব্য 'পদ্মাবতী'র রচয়িতা।

উল্লেখ যে, শিক্ষাকোর্স সমাপ্ত করার পর একজন মুসলিম যুবক ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনসহ শরী'আ ও ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে বর্তমান যুগের অক্সফোর্ড হতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটের সমান দক্ষতা লাভে সমর্থ হতেন।[২] বরং এক্ষেত্রে আরো তথ্য পাওয়া যায় যে, অক্সফোর্ড হতে যুবকগণ সদ্য যে, জ্ঞান নিয়ে বের হয়ে আসেন, মুসলিম যুবকগণ শুধুমাত্র সাত বছর শিক্ষাকালেই তদনুরূপ জ্ঞান আহরণ করে শিরস্ত্রাণ পরতেন এবং তাঁরা অনর্গল সক্রেটিস, এ্যারিস্টটল, প্লেটো, গেলেন ও ইবনেসীনা সম্বন্ধে পান্ডিত্যের পরিচয় দানে হতেন।[৩] এ শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে পন্ডিত, ধর্মবেত্তা, বিচারক, প্রশাসক, প্রকৌশল, পদার্থবিদ, অধ্যাপক ও আমলাগণিত স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিতেন।

ব্যবস্থাপনাঃ

সে সময় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে ন্যস্ত ছিল। বর্তমানে সরকার পরিচালিত কলেজ অথবা স্কুলের মতো কথিত এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তখন ছিলনা, সর্বস্তরে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক, শিক্ষার্থীদের জন্য আহার, আবাসন, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সরঞ্জাম, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত, কসবা-কাঘা অঞ্চলের নাম এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১. ইনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

২. এম.এ. রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১১১-১১২

৩. এম.এ. রহীম প্রাগুক্ত, পৃ.

৪. ডব্লিউ এ্যাডাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম রাজ-রাজরা, আমলা, আমাত্য ও ধনশালী ব্যক্তিবর্গ বিদ্বান ও পন্ডিতগণের পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। তাঁরা মসজিদ ও মাদরাসার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত করমুক্ত (লা খারাজ) ভূমি দান করতেন। কেউ কেউ নিজস্ব তহবিল হতে বৃত্তির ব্যবস্থাও করতেন। এসব কাজ তাঁরা নিজ নৈতিক দায়িত্ব ও ধর্মীয় কর্তব্য মনে করেই সম্পাদন করতেন। ১৮শ খ্রি. শায়খাংশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দিওয়ানী গ্রহণ করার সময় একমাত্র বাংলাই এক-চতুর্থাংশ ভূমি লা খারাজ দেখতে পান।[১]

পরীক্ষা-পদ্ধতি:

সে সময় কেন্দ্র ও সরকারের পরিচালনাধীনে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম-পদ্ধতি চালু ছিল না। ছাত্র বা বিদ্যার্থীর প্রধানতম বিচারক ছিলেন শিক্ষক। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়ে নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হলেই তিনি তাকে সনদ বা দস্তার অথবা ইজাজা দিতেন। [২] এ ব্যবস্থায় পরীক্ষা পাশের জন্যে বাছাইকৃত পাঠ মুখস্ত বা অন্য কথায় পাঠ ফাকি দেয়ার কোন সুযোগই ছিল না। শ্রেণী ভিত্তিক না হয়ে, ছাত্রগণ বিভক্ত হতেন। বিষয় ভিত্তিক গ্রুপে।[৩] যা সচরাচর বর্তমান সময়ে কাওমী মাদরাসাসমূহে দেখা যায়। বর্তমানে দেখা যায় যে, ছাত্রের মেধা, যোগ্যতা, একাগ্রতা, সামাজিক মার্যাদা এবং ব্যক্তিগত চাহিদা যাচাই না করে একই শ্রেণীর সব ছাত্রকে সব বিষয় গ্রহণে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সে সময়ে প্রতিটি বিদ্যার্থীই নিজের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী যে কোন বিষয় নির্বাচন ও বর্জনের স্বাধীনাত ভোগ করতেন। [৪] যে সব ছাত্র শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয় শর্ত, অর্থ্যাৎ সদাচার, উন্নত চরিত্র, পন্ডিত্য ও ব্যুপত্তি অর্জন করতেন তাঁরা শিক্ষকতা সনদ বা অধ্যাপনার অনুমতি লাভ করতেন।[৫]

সামাজিক মর্যাদা:

তৎকালে আলিমগণ ছিলেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা সমাজে উচ্চস্তরের ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাঁরা আহল্ ই-খায়র, আহল-ই কলমের সাইয়্যিদগণ বিশেষ টুপী পরতেন। তাঁদেরকে কুলাহ দাঁরা বলা হত। আলিমগণ পাগড়ি বা দস্তার পরতেন। তাঁদেরকে দস্তারা বন্ধা বলা হত। সূফীগণও আলিম ছিলেন। তাই তাঁরাও দস্তার পরতেন। আলিমগণও ছিলেন আইনের প্রবক্তা।[৬] সুলতানগণ বিভিন্ন বিষয়ে মালআলার উত্তর জানার জন্যে তাঁদের স্মরণাপন্ন হতেন। 'সদর ই-সুদূর, 'কাযী, শায়খুল-ইসলাম, শিক্ষক, ইমাম ও খতীবের সমুদয় পদ ছিল তাঁদেরই দখলে। [৭] আলিমগণ নিজ নিজ কাজে শিক্ষাদন এবং গবেষণায় চিন্তার প্রভূত স্বাধীনতা ভোগ করতেন। শিক্ষকবৃন্দ অধ্যাপনাকে নিজেদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত বলে জ্ঞান করতনে। তাই তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই বিনা ভাড়ায় নিজ গৃহে ছাত্রগণকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে এখানে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হত।

---

১. W. Adam, Opcit, P.56
২. জাফর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩. আবদুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২১
৪. আইউব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩০
৫. আবদুল করীম, মুর্শিদ কুলী খান ও তাঁর যুগ, ১৯৮৯, ঢাকা, পৃ. ৪
৬. আবদুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

মুগল যুগে নারী শিক্ষাঃ

ইসলামী নারী পুরুষ উভয়ের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করা আবশ্যক কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছে। কন্যাদেরকে শিক্ষিতা করা মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কর্তব্য; তাদের এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে, নামাজ আদায় করতে পারে এবং ধর্মের মূল সূত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারে। এটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বালিকারা বালকদের সঙ্গে একত্রে মক্তব ও পাঠশালায় অধ্যয়ন করত। [২] এতে দখা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে বালক-বালিকা উভয়ের জন্য প্রচলিত ছিল।

সমাজে পর্দাপ্রথা মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণ সীমাবদ্ধ করে। প্রাথমিক পর্যায়ের পর, সহশিক্ষা অনুমোদিত হয়নি। সেকালের মাদরাসায় বালিকাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার কোন রীতিসম্মত পদ্ধতি ছিল না। বালিকাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তারা এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারতেন। সম্রাট আকবর রাজকন্যা ও অভিজাত পরিবারগুলোর বারিকাদের জন্য ফতেপুর সিকরীতে তার রাজপ্রসাদের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩] এতে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাদের কন্যাদেরকে উচ্চশিক্ষা দেয়ার জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মুগল আমলের অভিজাত পরিবারের মহিলা সুশিক্ষিতা ছিলেন এবং তাদের কেউ কেউ সাহিত্য ও ইতিহাস রচনা করেন এবং ধর্মতত্ত্ব মরমিবাদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর গ্রন্থাদি লিখেন।[৪] শিক্ষিতা মহিলারা বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেন। অভিজাত মহল এবং ধনী লোকেরা তাদের কন্যাদের গৃহ-শিক্ষয়িত্রীরূপে শিক্ষিতা রমণীদেরকে নিয়োগ করতেন। জনৈকা উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা সতিউননেসা সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহান আরা ও রওশন আরার গৃহ শিক্ষায়িত্রী ছিলেন। আর একজন সংস্কৃতি সম্পন্ন মহিলা ছিলেন সম্রাট আলমগীরের সচিব এনয়েতউল্লাহ কাশ্মিরীর মাতা হাফিজা মরিয়ম। ইনি শাহজাদী জেবুন্নেসার গৃহ শিক্ষায়িত্রী ছিলেন।[৫] এ ধরণের মহিলা শিক্ষায়িত্রী এই উপমাহাদেশের অন্যান্য মুসলিম রাজ্যসমূহ ও প্রদেশগুলোতেও দেখা যায়। ফিরিস্তার মতে, মালবের সুলতান গিয়াসউদ্দিনের হারেমে ১৫,০০০ রমণী ছিলেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রী, সঙ্গীতজ্ঞ, কুরআন তিলাওয়াতকারিণী প্রভৃতি মহিলারা ছিলেন।[৬] এতে দেখা যায় যে, যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর, রমণীরা শিক্ষাদান কার্য এবং অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করতেন।

---

১. আহমদ শরীফ, (সম্পা.) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২. W.Adam, Education Report, 1335-38, Calcutta-1911, P.344

৩. N.L. Law Opcit, P. 202

৪. বাবরের ভগ্নি খানজাদা বেগম, গুলবদন বেগম, রোকেয়া বেগম, সলিমা সুলতানা বেগম, মহাম আনগা, নূরজাহান বেগম, মমতাজমহল বেগম, জাহান আরা, রওশন আরা, দারাশিকোর কন্যা ও যুবরাজ আজমের স্ত্রী জাহানজের বানু বেগম এবং জেবুননিসা বেগম। গুলবদন 'হুমায়ুননামা' সংকলন করেন। নূরজাহান ছিলেন একজন প্রতিভাময়ী মহিলা কবি এবং জেবুন্নেসার রচিত কবিতাবলী ফারসি সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ।

৫. হাফিজা মরিয়ম বিদ্যাবত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পান্ডিত্য ও রচনাবলীর জন্য বিখ্যাত এনায়েতউল্লাহ তার মাতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সম্রাট আলমগীর তার চমৎকার রচনাবলীর জন্য তাকে ভালবাসতেন।

৬. ফিরিস্তা এন.এন. ল কর্তৃক উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালি সুলতানগণ, সুবাদার, নবাব এবং অভিজাত মহল তাদের কন্যাদের শিক্ষার নিমিত্ত গৃহ শিক্ষয়িত্রী রাখার মুসলিম ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। মি. এডাম পান্ডুয়ায় ধনী ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার জন্য গৃহ শিক্ষক রাখার রীতি লক্ষ্য করেছেন।[১] কার্যত এই রীতি বাংলায় মুসলিম শাসনামলে ব্যাপক হারে প্রচলিত রীতিরই অব্যাহত ধারা ছিল।

মি. এডাম মন্তব্য করেন যে, প্রতিবেশী গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা সে যুগের অবস্থাপন্ন মুসলমানগণ কর্তৃক নিযুক্ত গৃহ শিক্ষকদের নিকট শিক্ষালাভ করতে পারত।[২] এভাবে মুসলাম বালিকারা গৃহে গৃহশিক্ষক কিংবা গৃহ শিক্ষয়িত্রীর নিকট বিদ্যার্জনের সুযোগ পেত। যেহেতু এই বিশেষ ব্যবস্থা কেবল অবস্থাপন্ন ধনী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারিণী বালিকাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। সমসাময়িক বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের উচ্চ সম্প্রদায়ের মহিলারা অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি সম্পন্না ছিলেন। বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গের স্ত্রী রোকেয়া বেগম তাঁর বিদ্রাবত্তা ও গুণরাজির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কামরূপের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত তদিয় ভ্রাতা বাহরামের তত্ত্বধান এবং প্রশাসনকার্যে তাকে সহায়তা দানের জন্য মীর্জা নাথনকে অনুরোধ করে একটি পত্র লেখেন। পত্রটিকে তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, যেহেতু মীর্জা বাহরাম আমার নিজ পুত্রের মতো, সেহেতু সে আপনার পুত্ররূপেও বিবেচিত হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আপনা শুভেচ্ছা ও দয়া উপর নির্ভর করে, আমরা তাকে কামরূপে পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক সে স্থানের বিষয়াদির এরূপ বন্দোবস্ত করবেন যাতে শত্রুরা হতাশাগ্রস্ত হয় এবং বন্ধুরা খুশী হয়।[৩] শায়েস্তা খানের দুজন ইরান-দুখত পরীবিবি এবং লৌক্ষের সন্নিকটে খিদিরপুরে সমাধিস্থ হন। শায়েস্তা খানের কন্যারা অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি সম্পন্না ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে পরীবিবি সে যুগের একজন গুণান্বিতা মহিলা ছিলেন।[৪]

নাববগণ এবং তাদের আমির-ওমরহা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন। এটা স্বাভাবিক, যে, তারা তাদের কন্যাদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করতেন। মহিলাদের কেউ কেউ তাদের শিক্ষা ও প্রতিভার গুণে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপন করেন এবং সে কালের ইতিহাসে খ্যাতিদ লাভ করেন। মুর্শিদকুলী খানের কন্যা ও নবাব শুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিনাতুননিসাদ বেগম ছিলেন এরকম একজন প্রতিভাময়ী ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মহিলা যার প্রভাব তদীয় স্বামীর প্রশাসন কার্যে অনুভূত হত।[৫] শুজাউদ্দিনের কন্যা নাফিসা বেগম ও দারনামা বেগম সম্মানিতা মহিলা ছিলেন এবং সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[৬] সে যুগের উচ্চশিক্ষিতা ও প্রতিভাশালিনী মহিলাদের মধ্যে আলিবর্দী খানের বেগম শরফুননিসার নাম সর্বাগ্রগণ্য।

---

১. A.R Mallick, British Policy and Muslim of Bengal, Dacca-1961,p.151
২. Ibid p.151
৩. বাহারিস্তান (অনুবাদ), ২য় খন্ড পৃ. ৬৭২
৪. যুবরাজ আজমের সঙ্গে পরীবিবির বিয়ে হয়। কথিত আছে যে, অনত্যন্ত প্রিয় কন্যা পরীবিবির আকস্মিক মৃত্যুতে পিতা শায়েস্তা খান এতে বেশি মুষড়ে পড়েন যে তিনি লালবাগ দূর্গের নির্মাণ কার্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করেন।
৫. A.R. Mullick, Opcit, P.152
৬. গোলাম হোসাইন তাবতাবঈ, (অনু.হাজি মোস্তফা), সিয়ারুল মুতাখখিরীন, নৌলজিশার, লক্ষ্মৌ, কলিকাতা-১৭৮৯, ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক পারস্য দেশীয় ও ইউরোপীয় লেখকগণ তার সুরুচি, সুশিক্ষা ও উদার ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নবা স্বয়ং একজন বিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তার প্রতিভাময়ী সহধর্মিণীর পরামর্শের পতি সম্মান দেখাতেন। [১] শরফুননিসা তার প্রাসাদে বহু দরিদ্র ও পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালিকা এবং ক্রীতদাসীদেরকে শিক্ষাদান করেন ও তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন।[২] আলিবর্দীর কন্যা ঘষেটি বেগম (আসল নাম ও মেহেরুননিসা), মায়ামুনা বেগম ও আমিনা বেগম এঁরা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। স্বামী শাহমৎজঙ্গের মৃত্যুর পর ঘষেটি বেগম নবাব কর্তৃক বাংলার দিউয়ান নিযুক্ত হন। শাহামৎজঙ্গ তার পিতৃব্যের রাজত্বের প্রারম্ভকাল থেকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [৩] এতে দেখা যায় যে, ঘষেটি বেগম উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন: অন্যথায় তাকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হতো না-কারণ দিউয়ানকে সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত দলিলপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হত। আলিবর্দী খানের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং আতাউল্লাহ্ খানের স্ত্রী রাবিয়া বেগম ছিলেন অন্য আর একজন মহিলা যিনি তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য খ্যাত ছিলেন। লুৎফুন নিসার নাম সুপরিচিত। আমিনা বেগম ক্রীতদাসী বালিকাকে শিক্ষিতা করে তোলেন এবং স্বীয় পুত্র সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে তার বিয়ে দেন।[৪] এইসব মাহিলাদের জীবন থেকে প্রমাণ হয় যে, উচ্চ শ্রেণীর রমণীরা শিক্ষার সুযোগ পেতেন এবং শিক্ষা ও প্রতিভার বলে তারা ইতিহাসের আলোকে আসতে সমর্থ হতেন। উচ্চশিক্ষার ফলে মুসলমান মহিলাদের প্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। শিক্ষা তাদেরকে সাহস ও মানসিক শক্তি সম্পদে বিভূষিত করে ফলে দেখা যায় যে, ভাগলপুরে গাউস খানের বিধরা রমণী মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার গুণে স্বীয় গৃহ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫]

উচ্চশিক্ষার নিয়মিত সুযোগ-সুবিধার অভাবের দরুণ মুসলমান বালিকাদের প্রতিভা প্রকাশ পেতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও পুরুষদের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক প্রতিযোগিতায় নারীদের পান্ডিত্য ও কৃতিত্বের কথা আমরা শুনতে পাই। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এর নজির দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের মতে, হাসানহাটির কাজির স্ত্রী হিন্দু শাস্তে পারদর্শিনী ছিলেন।[৬] 'গদামল্লিকার পুঁথি' বা 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' (মল্লিকার হাজার প্রশ্ন) নামেও অভিহিত বাংলা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মল্লিকা নাম্নী জনৈকা মুসলমান বালিকা জ্ঞানের নানা শাখায় গভীর বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এয, যিনি তাকে সহিত্য সংক্রান্ত বিতর্কে পরাজিত করতে পারবেন তিনি তাকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। বহু যুবরাজ বিদ্বান ব্যক্তি তার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, কিন্তু তাদের সকলেই পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে একজন সুফি পন্ডিত আব্দুল হালিম গদা তার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে তর্কে পরার্জিত করেন। মল্লিকা অতঃপর তার বিজয়ীকে বিয়ে করেন।[৭] যদিও এটা একটা গল্প মাত্র, তথাপি উহা সমাজের একটা অবস্থা তুলে ধরে যে, এরূপ

---

১. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-১১-১২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২
৩. করম আলী (অনু. জে এন সরকার) মুজাফফর নামা, কলিকাতা-১৯৫২, পৃ. ৩৭
৪. গোলাম হুসাইন তাবতাবঙ্গী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫
৫. ঐ, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫
৬. বিজয়গুপ্ত, পদ্মপুরাণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৭. বাঙ্গালী প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯০

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন রমণী বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিরল ছিল না। কবি আব্দুল হাকিমের আর একখানা সমসাময়িক বাংলা গ্রন্থ 'সায়ফুল মূলক' পুঁথি থেকে উক্ত ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়।

এই রম্য কাব্যের নায়িকা লাল মতি (লালবাবু) সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বাউলদের মধ্যে প্রচলিত একটি কিংবদন্তি অনুসারে, জনৈকা শিক্ষিতা মুসলমান রমণী মাধব বিবি ছিলেন বাউল মরমি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।[১] এই কিংবদন্তির সত্যতা যাই থাকুক না কেন, এতে অবশ্য পতিফলিত হয় যে, সেকালের মুসলমান সমাজে সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্ন রমণীরা ছিলেন যারা বুদ্ধিবৃত্তি এবং গুঢ়-তাত্ত্বিক আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৫৬৭-১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত বাংলা মুগলদের অধীনে ছিল। মুগল সাম্রাজ্যের প্রায় দু'শ বছরের সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কখনও সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এ বিরাট প্রগতির নৈপথ্যে প্রেরণা জুগিয়েছিল শিক্ষা-যা সেদিনের মুগল সম্রাটদের প্রচেষ্টার ফল। এটি তাদের শিক্ষানুরাগেরই প্রমাণ। প্রাপ্ত শিক্ষাই একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে সবচেয়ে ভালভাবে চিত্রিত করে। সে সময়ে শিক্ষা রাষ্ট্র পরিচালিত ছিল না। তবুও, তরুণদের শিক্ষালাভের সুবিধা বিদ্যমান ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই উচ্চ শিক্ষার জন্যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল। মুসলমানদের জন্যে সব মসজিদই মক্তবের কাজে ব্যবহৃত হত যেখানে অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হত। একই ব্যক্তি ইমাম ও শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। মুগল আমলের বহু মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে দেখা যায় যে, সেগুলো দু'তলা ছিল এবং একতলা যে মক্তব্য হিসেবে ব্যবহৃত হত তা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির একটি সুবিবেচিত চেষ্টা শিক্ষা নির্মাতাদের ছিল। মুসলিম সূফী-সাধকগণের খানকা এবং শি'য়াদের ইমামবাড়াগুলোও বিদ্যাপীঠ হিসেবে কাজ করছিল। এছাড়া এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরবী ও ফারসী ভাষা, ইসলামী ধর্ম-শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতিশাস্ত্র ছিল উচ্চতর মুসলিম শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ শিক্ষা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। বিষয়-বিন্যাসে ধর্মীয় জ্ঞান ও গবেষণাধর্মী বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষার সাথে সর্বস্তরে ধর্মশিক্ষার সাথে সর্বস্তরে ধর্মশিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছিল। পরীক্ষা-পদ্ধতি ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি।

---

১. আবদুল হাকি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী শিক্ষার অবস্থা এবং মুসলিম নারী শিক্ষার বিকাশ

- প্রতিপাদ্য সার
- বৃটিশ শাসনামলে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের ইসলামী শিক্ষা নীতি
- ইংরেজী বিরোধিতার অবসান
- নারী শিক্ষার বিকাশ ও মুসলিম নারী সমাজ মিশনারীদের উদ্যোগে নারী শিক্ষার সূচনা
- অন্ত:পুর নারীশিক্ষা: মুসলিমদের উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপদ্য সারঃ

সুদীর্ঘ সাতশত বছর মুসলিম শাসনাধীন এ অঞ্চল ছিল শিক্ষা ও সভ্যতার অন্যতম কেন্দ। মুসলিম শাসনদের দূরদর্শিতা অভাবে বাণজ্যের নামে আগম (১৪৯৮ খ্রী.) ইংরেজরা রাজ্য বিস্তারের অপকৌশল অবলম্বন করে। নবাব সিরাজুদৌলার পতনের পর বাংলার শাসনভার কার্যত ইংরেজদের হাতে চলে যায়। সে সময়ে কলকাতাই ছিল বাংলার প্রধান নগরী ও রাজধানী শহর। সুতরাং কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল বাংলার শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। ফারসী ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন। মুসলিম শাসনামলে ফারসী ছিল রাজভাষা। রাজপদ লাভ করতে হলে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ফারসী জানতে হত। ইসলামী গ্রন্থাদী ফারসীতে অধিক হারে রচিত ছিল বলে মুসলিম সমাজে ফারসী ভাষার কদর হিন্দুদের তুলনায় বেশী ছিল। সংস্কৃত ছিল হিন্দুরের ধর্মীয় ভাষা। সতের আঠার শতকের দিকে এদেশে আর একটি ভাষার আমদানী হয়, সেটি হল উর্দু ভাষা। মাতৃভাষা বাংলা যদিও ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি তবুও বাংলার চর্চা বরাবরই ছিল। সুতরাং ইংরেজীদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে আরবী,ম ফারসী, সংস্কৃত, উর্দু ও বাংলা এই পাঁচটি ভাষার প্রচলন ছিল। ইংরেজদের আগমনে ইংরেজী ভাষার প্রচলন হলে এদেশে ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টি।[১] তন্মধ্যে অন্যসব ভাষাকে ডিঙ্গেয়ে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ফারসীই ছিল মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের সাথে বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তিমিত হয়। এরপর ১৭৬৫ সালে বাংলার শাসনভার কার্যত ইংরেজদের হাতে চলে যায়। মূলত তখন থেকেই মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধিদ পেতে থাকে; যদিও তা ১৮৩৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। ১৭৬৫ সালে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করলে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের মর্মাঘাত এড়ানোর জন্য অফিস-আদালতের প্রচলিত ভাষা ফারসীকে প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা যদিও হিন্দু, তবুও হিন্দুদের পক্ষ থেকে আপাতত কোন সমস্যা নেই। কেননা তারা এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছে মুসলমানদের নিকট থেকে। আর ফারসী ছিল তাঁদের রাজভাষা তথা ধর্মীয় ভাষা।

সম্ভবতঃ এ কারণেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠি এদেশের শাসন ক্ষমতা দখলের প্রথম পঞ্চাশ ষাট বছর পর্যন্ত ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করেনি। বরং এই ভেবে তারা এ ব্যাপারে নীরব ছিল যে, এক্ষুনি শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করলে জনগণের মনে বিশেষত রাজ শক্তিহারা মুসলিম জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। আর তাই খ্রীস্টান মিশনারীরা স্কুল খুললে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানীর লোকেরা তাদের উৎসাহ দেয়নি বরং মিশনারীদের বাধা দিয়েছিল এই আশঙ্কায় যে ধর্মভীরু ভারতবাসী মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে ক্ষিপ্ত হবে।[২]

সুতরাং বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার গতি-প্রকৃতি যেরূপ চলে আসছিল সেরূপই থেকে গেল। অর্থাৎ মসজিদের বারান্দা, সম্পন্ন গেরস্তের বৈঠকখানা, মক্তব-মাদরাসা, টো ও চতুষ্পাটিতে 'আরবী-ফারসীর প্রাথমিক তা'লীম বা ধর্ম শিক্ষা।

---

১. ড. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ.২

২. Muhammad Mohar Ali, The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities Chittagong The Mehrab Publication, 1965, P. 2

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর সিকান্দার আলী ইবরাহিমীর মতে, এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কায়েম হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের জন্য প্রধানত দু'প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ছোট সাইজের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হত। ধনী, দরিদ্র, কৃষক, ব্যবসায়ী এমনকি জমিদারের ছেলে-মেয়েরাও এসব শিক্ষা লাভ করত। শিক্ষার্থীরা এসব প্রতিষ্ঠানে কুরআন পড়ার নিয়ম শিখে সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারত। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম, দোয়া-কালাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারত। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম, দোয়া-কালাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারত। তার সঙ্গে কোন কোন মক্তবে উর্দু, ফারসী, বাংলা ও অংকের প্রাথমিক শিক্ষাও লাভ করত। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বড় মসজিদ ভিত্তিক মাদরাসা বা স্বতন্ত্র মাদরাসা আর সূফীদের খানকাহ। এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষিত 'উলামা-মাশায়িখ' মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দান করতেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার বিষয়বস্তু বা সিলেবাস কারিকুলাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ছিল।[১]

বৃটিশ শাসনামলে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের ইসলামী শিক্ষা নীতি:

এরকম গতানুগতিক পন্থায় এদেশের মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ত আর কিছু দিন চলতে পারত। কিন্তু রাজভাষা ফারসী অপরিবর্তিত থাকায় এবং আদালতে মুসলিম আইনবলবৎ থাকায় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এদেশীয় জনগণের মধ্য থেকে কিছু লোককে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে যারা প্রশাসনকে সাহায্য করতে পারবে এবং প্রশাসনের বিরোধিতা করবে না। প্রধানত এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিং ১৭৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা 'আলীয়া মাদরাসা' স্থাপন করেন।[২] উক্ত মাদরাসায় শাসকদের কাঙ্খিত লোক তৈরীর উদ্দেশ্যে এমন এক সিলেবাস চাপিয়ে দেয়া হয় যাতে ইসলামের প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয়াদির স্থান না দিয়ে অধিকহারে ফিকহ্, মানতিক ও ফারসীর ন্যায় গৌণ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। এই মাদরাসায় লেখাপড়া করে যে সকল যুবক শিক্ষা লাভ করে বের হত তাদেরকে মুসলমানদের ইতিহাস ও ইসলামী আইনে পারদর্শীতার উচ্চ প্রশংসাপত্র দেয়া হত। যা রাজকার্যে প্রবেশের যোগ্যতার প্রমাণ বাহক। ফলে এরা প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে দেওয়ান, মীরমুন্সী, মুফতি কাযী, সদর, সদরে আলা, মৌলবী আদালত হিসেবে নিয়োজিত হতেন।[৩]

কলকাতা 'আলীয়অ মাদরাসা'র অনুকরণে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে মুহসীন ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতায় মুহসিনিয়া মাদরাসা স্থাপন করা হয়। ফান্ডের সহায়তায় ১৮৭৩ সালে এ ধরনের আরও কয়েকটি মাদরাসা স্থাতিত হয়। নওয়ার আবদুল লতিফ মহসীন ফান্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদরাসা স্থাপনের পরামর্শ দিলে সরকার তা কার্যকরী করেন (১৮৭৪)। বলাবাহুল্য ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এদেশে খাঁটি ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন করার পক্ষপাতীও ছিলনা। বরং তারা মুসলমানদিগকে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে রেখে ঈমানী শক্তি লাভ করা থেকে বিরত রাখারই প্রয়াস পেয়েছিল। কলিকাতা 'আলীয়া মাদরাসা' ও পরবর্তীতে অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ। আর তা হচেছ (১) মুসলমানদের মনের দাবী ইসলামী শিক্ষার ন্যূনতম দাবী পূরণ (২) প্রশাসনের সহায়তার জন্য যোগ্য লোক

---

১. Dr. Sekandar Ali Ibrahimy, An Introduction to Islamic Education in Bengaladesh, Dhaka, 1992, P.35.

২. ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী, বাংলাদেশে ইসলাম শিক্ষা: অতীত ও বর্তমান, ঢাকা-১৯১, পৃ.২৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

তৈয়ার করা এবং (৩) সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা থেকে মুসলমানদের দৃষ্টি দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস।[১]

ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেই মাদরাসা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যাখার করেন এভাবে, It had been deemed expedient on maxim of sound policy to continue the administration of our criminal courts ofjudicature and many of the most important branches of the police in the hands of Mohammadan officers. But for the due fulfilment of the duties attached to them not only natural talents but also considerable attainminments in the Persian and Arabic languages and extensive knowledge of the complicated systems of laws founded on the tenets of Mohammadan religion were required and that species of learning had for sometime past been decline. With the decay of wealth and the importance of Mohammadan families in the province diminished year by year their means of giving their sons the education which fitted them for responsible and lucarative offices in the state. Hence the Madrasha was established with a view to give them once again their due share of the Govt...... Job.

ড. সিকান্দার আলী ইবরাহিমী বৃটিশ শাসক কর্তৃক এদেশে প্রবর্তিত ধর্মীয় তথা মাদরাসা শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, The object of British religious education had the motive to soothe the feelings of the Muslims olny. The Madrasha education that they set up taught external aspects of Islam rather than its inherent spirit. W.S. Blunt, an Englishman who came to visit India during the Viceroyality of Lord Ripon found found that Madrasha teachers were chosen by the government from among the least religious and most loyal of the Ulama. Madrasha students were neither equipped with true Islamic knowledge nor were prepared for any kind of employment under the Government.

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার ১৮৩৫ সালে তাদের শিক্ষা নীতিতে (তথা রাজনীতিতে) এক যুগান্ত কারী পরিবর্তন আনয়ন করে। ইংরেজী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য তারা শিক্ষা উন্নয়ন খাতের যাবতীয় অর্থ ইংরেজী শিক্ষা খাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪] ইতোমধ্যে ১৮২২ সালে ড. লুমসদেনকে কলকাতা মাদরাসার সেক্রেটারী নিয়োগ করার পর মাদরাসার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ইউরোপীয়দের হাতে চলে যাওয়ার তাদের ইচ্ছানুসারে অন্তভূর্ক্ত করা হয় (১৮২৩)। ১৮২৬ সালে উইলিয়াম বেন্টিং এর নির্দেশে ইংরেজী শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী লর্ড মেকলে (Lord Macaulay) এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর মিনিউট (Minute) প্রকাশ করেন এবং ঐ বছরই ৭ মার্চ লর্ড উইলিয়াম রেটিং তা পাশ করেন। এই মিনিউটে তিনি বলেন যে, এদেশের এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে যা গ্রহণ করলে এদেশের মানুষের গায়ের রং ও রক্তের দিক দিয়ে ভারতীয় থাকলেও কৃষ্টি কালচার ও চিন্তা-বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে পুরোপুরি ইউরোপীয়।[৫]

---

১. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৮
২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসংগ, ঢাকা: ১৯৭৬, পৃ. ৬.-৬৪
৩. Dr. Sekadar Ali Ibrahimy, reports on Islamic Edlucation and Madrasha, Education in Bengal, 1861-1977, Dhaka, If. B. 1987, Vol-4, Publisher's Note P. VIII
৪. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৫. ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

অত:পর ১৯৩৭ সালে ২৯নং এ্যাক্ট অনুসারে ফারসী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে মর্যাদা হারায় এবং তদস্থলে ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে অফিস আদালতে ব্যবহার করার নির্দেশ জারী করা হয়। অবশ্য মাতৃভাষা বাংলাকে ইংরেজীর সংগী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কলিকাতায় শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ ৮৩১২ টি দস্তখতসহ বড় লাটের কাছে প্রতিবা পেশ করেন। ১৮৩৯ সালে ঢাকা শহরের ৪৮১ জন বিশিষ্ট নাগরিক (যাদের মধ্যে ১৭৯ জন হিন্দুও ছিলেন)। ফারসী ভাষাকে সরকারী ভাষা রাখার অনুরোধ করে আবেদন করেন। এ সময় সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মরিসন সুপারিশ করেন যে, ফারসী ভাষাকে আরও কিছুকাল ইংরেজীর সঙ্গে সরকারি কাজের ভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়ার অনুমতি দেয়া হাক। এই সুপারিশ কার্যকরী হলে মুসলমান সমাজের অনেকটা সুরাহা হত। অফিস-আদালতের ভাষার অকষ্মিক পরিবর্তনই মুসলমান সমাজের অনেকটা সুরাহা হত। অফিস-আদালতের ভাষার আকষ্কিক পরিবর্তনই মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বনাশের মূল হেতু।[১]

উপুক্ত সময় না দিয়ে রাজ ভাষার আকস্মিক এই পরিবর্তন মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। তারা সম্যাজি ভাবে হতোদ্দম হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে এ যেন তাদের জাতিসত্ত্বার উপর এক কঠোর বজ্রাঘাত। তাদের উপলব্ধি হয় যে, ইংরেজী জ্ঞানশূন্য অবস্থা তাদের ভাগ্যাকাশে কত বড় সর্বনাশের ছাড়া বিস্তার করেছে। তারা এও বুঝতে পারে যে, এই হঠকারী সিদ্ধান্তে মুসলমান সমাজ চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন রাতারাতি পেছনেপড়ে গেল, অপর দিকে হিন্দু সমাজ তেমনি এককভাবে এ সিদ্ধান্তের ফায়দা লুটে দ্রুত এগিয়ে গেল। ইংরেজদের এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলমান সমাজ হিন্দুদের তুলনায় সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষা-দীক্ষায় কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়ে।[২]

বাংলার হিন্দু সমাজ তাঁদের সে যোগ্যতা যা তাঁরা ইতোমধ্যে অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ পরবর্তীতে যখন ফারসী রহিত হয়ে ইংরেজী-বাংলা সরকারী ভাষার মর্যাদা পায় (১৮৩৭) তখন সফলভাবে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিছুদিন পর ১৮৪৪ সালে সরকার আদেশ জারী করে যে, অত:পর সরকারী চাকরিতে ইংরেজীতে শিক্ষিতদের দাবী অগ্রগণ্য হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তিত হয়। এসব সিদ্ধান্তে মূলত হিন্দুরাই লাভবান হয়েছে একচেটিয়াভাবে। কারণ ইতোমধ্যেই হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে তথা পাশ্চাত্য বিদ্যার্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে ছিল। অপর দিকে মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।[৩]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই খ্রীস্টান মিশনারীদের পাশ্চাত্য জ্ঞানলোকে প্রচার করতে বলা হয়েছিল যার ফলে উইলিয়াম কেরী প্রমুখ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, কোম্পানী সরকার প্রথম দিকে মুসলমানদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় পাদ্রীদেরকে ঐ কাজ থেকে বিরত রেখে ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা স্কুল প্রভৃতি ছাড়াও উচ্চ শিক্ষার জন্যে কালেজ বা মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাতে তাদের একক প্রাধান্য বিস্তার পাশ্চাত্য বিদ্যা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি হিন্দু সমাজের

---

১. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, প্রস্তাবনা অংশ দ্রষ্টব্য।
৩. সৈয়দ মুর্তজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

ব্যাপক আগ্রহের কথাই স্মারণ করিয়ে দেয়। অবশ্য তাদের এসব উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারী ও মিশনারী উদ্যোগ তাদের ইংরেজী শিক্ষায় সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকের দিনে শিক্ষার যে স্তরটিক মাধ্যমিক স্তর নামে আখ্যায়িত করা হয় সে স্তরটি তখনকার দিনে শিক্ষার উচ্চ স্তরের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৭৯২ সারে বানারসী সংস্কৃতি কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮১৭ সালে রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে ও বেথুন, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ইংরেজদের সহায়তায় বাঙ্গালী হিন্দুদের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় ১৮২৪ সালে। এরপর কলকাতায় ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশন (পরবর্তীতে নামান্তরিত ডাফ্ কলেজ) এবং শীলস কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৪৩ সালে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে আরও ছয়টি এবং বহরমপুর কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৫৩ সালে এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৫৪ সালে। [১] ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ক্লাশ খোলা হয় এবং হিন্দু কলেজে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হয়। উল্লেখ্য যে, এ দুটি প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পেতো না। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে আইন পড়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয় ১৮৩৬ সালে এবং ঐ সালেই মহসীন ফান্ডের টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। হুগলী কলেজ হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্র পড়াতে পারত, তবে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা মুসলমান ছাত্রের তুলনায় বেশী ছিল। ১৮৪৪ সালে কতকগুলো জেলা স্কুল স্থাপন করা হয় এবং মাতৃভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের এ সময় কালটিকে চিহ্নিত করা যায় তবে তা ছিল, হিন্দুদের জন্য একচেটিয়াভাবে। কারণ, ১৯৩৭ সালে ইংরেজী ও বাংলা সরকারী ভাষা সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের ফারসী কেন্দ্রিক শিক্ষা বিষয়ক মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয়নি। যখন তাদের মোহমুক্তি ঘটে তখন তারা বুঝতে পারল যে, হিন্দু সমাজ তাদেরকে ছাড়িয়ে বহুদুর (৫০/৬০ বছর) এগিয়ে গেছে।

অবশ্য সেই সময়কার প্রেক্ষাপটে মুসলমান অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের ইংরেজী পাদ্রী পারিচালিত স্কুলগুলোতে না পাঠানোর আর একটি বড় কারণ ছিল এই যে, সকল ইংরেজী স্কুলে 'আরবী-ফারসী' পড়ানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ মুসলিম সমাজে তখন 'আরবী ফারসী জ্ঞান চিল উচ্চশিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। 'আরবী-ফারসী'র জ্ঞান ছাড়া অন্য বিদায় যত পারদর্শীই হোক না কেন কাউকে তারা সুপন্ডিত হিসাবে সম্মান দেখাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

তাছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত ইংরেজী বিদ্যা মুসলমানদের ধর্মীয় 'আকীদা বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে' এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। তারা জানতেন যে, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রাথমিক যুগের ইংরেজী শিক্ষিতদের অনেকে যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, লাল বিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধায়, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রমুখ স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। উপরন্তু খ্রীস্টান মিশনারীগুলো ইসলাম বিরোধী প্রচার চালিয়ে মুসলমানদের এ আশঙ্কাকে সত্যে পরিনত করেছিল। ডিরোজিয়োর উচ্ছৃঙ্খলতাও মুসলমান সমাজে ভাবিত করে তোলে। [৩]

---

১. শামসুল হক, উচ্চ শিক্ষা: বাংলাদেশা, ১৯৮৯ , পৃ. ১১-১২
২. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৬
৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ঢাকা, ইফাবা-১৯৮৬, পৃ-২২-২৩

Dhaka University Institutional Repository

এসব কিছুকে উপচিয়ে বাংলার মুসলমানরা যখন ইংরেজি শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে পারলেন, অর্থাৎ যখন তারা বুঝতে পারল যে, চাকরি বা অন্যান্য পেশার জন্যে তথা তাদের জীবন-জীবিকার, সামাজিক প্রতিপত্তি ও অস্তিত্বের স্বার্থে ইংরেজি শিক্ষা করা প্রয়োজন, তখন অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়। পশ্চিম বঙ্গে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ও পূর্ববঙ্গে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮০-১৮৪৯) ও দুদু মিঞা (১৭৯০-১৮৬২) ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসন-শোষণ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলেন। তাঁদের আন্দোলন প্রথম দিকে ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁরা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদে (সশস্ত্র সংগ্রাম) লিপ্ত হন। সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রথমতঃ এদেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন, পরে তাঁর অনুসারীদের সাথে কোম্পানীর সংঘর্ষ হয়।

সৈয়দ আহমদ শহীদের এ আন্দোলনের নাম ছিল 'তরিকায়ে মুহম্মদীয়া' কিন্তু ভারতবর্ষে এই আন্দোলন 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত হয়। শরিয়তুল্লাহ ও তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তাঁরাও নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে বৃটিশদের দমননীতির শিকারে পরিণত হন। অপর কোন জাতির ভাষা ও জ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের নীতিগত কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ওয়াহাবী আন্দোলনের সমর্থকরা ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ ইংরেজি ভাষা বিদ্যার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে ঐ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা 'হারাম' বলে প্রচার করেন। বাংলাদেশে ওয়াহাবী পন্থী ও গোঁড়া মোল্লা শ্রেণি ঐরূপ মনোভাব দ্বারা লালিত হয়ে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। গ্রামদেশে এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু শহরের অভিজাত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কোন সংস্কার ছিল না। এসব আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রফেসর এ.আর মল্লিক বলেন, Thus this reform movement, instead a purifying the faith or aplofting the Muslims from their miseries, degenerated into a voilent reactionary one. As a result, the Muslims especially of rural Bengal and Bihar added to their existing poverty and ignorance, Fantism and pregudice-two serios obstacls to the progress and development of any community.[১]

পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাগ্রসরতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, The Hindu community, under enlightened leaders like Ram Mohn Roy and Dwarkanath Tagore, had cast off its prejudice and had advanced by accepting western education. They had also fully and wholeheartedly co-operated with the ruling race. The Muslims if will seem upto 1835 at least, before this reform movement had degenerated, showed an equal desire for education, but the advantages of education under Government supervision were not then offered to the areas where they were in majority.[২]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার যে, এদেশের আলিম সমাজ তখনকার সেই পরিস্থিতিতে ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করলেও তাঁরা ভালো করেই জানতো যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করা হারাম নয়।

---

১. A.R Mullick, Opcit, P. 163
২. Ibid, P. 163-64

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন ভাষা শিক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হতে পারে না। এমনকি ইসলাম সুদূর চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞানার্জন করতে বলেছে। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি যে কোন ভাষা শিক্ষা করা যেতে পারে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যাঁরা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ আবদুল আজীজ (র.) হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এবং ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেন এবং প্রচলিত দওর-ই-নিজামী শিক্ষা পদ্ধতি জারী রাখার চেষ্টা করেন।[১] ডাক্তার জেমস ওয়াইজ বলেছেন, ঢাকার শিক্ষিত মুসলমানরা তাঁদের সন্তানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাই দিতেন, ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার কথা ভাবতেন না।[২]

মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার পশ্চাৎপদতার কারণ হিসেবে তাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্রকেও দায়ী করা হয়েছে। যখন ইংরেজি শিক্ষার আবশ্যকতা তাদের মধ্যে অনুভূত হয় তখন নানা কারণে তাদের মধ্যে দারিদ্র দেখা দেয়। প্রথম দিকে ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো ছিল শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। শহরে পাঠিয়ে ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণ করার মত সামর্থ তাদের ছিল না। গ্রামে যাদের সামান্য সামর্থ ছিল, তারাও বিদ্যালয়ের অভাবে ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতে পারেনি।

অপরদিকে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এক চরম বিচার সংকটপূর্ণ অবস্থায় নিমজ্জিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল বিচার বিভাগে চাকরি করার জন্য একদল উপযুক্ত লোক তৈয়ার করা, ধর্মীয় শিক্ষাদান ছিল এগুলোর গৌণ উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৯৩৭ সালে ফারসি রহিত হবার পর চাকরি ক্ষেত্রে মাদ্রাসার গুরুত্ব লোপ পায়। বিভিন্ন ভাষার প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করতেই যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রাণান্তকর অবস্থা, সেখানে শিক্ষার অগ্রগতি যে কিরূপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এসময় মাদ্রাসায় 'আরবী, ফারসি, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা' এই পঞ্চভাষা শিক্ষা দেয়া হত। ইংরেজির মান ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তাও কেবল কলকাতা মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে মাদ্রাসার সিলেবাসে ইংরেজির স্থান ছিল না, ক্রমে 'ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা অনুভব হলে ১৮২৬ সালে মাদ্রাসা সিলেবাসে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি, ফলে ১৮৫১ সালে তা পরিত্যক্ত হয়। পুনরায় ১৮৫৪ সালে এ্যাংলো এ্যারাবিক এর স্থলে এ্যাংলো-পার্সিয়ান ডিপার্টমেন্ট নামে স্বতন্ত্র একটি স্কুল খোলা হয়, কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষার সাথে এর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯২৬ সালে পুনরায় মাদ্রাসা সিলেবাসে ইংরেজি শামিল করা হয়।[৩]

বস্তুত মুসলমানরা রাজক্ষমতা হারানোর মর্মবেদনা ভুলে উঠার আগেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত আকস্মাৎ পরপর কয়েকটি পদক্ষেপ যেমন- ফারসির স্থলে ইংরেজিকে রাজভাষা করা, সরকারি চাকরিতে ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের অগ্রাধিকার দেয়া, চাকরি নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেয়া ইত্যাদি এক দিকে যেমন তাদের মর্মপীড়া দ্বিগুণ করে তুলেছিল, অপরদিকে তেমনি জীবনের কাছে পরাজিত হয়ে ক্রমশ তারা নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন

---

১. ড. সিকান্দর আলী ইব্রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
২. Dr. James Wise, Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 1883, P. 36
৩. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা-১৯৮৬, পৃ. ২৭০-২৭১

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। নইলে তারা সরকারি অর্থে পরিচালিত সর্বপ্রাচীন কলিকাতা মাদ্রাসাকে যুগোপযোগি শিক্ষার অঙ্গন করে আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারতেন। কিন্তু কার্যত তা হয়নি।[১] ১৮২৬ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত (কারো কারো মতে ঐ সময়টি ১৮৫১ অথবা ১৮৫২ সাল পর্যন্ত) ২০ বছরের ইতিহাসে মাত্র দু'জন আবদুল লতিফ ও ওয়াহিদুন্নবী কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষা পাস করতে সক্ষম হন, তাতে মোট ব্যয় হয়েছিল ১,০৩,৭১৪ টাকা। সৈয়দ ওয়ারেস আলী ছিলেন সৈয়দ আমীর আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উক্ত চার ব্যক্তি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হয়েছিলেন।[২]

উল্লেখ্য যে, ১৮৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত ভারত সচিব স্যার চার্লস উড ডে নির্দেশনামা জারি করেন তাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কলিকাতা মাদ্রাসার কারিকুলামের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে উক্ত বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হোক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি দিলেন না। অন্যদিকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কারণ, তারা মনে করেছিলেন যে, কলিকাতা মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে আসলে তাদের নিজেদের কর্তৃত্বের হানি হবে।[৩]

আসলে ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসাটি, যা মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে দিকপাল হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকে এবং যাকে কেন্দ্র করে মুসলমানের শিক্ষার ইতিহাস প্রায় দু'শ বছর ধরে আবর্তিত হয়ে আসছে, তা ছিল নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। মাদ্রাসার সিলেবাস যেমন ছিল ত্রুটিপূর্ণ, যুগের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ অন্যদিকে তেমনি ছিল প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়মত ও অব্যবস্থার শিকার। প্রফেসর এ. আর. মল্লিক কলিকাতা মাদ্রাসার বিরাজমান এসব ত্রুটি ও অনিয়মের উল্লেখ করেছেন এভাবে, This defective management and indiscipline were accompanied by ineffective taching. Only two students in the whole history of the Madrasha up to 1952 attained the junior scholarship standard.[৪]

অপরদিকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ইংরেজি ভাষাকে একটি স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে সিলেবাসভুক্ত না করে অতিরিক্ত বোঝা হিসেবে খাপছাড়াভাবে শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হবার প্রয়াস পেয়েছেন। ড. এস. এ. হোসাইনঃ Again instead of incorparating English in the course of studies a somewhat unwise attempt was made to introduce English as an additional subject, thus throwing an undue burden upon the students.[৫]

বস্তুত এরই অনিবার্যভাবে পরিণতি হিসেবে দেখা যায় যে, যখন কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয় (১৮৩৬) তখন যেখানে ভর্তি হওয়ার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন একজন মুসলমান ছাত্রও পাওয়া যায়নি। যদিও কলিকাতা মাদ্রাসায় ১৮৩৬ সাল থেকেই মেডিক্যাল ক্লাস চালু ছিল।[৬] ফলে দেখা যায় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার প্রথম দিকে কলিকাতা কেন্দ্রিক যে শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচি হাতে নেয় তাতে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ

১. ড. ওয়াকিল আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬
২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৪. A.R. Mullick, Opcit, P. 218
৫. Dr. SM Husain, Islamic Education in Bengal, Islamic Culture, July, 1934, P. 440
6. A.R. Mullick, Opit, P. 258

Dhaka University Institutional Repository

দু'টি প্রতিষ্ঠান হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ছিল যেখানে মুসলমান ছাত্রের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ। মিশনারী, সরকারি স্কুলগুলোও ছিল হিন্দু প্রধান এলাকায়। সুতরাং সে সব স্কুল থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ মুসলমানদের বড় একটা হয়নি। অন্যদিকে মহসীন ফাণ্ডের টাকার স্থাপিত হুগলী কলেজে কোন প্রকার সংরক্ষণ নীতি গৃহীত না হওয়ায় সেখানে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু ছাত্রদেরই প্রাধান্য বিরাজমান ছিল। এমনকি কলিকাতা মাদ্রসায় ইংরেজি ক্লাস চালু হওয়ার পর সেখানেও তারা ভর্তির সুযোগ করে নেয় এবং এ ব্যবস্থা ১৮৩২ সাল পর্যন্ত চালু থাকে। সুতরাং এটাও পরিষ্কার যে, সরকারি একপেশে শিক্ষানীতি ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তার অভাব ইসলামী শিক্ষার অধোপতির অধপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। অপরদিকে রাজস্ব ও বিচার বিভাগে যোগ্য সরকারি কর্মচারী তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলেও কলিকাতা মাদ্রাসা পরবর্তী সময়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে গোটা বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারত কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে উঠেনি। এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, মাদ্রাসার সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। ফলে সেখানে মুসলমানদের জাতীয় প্রয়োজনের স্বার্থে কোন প্রকার সংস্কারমূলক বা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ছিল না। বরং এক পর্যায়ে ১৮৫৮ সালে গর্ডন ইয়ং নামক এক ডি.পি.আই এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বাংলার তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার ফেডারিক হ্যালিডে কলিকাতা মাদ্রাসাকে 'রাজদ্রোহের লালনক্ষেত্র' আখ্যা দিয়ে তা বিলুপ্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রিয় সরকার এ প্রস্তাবে রাযী না হওয়াতে মাদ্রাসার অস্তিত্ব রক্ষা পায়।[১]

ইংরেজি বিরোধিতার অবসান:

কলিকাতা 'আলীয়া মাদ্রাসার অন্যতম ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯১) এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল গফুর স্বীয় সমাজের বিরুদ্ধেবাদী ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থান করেও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চ পদে চাকরি গ্রহণ করেন। যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে তিনি ইংরেজি কর্তৃপক্ষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ স্থাপিত হয় যা এন্ট্রাল সমমানের মর্যাদাপ্রাপ্ত ছিল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বা কাজির পদ সৃষ্টি করিয়ে বহু বেকার আরবী শিক্ষিত মুসলমানের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া মুহসীন ফাণ্ডের টাকা বাঁচিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলীতে তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন এবং মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির সুযোগ করেন। এতদসত্ত্বেও সরকারের সাথে 'তোষণ নীতি'র কারণে তাঁকে গঞ্জণাও কম সহ্য করতে হয়নি।

বস্তুত নওয়াব আবদুল লতিফ এবং স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজের বৈরিতা ত্যাগ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং সে পথেই মুসলিম সমাজ উন্নতি লাভ করে নিজেদের হৃত গৌরব ও ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। আবদুল লতিফ তাঁর এ নীতির ভিত্তিতেই মুসলিম সমাজের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। ইংরেজি শিক্ষাকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালে তিনি 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।[২]

১. আব্দুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ৪৯
২. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ আহমদ খান আলীগড় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কিন্তু আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়না। কারণ 'আলিম সমাজ, রক্ষণশীল সমাজপতিগণ ও গ্রামে বসবাসকারী সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিম নরনারী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, ইংরেজ ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের রাজ্য হরণ করেছে, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদির আয়ের উৎস বন্ধ করে তাদের ধ্বংস করেছে, 'আরবী-ফারসীকে স্থানচ্যুত করে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে কোন লাভ হবে না। বরং তা করতে গেলে ইহকাল-পরকাল দুই-ই বিনষ্ট হবে।[১] সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক চিত্রে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি।

তবে এটা সত্য যে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মুসলমানদের মধ্য থেকে গুটিকয়েক যাঁরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সে সব মুসলিম তরুণ অমুসলিম শিক্ষকদের প্রভাবে শিক্ষিত হয়েও ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী আচরণ ও ঐতিহ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, উদাসীন বা বিরোধী হয়ে পড়েননি। এতে মুসলিম সমাজের আশংকা সম্ভবত কিছুটা দূর হয়েছিল। তাছাড়া, কর্মক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম তরুণগণ ভালো চাকরি, অর্থ ও মান সম্মান অর্জনের সুযোগ লাভ করায় ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কেউ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন এবং কেউ কেউ ইংরেজি ভাষায় ইসলামের শিক্ষা সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।[২]

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা মুসলমানদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন। তাছাড়া তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় 'আরবী বা ফারসীর কোন স্থান ছিল না। তবে সত্য বটে যে, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর থেকেই মুসলমানরা বাধ্য হয়ে কিছু কিছু করে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। যদিও বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সমাজে শিক্ষা-দীক্ষায় সাড়া জাগানো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু এটা ঠিক যে, উনবিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে মাদ্রাসা ও মুসলিম শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে কতিপয় কমিটি গঠিত যে, উনবিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে মাদ্রাসা ও মুসলিম শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে কতিপয় কমিটি গঠিত হয়, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিয় সরকারের মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হয় এবং সরকার বেশ কয়েকটি রেজিলিউশন, ডেসপ্যাচ ও মিউনট জারি করেন। এতে অনেক মূল্যবান সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও অংক, ভূগোল এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেকগুলো বৃত্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়।৩ এসব ব্যবস্থাও মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে কিছুটা সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। তবে সার্বিক পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্পর্কে মুসলমানদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মাদ্রাসা শিক্ষায় সংস্কার সাধনের চিন্তা ভাবনা, সামাজিক চড়াই-উৎরাইর মধ্য দিয়েই উনবিংশ শতাব্দী গত হয়। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই মাদ্রাসা ও মুসলিম শিক্ষায় সত্যিকার জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। এ জাগরণের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫), নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদা (১৮৬২-১৯২২), নওয়াব সৈয়দ আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ও সর্বোপরি শামসুল 'উলামা আবু নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩) প্রমুখের অবদানের কথা বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২. আবদুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষার বিকাশ ও মুসলিম নারী সমাজ

মিশনারীদের উদ্যোগে নারী শিক্ষার সূচনা:

উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার বিস্তার কতিপয় সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হতে দেকা যায়, কিন্তু সেগুলো সবসময় সময়ের ক্রমানুসারে ঘটেনি। খ্রিষ্টান মিশনারীরা এ ব্যাপারে অগ্রদূত ছিলেন। তাঁরা উপনিবেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তর করা। ছাত্রীরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে এসেছিল, কেননা 'ভদ্রলোক' তাদের বাড়ির কোন বালিকাকে এই ধরণের স্কুলে পাঠাতে প্রস্তুত ছিল না।[১]

১৮১১ সালে প্রায় ৪০টি বালিকা উইলিয়াম কেরী-মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ধর্মশিক্ষার জন্য প্রথম একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন।[২] ১৮১৮ সালে চুড়ায় বালিকাদের জন্য আলাদা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লন্ডন মিশনারী সোসাইটির রবার্ট মে।[৩] এরপর স্থানীয় ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের স্ত্রীদের উদ্যোগে অবিভক্ত বাংলায় প্রথম মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৯ সালের মে-জুন মাসে কলকাতায়। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল 'দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি', এই প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেয়ার জন্য, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ছাত্রীদের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রথমে গৌরীবাড়িতে একটি, পরে আরও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল স্কুলের ছাত্রীর সংখ্যা প্রথম বছর ছিল ৮, দ্বিতীয় বছর হয়েছিল ৩২।[৪]

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় মেরী অ্যান কুকের নাম। ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় এসে বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি স্কুল চালু করেন। ১৮২২ এর এপ্রিল মাসে তাঁর স্কুলের সংখ্যা হয় ৮ এবং ছাত্রীসংখ্যা ২০০। ১৮২৭ সালে মিস কুকের (পরে মিসেস উইলসন) স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩০ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৬০০। এসব স্কুলে হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা পড়ত।[৫]

প্রচলিত পাঠশালাগুলোর উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল। অপরদিকে একই সময়ে বিভিন্ন খ্রিষ্টান মিশনারী সোসাইটির পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে ছেলেদের জন্য স্কুল স্থাপিত হয়। তৎকালীন দেশীয় সমাজের নিয়ম অনুযায়ী এই সমস্ত স্কুলে মেয়েদের শিক্ষার নানা ধরণের অসুবিধা ছিল। তৎসত্ত্বেও ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি প্রথমে নেটিব ফিমেল স্কুল স্থাপন করে। সেই পরিকল্পনা কিছু পরিমাণে কার্যকরী হওয়ায় অন্যান্য মিশনারীদের পক্ষ থেকেও নারী শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তাদের মধ্যে খ্রিষ্টান মিশনারী সোসাইটি হল অন্যতম।[৬]

নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য চার্চ মিশনারী সোসাইটি 'দি লেডিস সোসাইটি ফর নেটিব এডুকেশন ইন কলকাতা এন্ড ইটস্ ভিসিনিটি' নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তৎকালীন বড়লাটের স্ত্রী লেডি আমহার্স্ট ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক।[৭]

---

১. সোনিয়া নিশাত আমিন, নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৬৯০
২. প্রদীপ রায়, বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা-১৯৮৬
৩. গৌতম নিয়োগী, ছিলেন সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী, শারদীয়া দেশ, কলকাতা-১৯৯৩, পৃ. ৩৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০
৫. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৩৬
৬. বিনয়ভূষণ রায়, অন্তপুরের শিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-১৯৯৮, পৃ. ১৫
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

উনিশ শতকে মিশনারীদের দ্বারা নারীশিক্ষার সূচনা ও বিকাশ হলেও রক্ষণশীল ও শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও দর্শন নিয়ে মত পার্থক্য হওয়ায় এদের প্রবর্তিত শিক্ষা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে, পরবর্তীতে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষিত সামাজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নারী শিক্ষার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।

১৮২৪ সালের ১০ এপ্রিলের সমাচার দর্পণ পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তখন মেয়েদের ১২টি স্কুল পরিচালনা করত। স্থানীয় কিছু ইংরেজ মেয়েও এই স্কুলে পড়ত, তবে বাঙালি মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশি। শ্রীরামপুর মিশনারীরা মুসলিম মেয়েদের জন্য ৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও ছাত্রীসংখ্যা ছিল কম। শ্রীরামপুরের ১২টি বিদ্যালয় ছাড়া বাংলার অন্যত্রও সে সময় বিদ্যালয় হতে দেখা যায়। যেমনঃ বীরভূমে ৬টি, ঢাকায় ৫টি ও চট্টগ্রামে ৩টি মেয়েদের স্কুল স্থাপন করে মিশনারীরা।[১] মিশনারীদের দ্বারা শুরু হওয়া বাঙালি মেয়েদের জন্য শিক্ষা উল্লেখিত স্থান ছাড়াও পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত হয়।

উঠতি শিক্ষিত সমাজের উদ্যোগে নারীশিক্ষাঃ

বাঙালি নারীদের শিক্ষা প্রসারে শহরের উঠতি ও আগ্রহী শিক্ষিতজনেরা উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নারীদের শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এদেশের শিক্ষিত ও ইউরোপীয় ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত সমাজকর্মীগণ ধীরে ধীরে নারীদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে আরম্ভ করেন। নিজেদের দেশীয় মহিলাদের সঙ্গে ইউরোপীয় মহিলাদের চাক্ষুস পার্থক্য দৃষ্টে এবং সমকালীন ইংল্যান্ডীয় নারীমুক্তি আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই কর্মীগণ এ সংস্কারের অনুপ্রেরণা লাভ করেন।[২]

স্ত্রী শিক্ষিত হলে সন্তানদের সুশিক্ষা হবে, একান্নবর্তী পরিবারে মেয়েদের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে, জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত হবে এসব ছাড়াও মেয়েরা প্রাত্যহিক জীবনে তাঁদের প্রকৃত ও উপযুক্ত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন এই সচেতনতা প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারকদেরকে ক্রমশ উদ্বুদ্ধ করেছিল। বেথুন সোসাইটি, ব্রাহ্মবন্ধু সভা, বামাবোধিনী সভা, ভারত সংস্কারক সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং কেশবচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র দত্ত, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, শশীপদ বন্দোপাধ্যায়, দূর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্যক্তি ১৮৫০, ১৮৬০ ও ১৮৭০ এর দশকে নারী জাগরণের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে তা সামগ্রিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার প্রমুখ রামমোহনের বন্ধুরাও স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।[৪]

১৮১৭ থেকে ১৮৩০ এই ১৩ বছর হিন্দু কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ১,২০০ ছাত্র সমাজসংস্কার ও নারীশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন। হিন্দু সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যক্তিরা এগিয়ে এলেন ১৮৪০ সালের দিকে তাদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার আগ্রহে। কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে নারী শিক্ষার সমর্থনে বক্তব্য প্রচার করতে থাকলে বিরুদ্ধপন্থীরা অর্থাৎ কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাম নারায়ণ তর্করত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিত ও কবি তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন।[৫]

---

১. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭
২. গোলাম মুরশিদ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ২৬৪
৩. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬
৪. গোলাম মুরশিদ, সংকোচন বিহবলতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ১৫
৫. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮৯, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষার প্রতি অক্ষয় কুমার দত্তের এই নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সব সংস্কারবাদী একমত ছিলেন না এবং বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত নারীশিক্ষা খুবই সীমিত সফলতা অর্জন করে। জয়কৃষ্ণ মুখার্জী বেথুন মডেল অনুসরণ করে সেই একই সালে (১৮৪৯) উত্তরপাড়ায় এক স্কুল প্রতিষ্ঠান করেন এবং কিশোরচন্দ্র মিত্র পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে রাজশাহীতে অনুরূপ এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বেথুন স্কুলের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-৫৮ সালে হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদেনীপুরে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ১৩০০ ছাত্রী এই স্কুলগুলোতে পড়ত। কিন্তু নারী শিক্ষার প্রতি সরকারের উদাসীনতার জন্য এই স্কুলগুলো অর্থাভাবে অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। একজন বিশ্লেষকের মতে, বিদ্যাসাগরের স্থাপিত স্কুলসমূহ গ্রামীণ নারীশিক্ষার ব্যাপারে কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি, কেননা একদিকে অভিভাবকদের অনীহা ছিল, অপরদিকে স্কুলের সামান্য বেতন যোগাতেও তারা অপারগ ছিল।[১]

১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল গঠিত হয়, এতে অভিজাত মেয়েরা মিশনারী প্রভাবমুক্ত পরিবেশে পড়ালেখা করতে পারে। এই স্কুলের মাধ্যমে বাঙালি নারীদের আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয় বলে মনে করা হয়। সেই সাথে নারীজাগরণের ভিত্তিও তৈরি হতে থাকে।

উনিশ শতকে বাঙালি নারীদের শিক্ষা বিস্তারে যাজক, ভদ্র-শিক্ষিত সমাজের ভূমিকার সাথে সাথে শাসক বৃটিশদের উদ্যোগও বিন্যস্ত হয়। উনিশ শতকের শুরু হতে ইংরেজি শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নারীশিক্ষাও সমাজে এবং সরকারি পর্যায়ের শিক্ষাকার্যক্রমে গুরুত্ব পেতে থাকে।

নারী শিক্ষার প্রতি ডালহৌসির অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও এবং ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষানীতিতে ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের অনুকূলে বিভিন্ন জোরালো পদক্ষেপের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ১৮৬০ সাল অবধি বিষয়টি খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টার ক্ষতি করে দেয়। কেননা এই ঘটনা সাধারণভাবে যেকোন সংস্কারের এবং বিশেষ করে নারী শিক্ষার দাবির ব্যাপারে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারকে খুবই সতর্ক করে দেয়।[২]

১৮৭০ সালে বাংলায় নিজস্বভাবে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার সংযোগে তা সম্ভব হয়েছিল। বৃটিশ সরকার শিক্ষার দায়িত্বের বিরাট অংশ নবগঠিত পৌরসভাসমূহকে হস্তান্তর করে। এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নারী শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে এবং সেই সাথে গ্রামে গ্রামে 'স্ব-শাসিত' প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয়ের বহুল প্রসার হয়।[৩]

১৮৭১-৭৩ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে ক্যাম্পবেল স্কীম গ্রহণ করে স্ত্রী শিক্ষা বিকাশে তা বিশেষ সহায়ক হয়। কারণ সরকারি অর্থ সাহায্য পাওয়ায় আলোচ্যকালে গ্রামে গ্রামে শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭০ ও ১৮৮০ এর দশকে এজন্যে প্রায় দু'হাজার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

১. সোনিয়াত নিশাত আমিন, নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৬৯২
২. সোনিয়া নিশাত আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮২ সালে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার যখন শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হন, তখনকার অবস্থা ১৮৩৫ সালে যা ছিল তা থেকে বেশ ভিন্ন। এই সময়ে বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ১০১৫টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রীসংখ্যা ৪১,৩৪৯। স্কুলগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ছিল বেসরকারি, তবে এগুলো সরকার থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য লাভ করত। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বালিকা স্কুলের সংখ্যা ৩০৯৪ এ পৌঁছায় এবং ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৭,৪০৩। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের হার বালক ছিল ২৮.৯০% এবং বালিকা ১.৯০%। অথচ ১৮৮৬-৮৭ সালে এই হার ছিল বালক ২৫.২৫% এবং বালিকা ০.৯১%। তুলনা করলে বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে বালিকা শিক্ষার ব্যাপারটি ততখানি আশাব্যঞ্জক ছিল না। পরবর্তী বছরগুলোতে এই হারের অবনতি ঘটে। ১৮৯৬-৯৭ সালে মেয়েদের জন্য মাত্র ২টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল কলকাতার বেথুন স্কুল এবং ঢাকার ইডেন স্কুল।[১]

অন্তঃপুরের নারীশিক্ষা:

শতাব্দীর পর শতাব্দী যুগের পর যুগ এই এলাকায় নারীদের অবস্থান পরিবর্তন হয়নি বিভিন্ন পর্যায়ে। নারীরা ঘরে থেকেছে বন্দী, তাদের জীবনধারার পরিবর্তন সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষার অপরিবর্তনীয় অবস্থানের কারণে দীর্ঘকাল ধরে থেকেছে স্থবির। কুসংস্কার আর পুরুষদের একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে। উনিশ শতকে এসে খ্রিষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে যে নারী শিক্ষার সূচনা হয়েছিল, তারই অংশ হিসেবে অন্তঃপুরে নারীশিক্ষার গোড়াপত্তন হতে দেখা যায়। পাশ্চাতে ও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনুকূল পরিস্থিতিতে শুধু মিশনারীরা নয়, ব্রাহ্মসমাজ, শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান, বিভিন্ন সমিতি সংস্থা ও সরকার এই ধারার শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

শুধুমাত্র খ্রিষ্টান মিশনারীরা নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় ব্যক্তি ও শিক্ষিত যুবকেরা অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে। ইয়ং বেঙ্গলদের প্রচেষ্টাই এই বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। প্রচলিত কুসংস্কারের জন্য উনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা একটা সমস্যার বিষয় ছিল। এই অবস্থার মধ্যেও উক্ত শতকের চারের দশকে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে এ বিষয়ে চিন্তাবাবনা শুরু করেন। একদিন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর এক বন্ধু সমাজের কুসংস্কারকে ভাঙ্গার জন্য কয়েকজন বৈষ্ণবীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুপারিশ করেন। তখনকার দিনে বৈষ্ণবদের অন্দরমহলে প্রবেশের অবাধ অধিকার ছিল সুতরাং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠানো যায় তা হলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। ইয়ং বেঙ্গলদের সেই সভায় কিন্তু ওই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। কারণ সেই সুফলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অনেক বেশি কুফল ঢুকতে পারে।[২]

অন্তঃপুরের নারী শিক্ষা বিষয়ে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কিত বিবেচনাবোধ তুলে ধরেন। ১৮৭০ সালের ১৩ মে ইস্ট ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ভারতবর্ষের স্ত্রী শিক্ষার অন্তরায়ের কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সভ্য দেশের মেয়েরা সন্তানের জন্ম দেয়।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৪

২. Proceedings of the Church Missionary Society for Africa and the East, 1824-25, London, 1825, P. 78-83 বিনয় ভূষণ রায়, অন্তঃপুরের স্ত্রী শিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৯

আর যে বয়সে তারা বিয়ে নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে তখন ভারতীয় মেয়েরা দিদিমা অথবা ঠাকুরমা নামে পরিচিত। এর ফলে মাত্র তিন বা চার বৎসর প্রকাশ্যভাবে স্কুলে পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। সুতরাং যে বয়সে তাদের পড়াশুনা শুরু করা প্রয়োজন সে বয়সে তাদের বিয়ে হয়ে যায়। এইভাবে অপরিণত বয়সে বিয়ে হওয়া শুধুমাত্র শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকেই ক্ষতিকারক নয়, শিক্ষার দিক থেকেও ক্ষতিকারক। তাই এই ক্রটি বিচ্যুতিকে যদি দূর করতে হয় তাহলে জেনানা শিক্ষা চালু হওয়া আশু প্রয়োজন।[১] স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন শুধু লন্ডনেই বক্তৃতা দেননি, বেঙ্গল সোশ্যাল সাইন্স এ্যাসোসিয়েশনেও একটি বক্তৃতা দেন। ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে তিনি ১৮৬৩ ব্রাহ্মবন্ধু সভা স্থাপন করেন তার তিনটি বিভাগের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা ছিল অন্যতম। সেই সময়ে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়ার কারণে বেশিদিন লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না, এই কারণে এই ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্ত:পুরে স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এই অন্ত:পুরের শিক্ষাপদ্ধতিতে স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। বাড়িতে শিক্ষকদের কাছে পড়াশুনা করা যেত।

এই পর্যায়ে সবচেয়ে ভালো লেখাপড়া জানতেন সেইসব মহিলা যাঁরা নিজ চেষ্টায় বাড়িতে স্বামী অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখতেন। এ ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি তখন জেনানা অথবা অন্ত:পুর শিক্ষা পদ্ধতি বলে পরিচিত ছিল। যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করতেন অথচ ঐতিহ্যিক মূল্যবোধে আস্থাশীল ছিলেন, তাঁরা এ পদ্ধতির শিক্ষাকে পছন্দ করতেন। ১৮৫০ ও ১৮৬০ এর দশকে এ পদ্ধতির স্ত্রী শিক্ষা যতটুকু সাফল্য অর্জন করে, তার জন্য ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্ম প্রভাবিত শিক্ষিত হিন্দুরাই বেশি অবদান রাখেন। এঁরা প্রায় ধর্মীয় উৎসাহ নিয়ে স্ত্রী শিক্ষা প্রচার করেন।[২] শুধু কেশবচন্দ্র সেন নন, অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাও এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরচন্দ্র গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দূর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতা যাঁরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ক পাশ্চাত্য ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, কিঞ্চিৎ শিক্ষা ব্যতীত স্ত্রীদের উন্নততর সঙ্গিনী হিসেবে তৈরি করা অসম্ভব।[৩]

২য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য:

রত্নসার, নীতিবোধ, ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ব্যাকরণ চন্দ্রিকা, পাটীগণিত, তেরিজ, জমাখরচ, পূরণ, হরণ।

৩য় বর্ষের ছাত্রীদের জন্য:

কবিতাবলি, বামারঞ্জিকা, চারুপাঠ প্রথম ভাগ, ব্যাকরণ প্রবেশ, পাটীগণিত ত্রৈরশিক পর্যন্ত, ধর্মচর্চা।

৪র্থ বর্ষের ছাত্রীদের জন্য:

দীপ্তশিরার অভিষেক, মহতের মৃত্যু, চরিতাবলী, সুশীলার উপাখ্যান ১ম ও ২য় ভাগ, প্রাণিবৃত্তান্ত, বাঙ্গালাবোধ ব্যাকরণ, ভূগোল বিবরণ এশিয়া ও ইউরোপ, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, পাটীগণিত ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক ও ভগ্নাংশ পর্যন্ত।

---

১. Prem Sunder Bush: (ed) Keshab Chandra Sen in England 3rd, edn. Calcutta, 1983, P. 169-72

২. গোলাম মুরশিদ, সংকোচের বিহবলতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ. ২৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

৫ম বর্ষের ছাত্রীদের জন্য:

সদ্ভাবশতক, টেলিমেক্স, চারুপাঠ, ৩য় ভাগ, প্রকৃত বিবেক, ব্যাকরণ উপক্রমণিকা, ভারতবর্ষের ইতিহাস দুইভাগ, ভূগোল বিবরণ, ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ, পাটীগণিত (সমস্ত), সুশীলার উপাখ্যান। অন্ত:পুর স্ত্রী শিক্ষার পাঠ্যতালিকা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়।[১]

বামাবোধিনী সভা ১২৭০ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৭৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অন্ত:পুর স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেই প্রতিবেদন থেকে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানা যায়।

পরিচালকদের ক্ষেত্রে:

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষিকার অভাবে শিক্ষক নিয়োগ।

(খ) শিক্ষকের সাহায্যে স্ত্রী শিক্ষার কাজ চালানোর ক্ষেত্রে নানা প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি।

ছাত্রীদের ক্ষেত্রে:

(ক) বাল্যকালে শিক্ষার অভাবে বেশি বয়সে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ থাকে না।

(খ) সন্তান জন্মের পর মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখা যায়। শিক্ষিকার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়:

এদেশের স্ত্রীলোকদিগের এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ অন্যায় ব্যবহার প্রচলিত আছে তাহাতে অন্ত:পুর মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত করাই স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি সাধনের প্রধান উপায় বটে, কিন্তু সেই অন্ত:পুর মধ্যে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন সর্বাগ্রে উপস্থিত হয়। সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর অভাব মোচন না হইলে অন্ত:পুর মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি প্রত্যাশা করা যায় না। এই শিক্ষয়িত্রীর অভাব ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হবারও একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হয়েছে।

পুরুষ শিক্ষকদের প্রতি অভিযোগ হ'ল:

বঙ্গসমাজের বর্তমান অবস্থায় অন্য কোন সদুপায় না থাকিতেই অগত্যা আমাদিগকে এই শিক্ষাপ্রণালীর ভার পুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। নতুবা পুরুষদিগের দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার যে বিবিধ বিঘ্ন রহিয়াছে তা সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায়। পুরুষেরা সংসারের নানাপ্রকার কার্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহাদিগের সকলের চিরদিন একস্থানে অবস্থিত হয় না। অনেককেই কার্যবশত: সময়ে সময়ে স্থানান্তরিত হতে হয়। এই সকল কারণে তাহাদিগের দ্বারা নিয়মিত শিক্ষালাভ ছাত্রীগণের পক্ষে দূর্লভ হয়ে পড়ে।[২]

শিক্ষার প্রতি অনুরাগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়।

ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে অন্ত:পুরের স্ত্রীশিক্ষা:

কলকাতার অনুকরণের বাংলার বিভিন্ন স্থানে উনিশ শতকে ব্রাহ্মদের দ্বারা অন্ত:পুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হতে দেখা যায়, এর মধ্যে ঢাকা ছিল সবচেয়ে এগিয়ে। ঢাকায় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় ১২৭১ সনে একটি শিক্ষয়ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৩] ময়মনসিংহের উত্তরপাড়া হিতকারী সভার

---

১. বিজ্ঞাপন, অন্তপুরে স্ত্রী শিক্ষা, দ্রষ্টব্য তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকা, ১৮৭৫ শতক, প্রথম ভাগ ২৪১ সংখ্যা, ভাদ্রবিনয়ভূষণ রায়, অন্তপুরের স্ত্রী শিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪

২. অন্তপুর শ্রীশিক্ষার ফল, দ্রষ্টব্য বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭৮, আশ্বিন, পৃ. ৫৯১-৯৩

৩. বিনয় ভূষণ রায়, অন্তপুরের স্ত্রী শিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭২ সালে এখানে একটি অন্তপুর স্ত্রীশিক্ষা সভার প্রতিষ্ঠা হয়। বৎসরের প্রথমে পাঠ্যবই বাছাই করে দেয়া হত। মহিলারা ঘরে বসে সেইসব বই নিয়ে পড়াশুনা করত এবং বৎসরের শেষে তাদের অভিভাবকের কাছে ছাপানো প্রশ্ন পাঠিয়ে দেয়া হত। স্থানীয় মুন্সেফ ভগবান চন্দ্র সেন তার প্রথম সভাপতি এবং মধুসূদন সেন তার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১]

কলকাতায় বসবাসকারী শ্রীহট্টবাসী যুবকদের মধ্যে ঐক্য ও প্রীতিবন্ধনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৭৬ সালে কলকাতায় শ্রীহট্ট সম্মেলনী স্থাপিত হয়। এই সমিতির কর্মধারা শুধুমাত্র কলকাতায় বসবাসকারী শ্রীহট্ট যুবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কালক্রমে সমস্ত সিলেটবাসীর মঙ্গল এবং স্ত্রী লোকদের উন্নতি সাধনের জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য সম্মেলনীর প্রচেষ্টায় সমগ্র সিলেট শহরে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই সেখানে পরীক্ষা দিত না, অন্তপুরের মহিলারাও পরীক্ষা দিতেন।[২]

অন্তপুর স্ত্রীশিক্ষা ত্রিপুরা, কুমিল্লা, বরিশালসহ আরও অন্যান্য স্থানে প্রসার লাভ করে। অনেক স্থানে লক্ষ্য করা যায়-সংগঠক হিসেবে হিন্দু মুসলমান উভয়ে এই শিক্ষা প্রসারে যৌথভাবে উদ্যোগে ছিলেন।

অন্তপুর নারীশিক্ষা: মুসলিমদের উদ্যোগ:

স্ত্রী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের আকর্ষণ হিন্দুদের তুলনায় অনেক পরে শুরু হয়। প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের অনীহা ছিল। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করত। স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হয় তখন থেকেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি শিক্ষিত যুবকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। অন্তপুরের স্ত্রী শিক্ষা হল এর প্রথম প্রতিফলন। ঢাকা, শ্রীহট্ট ও অন্যান্য স্থানের শিক্ষিত মুসলমান যুবকেরা এতে প্রথম অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দুদের মত তৎকালীন মুসলমান সমাজও দ্বিধাবিভক্ত ছিল। একদল যখন স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতায় সরব ছিল তেমনই আরেকদল এর সমর্থক ছিল।

বিরোধী পক্ষের যুক্তি হ'ল:

(১) মেয়েদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল।
(২) মেয়েরা শিক্ষা পেলে দাম্ভিক হবে। সুতরাং ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাই তাদের জন্য যথেষ্ট।

সমর্থকগণ পাল্টা বক্তব্য রাখেন:

(১) মেয়েদের স্মৃতিশক্তি যদি সত্যই দুর্বল হয় তাহলে প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া। কেননা ছেলেদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল।
(২) প্রথম প্রথম কিছু মেয়ে শিক্ষা পেলে দাম্ভিক হতে পারে। কিন্তু সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই দাম্ভিকতা দূর হয়ে যাবে।

---

১. শ্রীনাথ চন্দ্র, ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা-১৩৭৫, পৃ. ৯০-৯১
২. বিনয় ভূষণ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯৮, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

(৩) ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা মেয়েদের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে পৌত্তলিকদের মত খোদা এবং পয়গম্বর সম্পর্কে এদের ধারণা অতি নিচু স্তরের। এদের কাছে ধর্ম হল ইসলাম ও নিকৃষ্ট ধর্মের সংমিশ্রণ।

(ক) উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান মেয়েরা খোদার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং পয়গম্বরের শিক্ষার সাথে তুলনা করতে সক্ষম নয়।

(খ) অন্তপুরের যে সমস্ত মেয়েরা শিক্ষালাভ করে তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই অল্প। যে সমস্ত শিক্ষকদের কাছে শিক্ষালাভ করে তাদের জ্ঞান ছাত্রীদের তুলনায় মোটেই বেশি নয়। সাধারণত প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধ মোল্লা অথবা আতুজীদের হাতেই এদের শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তারা উর্দু বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ ভালোভাবে পড়তে পারে না।

(গ) পূর্ববঙ্গের মুসলমান মেয়েরা উর্দুর তুলনায় বাংলা ভাষার সাথে বেশি পরিচিত হওয়ায় কুরআনের তুলনায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অনেক বেশি। রাম, সীতা, কৃষ্ণ এবং কালীর গল্প বেশি করে শোনার জন্য এই সমস্ত মেয়েরা নিজ ধর্ম সম্পর্কে অনেক বেশি অজ্ঞ থাকে।[১]

অন্তপুরের স্ত্রীশিক্ষাঃ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মেলনীঃ

শুধুমাত্র হিন্দু অন্তপুরবাসিনীদের জন্যই নয়, মুসলমান অন্তপুরবাসিনীদের জন্যও সেই সময়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এজন্য সচেষ্ট ছিল তাদের মধ্যে ঢাকা সুহৃদ সম্মেলনী ও শ্রীহট্ট সম্মেলনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৩ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি কয়েকজন ছাত্রের প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরে মুসলমান সুহৃদ সম্মেলনী স্থাপিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। তবে নানা প্রকার অসুবিধার জন্য শুধুমাত্র স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে।[২] সমাজে নারীর প্রতি নীচ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন। নারী শিক্ষা এবং নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে তারা উদার মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। নারী শিক্ষার বিষয়ে সামাজিক বিরুদ্ধতার প্রতি সজাগ থেকে তাঁরা উদার মনোভাব প্রচার করতে থাকেন। ১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত একটি পাঠ্যতালিকা নির্বাচন করে সেই অনুসারে গৃহে পড়া ও পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হল। তাঁদের উদ্যোগেই মুসলিম মেয়েদের জন্য ঘরে ঘরে অন্তপুর শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল।৩

কলকাতা, ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালি এবং ময়মনসিংহ থেকে ৫৪ জন মহিলা পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রথমে আবেদনপত্র জমা দেয়। কিন্তু ৩৯ জন মাত্র পরীক্ষা দেয়ার জন্য এক মাস আগে আবেদনপত্র পূরণ করে। অসুস্থতার জন্য দু'জন পরীক্ষা দিতে পারেনি। এদের মধ্যে ১৪ জন উর্দুতে এবং ২৩ জন বাংলায় পরীক্ষা দেয়। উর্দু বিভাগে ১৪ জনের মধ্যে ১২ জন বাংলা বিভাগে ২৩ জনের মধ্যে ২২ জন পাশ করে।[৪]

---

১. The Muhammadan Community needs a Girls School (In the Muhammadan Observer, 1894, April, P. 26

২. বিনয় ভূষণ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৩. মোতাহার হোসেন সূফী, বেগম রোকেয়াঃ জীবন ও সাহিত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ৩৫

৪. বিনয়ভূষণ রায় প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অন্তপুর স্ত্রীশিক্ষা উনিশ শতকে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিভিন্নমুখী প্রভাব বিস্তার করে এর মধ্যে নারীরা নিজেরাও শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে, পরিবারে নারীদের স্বাধীন অবস্থান দৃঢ় হতে থাকে, নারী শিক্ষা বিষয়ে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষদের মনোভাব বদলাতে থাকে। অন্তপুর শিক্ষা থেকে যে মহিলারা লেখাপড়া শিখেছিলেন, তাঁরা অনেকেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন, এর ফলে মহিলা শিক্ষক ও বালিকা বিদ্যালয় উভয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্তপুর শিক্ষাপদ্ধতি উনিশ শতক পরবর্তী সময়েও বাংলায় বেশ জনপ্রিয় ছিল। মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্তপুর শিক্ষা সামাজিক প্রতিকূলতা দূর করতে বিশেষভাবে সমর্থ হয়, এর ফলে নারী জাগরণের পথ সুগম হয়।

মুসলিম নারীশিক্ষা ও মুসলিমদের উদ্যোগ:

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানরা সমাজ সংস্কারের কোনও উৎসাহ দেখাননি। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেন এবং মাতৃভাষা চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেন। এই সময় থেকেই মুসলমান সমাজের সচেতন অংশ প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা, পণপ্রথার কদর্যতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন। সভা-সমিতি এবং পত্র-পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।[১] এরকম পটভূমিতে খুবই ধীরে ধীরে নারী শিক্ষা বিষয়ে মুসলিম সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন হতে শুরু করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম মেয়েদের জন্য যেভাবে স্কুল তৈরি হওয়া শুরু হল তাতে বোঝা যায় যে মহিলাদের সম্পর্কে সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছিল। তবে মেয়েদের ঘরের বাইরে নিয়ে আসার বিতর্ক শুরু করে এই যে স্কুল তৈরি করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা অচিরেই বিফলে পরিণত হল এবং অধিকাংশ স্কুলই বন্ধ হয়ে গেল। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম কারণ এটি স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের আধুনিক করার চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছিল।[২]

এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে যে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ও তার পরবর্তী অনুসারি কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) প্রমুখ ব্যক্তিগণই হিন্দু নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা উন্নত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানবতাবাদী ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন হিন্দু নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য। ঠিক একই সময়ে বাঙলার মুসলিম সমাজে প্রথমে ছিল গোড়া ফারায়েজী আন্দোলনের প্রভাব এবং পরবর্তীতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলায় নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমেদ খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপোসমূলক মনোভাবের সাথে ইসলামী চেতনার সমন্বয় করার প্রয়াস করেছেন। তাঁরা মুসলিম সমাজকে আধুনিক করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা নির্ভরশীল ছিলেন ইসলামী চিন্তাধারার উপর। ফারায়েজী ও ওহাবী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজকে ইসলামী চিন্তাচেতনায় উদ্দীপিত করার ধ্যান ধারণা কখনই তাঁরা পরিত্যাগ করেননি।

---

১. স্বপন বসু, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণী, কলকাতা-২০০৩, পৃ. ১৫৪

২. জানালা মাহফিল, সম্পাদনা: শাহীন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন এবং পাশ্চাত্যের উদারনীতিবাদ এবং যুক্তিবাদ দ্বারা মুসলমান ছাত্রগণ যাতে প্রভাবিত না হয় সে বিষয়েও তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের মানস ইসলামী চিন্তা চেতনা, ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি, রক্ষণশীলতা, উদারচিন্তা, প্যান ইসলামী চেতনা প্রভৃতি বিপরীতধর্মী ধ্যান ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।[১]

নওয়াব আবদুল লতিফ উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং ইংরেজ সরকারের সাথে সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হবে মূলত পার্থিব ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী আধুনিক মানসের সার্বজনীন আদর্শ তাঁর মনে বিশেষ কোনো প্রভাব সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তা চেতনায় এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র কার্যক্রমে মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষা বা সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নত করার কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয় না।[২]

রক্ষণশীলদের বিরোধিতার ফলে তৎকালে নারীশিক্ষা বিষয়টিকে মুসলিম সমাজ কোন গুরুত্ব প্রদান করেনি এবং নারীশিক্ষার প্রশ্নে সমাজপ্রধানগণ নীরব ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমীর আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'Central National Mohammadan Association' এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বহু বিতর্কিত নারী শিক্ষা সম্পর্কে এমন একটি সমাধান বের করা যায় প্রগতিবাদী এবং রক্ষণশীল দুই দলেরই গ্রহণযোগ্য হবে।[৩]

কিন্তু এ বিষয়ে তারা কোন সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন কি না তা আমাদের অজানা। তবে এ কথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন' কর্তৃক ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড রিপনকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে মুসলিম নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে পৃথকভাবে কিছু বলা হয়নি।[৪]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন হলেও নারীশিক্ষা প্রশ্নে বাঙালি মুসলমান সমাজে তখনও রক্ষণশীলদের প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত বামাবোধিনী পত্রিকার এক তথ্য হতে জানা যায়, সেই সময়ে মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের স্কুলে শিক্ষা দেয়ার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন না।[৫]

শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে লক্ষণীয় কোন অগ্রগতি হচ্ছে না বলে বামাবোধিনী পত্রিকায় ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় মন্তব্য করা হয়।[৬] বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সংখ্যায় শিক্ষা বিভাগের ১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্ট আলোচিত হয়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কলিকাতায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১০টি এবং ১৪টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল, যেগুলো সরকারি সাহায্য পায় না, এবং উভয় স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৭৩২ জন, এর মধ্যে মাত্র ৫৮ জন ছিল মুসলিম ছাত্রী।[৭] এর চেয়েও অধিকতর করুণ চিত্র পাই ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইডেন বালিকা বিদ্যালয় সেখানে মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৫৩ জনের মধ্যে মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা মাত্র ১ জন।[৮]

১. তাহমিনা আলম, বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৬০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৩. ওয়াকিল আহমেদ, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৩-৮৪, পৃ. ১১৬
৪. Central National Mohammadan Association of Calcutta the Memorandum Presented to Lord Rion (1882), Historical Research Institute, Penjul University (Lahore-1963), P. 1588
৫. বামাবোধিনী পত্রিকা, ২৫ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫, পৃ. ৮৬
৬. বামাবোধিনী পত্রিকা, ৫০ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৮৬৭, পৃ. ৬০৪
৭. বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২০ সংখ্যা, আগস্ট, ১৮৭৩, পৃ. ১৪৩
৮. বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৮২ সংখ্যা, মার্চ ১৮৮০, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। ১৮৮১-৮২ সালের শিক্ষাবর্ষে বাংলায় বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রী সংখ্যা	মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা	মুসলিম মেয়েদের হার
উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	-	-
মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭,৫৫২	১,৫৭০	৮.৯
শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪১	-	-

উল্লেখিত সারণি/বিবরণ থেকে বোঝা যায় সেই সময়ে মুসলিম নারীদের শিক্ষা অগ্রগতি কোন পর্যায়ে ছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষা প্রচলনে দু'জন বিশিষ্ট নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা হলেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩) ও করিমুন্নেসা খাতুন (১৮৫৫-১৯২৬)। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী জন্মেছিলেন কুমিল্লা জেলার হোসনাবাদ পরগণায় লাকসামের কাছে পশ্চিমগাঁয়ে। ফয়জুন্নেসা অন্ত:পুরবাসিনী হয়েও কাব্যচর্চা, সমাজসেবা ও শিক্ষার জন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অগ্রজ রংপুরের পায়রাবান্দা গ্রামের সম্ভ্রান্ত জহির মোহাম্মদ আবু সাবেরের কন্যা করিমুন্নেসা খাতুন। নিজের আগ্রহে সহোদরদের বাংলা পড়া শুনে লিখতে ও পড়তে শেখেন। আত্মীয়স্বজন ও সমাজপতিদের বিরোধিতার কারণে তাঁর বাংলা চর্চা বন্ধ হয়ে যায়।[১] বছর বয়সে (১৮৬৯) বিয়ে হয় টাঙ্গাইলের গজনবী পরিবারে। সেখানে দেবরদের সাহায্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চালু রাখেন। পুত্রদের ইংরেজি স্কুলে পড়ানোর জন্য এবং ছোটবোন রোকেয়াকে বাংলা পড়াবার জন্য সমাজের নিন্দার পাত্রী হন তিনি। করিমুন্নেসা খানমের আর্থিক সাহায্যে টাঙ্গাইল থেকে ১৮৮৬ সালে আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ীর সম্পাদনায় আহমদী নামক একটি পত্রিকা বের হয়।[২] এভাবে নারী শিক্ষার ধারা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলে অব্যাহত গতিতে।

---

১. M. Azizul Haque, History and Problems of Muslim Education in Bengal, (Calcutta-1971), P. 20

২. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪, পৃ. ৪৫-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নে কয়েকজন মহিয়ষী মুসলিম নারীর অবদান (১৯০০-২০০০)

* বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
* নূরন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী
* এস. ফাতেমা খানম
* দৌলতনেসা খাতুন
* জোবেদা খানম
* সুফিয়া কামাল
* নীলিমা ইব্রাহীম
* রাবেয়া খাতুন
* বদরুন্নেসা আহমদ
* মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
* শামসুন নাহার মাহমুদ
* ডা. জোহরা বেগম কাজী
* বেগম সারা তৈফুর
* আকিকুন্নেসা আহমদ
* জেব-উন-নেসা জামাল
* সৈয়দা মোতাহেরা বানু
* আখতার মহল সাইদা খাতুন
* ড. মালিহা খাতুন
* মাহমুদা খাতুন
* রোমেনা আফাজ
* মিসেস. রাজিয়া মজিদ
* কবি আজিজা এন মোহাম্মদ
* খোদেজা খাতুন
* ফজিলাতুন নেসা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নে কয়েকজন মহিয়ষী মুসলিম নারীর অবদান

বিভিন্ন মুখী সামাজিক অবরোধ, সংস্কার ও শিক্ষার অভাবের কারণে যুগ যুগ ধরে বাঙালি নারী সমাজ সন্তানের জন্ম, তার লালন-পালন, পতিসেবা ও গৃহকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। ধর্ম, অর্থনীতি, আইন, সামাজিক মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রের শাসনে নারীরা হয়েছে বৈষম্যের শিকার। এর ফলে সামাজিক সুবিধা থেকে হয়েছে বঞ্চিত। বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, দাসপ্রথা, পর্দাপথা, পণ ইত্যাদি নারীর বিকাশকে করেছে আরও শ্লথ ও সংকুচিত। আঠারো শতক পর্যন্ত ও ধারা শক্ত অবস্থানে থাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এর সামাজিক পরিবর্তন বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরই দ্বিতীয়ার্ধে নারী শিক্ষা প্রধান দাবিতে পরিণত হয়।[১] নারীর প্রতি সামাজিক অত্যাচার, বিধি-নিষেধ, প্রথা, পশ্চাৎপাদতা ও তা থেকে মুক্তির বিষয় নিয়ে এই শতকে সমাজে ব্যাপক আলোচনা ও আন্দোলন শুরু হয়।[২] এ শতক থেকেই লেখক হিসেবে বাঙালি নারীর আবির্ভাব ঘটেছে। বিশ শতকে এসে বাঙালি নারীর লেখনী হয়েছে তীক্ষ্ম পরিণতি, সমাজ সতর্ক ও বৈচিত্রময়। বাঙালি নারী শিক্ষা গ্রহণের পর নিজের দৈন্য দশা উপলব্ধি করে এবং অবস্থার অবসানের জন্য সচেষ্ট হয়।[৩] এক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

রোকেয়া সাখাওয়াত জন্মেছিলেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের জমিদার পরিবারে। বাবা জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। তিনি স্ত্রীশিক্ষা, বিশেষ করে মেয়েদের বাঙলা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। শোনা যায়, তখনকার সামাজিক চাপই নাকি তাঁর এই গোঁড়ামির কারণ। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা আর বড় ভাই ইব্রাহিম সাহেবের সহযোগিতায় বাংলা ইংরেজি শেখার সুযোগ পান। এছাড়া তাঁর আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষাও জানা ছিল। শৈশব থেকেই কঠোর পর্দায় বড় হয়েছেন তিনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ কখনও পাননি। আনুমানিক ১৬ বছর বিহারের অধিবাসী বিপত্নীক সৈয়দ শাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। ১৯০৯ সালের ৩ মে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াতমারা যান। আর রোকেয়া মারা যান ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর, ৫৩ বছর বয়সে।[৪] বিয়ের পর তাঁর নাম হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তবে তিনি বেগম রোকেয়া নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।[৫]

---

১. সোনিয়া নিশাত আমিন, নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ৩য় খণ্ড, সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৬৭৫
২. আনিসুজ্জামান, বাঙালি নারী, সাহিত্য ও সমাজ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৫৬
৩. মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১৮৮
৪. শাহীন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, জানালা মহফিল, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৩-৪
৫. শাহীদা আখতার, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বাংলা পিডিয়া, খণ্ড-৯, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া লেখিকা হিসেবে বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী এবং চৈতন্যেও তিনি বিংশ শতাব্দীর সন্তান। সময়ের দিক থেকে তাঁর উত্থান এই শতাব্দীর প্রথম দশকে। বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও কর্মী এই তিন রূপেই তাঁর বিকাশ। আবার তাঁর প্রতিভার তাবৎ বিচ্ছুরণ একটিই জ্যোতিষ্মান কেন্দ্র থেকে কিংবা তারা পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট ও ওতোপ্রোত। বাঙালি মুসলমান, নারী শিক্ষা, নারীজাগরণ, তাঁর ভাবনাশীলতা এইসব কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা; এসব তাঁর কর্মের পরিধি। আর লেখিকা হিসেবে গল্প কবিতা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন কিন্তু সেইসবের মধ্যে দিয়েও একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে নারীজাগরণ তথা সমাজহিত।[১]

ইউরোপে যাওয়া এবং পিতামাতার অমন আনুকূল্য লাভ দূরে থাক, স্বদেশের কোন বিদ্যালয়েও রোকেয়া লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। ব্রাহ্ম অথবা পাশ্চাত্য প্রভাবিত হিন্দু পরিবারে দু'চারটা ব্যতিক্রম দেখা দিলেও, মুসলমান পরিবারের কোনো মেয়ের পক্ষে তখন পর্দা ভেঙ্গে বিদ্যালয়ে যাবার প্রশ্নই ছিল অবান্তর। এই পর্দাপ্রথা কত কঠোর ছিল, রোকেয়ার নিজের জবানি থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়িতে কোন স্বল্প পরিচিত মহিলা বেড়াতে এলও, পাঁচ বছরের রোকেয়াকে পর্দা করতে হত। কোন একবার বাইরের মহিলারা বেড়াতে এলে কদিন কী প্রাণপণ প্রযত্নে প্রায় অনাহারে কখনো চিলোকোঠায়, কখনো সিঁড়ির নিচে, কখনো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকেছেন তিনি। প্রায় সমবয়সী ছ'বছরের হালিম কখনো যদি তাঁকে একটি দুধ এনে দিতেন, তা হলে সেটাই হত তাঁর একমাত্র পথ্য। মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়ার আর একটা মস্ত বড় বাধ ছিল এই যে, তখনো তাঁদের লেখাপড়ার কোন স্কুল ছিল না।[২] মোটকথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করলেও রোকেয়া স্বগঠিত এবং স্বশিক্ষিত মানুষ। এর পিছনে ছিল ব্যাপক অধ্যয়ন, সযত্ন পরিশীলন আর পরিবেশের যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য।[৩]

তাঁর বিয়ে হয় সে যুগের তুলনায় বেশ পরিণত বয়সে ষোল বছরে। (একটা অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী আঠার বছর।) কিন্তু তাঁর পাত্রটি বিলেত ফেরত এক অবাঙালি দোজবরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভাগ্যের কী পরিহাস! পরবর্তীকালে যিনি হন নারীমুক্তি আন্দোলনের এত বড় অগ্রদূত, তাঁর বিয়ে হয় তাঁর চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি বয়সী এক দোজবরের সঙ্গে। আগের পক্ষের এক কন্যা ছিল সাখাওয়াতের। পরে সে কন্যা এবং তাঁর স্বামী রোকেয়াকে কম লাঞ্ছনা দেননি।[৪] তবে আপাতদৃষ্টিতে যতটা দুভাগ্যজনক মনে হচ্ছে, বাস্তবে বিয়েটা রোকেয়ার জন্যে তেমন শোচনীয় ছিলনা।[৫] রোকেয়ার জীবনে স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সহচর্যে এসেই রোকেয়ার জ্ঞানচর্চার পরিধি বিস্তৃত হয়।

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ. ১০
২. গোলাম মুরশিদ, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ১২২, ১২৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

উদার ও মুক্ত মনের অধিকারী স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় রোকেয়া দেশী-বিদেশী লেখকদের রচনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঘটে স্বামীর অনুপ্রেরণায়। তবে রোকেয়ার বিবাহিত জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।[১] রোকেয়ার গর্ভে দুটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করে।[২]

মৃত্যুর সময় সাখাওয়াতের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল সত্তর হাজার টাকা। স্বামী-স্ত্রীর পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য দশ হাজার টাকা তিনি আগেই বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন।[৩] স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে রোকেয়া ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। কিন্তু সাখাওয়াতের পূর্বক্ষণীয় কন্যা এবং সেই কন্যার স্বামীর পীড়নে অল্পকালের মধ্যে তিনি ভাগলপুর ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তবে বাধা পেলেও নিরুৎসাহ হননি তিনি। কলকাতায় গিয়ে এক বছর পাঁচ মাস পরে, ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ তিনি আর একটি বিদ্যালয় খোলেন। এবারে ছাত্রী সংখ্যা আট। ঐ বছর পর্যন্ত কলকাতায় মেয়েদের জন্যে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল এন্ড ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলসহ সাতটি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি এমই স্কুল, ৫টি ভার্নাকুলার স্কুল, ৪১টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ৪১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। মুসলমান মেয়েদের জন্য নিম্ন মাধ্যমিক উর্দু স্কুল ছিল ১৪টি আর ২৫টি কুরআন স্কুল অর্থাৎ মক্তব। কিন্তু একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল না। অথবা বাংলাভাষী মুসলমান বালিকাদের জন্যেও একটি স্কুলও ছিল না।[৪] ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির নাম ছিল 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। রোকেয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালে এই স্কুল মধ্য গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে পরিণত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এবং ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে স্কুলটি কলকাতার বিভিন্ন স্থালে স্থানান্তরিত করতে হয়।

প্রথম দিকে কেবল অবাঙালি ছাত্ররাই পড়ত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। রোকেয়ার অনুপ্রেরণায় ক্রমশ বাঙালি মেয়েরাও এগিয়ে আসে পড়াশোনার জন্য। ছাত্রীদের পর্দার ভেতর দিয়েই ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলে আনা-নেয়া হত।[৫] বিরূপ সমালোচনা ও নানাবিধ সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সে যুগের মুসলমান মেয়েদের শিক্ষালাভের অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত করেন। এটি ছিল তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের বাস্তবায়ন। শৈশব থেকে মুসলমান নারীদের যে দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ করেছে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করাই ছিল এই স্কুল প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য।৬

---

১. শাহীদা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
২. মজির উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৬৭, পৃ. ৫৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৪. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
৫. শাহীদা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে তফসিরসহ কুরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, হোম নার্সিং, ফাস্ট এইচ, রান্না, সেলাই, শরীরচর্চা, সঙ্গীত প্রভৃতি সব বিষয়ই শিক্ষা দেয়া হত। স্কুল পরিচালনা এবং পাঠদানে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বেগম রোকেয়া বিভিন্ন বালিকা স্কুল পরিদর্শন করতেন। পর্যবেক্ষণ করতেন সেসব স্কুলের পাঠদান পদ্ধতি। এক্ষেত্রে তিনি কলকাতার শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ইংরেজ, বাঙালি, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সব শ্রেণির মহিলাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেন। তিনি নিজেই স্কুলের শিক্ষিকাদের ট্রেনিং দিতেন। কলকাতায় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিয়ে আসেন।[১] শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়ার নিবেদিত হওয়ার আরও ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, তাঁর মধ্যে এমনি সচেতন চিল যে, শিক্ষা ব্যতিত নারী বিশেষ করে মুসলিম নারীর বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তি সম্ভব নয়। শিক্ষা বিস্তারে রোকেয়ার ভূমিকা সেইকালের নিরিখে শুধু তাৎপর্যই ছিল না, ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহসী আর উদ্যমী এক নারীর গৌরবগাথা।

বিবিধ অবদান সত্ত্বেও রোকেয়ার সবচেয়ে বড় পরিচিতি নারী আন্দোলনের কর্মী এবং প্রেরণদাতা হিসেবে। আপন অবস্থা দেখেই তিনি নারীর সার্বিক বন্ধন এবং অসম্মান প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করেছিলেন। দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হলেও, তাঁর মতে, প্রত্যেকের ঘরেই এ ব্যবসা পুরোদমে বিরাজ করছে।[২] তাঁর মতে, উড়তে শেখার আগেই পিঞ্জরাবদ্ধ এই নারীদের ডানা কেটে দেয়া হয় এবং তারপর সামাজিক রীতিনীতির জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয় তাঁদের।[৩] রোকেয়ার মতে, নারীর দাসত্বের প্রধান কারণ, পুরুষশাসিত সমাজ ধর্মের নাম করে নারীর দাসত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং অলৌকিক মহিমা দিয়েছে।[৪] জীবনকে অর্থবান করার জন্যে এই শোচনীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি আবশ্যক, এ বিষয়ে রোকেয়ার ভাবনায় কোন দ্বিধা ও অস্পষ্টতা ছিল না।[৫]

বেগম রোকেয়া বাংলা ও নিখিল ভারত পর্যায়ে এক সংগ্রামী সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেন। নারী সমাজের মধ্য দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, দক্ষ নেতৃত্বের গুণাবলি সৃষ্টি এবং সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১৬ সালে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' (মুসলমান মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই মুসলিম মহিলাদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সংগঠন। এর কার্যক্রম ছিল দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষা প্রদান, আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কুটিরশিল্প স্থাপন, মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা, অজ্ঞ ও অশিক্ষিতদের শিশু পালন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞানদান এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়। নারীজাতিকে সংগঠিত করার মানসে তিনি বিভিন্ন সংগঠন ও মুসলিম সমিতি, বেঙ্গল উইমেন্স

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

২. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রভৃতি সংস্থার জীবন সদস্য ছিলেন।[১] এসব সংগঠনের মধ্য দিয়ে রোকেয়ার সংগঠক জীবনের পরিচয় আমরা পাই। নারীর বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানে সংগঠিত প্রয়াস প্রয়োজন বলেই তিনি তাঁর প্রজ্ঞা সাংগঠনিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সমাজ সংস্কারের জন্য নারীদের সংগঠন ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, এ অর্ন্তদৃষ্টি তিনি অর্জন করেছিলেন সেই পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজে অবস্থান করেও, পরবর্তীতে মুসলিম নারী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

লেখিকা হিসেবে বিবাহের পরেই রোকেয়ার আত্মপ্রকাশ। যতদূর জানা যায় নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা (মাঘ ১৩১০)। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে।[২] মতান্তরে, তাঁর প্রথম লেখা 'পিপাসা' (মহরম) প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯০২ সালে, চৈত্র ও বৈশাখ ১৩০৮-১৩০৯ (যুগ্মসংখ্যা) নবপ্রভা পত্রিকায়। সমকালীন সাময়িক পত্রে মিসেস আর এস হোসেন নামে তাঁর রচিত প্রকাশিত হত।[৩] ভাগলপুর বসেই রোকেয়া লেখেন তাঁর একমাত্র ইংরেজি রচনা Sultana's Dream ১৯০৫ সালে। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। ১৯০৫ সালে 'মতিচুর' প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে।[৪] বেগম রোকেয়ার সাহিত্য সাধনার কাল তিন দশক: ১৯০৩-৩২। অর্থাৎ তাঁর তেইশ বছর বয়সে প্রথম আত্মপ্রকাশ (নিরীহ বাঙালি)। নবনূর (মাঘ-১৩১০) থেকে মৃত্যুর আগের রাত্রি পর্যন্ত (নারীর অধিকার)। মাহে-নও (মাঘ-১৩৬৪)। নবনূরে তাঁর গদ্য-পদ্য প্রচুর প্রকাশিত হয়।[৫] নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, মহিলা, ভারতমহিলা, আর-এসলাম, নওরাজ, মাহে নও, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, The Musalman, Indian Ladies Magazine প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।[৬]

হয়ত স্বামীর অকালমৃত্যু, স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ফলে রোকেয়ার সাহিত্য জীবন একটু বিঘ্নিত হয়েছে: কিন্তু তাকে দমিত তো করতে পারেননি, বরং পরবর্তীকালে রোকেয়াকে অনেকখানি সাহিত্যনিমগ্ন মনে হয়। স্কুলের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চা ছাড়েননি তিনি, তাঁর সাহিত্যচর্চা ও স্কুল পরিচালনার পিছনে অনন্য উদ্দেশ্য কাজ করে গিয়েছিল বলেই এ দুই ব্রতই তিনি উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর আগের দিনও তাঁকে দেখা গেছে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন, ডিসেম্বর ভোর রাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে রাতেও তিনি ১১টা পর্যন্ত তাঁর টেবিলে বসে কাজ করেছিলেন। যে টেবিলে শেষ লেখাপড়ার কাজ করে তিনি গিয়েছিলেন সেখানে পরদিন এই অসমাপ্ত লেখাটি (নারীর অধিকার) পেপার ওয়েটের নিচে দেখা গিয়েছিল। তাহলে, দেখা যাচ্ছে, জৈবনিক কিছু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রোকেয়া আমৃত্যু সাহিত্য সাধনা করেছেন।[৭]

---

১. মো: নুরুল ইসলাম, সমাজসংস্কার ও নারীর ক্ষমতায়নে বেগম রোকেয়া, বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ, শিক্ষাবার্তা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩, পৃ. ৬
২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৩. শাহীদা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৬. শাহীদা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

তিন দশকের সাহিত্য সাধনায় রোকেয়ার রচনা কম নয়। তিনি লিখেছেন- ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও শ্লেষাত্মক রচনা, অনুবাদও করেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয় পাঁচটি গ্রন্থ: 'মতিচূর' (১ম খণ্ড ১৯০৪, ২য় খণ্ড ১৯২২), 'Sultana's Dream' (নকশাধর্মী রচনা-১৯০৮), পদ্মরাগ (উপন্যাস-১৯২৪), অবরোধবাসিনী (নকশাধর্মী গদ্যগ্রন্থ-১৯৩১)।

পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত কিন্তু 'পুস্তকাকারে-অপ্রকাশিত' রোকেয়ার ১৬টি বিভিন্ন ধরণের 'প্রবন্ধ', ৭টি কবিতা এবং 'ছোটগল্পৎ ও 'রস রচনা' শিরোনামে ৬টি বিচিত্র রচনাও বাংলা একাডেমি প্রকাশিত রোকেয়া রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের সুবিখ্যাত 'রোকেয়া-জীবনী' তে রোকেয়ার ৫টি ব্যক্তিগত পত্র মুদ্রিত হয়েছে। এগুলো তিনটিসহ রোকেয়ার ১৭ খানা পত্রের একটি সংকলন মোশফেকা মাহমুদের সম্পাদনায় পত্রে 'রোকেয়া পরিচিতি' নামে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।[১] উদ্ভাবনা, যুক্তিবাদিতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর রচনার সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়।[২] মতিচূর, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি গ্রন্থে রোকেয়ার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বপ্নের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। প্রচলিত লেখায় নারীর স্বতন্ত্র্য ও বহুমুখী ভূমিকানির্ভর জীবনের রূপরেখা তিনি তৈরি করেছেন। প্রচলিত সামাজিক অবস্থানে নারীর বন্দিত্ব ও অসহায়ত্ব এসব লেখায় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি নারীর স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ঘটেছে।

শিল্পী রোকেয়া একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শিল্পের চর্চায় ব্রতী হন। তবে অত্যন্ত সযত্নে তার সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাকে সরিয়ে রাখলে প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে এক ধরণের সাহিত্যগুণ পরিলক্ষিত হয় যেখানে তার সৃজনী চেতনার শক্তি, বিষয় উপস্থাপনার মুন্সিয়ানা, ব্যঙ্গ ও রঙ্গরসের কৌশল ইত্যাদির স্বাদ পাওয়া যায়। বাঙালি রেনেসাঁ সন্দিগ্ধ বিবেচনায় এবং পরিপূর্ণ মানব সন্তানের দায়ভার কাঁধে নিয়ে সে আলোকবর্তিকাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে উদ্যোগী হন। তার গ্রন্থ মতিচূর (প্রথম খণ্ড, ১৯০৪), Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন-১৯০৮) মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২২), পদ্মরাগ-১৯২৪ এবং অবরোধবাসিনী-১৯৩১ সাহিত্যের শর্তকে পূরণ করে। কারণ রোকেয়া প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং ধর্মবুদ্ধির বাইরে শিল্পকে দেখেছেন। প্রগতিশীল ধারণায় নিজের জীবনকে নিরন্ত র তিনি দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করেছেন। নিজেকে জড়িয়ে বাস্তবতাগুলোকে যেমন নিজের উপলব্ধিতে নিয়েছেন ঠিক, তেমনি তাকে বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে দিয়ে প্রত্যেককে এক ধরণের অনিবার্যতার মুখে ঠেলে দিয়েছেন। সময়ের সত্য উপলব্ধিতে মানবের মহিমা ও মানবিকতাই ছিল তার চেতনা জগতের মূল উপপাদ্য।[৩] রোকেয়ার লেখার একটি প্রধান গুণ স্বপ্রবণতা, সজীবতা,

---

১. মোরশেদ শফিউল হাসান, বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৩৫
২. শাহীদা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
৩. শহীদ ইকবাল, বেগম রোকেয়ার সমাজচিন্তা: একটি বিশ্লেষণ, সংবাদ সাময়িকী, সংবাদ, ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর-২০০৩, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সরসতা। তিনি নিজেও চিন্তাহীন অনর্গল উৎসারণের স্বভাব লেখক নন, বরং তাঁর রচনার বিশিষ্ট চরিত্রই চিন্তাশীলতা, ভাবুকতা মননে সংগঠিত হয়েছে।[১]

রোকেয়ার আগে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রধান ও পরিচিত ছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মোজাম্মেল হক (১৯৬০-১৯৩৩), মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৯৬২-১৯৩৩), পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন আহমদ মাশহাবী (১৮৫৯-১৮১৮), মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬) প্রমুখ। লক্ষণীয় যে, এঁরা প্রায় সবাই সৃষ্টিশীল রচনায় নিরত না থেকে (মীর মোশাররফ হোসেন বাদে) সামাজিক-ধার্মিক-সাহিত্যিক ভাবনা প্রধান রচনাতেই প্রধান নিবিষ্ট। কবিতার চেয়ে গদ্য রচনায় বাঙালি মুসলমান লেখকেরা প্রথম থেকেই সচ্ছল ও কুশলী। এই ধারাবাহিকতায় রোকেয়ার উত্থান একান্ত স্বাভাবিক।[২]

উনিশ শতাব্দীর আশির দশকে যাঁরা জন্মেছিল, বা রোকেয়ার সমবয়সী বা সমসাময়িক যাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন: বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯৬২), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৩৮), ডাক্তার লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) প্রমুখ।[৩] সহজীবী এই লেখকদের একটি সামান্য লক্ষণ এই যে এঁরা সবাই মূলত চিন্তা প্রধান গদ্য লেখক। সেই চিন্তার অধিকাংশ জুড়ে থাকে দেশ, সমাজ, জাতি দেশহিত বা সমাজন্নয়ন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। সেই দিক থেকে এরা সবাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের লেখক হলেও উনিশ শতাব্দীর আদর্শবাদী ধারা এদের মধ্যে প্রবহমান। এঁদের প্রত্যেক নিজস্ব গদ্যশৈলীর অধিকারী, কিন্তু গদ্যকে শিল্পকর্ম হিসেবে যে স্বতন্ত্র মূল্য দান তা আমরা এঁদের মধ্যে লক্ষ করি না।[৪]

স্মারণীয় যে এঁরা সবাই রবীন্দ্রযুগের অধিবাসী। স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের জীবন উনিশ ও বিশ শতাব্দীতে আধাআধি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে উনিশ শতাব্দী শোভন দেশহিত ও সমাজন্নয়ন তাঁর গদ্যকর্মের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, অন্যদিকে এসব থেকে মুক্ত ব্যক্তির আনন্দ-বেদনার প্রকাশ, গ্রহণ আত্মার মুক্তি ও স্বেচ্ছাচার এসব তাঁর গদ্য কাজের অন্যতম চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৪), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-৯৯), অবনীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৫১) প্রমুখ যে গদ্যের প্রবর্তন করেছিলেন তা শিল্পশীলিত এবং অন্তত উনবিংশ শতাব্দীর উপযোগবাদী গদ্য থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও বাঙালি মুসলমান সমাজে ঘটেনি সেই প্রযুক্তি, যার ফলে রচনায় দেখা দিতে পারে নীলিমা নিমগ্নতা,

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৪. ঐ, পৃ. ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

দেশকালহীন চৈতন্যের উচ্ছলতা অর্থাৎ রোমান্টিকতা।[১] কিন্তু সামগ্রিকভাবে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ-বলেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর জগৎ থেকে রোকেয়া সিরাজী-ফজলুল করিম-লুৎফর রহমান এয়াকুব আলী চৌধুরী জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়ে, বক্তব্যে, বচনে।[২]

উনিশ ও বিশ শতাব্দীর প্রথমে যে সব লেখিকা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই কথাশিল্পী (স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী প্রমুখ) বা কবি (গিরীন্দ্রমোহনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৩৬-১৯৪৩), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৪), লজ্জাবতী বসু (১৮৭৩-১৯৪২) প্রমুখ। কিন্তু বেগম রোকেয়ার মত চিন্তাশীল গদ্যলেখিকা, যিনি সমকালীন সমাজচিন্তায় সর্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট, যিনি সমাজ সাহিত্য নারী ইত্যাদি নানা বিষয়ে জাগৃতির জন্যে সচেষ্ট, স্কুল ও নারীকল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, চাষি-সমাজের কথাও ভাবেন (চাষার দুঃখ), এণ্ডি শিল্পের প্রসারের জন্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রবন্ধ রচনা করেন (এণ্ডি শিল্প), তাঁর রচনার দ্বারা সমকালীন পুরুষ ও নারী-সমাজকে সচকিত করে তোলেন, এরকম দ্বিতীয় কোন লেখিকা বাংলা সাহিত্যে নেই।[৩]

---

১. ঐ. পৃ. ৪০
২. ঐ. পৃ. ৪০
৩. ঐ, পৃ. ৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়ার রচনায় নারীমুক্তির চিন্তাঃ

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত অধিকার বঞ্চিত নারী জাতির ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে পাবার জন্য যে জীবন সংগ্রামে নামের সে সংগ্রামে তাঁর অস্ত্র লেখনী সাহিত্য, তিনি তাঁর যুগের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর এক ভবিষ্যদর্শিনী। সেজন্য রোকেয়ার চিন্তার মুলসূত্র নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর মানবীয় সত্তার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার কামনায় তেজদীপ্ত হয়ে উঠেছে। রোকেয়ার সাহিত্য জগতে আগমন 'নিরীহ বাঙালী' শীর্ষক প্রবন্ধ দিয়ে আর বিদায়ী 'নারী অধিকার' নামক অসমাপ্ত রচনা দিয়ে। তাঁর উপর অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, তিনি মাদ্রাজে Cristan Tract Society এর ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্ত কাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এটা নিত্যন্তই অসত্য। এর প্রতি উত্তরে মোতাহার হোসেন সূফী বলেছেন, "ইসলামের মহান বাণী ও আদর্শের প্রতি বেগম রোকেয়া গভীরভাবেই আস্থাশীল ছিলেন। তবে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইসলামকে দেখেননি। ইসলাম নারীকে মানুষের মার্যাদা দানা করেছে। একইভাবে ইসলাম নারীদের যে সমস্ত অধিকার প্রদান করেছে, সেগুলো যথার্থভাবে প্রচার ও সংরক্ষণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলমান নারী সমাজের দুরাবস্থার অবসানকল্পে তিনি ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য বহু জায়গায় তাগিদ দিয়েছেন। নারী জাগরণের ব্রতী হয়ে তিনি কোথাও ইসলামের শিক্ষাকে কটাক্ষ করেননি।"[১]

বেগম রোকেয়া নিম্নলিখিত সাহিত্যরাজী দিয়ে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়াস পেয়েছেন-

বেগম রোকেয়ার প্রথম প্রকাশিক গ্রন্থ 'মতিচূর' (প্রথম খন্ড), প্রকাশিত ১৯০৫ সালে। গ্রন্থে ৭টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রী জাতির অবনতি'। এ প্রবন্ধটি প্রথমে 'আমাদের অবনতি' নামে নবনূর পত্রিকা বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সমাজের কুসংস্কার, পশ্চাপদতা ও অন্ধকারাচ্ছন্নতা দূরীকরণের জন্য নারী শিক্ষা প্রয়োজন। বেগম রোকেয়া 'স্ত্রী জাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে শিক্ষা দানে প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজে স্ত্রী শিক্ষা বিরোধিতা বিরাজ করছে তা আশু পরিবর্তনের প্রয়োজন। সমাজের উন্নিতির স্বার্থে স্ত্রী শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাঁর ভাষায়, "অশিক্ষিত স্ত্রী লোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মাহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে, "স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার"। আজকাল অধিকাংশ লোক শিক্ষাকে কেবল চাকুরী লাভের পথ মনে করে। মহিলাদের চাকুরী গ্রহণ অসম্ভব। সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রী শিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।" [২]

---

১. মোতাহার হোসেন সুফী, বেগম রোকেয়াঃ জীবন ও সাহিত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ৮২-৮৩
২. আব্দুল কদির সম্পাদিত, 'রোকেয়া রচনাবলী,' বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষার প্রশ্নে রোকেয়া নারীর সামাজিক অবস্থান, মর্যাদার ও অধিকারের কথা তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে জিল্লুর রহমান সিদ্দীকা বলেছেন, "প্রথমেই শিক্ষার প্রসঙ্গটা আসেনি, এসেছে সমাজে নারীর অবনতির এক ভয়াবহ বর্ণনা। নারীকে চিত্রিত করা হয়েছে দাসী হিসেবে।[১]

এই দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্তি দেয়াই ছিল রোকেয়ার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য।[২] নারী শিক্ষার জন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বলেছেন, "আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোকে প্রবেশ করিতে পারে না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যতই ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভান্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপ উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত করিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করেন।"[৩]

শিক্ষা হচ্ছে উন্নতির অন্যতম সোপান। নারী মূলত শিক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে অক্ষম। এ কারণে সমাজ জীবনে পুরুষের সাথে নারীর বিপুল ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। তাই গ্লানিকর চিত্র অঙ্কিত করে বেগম রোকেয়া "অর্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে লিখেছেন, "কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্য সহচারী হইতে পারে। প্রভূদের বিদ্যার গতির সীমা নাই। স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর "বোধোদয়" পর্যন্ত স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দুরত্ব মাপেন, স্ত্রী একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সূদূর আকাশে গ্রহ নক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন সূর্যমন্ডলের ঘনফল তুলাদন্ডে ওজন করেন এবং ধুমকেতুর গতি নির্ণয় করেন। স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাধুনীর গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতির্বেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্মিনী কই? বোধ হয়, গৃহিনী যদি আপনার সঙ্গে সূর্যমন্ডলে যান, তবে তথায় পৌঁছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন। তবে সেখানে গৃহিনী না যাওয়াই ভাল।"[৪]

মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সন্তানের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা সন্তান মায়ের কাছ হতে যা শিখবে জগতের অন্য কারো কাছ হতে তা অর্জন করতে সে অক্ষম। একজন শিক্ষিত মাতার সন্তান শিক্ষিত হবে। কেননা শিশু অবস্থায় মাতার দোষগুণ শিশু গ্রহণ করে। সুতরাং স্ত্রী লোকদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া "অর্ধাঙ্গী" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, " অনেকে বলেন, স্ত্রী লোকদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্যচোষ্য বাধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশী আবশ্যক নাই কিন্তু ডাক্তার বলেন, আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ-গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে

---

১. জিল্লুর রহমান সিদ্দীকা, বেগম রোকেয়া: নারী শিক্ষা প্রণোদনা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯৭ইং পৃ. ১৮
২. আব্দুল মালেক, বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম সাহিত্য পত্রিকা, একচল্লিশ পর্ব, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক-১৪০৪, পৃ. ৫৮
৩. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮
৪. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

Dhaka University Institutional Repository

অবতীর্ণ হওয়। এইজন্য দেকা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়ানায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ.বি.এ পাস হয় বটে। কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে। তাহাদের বিদ্যাপরীক্ষায় এ কথার সত্যকার উপলব্ধি হইতে পারে।"[১]

মুসলিম সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ভঙ্গকরেনারীকে পার্থিব সম্পত্তি এবং এমনকি অপার্থিব সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করেছে। রোকেয়ার সমসাময়িক আমলে মুসলিম নারী সমাজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। [২]

বেগম রোকেয়া নারী সমাজাকে রান্নাঘরের সীমা পেরিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছেন।[৩] উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার অভাবই নারী জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে, বেগম রোকেয়া বলেছেন, "আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীরনের সম্যক না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচছ মনে করি।[৪]

সংসার সুন্দারভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন সুগৃহিনীর প্রয়োজন। বেগম রোকেয়া লেখনীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মুগৃহিনী হবার নিমিত্তে নারীকে জ্ঞানে, কর্মে, শিক্ষায় উন্নত করার পথ নির্দেশ দান করা। সেজান্যে 'সুগৃহিনী' শীর্ষক প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "আশা করি আপনারা সকলে সুগৃহিনী হইতে ইচ্ছা করেন এবং সুগৃহিনী হইতে হইলে যে গুণের আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিনী আবশ্যক হইতে পারেন নাই। কারণআমাদের উচ্চ শিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করে। পুরুষ বিদ্যা লাভ করেন অন্ন উপার্জনের আশায়, আশায় আমরা বিদ্যালাভ করিব কিসের আশায়? অনেকেই মতে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই।

আমি বলি, সুগৃহিনী মূল এর উপর ভিত্তি করে গৃহিনীকে স্বাস্থ্যসম্মত রন্ধন প্রণালীর জন্য শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বলেছেন, "রন্ধন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিনীর ডাক্তারী ও রসায়ন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন খাদ্যের কি গুণ, কোন বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য্য প্রয়োজন। এসব বিষয়ে গৃহিনী জ্ঞান চাই।"

---

১. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়অ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অর্থাৎ স্বাস্থ্য জ্ঞান, রোগ প্রতিরোধ ও রোগীর সেবা যত্ন ইত্যাদি সম্পর্কে নারীদের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তিনি একটি 'জেনান মেডিকেল কলেজ' স্থাপনের আহবান জানিয়েছিলেন।[১]

সুগৃহিনী হওয়ার জন্য নারীদের সুশিক্ষার আয়োজনের আহবান জানিয়ে বেগম রোকেয়া সুগৃহিনী প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন, "পরিশেষে বলি প্রেমিক হও, ধার্মিক হও বা নস্তিক হও, যাই হইতে চাও, তাহাতেই মানসিক উন্নতি (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালীর জন্য তদ্রুপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।"[২]

'বোরকা' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া পর্দা শিক্ষার পথে কাটা নয়, বরং নারীর উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া জোর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নারীদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহিলা পরীক্ষকদের কথা উল্লেখ করেছেন।৩ নারী সমাজের পরাধীনতার হীনাবস্থর অন্যতম প্রধান, কারণ হলো শিক্ষার অভাব। তাই বেগম রোকেয়া বলেছেন, "সম্প্রতি আমার যে এমন নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পরিয়াছি, ইহা অবরোধ থাকার জন্য হয় নাই। শিক্ষার অভাবে হইয়াছি। শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদুরদশী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছে।"[৪]

মহিচূর (প্রথম খন্ড) এ সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ প্রবন্ধে নারীর দূর্গতি ও অধঃপতনের কারণ চিহ্নিত করেছেন এবং সেই সাথে তার প্রতিকার ও বাতলে দিয়েছেন। 'মতিচুর' (১ম খন্ড) সম্পর্কে মোতাহার হোসেন সূফী লিখেছেন, 'মতিচূর' (১ম খন্ড) এ সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নারী কেন্দ্রিক। নারীর দূর্গতি ও অধঃপতনের কারণ, উন্নতির অন্তরায়সমূহ স্ত্রীজাতির শিক্ষা গ্রহণের

১. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
২. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯-৪০
৩. রোকেয়া রচনাবলী, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ.৪০
৪. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধকর্তা, পর্দা এবং অবরোধের মধ্যে পার্থক্য, পর্দার ক্ষতিকারক দিক, সুগৃহিনী হওয়ার বিবিধ উপায়সহ নারীকে উন্নতির পথনির্দেশ দানের উদ্দেশ্যেই লেখিকা এই পবন্ধগুলি রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধসমূহ রচনায় লেখিকা যে বুদ্ধি দীপ্তি, মার্জিত রুচি, ভাবেই স্বকীয়তা এবং প্রকাশ ভঙ্গির বৈচিত্র প্রদর্শন করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাকে অনন্য সাধারণ মহিমা দান করেছে।[১]

'মতিচূর' (১ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ের পত্রিকায় এর তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'মহিতচূর' গ্রন্তের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রশংসা করে "বাসনা" পত্রিকায় শ্লোক বলা হয়েছে, 'মতিচুর প্রকৃতই মহিতচুর"। গুটিকতক সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় প্রবনধগুচ্ছ এ মিধুর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়েছে। নিবন্ধগুলি চিন্তাশীলতার পরিচয়ক। গ্রন্থকর্মী ভারতের (অবিভক্ত ভারতের) অন্তঃপুরাবদ্ধ চিরবন্দিনী মহিলাকুলের উন্নতি শিক্ষা ও স্বাধীনতার ভিখারিনী। তাঁহার সকল মতের সহিত সকলের মত এক নাও হইতে পারে; কিন্তু তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, মতিচূর একখানি সুলিখিত গ্রন্থ।[২]

'মতিচূর' (২য় খন্ড) গ্রন্থটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, ১৯২১ প্রকাশিত। গ্রন্থটি ৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে গৃহহকত্রী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতে পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩১। 'মতিচূর; (২য় খন্ড) গ্রন্থটি বেগম রোকেয়া তার বড় বোন করিমুন্নেসার নামে উৎসর্গ করেচেন। এ গ্রন্থটিতে দশটি রচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এগ্রন্থটি নুর ইসলামের প্রথম প্রবন্ধ। এটি মিসেস, এ্যানী বেশান্ত এর ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতার অনুবাদ, প্রবন্ধটি বেগম রোকেয়ার নিজস্ব কোন রচনা নয়। এ প্রবন্ধটি ১৩২২ বঙ্গাব্দ (১৯১৫ সালে)। আল-এসলাম পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শিক্ষা বিস্তারের সাথে মানব সভ্যতার উন্নতি সাধনেও মুসলমানদের উন্নতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধে শিক্ষা সম্পর্কিত রাসূলুল্লহ (স.) মুখ নিঃসৃত পবিত্র বাণী শ্রদ্ধা সহকারেউপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে, 'এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, আরবীয় পয়গম্বর তেরশত (১৩০০) বৎসর পূর্বে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন-বিদ্যা শিক্ষা কর, যে বিদ্যা শিক্ষা করে সে নির্মল চরিত্র হয়: যে বিদ্যার চর্চা করে সে ঈশ্বরের অন্তরও লাভ করে' যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে উপাসনা করে, বিদ্যাই মানবকে ভাল ও মন্দ (সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ) জ্ঞান শিক্ষা দান করে, শিক্ষাই সুপথ প্রদর্শন করে, শিক্ষাই নির্জনে নির্বাসনে প্রকৃত বন্ধু কাজ করে শিক্ষাই বনবাসে, সান্ত্বনা প্রদান করে, বিদ্যা আমাদিগকে উন্নতিমার্গে লইয়া যায় এবং দুঃখে সহানুভুতি প্রকাশ করে। বন্ধু সভায় বিদ্যা আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ, শত্রু সম্মুখে অত্র স্বরূপ। বিদ্যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার বিপন্ন দাস পূণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত হয়। [৩]

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মানবিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।[৪] এ প্রবন্ধের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া স্ত্রী শিক্ষা করা যে দরকার তাই বুঝিয়েছেন। তাছাড়া তিনি বলতে চেয়েছেন ইসলাম স্ত্রী শিক্ষা বিশেধ করেনি বরং জ্ঞান অর্জন করা ধর্মের অঙ্গ।

---

১. মোতাহার হোসেন সুফী, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭
২. শেখ ফজলুল করিম (সম্পাদিত), বাসনা-১৩১৬, আষাঢ় পৃ. ৯৪-৯৫
৩. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত , পৃ. ৭৬-৭৭
৪. মোরশেদ শফিউল হাসান, বেগম রোকেয়া: সময় ও সাহিত্য বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২ পৃ.৬৬

Dhaka University Institutional Repository

'জ্ঞানফল' হলো গ্রন্থের পঞ্চম রচনা। বেগম রোকেয়া রদতচনাটিকে রূপকথা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ রূপ কথার মর্ম সমাজ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। গল্পের শুরুতে আল্লাহর নিষিদ্ধ জ্ঞানফল খাওয়ার ফলে হওয়া ও আদমের জ্ঞান চক্ষু উদয় হলো ও সে পাপের শাস্তি স্বরূপ তাঁদের উভয়কে স্বর্গ হতে বিতাড়িত করা হল।"পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে আদমের জ্ঞানোদয় হইল।" .. এখন অজ্ঞতারূপ স্বর্গ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে লাগিল। সুতরাং মোহ ও শান্তির স্থলে চেতনা ও অশান্তি দেখা দিন।"[১] নারী হওয়ার আহৃত সেই জ্ঞানফল থেকে পরবর্তীকালে নারী জাতিকে বঞ্চিত হলো সমাজের সকল দুদর্শার মুল কারণ। কাহিনীর আলোকে বেগম রোকেয়া তাঁর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এভাবে" ...... দুইশত বৎসর হইল এই দেশের অদূরদর্শী স্বার্থপর পন্ডিত মূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে, কার্যক্রমে ঐ নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ ফল নিজেদের জন্য একচেটিয়অ করিয়া হইল। ... নারীর আনীত জ্ঞানফলে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এ কথা অবশ্য স্মরণ রাখিবে।" [২]

'নার্স নেলী' এ গ্রন্থের সপ্তম রচনা। রচনাটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এ রচনায় নয়িক নয়ীমার ধর্মান্তর ধর্মান্তর গ্রহণের বিষয়কে যারা সহজেই স্ত্রী শিক্ষার কুফল বলে সিদ্ধান্ত টানতে চাইবে মূলতঃ লেখিকা তাদেরকে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "...কেহ এই অবসরে খানিকটা স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়িয়া লইলেন। কেহ স্ত্রী শিক্ষার কুৎসা গাহিলে কেহ কাটা গায়ে লবনের ছিটা দিয়া বিলাত ফেরা মি. জামাল আহমদকে, তাহার কন্যা সুশিক্ষা উচ্চ শিক্ষার চরমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মোবারকবাদ দিলেন।....কেহ কেন আপন চিন্তায় শঙ্কিত হইয়াছেন যে, এরকম হইলেতো ঘর বউ-ঝি রক্ষা করা দায়। আজ এত বড় কালেক্টর সাহেবের বিধি মিশনারীদের কথায় ঘরের বাহির হইলের তবে আমাদেরতো কথাই নাই। .... নারীদ্বেষী পুরুষগণ স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে যতই দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ুন না কেন, সত্যের জয় অনিবার্য। শিক্ষা স্ত্রীলোক পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা ব্যঞ্জনীয়। স্থলবিশেষে অগ্নি গৃহদাহ করে বলিয়া কি কোন গৃহস্থ অগ্নি বর্জন করিতে পারে?"।[৩]

"শিশু পালন" এ গ্রন্থের অষ্টম রচনা। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু হলো শিশু পরিচর্যা। শিশু পরিচর্যা করতে হলে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বেগম রোকেয়া জোর দিয়ে বলেছেন, "... মায়ের কর্তব্য কি, তা না জেনে শুনে কেউ যেন মা না হয়। "[৪]

---

১. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
২. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৩. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৪. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া বংশধরকে টিকিয়ে রাখার জন্য দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে লিখেছেন, "... প্রথম স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার, দ্বিতীয় বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থ্যাৎ মেয়েদের বেশী করে শিখাতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে, আর অল্প বয়সের ছেলে মেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে।"[১]

বেগম রোকেয়ার জীবদ্দশায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর বাইরে যে সমস্ত প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো অগ্রন্থিত প্রবন্ধ নামে রোকেয়অ রচনাবলী (নতুন সংস্কার) উল্লেখ করা হয়েছে। বেগম রোকেয়া একজন শক্তিশালী গদ্য লেখিকা ছিলেন। গদ্য রচনার বিশিষ্ট্য ক্ষেত্রে প্রবন্ধ রচনায় তাঁর প্রতিভা সমধিক স্ফূর্তি পেয়েছে। উল্লেখিত প্রবন্ধ থেকে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সে সব প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপঃ

'রসনাপূজা প্রবন্ধটি ১৩৩১ এর অগ্রহায়ণ, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখিকা মুসলিম পরিবারের ভোজন বিলাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "জ্ঞানচর্চা ও আমরা জানি না, সামান্য সুচিকার্য ও রন্ধন প্রণালী কেবল আমাদের শিক্ষাণীয়। ৫০০ রকমের আচার, চাটনী, ৪০০ প্রকার মেরুবা প্রস্তুত জানিলেই সুগৃহিনী পরিচিতা হইতে পারা যায়। রমণী রাধুনীরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং মরণে বাচুর্চি জীবনলীলা সাঙ্গ করে। আমাদের সুখের চরম সীমা সচরাচর উপাদেয় খাদ্য রাখিতে শিক্ষা করা ও বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করা পর্যন্ত।"[২]

মোতাহার হোসেন সূফী লিখেছেন "পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও রসনা পূজা পরিহার করে সংযম শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি রচিত।[৩]

'আশা জ্যোতি' প্রবন্ধটি সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব একমাত্র শিক্ষা বিস্তারর মাধ্যমে। তাই বেগম রোকেয়ার মনে প্রাণে বিশ্বাস ছিল রাংলার মুসলমানদের মুক্তির পথ হলো শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে। তাই বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "মুক্তির উপায় ঐ শিক্ষা বিস্তার। আমরা যদি শিক্ষার জন্য মনে প্রাণে চেষ্টা করি, তবে আলীগড়ের দূরত্ব আমাদিগকে আলীগড়ে পৌছিতে বাধা দিতে পারিবে না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধির আশা করা যায় কি? যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সুশিক্ষালাভই আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায়, তবে শিক্ষার পথ যতই কন্টক থাকুক না কেন, বিশ্বাস (বিশ্বসিনী) তাহা উৎপাটন করিতে পারিতে।

১. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
২. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
৩. মোতাহার হোসেন সূফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রসর হইবেই। জ্ঞান সাধনা করে একটি সমাজ তথা জাতির উন্নতি অর্জন করতে হয়। লেখিকা জাপানের উন্নতিকে স্বাগত জানিয়েছেন কারণ তারা জ্ঞান সাধনা/জ্ঞানচর্চা করেছিলেন। তাই বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "জ্ঞান ধর্মেরই প্রধান অঙ্গ। এককালে মোসলেম সমাজ অতিশয় উন্নত ছিল, কিসের বলে? জ্ঞানের বলে আজি ইউরোপ ও আমেরিকা সুসভ্য, ধর্নাড্য এবং সর্ব বিষয়ে উন্নত কেন? জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৃপায়। যে ক্ষুদ্র জাপানের দিকে চাহিয়া অভাগিনী বঙ্গভূমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাহারও উন্নতির একমাত্র কারণ জ্ঞান।"[১]

"সিসেম ফাঁক": 'স্ত্রী শিক্ষা' শিরোণামে 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন সংখ্যায় ১ম বর্ষ, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে লেখিকা মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অগ্রহ লক্ষ্য করেছেন। তাই বিলম্ব হলেও সমাজের অর্ধেক নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পুরুষ সম্প্রদায় বাদ্য হয়েছেন। এ সম্পর্কে বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "চতুর্দিকে স্ত্রী শিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এখানে মুসলমান মহিলঅ সমিতি, সেখানে মহিলা ক্লাব প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান আমাদের শ্রুতিগোচর ও নগনগোচর হইতেছে। স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত ও অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই।"[২]

"চাষার দুক্ষু" প্রবন্ধটি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের ভাবনা শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল না তা পল্লীগ্রামেও ছড়িয়েন বেগম রোকেয়া বলেন, "পল্লী গ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র ঘুচিবে।"[৩]

"কাঠামুড কথা কয়" প্রবন্ধটি "বঙ্গলক্ষী" মাঘ ১৩৩২ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি সত্য ঘটনা। প্রতিকূল পরিপার্শ্বিকের বাধা অতিক্রম করে পর্দানশীল মুসলমান মহিলারা কিভাবে "অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের আলীগড়" অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন সেই কাহিনী। নারী শিক্ষায় নারীরা জাগরিত হয়ে উঠুক তাঁর অনেক দিনের আকাঙ্খার স্বপ্ন সার্থকরূপ নিয়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমে ।

"বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি" এটি লিখিত অভিভাষণ, কোন প্রবন্ধ নয়। এই নিবন্ধটি 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই অভিভাষণে বেগম রোকেয়া সাধারণভাবে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষার দুরবস্থা, স্ত্রী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের প্রতিকূল মনোভাব, মুসলমান প্রাণঘাতী অবরোধ প্রথা প্রতিহত প্রভাব সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।[৪]

---

১. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২০২
২. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২১১
৩. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২১৫
৪. মোতাহার হোসেন সূফী, প্রাগুক্ত, ২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

"রাণী ভিখারিনী" প্রবন্ধটি "মাসিক মোহাম্মদী" পত্রিকায় ১৩৩৪ পৌষ সংখ্যায় ১মবর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্মেই আবশ্যক। তাই তিনি লিখেছেন, "হিন্দু শাস্ত্র বলে, "স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।" আর আমাদের রসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, "তালাবুল ইলমি ফরীজাতুন, আলা কুল্লি মুসলিমীন ওয়া মুসলিমাতিন", অর্থাৎ (সমভাবে শিক্ষালাভ করা সমস্ত মুসলিম নরনারীর আবশ্য কর্তব্য। এখন হিন্দুগত অতি উদারভাবে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দান করিতেছেন। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন। এখন হিন্দু বালিকা চতুস্পাটী পাঠশালা, স্কুল, হাই স্কুল ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জয় করিযাছে। আর আমাদের সমাজ আমাদিগকে শিক্ষার আলো কিছুতেই দেখিতে দিবেন না।"[১]

তাই তিনি মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করানোর জন্য আহবান করেছেন। তিনি লিখেছেন, ৬০/৭০ বৎসর পূর্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরেজী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজী পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্তারা তাহার ফলভোগ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি, সার্মথ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগের দ্বারই মুসলমানদের জন্য অযোগ্যতার অজুহাতে রুদ্ধ হইয়া আছে। কলিকাতা করপোরেশনে শতকরা ৫০টি চাকুরী লাভের জন্য চেঁচামেচি করিয়অ মুসলমানগণ ভারতের নিকৃষ্ট শ্রেণীর (Depressed Class) তাহারা নিশ্চয়ই "অযোগ্য"। মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা সুযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা অযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি স্বাভাবিক। "অযোগ্য" বলার জন্য রাগ না করিয়া "যোগ্য" হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়।"[২]

"বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ" মূল প্রবন্ধটি উর্দু ভাষার রচিত। এটি "সওগাত" পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভদ্র সংখ্যায় ৭ম বর্ষে, ১ম সংখ্যায় প্রবন্ধটি অনুবাদ করে বেগম রোকেয়া প্রকাশ করেছেন। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য লেখিকা বেগম তরজীর বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। [৩]

'সুবেহ সাদেক' প্রবন্ধটি মোয়াজ্জিন' পত্রিকায় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে লেখিকা অনুধাবন করেছেন নারী জাগরণের সর্বপ্রধান অন্তরায় হল, শিক্ষাহীনতা। নারীকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ মাতা, আদর্শ গৃহিনী, আদর্শ ভগিনীরূপে তৈরী করতে হলে শিক্ষা অপরিহার্য। তাই তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। মানসিক ও শারীরিক উভয় দিকেই এ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি লিখেছেন, "শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমত্র মহৌষধ! শিক্ষা অর্থ আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি: গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিলে বা ছ'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়।

১. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২৩৩
২. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২৩৩
৩. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভের সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভাগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে। শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য, শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই, বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্তে নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে তাহাদের জীবন শুধু পতি দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্ন বস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়। শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোড়া খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। .... গর্ভনমেন্ট এখন শিশুর রক্ষা দিকে মনোযোগ দিয়াছেন, ভাল কথা কিন্তু প্রথমে মাতাকে রক্ষা করা চাই।"[১]

"৭০০ স্কুলের দেশে" প্রবন্ধটি "সওগাত" পত্রিকায় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখিকা ৭০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় গঠন করায় কি কি সমস্যা হয় তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই বঙ্গদেশে এমন একটি জেলা আছে, যেখানে একটি নয়, দুইটি নয়, সাতশত বিদ্যালয় আছে। সেই জেলার এক গ্রামের জমীদারের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার নিজ গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। বিদ্যালয় স্থাপন করা বরং সহজ কিন্তু তাহা পরিচালনা করা সহজ নহে: বিশেষত পর্দানশীল মেয়েদের স্কুল।"[২]

"ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম" প্রবন্ধটি মোহাম্মদী পত্রিকায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রোকেয়াত্র রচিত্র এ প্রবন্ধটি শিক্ষা বিষয়ক একটি বিশিষ্ট রচনা। বেগম রোকেয়া "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'টি মুসলিম মেয়েদের আদর্শ রমণীরূপে গড়ে তোলার জন্য স্থাপন করেছিলেন। স্বার্থসিদ্ধি লাভের জন্য নয়। স্বামীর স্মৃতির জন্যও নয়। নারী শিক্ষার জন্য তিনি সমালোচনা, নিন্দা ও কটাক্ষ হজম করেছিলেন।"[৩]

মুসলিম সমাজে নারীদের শিক্ষা গ্রহণের সুষ্ঠ কোন ব্যবস্থা না থাকায় জাতি কিভাবে তারা নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র হারিয়ে ফেলছিল এবং কিভাবে রুচির পরিবর্তন ঘটছিল তা বেগম রোকেয়া মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, "সে দিন Bengal women's Educational Conference' উপলক্ষ্যে জনৈক উচ্চশিক্ষিতা "মুসলমান ব্রাহ্ম" মহিলার সমাজে স্ত্রী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই তাঁর বাবা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে গিয়ে তাঁকে উচচ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা যেভাবে হয়েছে তাতে তিনি কোরান-হাদীস আলোচনা করবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং তিনি নিজেকে মোসলেম সমাজের উপযোগী করতে পারেন নাই। এরূপ একটি সুশিক্ষিত মহিলাকে তাঁর পিতামাতাএবং ভ্রাতাসহ মোসলেম সমাজ খরচের খাতায় লিখতে বাধ্য হল।

১. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২৪০
২. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২৪০
৩. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী শিক্ষার অভাবে আমাদের খরচের খাতা নানা প্রকারের খরচ লিখতে লিখতে ক্রমশঃ ভারি হয়ে চলছে। আমাদের সমাজে খরচের খাতা কিরূপ বেড়ে যাচ্ছে তার একটু আভাষ দিচ্ছি। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম যুবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে গ্রাজুয়েট পাত্রী না পেলে তাঁরা বিয়ে করবেন না। মোসলেম সমাজে যদি একান্তই গ্রাজুয়েট মেয়ে না পাওয়া যায় তবে তারা খ্রিষ্টান হয়ে যাবেন।........এসব বিকৃত রুচির প্রধান কারণ, ... বর্তমান ধর্মহীন শিক্ষা।"[১]

মুসলিম সমাজের বিকৃত রুচির জন্য লেখিকা স্পষ্ট দায়ি করেছেন ধর্মহীন শিক্ষা ও সঙ্গে আদর্শ ভ্রষ্টতাকে। এ সংশোধনের জন্য প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই তিনি লিখেছেন, "ফলকথা, উপরোক্ত দূরবস্থার একমাত্র ঔষধ একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়,...... সেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে।....... আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয় আদর্শ মোসলেম নারী গঠিত হবে, যাদের সন্তান-সন্ততি হবে হযরত ওমর ফারুক, হযরত ফাতেমা জোহরার মত। এর জন্য কুরআন শরীফ শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। কুরআন শরীফ অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।.. কুরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কুরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।"[২]

"পদ্মরাগ" উপন্যাসটি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি ২৮টির পরিচ্ছেদ রয়েছে। বেগম রোকেয়া রুচিবোধ, পরিশীলন ও মানসিকাত ও সুন্দর জীবন বিন্যাস ও শিক্ষার আদর্শকে স্পষ্ট করে তোলেন। তাঁর পদ্মরাগ উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সপ্তদশবর্ষীয়া বিধবা দীন তারিনী আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। আশ্রমের নাম হয় তারিনী ভবন। এ সম্পর্কে বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "তারিনী ভবনের শ্রীবৃদ্ধিতে হইয়া তিনি একটা বিদ্যালয় খুলিলেন এবং নারী ক্লেশ নিবরাণী সমিতি নামে একটি সভা গঠন করিলেন। তারিনী ভবনের বিরাট অট্টালিকার এক প্রান্তে বালিকা বিদ্যালয়। অপর প্রান্তে বিধবা আশ্রম। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে তৎসংলগ্ন একটা আতুর আশ্রমও স্থাপন করিতে হইল।"[৩]

তিনি তারিনী বিদ্যালয়ের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এভাবে, "বিদ্যালয় বিভাগে ব্রাহ্ম, হিন্দু, খ্রিষ্টান শিক্ষয়িত্রী ত ছিলেনই, ক্রমশ মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের ধর্মশিক্ষার জন্য দুই তিনজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করা হয়। কি সুন্দর সাম্য! মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান, সকলের যেন মাতৃ গর্ভজাত সহোদরার ন্যায় মিলিয়া-মিশিয়া কার্য করিতেছেন।"[৪]

---

১. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
২. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬-২৪৭
৩. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪
৪. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া নারী মুক্তির কথা বলেছেন, এ মুক্তির প্রথম শর্তই শিক্ষা। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট এবং সোচ্চার ছিলেন। এ শিক্ষাকে তিনি দু'ভাগে দেখতেন। একদিকে তিনি চাইতেন শিক্ষা যেন নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যোগ্য করে, অন্যদিকে এই শিক্ষা তাকে যথার্থ মানুষরূপে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। যথার্থ শিক্ষার অভাবই সমাজে অসৎ বিবেকহীন মানুষের ভীড় বাড়ায়। এভাবেই তার পদ্মরাগ উপন্যাস একদিকে বিবেকবান, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী, পর দুঃখকাতর মানুষ অন্যদিকে স্বার্থপর লোভী অসৎ কলহপ্রিয় মানুষ লক্ষ্য করা যায়।"[১]

তারিনী ভবনে ছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষা দান করা হত। এই বিদ্যালয়ে যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সঙ্গে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তারিনী ভবনের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে লেখিকা লিখেছেন, "সরকারি পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাভুক্ত কোন পুস্তক অধ্যয়ন করা হয় না। দেশের সুশিক্ষিত মহিলাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দীন তারিনী নিজেই পাঠ্য–পুস্তক নির্বাচন করেন। ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যারয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অংকশাস্ত্র সবই শিক্ষা দেয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন।......... নীতি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা সুগৃহিনী, সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের সহিত ভালোবাসিতে শিক্ষা দেয়া হয়।"[২]

১. রাশিদা জামান, বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ, সাহিত্য পত্রিকা, চল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন-১৪০৩
২. রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়ার শিক্ষাদর্শন:

বাঙালি মুসলমান নারীর অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি সংগ্রামের পথিকৃৎ, শিক্ষাবিস্তার সাধনার নিরলস তাপসকর্মী এবং মুক্তচিন্তায় উদ্বুদ্ধ সাহিত্যসেবী বেগম রোকেয়ার পরিচিত আক্রোশবিক্ষুব্ধ পরিবেশে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও তার পরিচালনার জন্যও। এই বিদ্যালয় ছিল তাঁর আদর্শ রূপায়ণের ব্যবহারিক কর্মক্ষেত্র। কারণ তিনি বেশ বুঝতেন যে, নারীর অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির ও তা বৃদ্ধির পূর্বশর্তই হচ্ছে নারীকে সুশিক্ষিত করে তোলা। তাই তিনি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সে ব্রত পালন করেছিলেন সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে। শুধু সুযোগ করে দেয়া নয়, নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় শিক্ষকতা করে এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকা পালন করে অবদান রেখেছেন শিক্ষা ব্যবস্থায়। বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম প্রশংসার সাথে মূল্যায়িত হয়েছে। নারী অধিকার ও তা আদায়ের পন্থা সম্পর্কিত বক্তব্য আজো সমাজকর্মীদের প্রেরণার উৎস, তাঁর শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসও শ্রদ্ধা পেয়েছে সুধীজনের। যিনি চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, পরিচালনা করেছেন বিদ্যালয় প্রশাসন, সাগ্রহে পাঠদান করেছেন শ্রেণিকক্ষে তাঁর নিজস্ব একটা শিক্ষাদর্শন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষাদর্শনের উপর তিনি কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। শিক্ষাদর্শন কী বা কাকে বলে? এ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা রয়েছে বেশকিছু দেশী-বিদেশী লেখায়। সেসব বক্তব্য পর্যালোচনা করলে যা বোঝা যায় তার সারসংক্ষেপ হল শিক্ষাদর্শন হচ্ছে কী শেখাব এবং যা শেখাব তা কেন শেখাব? সে সম্পর্কিত বক্তব্যের একটি সুসংহত রূপ। বেগম রোকেয়া শিক্ষা সংক্রান্ত বক্তব্যগুলোকে এদৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হবে।

তিনি সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যকে অযৌক্তিক বলেই বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে রকম সমকক্ষতা থাকা উচিত শিক্ষা ক্ষেত্রেও সেটাই প্রয়োজন।[১] তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বর ও মায়ের কাছে মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক নয়। যদি তাই হত তাহলে এই রকম বন্দোবস্তো স্বাভাবিক হত যে, ছেলে যেখানে দশ মাস মাতৃগর্ভে থাকবে মেয়ে সেখানে পাঁচ মাস থাকবে। ছেলের জন্য মায়ের স্তনে যতটা দুধ আসে মেয়ের জন্য তার অর্ধেক আসবে। কিন্তু প্রকৃতিতে তো সে রকম নিয়ম নেই।'[২]

বেগম রোকেয়া বলেছেন, 'প্রকৃত সুশিক্ষা চাই যাহাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত হয়।[৩] তাঁর মতে, সুশিক্ষার অভাবেই হৃদয়বৃত্তি সঙ্কুচিত হয়ে যায়।[৪] প্রকৃত শিক্ষা কাকে বলে সে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শিক্ষার অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের অন্ধ অনুকরণ নয় এবং সৃষ্টিকর্তা যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের মাধ্যমে বাড়িয়ে তোলাই শিক্ষা। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত যে ক্ষমতা বা গুণ রয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা তার কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা অন্যায়।[৫]

---

১. বেগম রোকেয়া-রচনাবলী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৪, পৃ. ২১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা যে অন্ধ অনুকরণ নয় একথা বলে বেগম রোকেয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। শিক্ষার অর্থ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের যে অন্ধ অনুকরণ নয় একথা বলে বেগম রোকেয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। শিক্ষা শুধু কোন জাতি বা সম্প্রদায় নয়, শিক্ষা কোন ব্যক্তিরও অন্ধ অনুকরণ হতে পারে না। অনুকরণই সেটা শেখা নয়। শিশুরা বড়দের অনুকরণ করে অনেক কিছু শেখে বটে কিন্তু সেটা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের শেখা। তাছাড়া সেও কেবলই অন্ধ অনুকরণ করে না। নিজস্ব বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে গ্রহণ ও বর্জন করে থাকে। মানুষ যদি কেবলই অন্ধ অনুকরণ করত, কোন নতুন সংযোজন না করতো তাহলে আজ সে গুহাবাসিই থেকে যেত, বিংশ শতাব্দির এই স্বর্ণালোকিত সভ্যতাকে সম্ভব করতে পারত না। মানুষের মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্য রয়েছে। প্রকৃতির প্রয়োজনেই এই গুণগত বিভিন্নতা। শক্তির বা গুণের এই বিভিন্নতা মানুষকে বিভিন্নমুখী কর্মসম্পাদনে সক্ষম করে। আর শিক্ষার অর্থই হচ্ছে এই শক্তি বা গুণের সুষ্ঠু উন্মেষণ। অন্য ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণ কোনো ব্যক্তির নিজস্ব গুণের উন্মেষণকে বাধাগ্রস্ত করে। ব্যক্তির বেলায় যা সত্য জাতির বেলায়ও তা সত্য। এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রেক্ষিত এক এক রকম। এক জাতির প্রেক্ষিত বিবেচনা করেই তা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তা না হলে কোনো জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির সঠিক উদ্বোধন হবে না। সুতরাং বেগম রোকেয়া যথার্থই বলেছেন, শিক্ষার অর্থ অন্ধ অনুকরণ নয়।

শুধু তাই নয়, বেগম রোকেয়া বলেছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা।[১] তাঁদের কাছে শিক্ষা শিশুর সহজাত ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের চেয়ে বেশি কিছু নয়।[২] অর্থাৎ তাঁরা সহজাত ক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্য মানুষের হস্তক্ষেপের বিরোধী এবং বাধাহীন বিকাশ ঘটতে বিকাশের ক্ষেত্রে অন্য মানুষের হস্তক্ষেপের বিরোধী এবং বাধাহীন বিকাশ ঘটতে দেয়ার পক্ষপাতী। অনুশীলন করার অর্থই হচ্ছে নিয়মিত চর্চা করা এবং শিশু নিয়ম আপনিই শেখে না, অভিজ্ঞজনের নির্দেশনাতেই শেখে।

রোকেয়ার কাছে শুধু পাস করা বিদ্যা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাঁর মতে, শুধু সনদলাভ করলেই মানুষ শিক্ষিত হয়না; জ্ঞান ও গুণের সদ্ব্যবহার করতে পারা, 'মস্তিষ্ক ও মন উন্নত' করতে পারাটাই হচ্ছে শিক্ষিত জনের মূল্যায়নের মাপকাঠি। এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বোধ হয় বলা যায় যে রোকেয়ার মতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে যে পরিণত মানুষ কেবল বংশগতিরও ফসল নয় অথবা কেবল পরিবেশেরও ফসল নয়, বরং এ দুয়ের মিলিত ফসল। সাম্প্রতিকালের বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের মস্তিষ্কের যে পরিমাণ কোষ রয়েছে আমরা এ পর্যন্ত তার অতি সামান্য অংশই ব্যবহার করতে পেরেছি এবং চর্চার মাধ্যমে সম্ভব। সুতরাং মস্তিষ্কের উন্নয়নকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে রোকেয়া তাঁর উন্নত বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছে।

---

১. বেগম রোকেয়া রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া বলেন, সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে যে হাত, পা, চোখ, কান, মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়েছেন, আমরা যদি সেগুলোকে সবল করি, হাত দিয়ে সৎ কাজ করি, চোখ দিয়ে কার্যকরভাবে প্রত্যক্ষ করি, কান দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে শুনি এবং চিন্তাশক্তি দিয়ে আরো সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে শিখি, তবে সেটাই প্রকৃত শিক্ষা।[১] মুখস্ত করা যে প্রকৃত শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে যথেষ্ট নয় সে কথা রোকেয়া বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেন, "তাহাদের বাকশক্তি কেবল আমাদের শিখান বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে।"[২]

অর্থাৎ তাঁর মতে, কেবল অন্যের বক্তব্য মুখস্ত করে উদগীরণের মাধ্যমে নয় বরং চোখ, কান এবং চিন্তাশক্তির যথা নিয়ম অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা সম্ভব।

বেগম রোকেয়া শিক্ষা বলতে প্রকৃত সুশিক্ষা বোঝেন এবং তাঁর মতে শুধু গোটা কতক বই পড়তে পারা বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়। তিনি চেয়েছেন সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদেরকে নাগরিক অধিকার অর্জন করতে সক্ষম করবে। এই শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক দুই রকমই হতে হবে।[৩] মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার আওতায় তিনি যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন এখনকার আলোচনা সেগুলো সম্বন্ধে। রোকেয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম বিজ্ঞান, সাহিত্য ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র এইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে নীতিবিজ্ঞান, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ না করিয়ে দেশ ও ধর্মকে অধিক ভালোবাসতে শিক্ষা দেয়া দরকার।[৪]

পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান পাঠের উপর রোকেয়া বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সৌরজগত' গল্পে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের কথাই বলেছেন প্রথমে।[৫] 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পটিতেও বিভিন্নভাবে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছেন এবং অল্প বয়স থেকেই যে এই পাঠ শুরু করা দরকার তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। রোকেয়ার বক্তব্য এখানে কিছুটা উদ্বৃত করা যায়। "তাহাদের আলোচ্য বিষয় ছিল বায়ু। বায়ুর শৈত্য, উষ্ণতা, লঘুত্ব, গুরুত্ব, বায়ুতে কত প্রকার গ্যাস আছে; কিরূপে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাস্প, মেঘ, সলিল এবং শীতল তুষারে পরিণত হয় ইত্যাদি।[৬] অন্য জায়গায় লিখেছেন, "অল্পকালের মধ্যে একটি যন্ত্র

---

১. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
৩. "শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটাকতক পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়।... শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই।... শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেয়া।" রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৪. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
৫. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
৬. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ করিলেন, তদ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়।[১] অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়গুলোর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গভীর অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। কারণ বিজ্ঞানের চর্চাই যে উন্নয়নের চাবিকাঠি সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিলনা। তাঁর এই মনোভাব তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন 'সুলতানার স্বপ্ন' গল্পে।

তিনি বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়ার সাথে সাথে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয় শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন। এছাড়া ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারটিকেও তিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।[২] মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরেজি ও অন্য কিছু ভাষা শেখাও যে আত্মোন্নয়নের পক্ষে উপকারী তিনি সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন।[৩] তিনি বুঝতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উভয় ধরণের জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সুষম হবে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন স্থানের পরিবেশ ও মানুষের জ্ঞান দানের উপর গুরত্ব দিয়েছেন। রোকেয়ার মতে, প্রকৃতি আমাদের ভোগের জন্য তার অক্ষয় ভান্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করে রেখেছে, আমাদের উচিত অতল জ্ঞানসাগরে ডুবে সেই রত্ন আহরণ করা। সুতরাং এজন্য যা কিছু দরকার তার সবই শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪]

মানসিক শিক্ষার মধ্যে আর যে দুটি বিষয়ের উপর রোকেয়া বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা। ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা নিয়মিত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না, ভালো চরিত্র গঠন কি কেবল ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব নাকি ধর্মেরও এতে ভূমিকা আছে, ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি সহযোগিতার হবে না বিরোধীর হবে ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাসে প্রচুর দ্বন্দ্ব ও তর্কবিতর্ক রয়েছে।[৫] রোকেয়ার মতে, ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁর মতে, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ নেই। (ধর্ম বলতে তিনি ইসলাম ধর্মকে বুঝিয়েছেন বলেই মনে হয়।) যথাসাধ্য জ্ঞানোন্মেষ ধর্মেরই এক অঙ্গ। বরং জ্ঞান ধর্মের প্রধান অঙ্গ।[৬] তাঁর মতে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কুরআন শিক্ষাদান করা সবচেয়ে বেশি দরকার। কারণ তাঁর মতে, আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুন্ন রাখার জন্য কুরআন শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য কুরআন শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখির মত আরবি শব্দ আবৃত্তি করানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর মতে, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কুরআনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, কেউ যেন মনে না করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন শিক্ষা দিতে বলে তিনি গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছে, কারণ গোঁড়ামি থেকে তিনি বহুদূরে। তাঁর মতে, আসলে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে যা কিছু শিক্ষা দেয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কুরআনে পাওয়া যায়।[৭] তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলাম 'অতি সুন্দর ধর্ম' এর

---

১. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫, ৯৭, ১১১, ১১৩
২. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬, ৯৭
৩. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭, ১১২, ১১৩, ১১৫
৪. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৫. J.S. Brubacher, A History of the problems of Education, NY-1947, P. 318
৬. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৭. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে 'অতি সুন্দর আচার প্রথা।' এগুলো সম্বন্ধে জানা এবং তা জীবনের কাজে লাগানোর জন্য কুরআন শরীফের শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।[১] তাঁর মতে, কুরআনের সর্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কুরআনের বিধান অনুযায়ী ধর্মকর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।[২] নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে যেসব গুণাবলীর উন্মেষ দেখতে চেয়েছেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সত্যবাদিতা, আত্মনির্ভরতা, সাহসিকতার প্রয়োজনীয়র কথা ও ভীরুতার কুফল সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন। 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন শিশুদেরকে বাড়ির কাজের লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার শেখানোর কথা। বেতনভোগী হলেও তারাও যে মানুষ তাও তিনি আমাদেরকে বুঝতে বলেছেন। আড়িপাতাও যে একটি নৈতিক অপরাধ তাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'লুকাইয়া কিছু শুনা উচিত নহে; সাবধান।''[৩]

অবসর বিনোদনের শিক্ষা ও তাঁর পাঠ্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেছেন অবসর সময়টা পরনিন্দায়, বৃথা কোন্দলে বা তাস খেলায় না কাটিয়ে নির্দোষ আমোদে কাটালে ভালো হয়। সেজন্য তিনি ছবি আঁকা ও সঙ্গীত শেখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।[৪] নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়গুলোও তাঁর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বেগম রোকেয়া বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে হাতের কাজেরও একটা বিশেষ স্থান দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে নানা রকম হাতের কাজ করানোকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি বরং সেই সব শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছেন। রোকেয়া মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেবল বইপড়া বিদ্যার উপর নির্ভর করাকে যথেষ্ট বলে মনে করেননি, বিভিন্ন রকম সৃজনশীল কর্মের সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। চারু ও কারুকলা শিক্ষাদানকে যে তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তা নয়, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের শ্রেণি সময় তালিকাতে এসব বিষয়ের জন্য সময় বরাদ্দ রেখে নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৫]

মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক শিক্ষাকেও রোকেয়া সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধি হওয়া চাই।" তাঁর মতে, দেহে স্ফূর্তি না থাকলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। শরীরে স্ফূর্তি আনতে হাত পা খাটানো অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। তিনি আরো বলেছেন শুধু ঘোরাফেরা করলেই ব্যায়াম হয় না। প্রতিদিন অন্তত আধঘন্টা দৌড়াদৌড়ি করা দরকার।[৬] শুধু তাই নয় শারীরিক শিক্ষার জন্য তিনি মেয়েদের

---

১. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধানভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং সব রকম ঘরের কাজ শেখাতে বলেছেন। তিনি শুধু লাপঝাঁপ, নাচ ইত্যাদির চেয়ে ঐ ধরণের শরীরচর্চা শতগুণে শ্রেয় বলেছেন। কারণ ঘরের শ্রমনির্ভর কাজগুলো করলে দু'তরফা লাভ হবে। কাজও হবে শরীরও ভালো থাকবে। তাছাড়া লাঠিখেলা ধরণের মাধ্যমে তো দুবৃত্তের হাত থেকে আত্মরক্ষার যোগ্যতাও কিছুটা অর্জন করা যায়। তিনি খেলা মাঠে প্রাতঃ ভ্রমণকেও বাঞ্চনীয় বলেছেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া বাস্তববাদী ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন বলেই মনে হয়। সাধারণভাবে তিনি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে না বুঝিয়া থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমি বুঝাইয়া বলি।"[১] তাঁর এই বক্তব্য থেকে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর মত বোঝা যায়। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা কেবল দাতার ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা কেবল গ্রহীতার হবে না বরং শিক্ষাদানের কাজ প্রশ্ন ও উত্তরের আদান-প্রদানের মাধ্যমে অগ্রসর হবে। রোকেয়া এক জায়গায় বলেছেন, "আমি কাল সকাল বেলা মেঘমালা দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রশ্ন করিব।২ তাঁর এই বক্তব্যে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ফুপে উঠেছে। বাস্তববাদীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। অর্থাৎ তাঁরা নিক্রিয় পঠনপাঠনের চেয়ে বাস্তববস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণকে জ্ঞান লাভের পন্থা হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেন।

কেবল পর্যবেক্ষণ নয়, শিক্ষা লাভের পদ্ধতি হিসেবে অনুসন্ধান, শ্রেণিকরণ ও পরীক্ষণের উপরেও রোকেয়া গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ভূগোল পাঠদানের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তিনি অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রয়োগ করার ইঙ্গিত দিয়েছে।[৩] আধুনিক বিজ্ঞানীরা জানেন প্রাপ্ত উপাত্তের শ্রেণিকরণ জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল ও বোধগম্য করার একটি অপরিহার্য পন্থা। রোকেয়াও এটি ব্যবহারের কথা বলেছেন।[৪] পরীক্ষণ ছাড়া বিজ্ঞান শেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পরীক্ষণের মাধ্যমেই শেখাতে চেয়েছেন। এইসব পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খেলার আনন্দও উপভোগ করবে বলে তিনি মনে করতেন। অর্থাৎ রোকেয়া চাইতেন আনন্দঘন পরিবেশে খেলার ছলে পরীক্ষণ করতে করতে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের সত্য বা মূলসূত্রগুলো শিখে নেবে।[৫] শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে পরীক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়ায় রোকেয়াকে প্রয়োগবাদীদের দলভুক্ত করা যায়। কেবল বইপত্রের উপর নির্ভরতার বদলে গল্পচ্ছলে শিক্ষা দেয়ার কথাও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[৬]

---

১. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

চার দেয়ালের বাইরে প্রকৃতির মাঝখানে না গেলে যে শিক্ষা সম্পূর্ণ ও কার্যকর হয় না সে ব্যাপারেও রোকেয়া সচেতন ছিলেন। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ বা বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সুযোগ করে দিয়ে প্রকৃতি পাঠ, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এভাবে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বিপদাপদ ও দূর্গমতাকে উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা উচিত বলেই তিনি মনে করতেন।[১] শুধু জ্ঞান বিজ্ঞান নয় রোকেয়ার মতে, ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যেও ভ্রমণের আবশ্যকতা রয়েছে। তাঁর মতে, ঈশ্বরের সৃষ্টি যত বেশি দেখা যায় ততই তাঁর প্রতি ভক্তি বাড়ে। চোখ-কান ঠিকমত ব্যবহার করে সৃষ্টি জগতের পরিচয় না নিয়ে স্রষ্টাকে ভালোভাবে চেনা যায় না।[২]

কুরআন শিক্ষাদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও রোকেয়া বাস্তববাদী। কুরআন শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কেউ যদি ডাক্তার ডেকে রোগের ব্যবস্থাপত্র নেয়, কিন্তু তাতে লেখা ঔষধপত্র ব্যবহার না করে সেই ব্যবস্থাপত্রটিকে মাদুলি করে গলায় পরে থাকে আর দৈনিক তিনবার করে পড়ে তাতে তো আর রোগ সারবেনা। আমরাও কুরআনে লেখা ব্যবস্থানুযায়ী কোন কাজ করিনা, শুধু তা পাখির মতো পড়ি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরে অত্যন্ত যত্নে উঁচু জায়গায় রাখি।[৩] তিনি এই অবস্থাকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার প্রকৃত পন্থা বলে মনে করেননি। তাঁর মতে উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে শ্লোকসমূহের অর্থ বলা ও তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া। এভাবে শিক্ষা না দিলে শিক্ষার্থীদেরকে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলার যোগ্য করে তৈরি করা যাবে বলে তিনি মনে করেননি। এ যোগ্যতার অভাবেই মানুষ অল্প আঘাতে বা প্ররোচণাতেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় বলেই তিনি মনে করেছেন। তিনি নামাজে ব্যবহৃত দোয়া কালামেরও অর্থ বুঝিয়ে শিক্ষা দেয়ার কথা বলেছেন।[৪]

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা বা আচরণ এবং যোগ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রোকেয়ার বক্তব্যে এ সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, শিক্ষকের ভূমিকা হবে আন্তরিকতাপূর্ণ, হাসি খুশি ও সহিষ্ণু, শাসন ও শৃঙ্খলা বিধানে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত এবং যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। রোকেয়ার মতে, শিক্ষকের থাকতে হবে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপক ও সমন্বিত জ্ঞান যাতে তিনি শিক্ষার্থীর (শিশু-কিশোর), প্রশ্নগুলোর সম্যক উত্তর দিতে পারেন। একটা সময় ছিল যখন শিক্ষা ছিল শিক্ষক কেন্দ্রিক, অর্থাৎ শিক্ষকের কাজকর্ম ও আচরণ ছিল পুরোপুরি কর্তৃত্বপূর্ণ। বেগম রোকেয়া যখন শিক্ষকের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন তখনও প্রায় সব বিদ্যালয় ঐ ধারাই বর্তমান। কিন্তু রোকেয়া তাঁর উন্নত মননের আলোকে একেবারে বিপরীতধর্মী ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। সাম্প্রতিককালের শিক্ষাদর্শনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলে।[৫]

শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় মানুষের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র হাতিয়ার যে শিক্ষা, এ সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিলনা। তাছাড়া কেবল তাত্ত্বিক শিক্ষা বা বইপড়া বিদ্যার যে কোন উপযোগিতা নেই এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি তত্ত্বের সাথে সে তত্ত্বের ব্যবহার সম্পর্কেও জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। শিক্ষা কাকে বলে এ বিষয়েও তিনি প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

---

১. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২, ১০৭, ১১০-১১২
২. বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮, ১৭৬, ১৯০, ৯৫, ১১১, ১০৪, ১০৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে বেগম রোকেয়ার অবদানঃ

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলিম সমাজে নারী অসূর্যম্পর্শা ও অন্ত:পুরবাসিনীর সার্বিক উন্নতি এবং নারী মুক্তির জন্য যেমন নিরলস কাজ করেছেন তেমনি নারী শিক্ষা বিস্তারও ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। তিনি ছিলেন নারী শিক্ষার অগ্রদূত। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বেগম রোকেয়া অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষার অভাবেই নারী জাতির অবনতি ও অধঃপতনের মূল কারণ। নারী মনে সচেতনতাও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হবে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। তাই মুসলিম নারী জাগরণের লক্ষ্যে রোকেয়া শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে ব্রতী হন। মুসলমান মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁর আগে কেউ কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বাঙালি মুসলমান সমাজে রোকেয়াই সর্বপ্রথম শিক্ষা বিস্তারের এই কর্মসূচিকে নারী মুক্তি ও প্রগতির বৃহত্তর অগ্রযাত্রা গ্রহণ করেন।[১]

সাখাওয়াত হোসেন অতিশয় উদার লোক ছিলেন। তিনি যেমনি জ্ঞানী তেমনি বিচক্ষণ ছিলেন। এদেশে স্ত্রী শিক্ষার খুব অভাব। তাই বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন, "সাখাওয়াত স্ত্রীর ভবিষ্যৎ অবলম্বনহীন জীবনের কথা মাঝে মাঝে চিন্তা করতেন। তিনি চাকরি জীবনে সত্তর হাজার টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি রোকেয়াকে পরামর্শ দিলেন। তাঁর অবর্তমানে তিনি যেন একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী জাতির শিক্ষা ব্যতিত সমাজ জীবন অসম্পূর্ণ এবং পঙ্গু রোকেয়া নিজেকে উৎসর্গ করবেন নারীর জ্ঞান চক্ষু উম্মিলনে। তিনি তাদের নিয়ে গড়ে তুলবেন একটি নতুন জগৎ। সঞ্চিত সত্তর হাজার টাকার মধ্যে তিনি যেন দশ হাজার টাকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় ব্যয় করেন।"[২]

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ১৯০৯ সালে ১লা অক্টোবর বেগম রোকেয়া ভাগলপুরে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। এ স্কুলটি স্থায়ী হয়নি। কারণ স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতার প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হন। তাদের দূর্ব্যবহারে তিনি অতিষ্ট হয়ে উঠেন। ফলে তিনি ১৯১০ সালে ৩রা ডিসেম্বর কলকাতায় চলে আসেন ও ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনে একটা বাড়ি নেন এবং এখানেই আটজন ছাত্রী নিয়ে ১৯১১ সালে ১৬ মার্চ তাঁর প্রথম মেয়েদের স্কুল পরিচালনা শুরু করেন। ১৯১১ সালে ২রা এপ্রিল মৌলভী সৈয়দ আহমদ আলীকে সেক্রেটারী করে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করেন।[৩]

এই স্কুলের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া বেশির ভাগ সময়, শক্তি ও উদ্যম নিবেদন করেন মুসলিম নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ।

---

১. মোরশেদ শফিউল হাসান, বেগম রোকেয়া, সময় ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১৯
২. বন্দে আলী মিয়া, বেগম রোকেয়া, ছোটদের জীবনী গ্রন্থ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ৯১
৩. শামসুন নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় কলকাতায় প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় নয়।[১] এ বিষয়ে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় উনবিংশ শতকে দ্বিতীয় দশক থেকে। 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাঙালি মেয়েদের জন্য 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র উদ্যোগে ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের মে-জুন মাস নাগাদ প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলিকাতার গৌরীবাড়িতে। এ বিদ্যালয়টি প্রথম নামকরণ করা জুভেনাইল সোসাইটির অধীনে আরো কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।২ এরপর ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্যামবাজার অঞ্চলে মুসলিম মহিলা কর্তৃক প্রায় ১৮টি বালিকা নিয়ে স্কুল স্থাপনের তথ্য পাওয়া যায়।[৩]

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ও লেডিজ সোসাইটি'র অধীনে কলিকাতায় অন্তত পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। গৌরমোহন বিদ্যালংকারের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে শুরুতে এবং এর তৃতীয় সংস্কারণ লেখেন ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে। এই পঞ্চাশটি বিদ্যালয়ে গড়ে ষোলজন ছাত্রী ছিল। আনুমানিক মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮০০ এর মত।[৪]

বিখ্যাত বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী'র মাতা সমাজকর্মী খুজিস্তা আখতার বানু 'সোহরাওয়ার্দী'র বালিকা বিদ্যালয়' ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপন করেন।[৫] ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় কুমিল্লা পশ্চিম গাঁও ফয়েজুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬] বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) নারী জাতির নিরক্ষরতাকে ভারতীয়দের দূর্বলতার একটি প্রদান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] সামাজিক কুসংস্কার, কুপ্রথা, কুরীতি নীতি ইত্যাদি ছিন্ন করে মুসলমান নারীদের ভেতর শিক্ষাবিস্তারের মহান উদ্দেশ্যে বেগম রোকেয়া সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন। বেগম রোকেয়া কর্তৃক বাঙালি মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের বহু পূর্ব হতে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা চলছিল; কিন্তু তা সমাজে সীমা ছিল নির্দিষ্ট পর্যায় এবং ব্যাপক রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বেগম রোকেয়াই এবং স্বীয় সমাজে নারীশিক্ষার পক্ষে শক্তিশালী জনমত তুলে ধরতে সক্ষম হন।

স্কুল প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৯১২ এপ্রিল থেকে মাসিক ৭১ টাকা সরকারি সাহায্য পেত, ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ সাহায্যের পরিমাণ অপরিবর্তীতে থাকে। বহু আবেদনের পর সরকারি সাহায্যের পরিমাণ বর্ধিত হয় ৪৪৮ টাকা। সে সময় স্কুলে মাসিক পৌঃপুনিক ব্যয় হতো ৬০০ টাকা।

---

১. শামসুল আলম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৯, পৃ. ১১৩
২. শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার স্ত্রী শিক্ষা-১৮০০-১৮৫৬ (কলিকাতা, বাং-১৩৫৭), পৃ. ৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-১০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৬. রূপ জালাল, আব্দুল কুদ্দুস সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ. ১৪
৭. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ১৮৩১-১৯৩০, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত ১৫২ টাকা প্রতি মাসে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল।[১] তা বুঝা যায় বোনকে লেকা এক পত্রে।

"আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমার কাসন্দ পেয়ে সুখী হয়েছি। বুয়া তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুলফাণ্ডে চার-পাঁচটা টাকা পাঠাতে তাতে আমি বেশি সুখী হতাম। এক ব্যক্তি সুদূর রেঙ্গুন থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন। গত মাসে ২৭ টাকা পাঠিয়েছিলেন। এবার ৬৯/৯০ পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার আপন লোক হয়ে স্কুলটাকে ভুলে যাক।"[২]

নওয়াব সৈয়দ শাসুল হুদা স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে আর্থিক সহায়তা দান ও সরকারি অনুদান সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া কলকাতার স্মল কজেসকোর্টের জজ আমিন আহমেদ ও জনৈক অবাঙালি জি.এম.কাসেমী ও উন্নয়ন কাজে আন্তরিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন।[৩]

কঠোর অবরোধবাসীনি হয়ে বেগম রোকেয়ার জীবন কেটেছে। তাঁর জীবনে স্কুলের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ কখনও হয়নি। কাজেই তিনি স্কুল পরিচালনার হাত দিয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই তিনি বলেছেন, "প্রথম যখন পাঁচটি মেয়ে নিয়ে স্কুল আরম্ভ করি তখন ভারী আশ্চর্য ঠেকিয়াছিল এই কথা যে, একই বিক্ষয়িত্রী কেমন করিয়া এক সঙ্গে একই সময়ে পাঁচটি মেয়েকে পড়াইতে পারেন।[৪]

রোকেয়া কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পর তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা জনগণকে জানানোর জন্য The Mussalman প্রত্রিকায় প্রকাশ করেন-

I intend to start a girl's school in Calcutta in strick obsenvare of Purda at an earliest opportunity posible, which is not only the crying need of the time but thee want of which, I belive, is keenly felt by all right thinking men and women. My beloved husband, the late Moulvie Sakhawat Hossain. B.A. of the provincial Executive service, has bequenthed RS. 10,000 for female education the income (RS. 6.00 annualy) of which is at my disposal. I am therefore not only ready to spend the amount but I shall rather be glad to personally conduct the school and I am prepared to devote my time, energy and whatever knowledge I possess, towards its furtherance.[৫]

তিনি জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িক করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন- Mohamedan gentle men desirous of helping me in my scheme are reguested to kindly communicate with me direct, while my Muslim

১. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
২. মোশফেকা মাহমুদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৬৫, ২১.৫.১৯ তারিখের পত্র, পৃ. ১১
৩. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৪. শামসুন নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, পৃ. ৩২
৫. The Mussalman, Vol-VVV, T.W. Falitio, Vol-VII, 5 March, 1931, No. 20, P. 7

Dhaka University Institutional Repository

sisters who wish to associate themeselves by their co-operative in the moment are invited in my house to discuss the subject or Ishall be glad to call on them should they inform me of their addresses.[১]

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লর্স স্কুল স্থাপনের কার্যাবলীকে স্বাগতম জানিয়ে 'দি মুসলমান' পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। স্কুল স্থাপনের অল্পদিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা নেমে আসে। স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট ১০,০০০/- টাকা প্রথমে একটি সাবওয়ারী ব্যাংকে রাখা হয় সেখান থেকে এনে পরে বার্মা ব্যাংকে রাখা হয়। বার্মা ব্যাংক ফেল হবার ফলে স্কুলে দশ হাজার টাকা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে সহকর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তৎকালীন সেক্রেটারী জনাব সৈয়দ আহমদ আলী এসময় বেগম রোকেয়াকে বলেন, "পরাজয় অবশেষে আসিল, একেবারে অপ্রত্যাশিত বিপদের মধ্য দিয়ে আসিল, ইহাই দুঃখ।"[২]

কিন্তু বেগম রোকেয়া এ বিপর্যয়কে সহজে মেনে নেননি। স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট টাকা ছাড়াও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল হতে প্রায় ৩০,০০০/- টাকা স্কুলের জন্য প্রদান করেন। এ স্কুলের পরিচালিকা হিসেবে তার একটি নির্দিষ্ট অংকের বেতন ছিল। সেই বেতনও তিনি স্কুলের কাজে ব্যয় করেছেন। তাঁর অসীম স্বার্থত্যাগের ফলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা লাভের সূত্রপাত হল।[৩]

অতঃপর বেগম রোকেয়া স্কুল পরিচালনার কাজ শুরু করলেন। রোকেয়া স্কুলের নিয়ম-কানুন ও বিবিধ বিষয়ে ছিলেন একেবারে অনভিজ্ঞ। তথাপিও তিনি নিরুৎসাহ হননি। তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্কুল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে নিজের সকল উদ্যম ও সময় নিবেদন করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতার সকল সমাজের অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ মহিলাদের সাথে মেলামেশা শুরু করেন। ক্রমে জ্ঞানপিপাসু বেগম রোকেয়া মিসেস পি.কে.রায়, মিসেস রাজকুমারী দাস প্রভৃতি শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মহিলাদের সহানুভূতির ফলে কলিকাতার বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান। এ সময়ে তিনি দিনের পর দিন স্কুলের ছাত্রীর মত প্রত্যেক নিয়মিতভাবে তিনি ব্রাহ্ম গালর্স স্কুল ও অন্যান্য স্কুলসমূহে যাতায়াত করেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা নিরীক্ষণ করে স্কুল পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।[৪]

এ বিষয়ে মিসেস. পি.কে. রায় বলেন, "When I first met her...I was busy with the work of the Brohmo girls school and she asked me if she could watch and find out the inner working of the school. She had herself started a girls school at that time and wanted to madel her school on efficient lines. She had not the advantage of a systematic education like the modern girls of the day but she was always keen to learn by watching and studying matters of importance connected with girls education.[৫]

---

১. Ibid. P.7
২. রোকেয়া জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৩. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪. শামসুন নাহার মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৫. তাহমিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের সূচনালগ্ন হতে ছাত্রী যোগার করা, ছাত্রীদের শিক্ষাদান থেকে শুর করে যাবতীয় সমস্ত কর্মকাণ্ড বেগম রোকেয়াকে একাই করতে হত।[১]

ছাত্রীদের অনেকেই লেখাপড়া করত বিনা বেতনে। কেউ কেউ পড়ত নামমাত্র বেতন দিয়ে। এ সমস্ত সুযোগ দান করেও ছাত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন মুসলিম পরিবারে গিয়ে অনুরোধ জানাতেন। যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া মওকুফ করা হত অনেক মেয়ের।[২] দু'একজন সহকারী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তী অবসর সময়ে উচ্চ শ্রেণির ছাত্রীরা নিম্ন শ্রেণিতে শিক্ষাদান করত; কারণ প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুল্যতার জন্য অপর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্রী নিয়োগ করা অসম্ভব ছিল। তাছাড়া উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবও ছিল। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বলেছেন, "বাহিরে না প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়াছি, ভেতরে যে শুধু ছাত্রীদিগকেই উপযুক্ত শিক্ষাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। স্কুলের জন্যে জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া,.... এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।"[৩]

ঢাকার পোস্তা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এম. ফাতেমা খানম'কে তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে যোগদান করার জন্য ডেকেছিলেন। রোকেয়ার ঢাকে এম. ফাতেমা খানম স্কুলে যোগদান করেন।[৪]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর সবাই ছিলেন দেশী খ্রিষ্টান। Anglo-Indian হিন্দু এবং অবাঙালি মুসলিম মহিলা, একমাত্র বাঙালি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন আমার খালাম্মা বেগম ফাতেমা খানম। হেড মিস্ট্রেজ ছিলেন মিসেস, সিনহা নামে একজন খ্রিষ্টান মহিলা। তিনি যথেষ্ট শিক্ষিতাও চটপটে ছিলেন।[৫]

স্কুলের প্রত্যেক বছরের বার্ষিক রিপোর্টে মুসলিম মহিলা শিক্ষয়িত্রীদের যথোপযুক্ত টেনিংয়ের ব্যবস্থার জন্য আবেদন করা হয়েছে। এর ফল স্বরূপ একটি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেন ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে।[৬] কলিকাতায় স্কুলের কাজ আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরে বেগম রোকেয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ভূপালের মহামান্য বেগম সুলতানা জাহান সাহেবার[৭] সহানুভূতি আকর্ষণ

---

১. রোকেয়া জীবনী, পৃ. ৪২
২. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, রোকেয়া পরিচিতি, সওগাত, (বৈশাখী বাং-১৩৮৫), পৃ. ৯৭
৩. রাকেয়ার জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৪. তাহমিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৫. আনোয়ার বাহার চৌধুরী, বেগম রোকেয়াকে যেমন দেখেছি, সংবাদ, ২৪ অগ্রায়ণ, (বাং-১৩৮৯), পৃ. ৪
৬. মাশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৭. বেগম সুলতানা জাহান পুরো নাম হার হাইনেস সুলতানা জাহান বেগম। তিনি একজন বিদূষী মহিলা ছিলেন। তিনি বহুকাল আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মাতা শাহজাহান বেগমের মৃত্যুর পর তিনি ভুপালের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর পুত্র হামীদুল্লাহ খানকে রাজ্যভার অর্পণ করেন এবং নারী কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি অনেক নারী কল্যাণ সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ শিল্পীও ছিলেন। (সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, বৈশাখী (১৩৩৬ বাং), পৃ. ৭২৭

Dhaka University Institutional Repository

করতে পেরেছিলেন।[১] বেগম রোকেয়ার সাধনা ও উচ্চ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হন সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরোজিনী নাইডু[২] ও বেগম সুলতানা জাহান।

ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত, বোম্বাই হতে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভূখণ্ডহতে কচিৎ এক একটি মহাপ্রাণ মানুষের দানের হস্ত একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বেগম রোকেয়ার সাহায্যের জন্য প্রসারিত হয়েছে। কচিৎ এক একজন অজ্ঞাতনামা মানুষ আগাগোড়া নিজের পরিচয় গোপন করে অযাচিতভাবে অন্তরাল হতে রাশি রাশি অর্থে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলকে পুষ্ট করেছেন, এমনও দৃষ্টান্ত দেখা যায়। একবার এক নববিবাহিত তরুণ-তরুণী তাদের বিবাহের সমস্ত যৌতুক, টাকা-পয়সা ও দ্রব্য সামগ্রী স্কুলের উন্নতির জন্য হাসিমুখে দান করেন।[৩]

সুদূর রেঙ্গুন হতেও চাঁদা পেয়েছে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।[৪] বেগম রোকেয়ার নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে অল্পদিনের মধ্যে স্কুলের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিশেষ করে ছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়ীর অভাবে স্কুলের উল্লেখযোগ্য উন্নতিতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল।[৫] স্কুল প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন মাস পর ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ ৬ জুন স্কুলের সেক্রেটারী সৈয়দ আহমদ আলী বলেছেন, "It will be noted with interest that the school, althought started only recently, is gaining in popularity as testified to by the steady increase in the number of girls belonging to respectable families attending the institution. I regret to observe that owing to the present inadequate arrangements regarding conveyance I am unable to cope with growing demand for admission to the school"[৬]

এই বাধা বিদূরীত করে নারী শিক্ষার গতিকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে জনগণের নিকট সাহায্য কামনা করা হয়। এ সম্পর্কে অবৈতনিক সেক্রেটারী জনাব সৈয়দ আহমদ আলী আবেদন করে বলেছেন, "The school is I am glad to say, making satistaetory progress due to the unremitting and unselfish labours of Mrs. R.S. Hossain. But owing to the want of an omnibus carriage and house the growth of the institution in being retarded the present mode of conveyance by hired carrige not being adequate meet the requirements. Will the generous public help us to purchase the necessary equipage? I have already some money in hand and a further sum to RS. 1200 is wanted for the purpose. I hope it is not too much to ask for so important a purpose viz. the promotin of female education."[৭]

---

১. রোকেয়া জীবনী, পৃ. ৩৭

২. সরোজিনী নাইডু, (১৮৭৯-১৯৪৯) ছিলেন একাধারে কবি, রাজনীতিক ও বাগ্মী। তাঁর আদি বাসস্থান ব্রাহ্মণগাঁও, ঢাকা। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি ইংল্যান্ডের কিংস কলেজ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্টন কলেজে পড়াশুনা করেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। ইংরেজি কবিতা রচনার জন্য তিনি প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল নামে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল হন এবং আমৃত্যু তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৩. রোকেয়া জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৪. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৫. তাহমিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৬. The Mussalman, Vol-V, June-9, 1911, No. 26, P. 7

Dhaka University Institutional Repository

১৮২ হ্যারিসন রোডের জনৈক ব্যবসায়ী মৌলভী আব্দুল বারী ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য প্রথম একটি ঘোড়া অনুদান করেন।[১] মাওলানা মুহাম্মদ আলীর কন্যারা এ স্কুলে অধ্যয়ন করতেন। তিনি প্রথম গাড়ী ফাণ্ডে ২৫ টাকা দান করেন। সরকার হতে এ বাবদে মাত্র ২৫ টাকা সাহায্য পাওয়া যায় এবং শীঘ্রই স্কুলের নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ী চালু করা হয়।[২] ফলে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, নিম্নের ছকটি তার প্রমাণ-৩

তারিখ	ছাত্রীর সংখ্যা
১৬ ই মার্চ ১৯১১	৮ জন
১৬ ই মার্চ ১৯১২	২৭ জন
১৬ ই মার্চ ১৯২৩	৩০ জন
১৬ ই মার্চ ১৯১৪	৩৯ জন

ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারি স্কুলের স্থান পরিবর্তন করে ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডে আনা হয়।[৪]

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে শুরুতে ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্তে মোটর বাস চালু করা হয় এবং ঐ বছর জুন মাসে দ্বিতীয় বাসের বন্দোবস্ত করা হয়।[৫]

স্কুল পরিচালনা করতে গিয়ে বেগম রোকেয়া তাঁর সংগ্রামী জীবনে আরও একটি প্রতিবন্ধকার সৃষ্টি হয়েছিল। বিভ্রান্তিকর পরিবহন সমস্যা সমাধানের জন্য স্কুলের বাসে ব্যবস্থা করেছেন রোকেয়া। কিন্তু এতে করে এ মহীয়সী নারীর জীবনে বিড়ম্বনা বৃদ্ধিই পেয়েছিল। একদল স্কুলের বাসকে অভিহিত করলেন Moving Black Hole বা 'চলন্ত অন্ধকূপ' বলে আর অন্যদল তুমুল হৈ চৈ শুরু করলেন বাসে ছাত্রীদের পর্দার খেলাফ হচ্ছে বলে।[৬]

তথাপিও বেগম রোকেয়া নির্ভীকতার সাথে ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। সাথে সাথে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি স্কুলের জন্য তৃতীয় মোটর গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হয়। ১৩/১, ওয়েলেসী স্কোয়ারের মিসেস, আব্দুল করিম এ গাড়ীর অর্ধেক মূল্য ৪৫০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭ জনে। সে রিপোর্টে বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "ছাত্রী সংখ্যা এই রকমই থাকবে, যতদিন পর্যন্ত আরো গাড়ীর বন্দোবস্ত না হয়।"[৭]

১. Ibid, Vol-V, November, 3, 1911, P. 7
২. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৬. শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৭. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, যানবাহন সমস্যা, এমনকি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাব ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক পরিশ্রম, সাধনা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে স্কুল শুরুর কয়েক বছরের মধ্যে স্কুলের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৫ই মার্চ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্কুলের উন্নতির জন্য প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান অঞ্চলের স্কুল প্রদর্শিকা মিস.এস.বোস তাঁর ভাষণে বলেন, "It (Sakhawat Memorial Girl's School) was started in a very small house at Waliullah lane with only 8 girls on the roll. When I first visited it. It could hardly be called a school but now I am glad to notice the gardual development and rapid progress it had made in the course of only six years."[১]

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর ছাত্রীদের জন্য চতুর্থ গাড়ী ক্রয় করা হয়। এ সম্পর্কে বেগম রোকেয়া জানিয়েছেন, "উল্লেখযোগ্য যে, সাড়ে চার বছর পর আবার এই প্রথম ৫৫০ টাকা সরকারি সাহায্য পাওয়া গেল যদিও ইতোমধ্যে আমাদের বহু আসবাবপত্র ক্রয় ও অন্যান্য খাতেও যথেষ্ট ব্য বহন করতে হয়েছে।"[২]

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্চম গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হয়। যানবাহনের অসুবিধা ও স্থানাভাবের কারণে স্কুলের ছাত্রীদের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছিল। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চের শুরুতে স্কুলে খুব কর্ম ক্লাস ছিল। ১৯১৫ সালে পাঁচটি ক্লাস নিয়ে উচ্চ প্রাইমারীতে পৌঁছেও ১৯১৭ সালের মধ্যে ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এভাবে চলে। ১৯২৭ এর শুরুতে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার আগ্রহেও বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় ৭টি মেয়ে নিয়ে ফোর্থ ক্লাস খোলা হয় এবং প্রত্যেক বছর একটি করে ক্লাস বাড়ানো হয়। সর্বসাধারণের জ্ঞান করার জন্য The Mussalman পত্রিকায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি বহুবার প্রকাশ করা হয়।[৩]

SAKHAWAT MEMORIAL GIRL'S HIGH ENGLISH SCHOOL
WANTED

Muslim girl students for 4th . 3rd and 2nd classes. The school outhorities have secureda B.T. and a Muslim graduate for teaching the higher classes. The students may take persian. Urdu or Bengali as their second language. English Urdu and Bengali are heing regularly.

M. ASHRAF AII
Honey Secretar
Sakhawat Memorial Girls High School

১. The Mussalman, Vol-IX, March-23, 1917, No. 7, P. 5
২. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩. The Mussalman, Vol-XXII, T.W. Edition, Vol-IV, September 20, 1928, No. 108, P. 6

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে ছোট মেয়েদের সুবিধার্থে কিন্ডার গার্টেন ক্লাসগুলো খোলা হয়। ১৯৩১ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল থেকে প্রথম তিনজন ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। The Mussalman পত্রিকায় উচ্চতর শ্রেণিতে ভর্তির আহ্বান জানিয়ে উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।১

SAKHAWAT MEMORIAL GIRL'S HIGH ENGLISH SCHOOL WANTED

Day scholars for higher classess i.e. from class V to Class X for the new session which begins from 1st January 1932. The medium of instruction will be either Bengali or Urdu according to wishes of the guardians there are 2 B.T. Passed teachers for the higher classes.

Apply to the Honey, secretary Sakhawat Memorial Girls School. 86/A, Lower Circular Road, Calcutta.

বেগম রোকেয়া বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানের গভীরতায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারিনী অনেকের চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন, তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিনী নন বলে স্কুলের কাজকর্মে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হত। তাই তিনি অপেক্ষা করে বলেছেন, "আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা নই। গাধার খাটুনিই আমি খাটি। আধুনিককালের উপাধিধারিনীর শিক্ষয়িত্রীদের দেখিয়াই কর্তৃপক্ষ স্কুলের ভালোমন্দ বিচার করেন।"২

স্কুলের কাজে হাত দিয়ে বেগম রোকেয়া কখনও নিরুৎসাহিত হয়ে যাননি। এ স্কুলের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তিনি সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে অবিচলভাবে এগিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনের মূলসূত্র ছিল দেশের প্রত্যেকটি হতভাগ্য নারীকে জ্ঞানের পক্ষে উদ্ভাসিত হউক।

---

১. The Mussalman, Vol-XXVI, T.W. Edition, Vol-February, 16, 1932, P. 1

২. রোকেয়া জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সাখাওয়াত মেমোরিয়া গার্লস স্কুলটিকে তিনি একটি প্রথম শ্রেণির বালিকা বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন যার জন্য তিনি সারা জীবন সাধনা করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি স্কুলে মেয়েদের জন্য ব্যায়ম চর্চা, চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। স্কুলের ছাত্রীদের তিনি আপন সন্তানের মত দেখতেন এবং পড়াশুনা ব্যতীতও ছাত্রীদের অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধার দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনা ব্যয়ে ঔষধ দেবার জন্য পুরুষ ডাক্তার নিযুক্ত করেন। আপত্তি উঠিল মিসেস হোসেন মুসলমান মেয়েদের পর্দা নষ্ট না করিয়া ছাড়িলেন না।[১] সর্বদিক বিচার করে অবশেষে উচ্চ দরে তিনি মিস কোহেন নামক একজন মহিলা ডাক্তার নিযুক্ত করেন।

সমাজের কটুক্তির মুখে তিনি কখনও নিজ কর্তব্যে অবহেলা করেননি। ছাত্রীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উভয় দিকে নজর রেখেছিলেন। স্কুলটি ছিল রোকেয়ার প্রাণস্বরূপ। স্কুলের প্রতিটি মেয়ে যাতে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতেন। এজন্য তিনি নিজেও পড়াশুনা করতেন। প্রতি সপ্তাহে তিনি মিসেস রাজকুমারী দাস মি. রেজাউল করিমের কাছে অধ্যয়ন করতেন।[২]

শুরুতে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' এ উর্দুতে ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়া হত। তবে সে সময় বাংলা বিষয়ের একটি ক্লাস চালু ছিল।[৩] বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাংলা বিভাগে চালু রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার প্রধান কারণ হল, বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব, বাংলা শিক্ষয়িত্রীর অভাব, সর্বোপরি বাংলার ছাত্রীর অভাব। বেগম রোকেয়া এ সম্পর্কে বলেছেন, "It seems to me that even those Bengali speaking Mohamedan families that are residing in Calcutta, do not quite appreciate the advantage of school education for their girls. From the experience I have gained during these 7 years. I have noticed that Urdu speaking people are more keen on sending their to school and that Bengali speaking families are less enterprising in this respect."[৪]

বাংলা ছাত্রী'র অপর্যাপ্ততার জন্য বাংলা বিভাগ বন্ধ করে দেন ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে। এরপর ধীরে ধীরে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে বাংলা বিভাগ চালু করার অনুরোধ জানান। এর ফলে ত্রিশ দশক শুরু হবার কিছু পূর্বে এ স্কুলে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা চালু করা হয়। স্কুলের উন্নতির সাথে সাথে মাসিক খরচও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারি সাহায্যের হারও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ১৯১৪ থেকে ১৯২৫ এ দীর্ঘ ১১ বছর পর্যন্ত ৪৪৮ টাকা সাহায্য পেয়ে আসছিল। কেবলমাত্র ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা দান ক্লাসের জন্য মাসিক ১৫ টাকা বাড়তি সরকারি সাহায্য করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৭৫০ টাকা সাহায্য পেয়েছে।

১. ফকির আহমেদ, রোকেয়া জীবনী, সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, (বাংলা ১৩৩৯), পৃ. ২৭১
২. রোকেয়া জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৩. The Mussalman, Vol-IX, 23 March, 1917, No. 17, P.5
4. Ibid, Vol-XI, 30 November, 1917, No. 50, P.5

Dhaka University Institutional Repository

প্রাদেশিক রাজস্ব খাতে দেখা যায় যে, কলিকাতাতেই অনেকগুলো অমুসলিম বালিকা বিদ্যালয় ৮০০ টাকা থেকে ১১০০ টাকা পর্যন্ত বাঁধাধরা সরকারি সাহায্য পেয়ে থাকে এবং অন্যান্য সাহায্য বাবদ সাখাওয়াত স্কুলের এই জীবনকালের চেয়ে কম সময় নানা খরচ বাবদ লাখ টাকাও দেয়া হয়। কিন্তু সরকারি মুসলমান বালিকাদের শিক্ষা খাতে যেন ন্যায় সঙ্গত ও ন্যায্য অনুদান প্রদান করা হয়নি।[১]

স্কুলটি ছিল তার স্বপ্ন। এ স্কুল নিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এমনকি বেগম রোকেয়া জীবনের সায়াহ্নে এসেও স্কুলের উন্নতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করে গেছেন। ছাত্রীদিগকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে শেষ পর্যন্ত নিরলসভাবে পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে'র ছাত্রীদের ফলাফল সন্তোষজনক ছিল। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এই স্কুলে কলিকাতা বালিকা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতি বছর বেশ কয়জন ছাত্রী বৃত্তি লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতায় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে সাবিরা খাতুন এই স্কুল থেকে বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে বঙ্গীয় বালিকা শিক্ষা পরিষদে যে পরীক্ষা গ্রহণের সূত্রপাত হয়েছে, তাতে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে'র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে এবং তাতে তাদের ফলাফল বরাবর সন্তোষজনক ছিল।[২]

মুসলমান সমাজে বালিকাদের শিক্ষাদানের স্কুলটি মুসলিম নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। The Mussalman সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়- ".... The school is doing most useful work for the Muslim community."[৩]

বেগম রোকেয়া দু'দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, অত্যাচারিত, নির্যাতিত নারী সমাজের মুক্তির পথ হল একমাত্র শিক্ষা।

শিক্ষা জাতিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারে, তাই স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা নির্দেশ করে রোকেয়া বলেছেন- "We are education prospective parents and if education is ellective it has a culmulative effect thoughout succeeding generation. It is particularly important that Girls should receive a good education becouse they will be mothers of the next generations.[৪]

---

১. The Mussalman, Vol-XXVI, T.W. Edition, Vol-VIII, 14 January, 1932, No. 6, P.4
২. Ibid, Vol-XI, 23 March, 1917, No. 17, P. 5
৩. Ibid, Vol-XXVI, T.W. Edition, Vol-VIII, 8 March, 1932, No. 27, P. 6
৪. A.R.M. Nilam, Education of Muslim Girls, Lahore-1916, P. 9

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন নামক সমিতি গঠন করেন যা নারী জাতির সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক ও আইনগত অধিকার প্রদান করা হয়। বেগম রোকেয়া প্রবল আন্ত রিকতা নিয়ে বস্তিতে অবহেলিত নারী ও শিশুর কল্যাণ যোজন করেছেন। নিরক্ষর মুসলিম নারী সমাজের সুপ্ত চেতনায়, রোকেয়া অসীম ধৈর্যের সঙ্গে এভাবেই পৌঁছে দিয়েছেন জাগরণের অভয় মন্ত্র।

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে রোকেয়ার অবদানের করা স্বীকার করে সওগাত পত্রিকায় সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন বলেছেন, "সেই যুগে বেগম রোকেয়া পর্দার অন্তরালে থেকেই নারী শিক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেয়েদের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে তিনি উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।"[১]

মোরশেদ সফিউল হাসান নারী শিক্ষায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব মূল্যায়ন করে বলেন, ... রোকেয়অর প্রধান কৃতিত্ব এই নয় যে, তিনি বাংলাদেশে মুসলমানদের মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেননা এ কাজটি এর আগেও কারো কারো দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, তাদের মধ্যে অন্তত চারজন ছিলেন মহিলা। ...রোকেয়অর জীবন ও কৃতিত্ব আলোচনায় সাখাওয়াত মেমোরিয়অলের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। তবে তা অন্য কারণে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নারী জাগরণ ও প্রগতির ক্ষেত্রে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের অনেকেই ছিলেন রোকেয়অ পরিচালিত এ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও রোকেয়অর জীবন ব্যাপী স্বপ্ন ও সাধনার মূর্তরূপ হলো এ বিদ্যালয়। কর্মী রোকেয়ার, শিক্ষাব্রতী রোকেয়ার, সমাজ সংস্কার রোকেয়া, সৈনিক রোকেয়াকে চিনতে হলে সাখাওয়াতে মেমোরিয়অল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালিকা রোকেয়া বুঝতে হবে।"[২]

সওগাত এর মহিলা সংখ্যায় সমসাময়িক বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের অনেকের ছবি ছাপা হলেও রোকেয়া তাঁর ছবি ছাপাতে দিতে চাননি তাও স্কুলের কারণেই রোকেয়া সম্পাদক সাহেবকে বলেছিলেন, "আমার স্কুলটা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি সমাজের অযৌক্তিক নিয়ম-কানুনগুলিও পালন করছি।... স্কুলের জন্য আমি সমাজের সব অবিচার, অত্যাচার সহ্য করে চলেছি। আপনি মহিলা সওগাতের জন্য আমার ছবি চেয়েছিলেন, এসব কারণেই দিতে পারিনি।"[৩]
বেগম রোকেয়া বাঙালী মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হন এবং আমৃত্যু বিরামহীনভাবে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর এই সুদীর্ঘকারের অধ্যবসায় সফতার নিদর্শনের কথা নিজেই পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়েছেণ, স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই। তাই তাঁহারা আর শুধু ভ্রাতৃসমাজ লইয়াই ব্যস্ত নহেন। চতুর্দিকে স্ত্রী শিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।"[৪]

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ.১১৪, পরিশিষ্ট-৬
২. মোরশেদ সফিউল হাসান, বেগম রোকেয়াঃ সময় ও সাহিত্য বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২, পৃ. ১৪-১৫
৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, বেগম রোকেয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩, পৃ.১১৭
৪. মিসেস, আর.এস. হোসেন, সিসেম ফাঁক, সওগাত, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ন-১৩২৫ (বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

রোকেয়অর মৃত্যুঃ

রোকেয়া জীবন চক্রের আবর্তনে ক্রমশ তাঁর শরীর ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়েছিল। মৃত্যুর বছর খানেক আগে থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাছাড়া পেটের অসুখ ও কিডনীর গোলমালও দেখা যায়। অন্তিম লগ্নের কিছুদিন পূর্বে তাঁর প্রিয়তমা ছাত্রীকে করুণভাবে লিখেছেন, "মা, সময় বুঝি হইয়া আসিল। মরণের বোধ হয় আরবেশী দেরী নাই। আল্লাহর রহমতে জীবনের সকল আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হইয়াছে। এইবার ছুটি নিতে ইচছা হয়। সত্য সত্যই জীবনের কন্দুকুসুম যেদিন ঝরিয়া পড়িবে সেদিন আমার শেষ বিশ্রাম স্থান রচনা করিও আমার প্রাণের এই তাজমহলের একপাশে কবরে শুইয়অও যেন আমি মেয়েদের কলকোলাহল শুনিতে পাই।"[১]

ইন্তিকালের কয়েক ঘন্টা আগেও ৮ই ডিসেম্বর রাতে ২২টা পর্যন্ত বেগম রোকেয়া লেখাপড়া করেছিলেন। তাঁর লেখার সর্বশেষ বিষয় ছিল "নারী অধিকার"[২] এরপর নিয়মিতভাবে শেষ রাত ৪ টায় তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করার জন্য অজু করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ্য বোধ করেন। রোকেয়ার শেষ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর চাচাতো বোন মরিয়ম রশীদ ও ছোটবোন হোমায়রা।[৩]

ডাক্তারের কাছে খবর পাঠানোর পূর্বেই রোকেয়া পরম শান্তিতে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। তখন সময় ছিল ভোর পাচটা ত্রিশ মিনিট ৯ই ডিসেম্বর১৯৩২ সাল। বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর খবর প্রচার হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাড়ীপূর্ণ হয়ে গেল জনগণে।৪

কাইসার স্ট্রীটে বিখ্যাত বুআলী কলন্দর মসজিদ প্রাঙ্গণে বেগম রোকেয়ার নামাজের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। যারা রোকেয়অর নামাজে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন জনাব এ.কে. ফজলুল হক, স্যার আব্দুল করিম গজনভী, অনারেবল, নবাব কে.জি.এম ফারুকী, অনারেবল খাজা নাজিমুদ্দিন, কে.বি. তোসাদ্দক আহম্মেদ, কে.বি. তোফাজ্জল আহম্মেদ জনাব আমিন আহমদ, ড. আর আহমদ, মৌলভী আব্দুর রহমান, জানাব রেজাউর রহমান, নবাবজাদা কামরুদ্দীন হায়দার এবং মৌলভী মজিবুর রহমান অন্যতম। জানাযার পর রুহুমার মরদেহ সৌদপুরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তথায় রোকেয়ার আত্মীয়দের গোরস্থানে সমাধিস্ত করা হয়।[৫]

১০ই ডিসেম্বর কলিকাতার বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে অতি গুরুত্বের সাথে রোকেয়ার মৃত্যুর শোক সংবাদ পরিবেশন করা হয় এবং তাঁর জীবন চিত্র তুলে ধর হয়। [৬] এ.কে. জফলুল হকেব ভাষায় যেন সত্যি উচ্চারিত হয়েছেন, "She was one of those gifted people who raised their own memorial by their own hands in their own life time.[7]

১. ছৈয়দা রোকেয়া সুলতান, অন্ধকার যুগে আলো-রোকেয়া, সওগাত, মহিলা সংখ্যা, অগ্রাস, ১৩৫২, পৃ.১০৯.
২. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, ২৯
৩. মোশফেকা মাহমুদ, প্রাগুক্ত, ২৯
৪. মোশফেকা মাহমুদ,
৫. The musslman, Vol-XXVI: Dily Edition Vol-41, 1 Decembr
৬. The Muslman. Amrita Bazar, Patrika, Teh Statesman, Advance, প্রভৃতি পত্রিকার ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩২.
৭. A.K. Fazlul Haq's Speech, The Amrita Bazar Patrika, 15 December, 1932.

Dhaka University Institutional Repository

The Amirta Bazar Patrika ১০ই ডিসেম্বর শুক্রবার বেগম রোকেয়ার শোক সংবাদ পরিবেশ করেন। পত্রিকা লিখেছে, "Mrs. R.S. Hossain, the well known exponet of female education and foundress of sakhawat memorial Girl's High English School. The only one institution of its kind for Muslims girls in the whole province. Passed away peacefully at 5.30 a.m. on Friday morning in the premises of the school. A pioner among the very few muslims ladies, she had devoted her life and all her resources to the cause of female education."[১]

The Statesman পত্রিকা রোকেয়া সম্পর্কে, " "She devoted her life and all her resources to the cause of education for girls founding the sakhawat school in 1911"[২]

The Mussalman পত্রিকার সম্পাদকীয়তে "In her works she delineated a vivid ficture of the social tyrannies to which women, especially muslim women are subjected, she was, as it were, growing, under those tyrannies. Her greatest achievement is, of course, the sakhawat memorial girls school. No muslim women in Bengali in not in india, has done so much for the spread of female education among the Mussalmans as Mrs. Hossain has done, Her whole life was sacrificed for the cause and she died in hamess."[3]

বেগম রোকেয়া মৃত্যুতে বাংলার গভর্ণর John Anderson স্যার এ,কে গজনভীর নামে প্রেরিত শোকবার্তায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য মহান ত্যাগ ও বলিষ্ঠ নীতির প্রশংসা করেন এবং করিকাতার কর্পোরেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শোকাবার্তা প্রেরণ করেন।[৪]

---

১. The Amrita Bazar, Saturay, 10 December, 1932
২. The Amrita Bazar, Saturay, 10 December, 1932
৩. The Musslman, 10 December, 1932
৪. মাসিক মোহাম্মদী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৯৩৯, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৯৯৪-১৯৭৫) :

নূরন্নেছা খাতুন ১৯৯৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেরার শাহপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ পীর শাহ হাহেবের বংশোদ্ভূত খোন্দকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পীর সাহেব ভারতের বাইরের দেশ থেকে এদেশে আগমন করেছেণ বরে মনে হয়, পুর্বপুরুষের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে মুর্শিদাবাদের যে অঞ্চলে তাঁর জন্ম তা 'সালার' নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি নানা কারণে প্রসিদ্ধ। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীও (১৮৯২-১৯৬৩) সালার অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। নূরন্নেছা খাতুনের পিতা খোন্দকার হাবিবুস সোবহান সরকারি চাকুরে ছিলেন।[১] মা সাদিকাতুন্নেসা। তিনি ভাই, লেখালেখির অভ্যাস তাঁদের কারও কারও ছিল; এক ভাই ছিলেন সাংবাদিক, চট্টগ্রমে থাকতেন: আর একজন খোন্দকার রকিবুস সুলতান, তাঁর দু'টি কবিতার বুই ছাপা হয়েছিল।[২] বই দুৎটির নাম 'স্রোতের আগে' ও 'সাগর সৈকত'। পাঁচ বোনের মধ্যে নূরন্নেছা খাতুন ছিলেন তৃতীয়।

একদিকে পীরবংশ অন্যদিকে সম্ভ্রান্তির প্রভাবের ফলে পরিবারের মেয়েরা কড়া পর্দার মধ্যেই থাকতেন। সমসাময়িক ধনী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবরের মেয়েদের জন্য এই ধরনের পর্দা সাধারণ ব্যাপার ছিল।[৩] কঠোর অবরোধ প্রথার মধ্যে নূরুন্নেছা খাতুনের বাল্যকাল কেটেছে। তাঁর প্রথম জীবনের অবরোধ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'প্রাচীন ভদ্রবংশীয় মোসলমান আয়মাদার কন্যা বিধায়ে এবং কঠিন পর্দ্দবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা খুবই কম। বলিতে কি, পিত্রালয়ে অবস্থানকালে অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইবার পর, চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অন্দর ও মস্ত কোপরি চন্দ্রতারকা খচিত নীল চন্দাতপ ভিন্ন কোনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার নয়ন পথের পথিক নয় নাই"

এ কারণে তাঁর পক্ষে তৎকালে প্রচলিত স্কুল-কলেজের রীতিবদ্ধ পাঠ সমাপন করা সম্ভব হয়নি। বরং সেদিনের মুসলমান অভিজাত পরিবারের ন্যায় পারিবারিক জীবনের গন্ডিতেই তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। এসম্পর্কে তিনি তার উপন্যাসের 'নিবেদন' এ বলেছেন, "জীবনে কখনও পাঠাগারের বেঞ্চে বসার আস্বাদ পাই নাই। কখনও কোন শিক্ষকের নিকট পাঠার্থে বই খুলিয়ে বসি নাই। আপন কৌতূহল নিবারণার্থে আপনা আপনি সামান্য ক, ব, ঠ শিখিয়অ দু'চারিখানা বই হাতে করিয়াছি মাত্র।"[৫]

---

১. রশীদ আল ফারুকী, নূরেন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ.১৯-২০
২. শাহীন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, জানালা মহফিল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৯১
৩. মজির উদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৬৭, পৃ. ৭২-৭৩
৪. রশীদ আল-ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, ২১

Dhaka University Institutional Repository

এইরূপ অবরোধের মধ্যে মানুষ হয়ে সতের কি আঠার বৎসর বয়সে শ্রীরামপুর (হুগলী) নিবাসী কাজী গোলাম মোহাম্মাদের সঙ্গে তিনি পরিনীতা হন। কাজী গোলাম মোহাম্মদ এর জন্ম হয় চব্বিশ পরগণা জেলার আনোয়ারপুর পরগণাধীন কাজীপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল কাজী গোলাম সোবহান।

কাজী গোলাম মোহাম্মদ কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তিনি ছাত্র জীবন শেষ করে হুগলী শ্রীরামপুরে মোক্তার হিসেবে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ফলে এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[১]

শিক্ষা-দীক্ষার পতি কাজী গোলাম মোহাম্মদের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি ছিলেন একজন সার্থক আইন ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিমনা উদার পুরুষ। সমসাময়িককালের রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। নূরন্নেছা খাতুনকে স্ত্রী হিসেবে এনে তিনি তাঁর প্রতিভা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সে প্রতিভা বিকাশের সর্বাঙ্গীণ আনুকূল্য দান করেছিলেন। স্বামীর সাহচর্যে নুরন্নেছা বাংলা এবং পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। স্ত্রীর জ্ঞানপিপাসা লক্ষ করে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাদি এনে তাঁকে পড়তে দিতেন।[২]

কাজী গোলাম মোহাম্মদের ভ্রমণের উৎসাহ ছিল। তিনি সুযোগ পেলেই ভ্রমণে বের হতেন এবং তাঁর সঙ্গে নূরন্নেছা খাতুনকে নিয়ে যেতেন। এখান তিনি অবরোধের বেড়া অতিক্রম করেন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের সুযোগ পান। প্রকৃতপক্ষে এই ভ্রমণ স্পৃহাই তাঁকে পরবর্তীকালে একজন ইতিহাস সচেতন ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল, "স্বামীর দেশ পর্যটনটা ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা স্বাভাবগত হইয়া পড়ায় বিবাহের বৎসর অর্থ্যা ১৩১৯সাল হইতে আমিও জেলের কোমরের হাড়ির ন্যায় তাহার পশ্চাৎ এদেশ ও ওদেশ যাইতে আরম্ভ করিরাম এবঙ তজ্জন্যই কঠিন (Strict) পর্দা ক্রমশ; আপনা আপনিই একটু শিথিল ভাবাপন্ন হইয়া আসিল।"[৩]

স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণের এই সুযোগ ও আকাঙ্খাকেই তিনি তার সাহিত্যচর্চার মূল প্রেরণা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, "এই হইতেই আমা সামান্য অভিজ্ঞতা এবং এই যৎসামান্য অভিজ্ঞতা মূলেই আমার পুস্তিকা রচনার প্রয়াস বা ঘোর পাগলামী।"[৪]

কাজী গোলাম মোহাম্মাদের ঔরসে এবং নূরন্নেছা খাতুনের গর্ভে দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম সন্তান কাজী নুরুল ইসলাম। দ্বিতীয় সন্তান কাজী নুরুল সোবহান সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ যশোর সাহিত্যসংঘ তাঁকে 'সাহিত্যরত্ন উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর বড় মেয়ে কামরুন্নেসা খাতুন (পান্না বেগম) 'আশা মরিচীকা' ও 'গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার' নামেদু'খানা গ্রন্থ প্রনয়ন করেন।

---

১. মজির উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩, ৭৪
৩. রশীদ আল ফারুকী প্রাগুক্ত, পৃ. ২১,২২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

আশা মরিচীকা কাজী গোলাম মোহাম্মদের উৎসাহে প্রকাশিত হয়। গাঙ্গুলী ম'শায়েল সংসার (১৯২২) একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং সম্ভবতঃ কোন মুসলমান মহিলা কর্তৃক লিখিত এ ধরনের একমাত্র উপন্যাস । তাঁর মেজমেয়ে বদরুন্নিসা খাতুন ও লেখিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সওগাতে তাঁর 'রেখ নামে একটি গল্প ছাপা হয়েছে। তাঁর মেজ মেয়ে রোকেয়অ ওপেল খানমও একজন সাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বৃকতিস্বরূপ যশোর সংঘ তাঁকে 'কাব্যভারতী' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর ছোট মেয়ে খালেদা ফ্যান্সী খানমও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করে যশশ্বিনী হয়েছেন।[১]

নূরন্নেছা খাতুন ১৯৫২ সালে স্বামীর সঙ্গে দেশ ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তান চলে আসেন এবং ঢাকা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দেশবিভাগজনিত কারণে তাঁর ছেলেমেয়েদের অনেকে পূর্বেই দেশত্যাগ করেছিলেন। দেশত্যাগ তাঁকে ব্যথিত করেছিল। এই ব্যথার স্মারক হিসেবে তিনি ঢাকার কমলাপুর ষ্টেশনের নিকটে যে বাড়ি তৈরী করেছিলেন তার নাম রাখেন 'উপকূল'। ১৯৬১ সালে তাঁর স্বামী কাজী গোলাম মোহাম্মদ পরলোক গমন করেন।[২]

স্বপ্নদ্রষ্টা উপন্যাসেই তাঁকে সাহিত্যিক খ্যাতিতে ভূষিত করেছে তবু সম্ভবত তাঁর সাহিত্যকর্মের সূচনা হয় আহবান-গীতি নামক একটি কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটি ১৩১৮ সালের কোহিনূর পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'সওগাত' পত্রকায় সপ্তমবর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের কাজ" নামে একটি প্রবন্ধ ও প্রকাশিত হয়। কথাশিল্পী হিসেবে নূরন্নেছা খাতুনের সাধানার ব্যাপ্তি মাত্র ছয় বছরের। ১৯২৩ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্বপ্নদ্রষ্টা প্রকাশিত হয়; পক্ষান্তরে ১৯২৯ সালে তাঁর শেষ উপাখ্যানমূলক রচনা 'নিয়তি' আত্মপ্রকাশ করে।[৩] ১৯২৯ সালে শেষ বড় গল্প 'নিয়তি' প্রকাশিত হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা এবং 'নিয়তির' মাঝখানে তিনি 'আত্মদান' নামে একটি উপন্যাস লেখেন, জানকী বাঈ বা ভারতে মোসলেম বীরত্ব নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'ভাগ্যচক্র' এবং 'বিধিলিপি' নামে দুটি বড় গল্প। শেষোক্তটি এই সংকলনের অন্তর্ভূক্ত। এইসব ক'টি লেখা তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ১৩২৩৬(১৯২৯) সালে। তাঁর সাহিত্য সাধনার জন্য নূরন্নেছাকে 'বিদ্যাবিনোদনী' উপাধিতে ভূষিত করে নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি এবং নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাঁকে সাহিত্য স্বরস্বতী' উপাধি প্রদান করেন। ১৩৩১ সালে তিনি মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনে 'বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়ে শোণার এবং সম্মেলনের সভাপতি নাটোরের মহারাজ শ্রী জগদীশচন্দ্রনাথ রায় তাঁর দারুণ প্রশংসা করেন। ১৩৩৩ সালের পৌষ মাসে বঙ্গী মুসলমান মহিলা সঙেঘর সভায় সভানেত্রী হয়ে তিনি একটি ভাষণ দেন, যা সে বছর সওগাত পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দেশ ভাগ্যের পর ঢাকার বাঙলা একাডেমী তাঁকে 'ফেলো' নির্বাচন করে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামে একাধিক বৃত্তি এবং পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ লেখিকা সঙ্ঘের তরফ থেকে।[৪] নুরন্নেছা খাতুন ১৯৭৫ সালের ৬ এপ্রিল পরলোকগমন করেন।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৪. শাহীন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২, ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

এতখানি প্রতিষ্ঠা, এত সফলতা খুব কম লেখকই তাঁদের জীবদ্দশায় পেয়ে থাকেন। অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে নূরন্নেছা কেবলমাত্রঐ ছটি বছর সক্রিয় ছিলেন। এরপর আর কিছু লিখেননি। কেন লিখেননি এই প্রশ্নের উত্তর মেলে তাঁর জীবনীগ্রন্থ অথবা গ্রন্থাবলীর ভূমিকা থেকে। তাঁর নিজের লেখা থেকেও এর উত্তর পাওয়া যায় না।[১] এ প্রসঙ্গে নূরন্নেছা খাতুনের নাতি শামার মনে হয় না তাঁর নানুর মনেকোন হতামা ছিল। শামা আরও বলেছেন, 'আমি ঠিক Exactly বলতে পারি না, তবে এমন তো হতে পারে যে লেখিকা হবার একটা স্বপ্ন ছিল, একটা কাজে সফল হয়েছিলেন। তারপর হয়ত আরও একটা কাজে অগ্রসর হতে আর পারেননি। চানওনি হয়ত।"[২]

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিয়মিত লেখাপড়া করতেন। এমন কি মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি অন্যের সাহায্যে দৈনিক খবরের কাগজের সংবাদ শুনেছিলেন্ জ্ঞানানুশীলনের ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। আশি উত্তর বয়সেও তার দৃষ্টিশক্তি প্রখর ছিল।[৩]

নূরন্নেছা খাতুন কঠোর অবরোধে ভেতর শৈশব কাটিয়েছেন। এজন্য তাঁকে পারিবারিক অবরোধের গন্ডির মধ্যে পাঠ অভ্যেস করতে হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজে অবরোধের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সবার অতি নিকটে এসে পৌঁছেছিলেন। এ সময় তাঁর অবাধ মেলামেলায় বিস্ময় প্রকাশ করে প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উল্লেখ করেছেন, "কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে শ্রীরামপুরে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। সেকালে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়া মেয়েরা অন্য কারো সামনে আসতেন না। ভেবেছিলাম নূরন্নেছা খাতুন বাড়ীর কোন লোকের মারফতে আমার কথার জবাব দিবেন। কিন্তু তিনি অতি সহজ-সরলভাবে আমার সম্মুখে এসে বসলেন। আমার আগমনকে অভিনন্দন করলেন। নারী জাগরণ অভিযানের জন্য সওগাতের খুব প্রশংসা করলেন।"[৪]

নূরন্নেছা খাতুন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু লোক দেখানো ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন না। একারণে তিনি নিম্নের শ্লোকটি সবসময়ে আবৃত্তি করতেন,

যো মালা যপে ও সালা হামারি যে অঙ্গুলি যপেও ভাই
যো মন মন যপে ও গুরু আর সব ঠকর ঠাই।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২,১৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩. রশীদ আল ফারুকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত পংক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বিবেচনা ও ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির বিরোধী মনোভাব ফুটে উঠেছে।

নূরন্নেছা খাতুন ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত কিন্তু নারী স্বাধীনতা, নারীশিক্ষা, বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব বিবেচনাবোধ থেকে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা তাঁর লেখায় খুঁজে পাই, লেখক হিসেবে দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ, যা রচনার দর্শনকে তুলে ধরে।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত, শ্রী শিক্ষা নিশ্চয়ই আমাদের অপরিহার্য্য জিনিসের মধ্যে হয়ে পড়েছে। আর এইটি আমাদের রুগ্ন সমাজে নেই বল্লেই চলে। তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন সকল রকমে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই দুর্বলতায় আমরা এত নিম্নস্তরে নেমে চলেছি যে, ভাবতে গেলে ভবিষ্যৎ জীবনগুলো সেখানকার অন্ধকারে খুঁজেই পাওয়া যাবে না।"[১]

তাঁর সময়কারে মাতৃভাষা সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে দ্বিধা, সংশয় ও বিতর্ক শুরু হয়েছিল, সে সম্পর্কে সংশয়হীনচিত্তে লেখক বাঙালি মুসলমানদের জন্য মাতৃভাষা বাঙলার সপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন, তা সেই সময়কালের এগিয়ে থাকা মানুষের পরিচয় মেলে ধরে, তাঁর অভিব্যক্তি ছিল এমন, "আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের জননী জায়া দুহিতাগণের মনে মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভঙ্গি যদি উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তবে তাহা অচিরে কি মঙ্গল ও কল্যান যে আমাদের করায়ত্ব করিয়া দিবে তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।"[২]

নূরন্নেছা খাতুন অত্যন্ত জোরালো যুক্তিতে বাঙালি হয়ে ওঠা বা থাকা পক্ষে বলেছেন, এমন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর যুক্তি সেই সময়কালের মুসলমান লেখকদের কাছ পাওয়া বেশি যায়নি, নারী লেখকরা তাঁর মত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী এ বিষয়ে কমই ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'যদিও আমাদের বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের আদি পুরুষগণ আরব, বাগদাদ বা পারস্য দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ বঙ্গের ফল, জল, আকাশ-বাতাস, ঔষধি-বনস্পতি প্রভৃতির সহিত যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা পরিচিত। এই বঙ্গের বাণী আমাদের জন্ম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের দিন পর্যন্ত নিয়ত কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের সমাজে এম অনেক জন আছে যাহারা এই পরম সত্যকে অস্বীকার করেন। পঞ্চনদ তীরবর্তী সকলেই পাঞ্জালী নহেন, ইহার ন্যায় আশ্চর্যজনক অযৌক্তিক কথা আর আছে কিনা জানি না।"[৩]

নূরন্নেছার লেখা পড়ে মনে হয়েছে তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্পর্শকাতর দিকগুলির বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। এমন কিছু তিনি লিখতে চাননি যাতে তাঁর প্রতিবেশী সমাজ আঘাত পায়।

১.১৩৩৩ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে সভানেত্রীর ভাষণ।
২. প্রাগুক্ত, পৃ.
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

কখনও কখনও গল্প লেখার সময় তাঁর মনে হয়েছে, এ গল্প কেউ ভুল বুঝবে না তো? যেমন "বিধিলিপি" এবং 'জানকী বাঈ'। 'জানকী বাঈ' এর সূচনায় তিনি পাঠককে স্মারণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের সেনাপতিই অধীনস্ত সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধনকল্পে বিপক্ষ সেনা ও সময় সময় অপর পক্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণকে সর্বতোভাবে হেয় ও হীনবীর্য্য প্রতিপন্ন করে থাকে। অতএব এই সমুদয় উক্তিতে কোন সম্প্রদায়ের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা নিজ নিজ উদারতার পরিচয় দিবেন।"[১]

নূরন্নেছা বোধ হয় সব ধরণের দ্বন্দ্বই এড়িয়ে চলতে চাইতেন। তাঁর লেখায় তাই তৎকালীন মূলধারার লেখকদের প্রভাব যতখানি লক্ষ করা যায়, রোকেয়া বা মিসেস, এম, রহমানের মতন সমসাময়িক লেখিকাদের আগুনের আঁচ ততখানি পাওয়া যায় না। বস্তুত তাঁর লেখায় আখতার মহল সৈয়দা খাতুন বা ফাতেমা খানমের মতন ঘরের ভিতরের ছবিও পাওয়া যায় না। তাঁর গল্পের বিষয় তাই সুপরিচিত, লেখার ভঙ্গিটিও। এই জন্যই কি রোকেয়া এবং মিসেস এম. রহমান কোনভাবেই তাঁদের জগতে নুরন্নেছাকে স্থান দিতে চাননি? কারণ, তাঁর মধ্যে যথেষ্ট বিদ্রোহের আগুন ছিল না? [২]

নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদনীয় সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য পর্যলোচনা করে আমরা দেখেছি, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতি সংক্রান্ত এমন কোন সমস্যা সেদিন ছিল না, যাঁ তাঁর সচেতন দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে তিনি সমাজ সংস্কারের বৃত্র এমনভাবে গ্রহণ করেননি, যেজন্যে তাঁকে আর পাঁচজন মহিলা থেকে আলাদা করা যায়। তবে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অবদান অবিসংবাদিত।[৩]

---

১. শাহীন আখতার, মৌসুমি, ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৩. রশীদ আল ফারুকী, প্রাগকত পৃ.২৯

Dhaka University Institutional Repository

এম ফাতেমা খানম (১৮৯৪-১৯৫৭):

এম, ফাতেমা খানমের সম্পূর্ণ নাম মমলুকুল ফাতেমা ফানম (তোতা)। ১৮৯৪ সালে তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ অন্তর্গত তছবিভাঙ্গা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে রইসউদ্দীন আহমেদ এবং আখতারুন্নেসা।[১] বাবা রইসউদ্দীন আহমেদ ছিলেন রেলওয়ে পুলিশ রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর, চাকুরিসূত্রে তাঁকে বাংলা বিহারের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। ছেলেবেলায় ফাতেমা খানমও বাবার সঙ্গে এ জায়গা থেকে সে জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। স্কুলে যাওয়া হয়নি যদিও তবু বাড়িতেই নানা ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে মেধার চর্চা শুরু হয়েছিল। রইসউদ্দীন আহমেদ স্ত্রী আখতারুন্নেসার জন্য বাড়িতে মেম এনে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, মেয়ে ফাতেমাকে তিনি ব্রিচেস পরে ঘোড়ার চড়তেও শিখিয়েছিলেন। বোধ করি তিনি বেশ স্বাধীনচেতা, মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। একবার নাকি প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসুকে গ্রেফতার করার দায়িত্ব তাঁর উপর পড়তে পরে, এই আশঙ্কায় তিনি কর্মস্থল ত্যাগ করেছিলেন। এমন একজন মানুষ কেন যে মেয়ের বারো বছর হতে না হতেই মানিকগঞ্জের গড়পোতা গ্রামের পীর আবদুল গনির ছেলে আবদুর রহমানের সঙ্গে ফাতেমা খানমের বিয়ে দিয়ে দিলেন, তা ঠিক বোঝা যায় না।[২]

এম ফাতেমা খানম কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। গৃহশিক্ষাই তাঁর একমাত্র এই শিক্ষার ভিত প্রোথিত হয়েছিল শৈশবে পিতৃগৃহে। উত্তরাকালে স্বীয় উদ্যোগ ও নিষ্ঠার তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্র যথাসাধ্য সম্প্রসারিত করেছেন। তিনি ছয়টি ভাষা আয়ত্ব করেন বলে জানা যায়-বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, আরবী ফারসী ও দেবনাগরী। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দানের একটি পয়সাও তাঁর ছিল, কিন্তু সফল হতে পারেননি। তবে শিক্ষকতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় সেকালের গুরু ট্রেনিং কোর্স বা শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্যায়ে তাঁকে অংশ নিতে হয়েছে।[৩]

বিয়ের কয়েক বছর পর তাঁর শ্বশুরের মৃত্যু হয়, একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙ্গন নামে এবং ফাতেমা খানম স্বামীসহ আলাদা বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু স্বামীও যখন শ্বশুরের মতন পীরপ্রথার দিকে ঝুঁকে ঘরে ডাক্তারি ছেড়ে দিলেন, একদিকে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অন্যদিকে স্বামীর সঙ্গেমন ও মতের অমিল, ফাতেমা খানম তখন ১৯২০ সালে ছেলেদের সঙ্গে করে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে প্রথমে তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আগা নবাব দেউড়ি স্কুল এর শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। কয়েক মাসও ফাতেমা খানমকে পোস্তা গার্লস স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে তিনি ১৯২৬ পর্যন্ত চাকরি করেন। এরপর ১৯২৭ এ তিনি কলকাতার মুসলিম ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন, কিন্তু সেখানকার 'হেডমিসট্রেস'র সঙ্গে বনিবনা হল না বলে ঐ বছরেই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে যোগদান করেন।[৩]

১. সিদ্দিকা মাহমুদা, এম ফাতেমা খানম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৯, পৃ. ৯
২. শাহীন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, জানালা মহফিল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৬৪-৬৫
৩. সিদ্দিকা মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪. শাহীন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এম ফাতেমা খানমের পূর্ব থেকে বেগম রোকেয়ার সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ ছিল। তিনি রোকেয়ার জীবনীও লিখতে চেয়েছিলেন। নারী-জাগরণের পুরোধা বেগম রোকেয়াকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। রোকেয়াও তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন গভীর স্নেহে।[১] বেগম রোকেয়ার জীবনবৃত্তান্ত লেখা সম্ভব না হলেও ফাতেমা খানম হয়েছিলেন রোকেয়ার সহকর্মী, তাঁর স্বপ্ন ও বেদনার অংশীদার। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের একমাত্র মুসলমান বাঙালি শিক্ষিকা।[২]

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের অত্যাধিক খাটুনিতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি দুরারোগ্য 'শিলষ্টোন' রোগে আক্রান্ত হন; অর্থ্যাৎ গলব্লাডার স্টোন বা পিত্তপাথুরী রোগ। পেটে তীব্র ব্যাথা, প্রয়োজন শল্য চিকিৎসার। তাঁর জন্য ভাল হাসপাতালে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু ফাতেমা খানম অস্ত্রোপচারে রাজী হননি। কলকাতায় তাঁর চিকিৎসক ছিলেন ডা. আবুল আহসান। ক্রমশ সংকীর্ণ হতে থাকে তাঁর সাহিত্য-চর্চা, শিক্ষকতা ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের গন্ডী। ১৯৪৭ এ দেশবিভাগের পর তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন, কিন্তু পূর্বের জীবন আর ফিরে পাননি। দীর্ঘ তেইশ বৎসর তিনি অসুস্থ ছিলেন; হারিয়ে ছিলেন কর্মশক্তি, অনেক কিছুই মনে রাখতে পারতেন না, কথা ভুলে যেতেন, প্রয়োজনীয় কাজের কথা নোট বইতে টুকে রাখতেন।[৩]

এই দীর্ঘ সময়ের অধিকাংশ তিনি যাপন করেছেন কন্যাপ্রতিম বেগম আনোয়ারা বাহার চৌধুরীর বাসায় মিন্টু রোডে অথবা শান্তিনগরে; কখনো জ্যেষ্ঠ পুত্র এ.এম. ফজলুর রহমানের কাছে, ভূতপূর্ব উর্দ্দু রোডে, পরে হরনাথ ঘোষ রোডে রূপান্তরিত হয়েছিল। দুঃখজনক এই যে, জীবনের সর্বপেক্ষা পরিণত এবং সম্ভাবনাময় সময় তিনি ব্যাধি কবলিত হয়েছেন। ফলত দতজড়তাগ্রস্ত হয়েছে তাঁর শক্তিশালী লেখনী, খুঁজে পাননি চিন্তাচেতনার পূর্ববৎ দৃঢ়তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সামঞ্জস্য। এ সময় তিনি কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি লেখার চালিয়েছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেননি।[৪]

দীর্ঘ তেইশ বৎসর রোগে ভুগে, স্বীয় কর্ম ও স্বপ্নজগৎ থেকে বিচ্যুত হয়ে যে শেষ জীবন ফাতেমা খানম অতিবাহিত করেছেন তা ছিল তাঁর মত কর্মঠ, সাহিত্য ও শিল্পপ্রিয়, শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী সংগ্রামী মহিলার জন্য অত্যন্ত বিষাদময় এবং অসহনীয়। ফলত নিজের উপরে এ সময় তিনি অত্যাচারও কম করেননি। অবশেষে ১৭৫৭'র ১লা জুলাই এক দুর্যোগময় দিনের বন্ধ্যায় তেষট্টি বৎসর বয়সে ফাতেমা খানমের জীবনাবসান হয়।[৫]

যে যুগে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির জন্য কেবল আন্দোলন সূচিত, সেই যুগে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া পীরপ্রথাশ্রয়ী এক অনগ্রসর পরিবারে সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় পঠন-পাঠন এবং নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে একান্ত অন্তরগরজে এম. ফাতেমা খানম নিজেকে উত্তীর্ণ

১.সিদ্দিকা মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৩২
৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন লেখক স্তরে, অথচ বেগম রোকেয়া, নূরন্নেছা বিদ্যাবিনোদনী (১৮৯৪-১৯৭৪) বা শামসুন্নাহার মাহমুদের ন্যায় পারিবারিক সহযোগিতা তিনি পান নি। তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে মুসলিম সমাজাশ্রয়ী প্রাচীনপন্থী চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে, ছেড়ে আসতে হয়েছে নিজস্ব পরিবেশ। কিন্তু পারিবারিক দায়-দায়িত্ব তিনি উপেক্ষা করেননি। দুই বছরের বোনঝি শিশুকন্যা আনোয়ারাসহ নিজের পুত্রদ্বয়কে যুগোপযোগী শিক্ষাদান করেছেন। পোস্তা স্কুল পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সেই অবরোধের যুগের বেগম রোকেয়ার সহকর্মী হওয়ার মধ্যেও তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা সুস্পষ্ট। সেই সঙ্গে ললিতকলাপ্রিয় সুকুমার হৃদয়বৃত্তির পরিচর্যা করেছেন আজীবন।[১]

ফাতেমা খানমের সাহিত্যজীবন ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। মোটামুটিভাবে গল্পকার হিসেবেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ও প্রাকাশিত তাঁর গল্পগুলির রচনাকাল ১৯২১ থেকে ১৯৩০। ঢাকার বাইরের দুই একটি পত্র-পত্রিকা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। গল্প ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি কিছু প্রবন্ধ ও রচন করেন। প্রধানত যা তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক চেতনা থেকে উৎসারিত। তার কবিতা প্রকাশিত না হলেও কবিতা রচনার অনুশীলনী তিনি করেছিলেন। এমনকি তাঁর অসমাপ্ত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার প্রয়াস সম্পর্কেও আমরা পারিবারিক সূত্র অবহিত হই।[২]

১৯২১ সালে ৯১৩২৮) যশোর থেকে প্রকাশিত ধ্রুবতারা সম্মাসিক পত্রকায় ফাতেমা খানমের প্রথম ছোটগল্প 'শষ অনুরোধ' প্রকাশত হয়; পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন লেখিকার দূর সম্পর্কের দেব, ড. নুরুল ওহাব।[৩] 'শেষ অনুরোধ' প্রকাশিত হয়েছিলেন ১৩২৮ বঙ্গাব্দে, শেষপ্রবন্ধ'তরুণের দায়িত্ব' ১৩৩৭ এ মুসলিম সমাজের মুখপত্র বার্ষিক শিখায়। মাঝের সয়টাতে তাঁর গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার মানসী ও মর্মবাণী, মাতৃমন্দির এবং সওগাত পত্রিকায়, ঢাকার মাসিক সঞ্চয়, আল-ফারুখ এবং শিখা'য় রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত যুগের আলোতে।[৪]

মৃত ফাতেমা খানম যে যুগে গল্প লেখায় আগ্রণী ছিলেন, সে যুগে মহিলা গল্পকারদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় বিশেষত মহিলা গল্পকারদের সংখ্যা। তাঁর সমসাময়িককারে আমরা যে ক'জন হিন্দু গল্প লেখিকার সন্ধান পাি, তাঁদের মধ্যে ভাগলপুরের 'ছায়া' গোষ্ঠির লেখক বিভূতিভূষণ ভদ্রের (জ. ১৮৮১) ভগ্নী নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯১৫), 'ভারতী' দলের লেখক সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনূজা অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) ও ইন্দ্রিরা দেবী (১৮৮৫-১৯১২)। শৈলবালা ঘোষজায়া (জ. ১৮৯৪), শান্তা দেবী (জ. ১৮৯৪) ও তার ভগ্নী সীতা দেবী (জ. ১৮৯৫) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের এক বা একাধিক ছোটগল্প সংকলন বিংশ শতাব্দির প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত হয়েছে; পারিবারিক সূত্রে অনেকেই পেয়েছেন সাহিত্য নির্মিতির অনুকূল পরিবেশ।[৫] এইসব মহিলা লেখিকা নারী মনস্তত্ত্ব অনুধাবন ও ঘর কন্নার খুঁটিনাটি উপস্থাপনে।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩. শাহীন আখতার, মৌসুমী ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৫. সিদ্দিকা মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

অনেকক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রেম, বাৎসল্য, হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতা, কখনোও প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গল্পসমূহে উপস্থিত, তবে বৃহত্তর সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা বা গভীরতর জীবনবোধ তেমন লক্ষ্য করা যায় না। এদের মধ্যে সুলেখিকা হিসেবে নাম করেছেন শান্তা দেবী। অনুরূপ দেবী পেয়েছিলেন কুন্তলীন পুরস্কার। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এরা কেউ মুসলমান সমাজের অন্তপুরে প্রবেশ করতে পারেননি।[১]

অপরদিকে সামাজিক ঐতিহাসিক কারণে একালে সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমানদের পর্দাপন ছিল যেমন বিলম্বিত, তেমনই দুর্বল। পুরুষ-লেখকই যেখানে অপ্রতুল, সেখানে মহিলা লেখিকা অদৃশ্য প্রায় বললেই চলে।[২]

মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম বিক্রমপুরী 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা' শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকজন মুসলমান লেখিকার নাম উল্লেখ করেছেন যেমন-মিসেস. আর. হোসেন, রত্নাধার রচয়িতা আফজালুন্নেসা, সতীর পতিভক্তি রচয়িতা খায়রুন্নেসা খাতুন, স্বর্গের জ্যোতিঃ রচয়িতা সারা তৈফুর, কবি সাজেদা খাতুন, মিসেস. এম. রহমান, সৌদামিনী বেগম, কাসেমা খাতুন, দৌলতপুরের রিজিয়া খাতুন ও তাঁর ভগ্নী রহিমা খাতুন, চট্টগ্রামের পুন্যময়ী গ্রন্থ এবং সারগর্ভ রচয়িতা শামসুন নাহার (মাহমুদা) ও ঔপন্যাসিক নুরুন্নসা খাতুন প্রমুখ।[৩]

মুসলিম নারীর সাহিত্য সাধনার জগতে সে যুগে মমুকুল ফাতেমা খানম খ্যাতি পেয়েছিলেন ছোটগল্প রচয়িতা হিসেবে। তাঁর সাহিত্য সাধনার সময় ছিল ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল পযন্ত। জনাব নাসির উদ্দিনের গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ঐ দশ বছরে তাঁর সমপর্যায়ের মুসলিম গল্প লেখিকা আর কেউ ছিল না।[৪]

ফাতেমা খানম যেমন পড়েছেন তেমনি লিখেছেনও। কিন্তু নিজের লেখা গুছিয়ে রাখার অভ্যাস ছিল না। উপরন্তু অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে আত্মগোপন মনোবৃত্তি ছিল তাঁর। সেলিনা চৌধুরী লিখেছেন: একবার সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দীন সাহেব তাঁর পরিচয় চেয়ে পাঠালে ফাতেমা খানম লেখেন: আমার জীবনের এমন কোন অসাধারণতা নেই, যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখার প্রয়োজন হচ্ছে।[৫]

ফাতেমা খানমের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে আমরা লক্ষ করি, তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত। নারী ও পুরুষে শিক্ষা পুষ্ট, সংস্কারমুক্ত উদার, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি তিনি সমর্থন করেছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি, শক্তি ও অর্থের দম্ভ, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা বা নীচতা বা মনুস্যত্বকে লাঞ্চিত করে ফাতেমা খানম তার বিরোধী ছিলেন। স্ব-সমাজের সীমাবদ্ধতা তাঁকে নিয়ত পীড়িত করেছে এবং গল্প ও প্রবন্ধের মাধ্যমের তিনি যথাসাধ্য এই দোষ-ত্রুটি উম্মোচন করেছেন। উদার ও মানবিক ধ্যান-ধারণা তার সীমিত রচনাগুচ্ছে সুস্পষ্ট। তাছাড়া ভাব ও ভাষার ক্রমপরিণতি ফাতেমা রচনা অধিকতর মূল্যবান করেছে।[৬]

১. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯
৪. বেগম জাহান আরা, বাঙলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৭, পৃ. ২৬
৫. সিদ্দিকা মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ.২০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

Dhaka University Institutional Repository

দৌলতননেছা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭) :

দৌলতননেছা খাতুন ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতার কর্মস্থল বগুড়া জেলার সোনাতলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মরহুম ইয়াছিন আলী ও মাতা মরহুমা নছিরন নেসা। দু ভাই ও সাত ভাইয়ের মধ্যে দৌলতননেছা খাতুন ছিলেন পিতা মাতার চতুর্থ সন্তান। কর্মসূত্রে তাঁর পিতা ছিলেন রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার। রাজশাহীতে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর পিতা সেখানেই বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার পৈত্রিক নিবাস ছিল যশোর জেলার মাগুরায়।[১]

পিতা ইযছিন আলী একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর লেখা 'স্বর্গোদ্যান' ও 'হীরার ফুল' নামের দুটি উপন্যাস সেই সময়ের সাহিত্যমোদীদের সমাদার লাভ করেছিলেন। 'জীবনতারা' নামে আরও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি নিজে গান লিখে সুর দিতেন, গান গাইতেন। হারমোনিয়াম বাজাতেন। সেই সময়ে মুসলমান সম্প্রদায় গানবাজনাকে হারাম বলে মনে করা হত। দৌলতননেছা খাতুনের পিতা সেই সময়ের মুসলিম সমাজের ভেদবুদ্ধিতে নত হননি বলেই প্রতীয়মান হয়। উদারপন্থী ও কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন তিনি।[২]

দৌলতননেছা খাতুনের বড় বোনটি সাত আট বছর বয়সে এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানে ভাই-বোনদের মধ্যে একজন ভাই বেঁচে আছেন, তিনি হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং গোলাম সামাদ।

দৌলতনেছা খাতুন শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর কালে মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার তেমন ছিলনা, বিশেষত মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার হার ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সংগ্রাম অসাধ্য সাধন করে।

শৈশব থেকে পড়াশুনার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। এছাড়া তাঁর বাবার উৎসাহ ও মনোযোগও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীকালে তাঁর স্বামীরও অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে বৃত্তি পান। মাত্র আট বছর বয়সে গাইবান্ধার ডা. হাফিজুর রহমান (এমবিএ) এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা করা পর্যন্ত তিনিতার বাবার সাথেই ছিলেন। এরপর বার বছর বয়সে স্বামীর ঘরে যান। স্বামীর ঘরে পড়াশুনার ছেদ পড়েনি। শ্বশুরকুলের লোকজনেরা ছিলেন প্রবল রক্ষণশীল, পাশাপাশি সে সময়ে মুসলিম সমাজও স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিল। এই অবস্থায় নিজের অদম্য চেষ্টায় ও স্বামীর সহযোগিতায় পড়াশুনা করতে পিছপা হননি। স্বামীর ঘরে সংসারের বহুবিধ কাজ নিজের হাতে করতে হত। ক্লান্তি এলেও বিশেষ প্রণোদনায় তিনি লেখা পড়াকে জীবন গৌরবময় পথ হিসেবে

১. গোলাম কিবরিয়া পিনু, দৌলতননেছা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ১১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনা করতেন।[১] দৌলতননেছা খাতুন ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক, ১৯৪০ সালে আই.এ ১৯৪২ সালে বি.এ এবং ১৯৫৯ সালে এম.এ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকল্যাণে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সমাজকল্যাণ বিষয়ে অধ্যাপনাও করতেন, এ বিষয়ে ' এক অজানা মেয়েরা কথা' নামক স্মৃতিকথায় রওশন আরা রহমান এভাবে উল্লেখ করেন, "পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু ষাটের দশকে সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমাজকল্যাণ কজেলের বিশেষ প্রচেষ্টায় পেশাগত দক্ষতা নিয়ে উচ্চ শিক্ষিত এবং সমাজ কর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী এবং পুরুষ তখন থেকে সমাজকর্মে যোগ দেয়। মিসেস সায়রা আহমদ হুসনা বানু খানম (রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী), দৌলতননেছা (প্রাক্তন এম.এ), কাজী শামসুন, নুরুল ইসলাম খান, এম. রসুল তাঁরা সকলে আমাদের পূর্বসূরী। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের পেশাগত সমাজকর্মের পাঠ দিতেন।"[২]

শৈশবে যে সময় হেসে বেড়ানোর কথা সে সময়ে তাঁর বিয়ে। ৫ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করা পর্যন্ত তিনি বাবার সাথেই ছিলেন। তারপর ১২ বছর বয়সে স্বামীর ঘরে যান।[৩] বিয়ের পর থেকে গাইবান্ধা শহরের পি.কে বিশ্বাস রোডস্থ স্বামীর বাড়িতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বসবাস করেন। বিচ্ছিন্নভাবে কিছুদিন ঢাকাতেও থেকেছেন।

দৌলতননেছ খাতুননের ছোট ভাই অধ্যাপক এবনে গোলাম সামাদ তাঁর মৃত্যুর পর লিখলেন, আমার ভগ্নিপতি সে আমলের এমবিবি.এস পাস ডাক্তার। ডাক্তারী তিনি পাস করেছিলেন ১৯২৬ সালের কাছাকাছি। তিনি ছিলেন খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি নিজেও ডাক্তারী করে যথেষ্ট বিত্তের অধিকারী হন। ... গাং নগর নামক স্থানে তার ছিল উর্বর ১০০ বিঘা পরিমাণ জমি। তিনটি বিরাট দীঘি, যাতে মাছের চাষ করা হতো। ... ডাক্তারী করতেন গাইবান্ধায়। তিনি সেখানেও করেন বেশ কিছু সম্পত্তি। তিনটি পাকা বাড়ি, একটি সিনেমা হল, একটি তেলের ডিপো, একটি পেট্রোল পাম্প এবং কয়েকটি পাটের গুদাম। আমার ভগ্নিপতি ১৯৬৪ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। অনেকে বলেন, সেটা আসলে দুঘটন ছিল না। তাকে কোন কারনে খুন করা হয়। ব্যাংকে তাঁর ছিল অনেক টাকা যার কোন খোজ আমার ভগ্নি পাননি। আমার একমাত্র ভাগিনেয় সেও ডাক্তারী পাস করে বিলেত যায়। কিন্তু আক্রান্ত হয় Schijophrenia নামক মানসিক রোগে। পরে তার একটি পা কেটে ফেলতে হয় Gangrene হবার জন্য। হটাৎ স্বামী মারা যাওয়ায় এবং পুত্র প্রথমে অসুস্থ ও পরে পঙ্গু হবার কারণে আমার বোন ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েন। তিনি অবশ্য কখনই আমাদের কাছে তাঁর বিপদের বলতেন না। কিন্তু এখন মৃত্যুর পর জানছি, তিনি তাঁর স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছেন। এমনকি তাঁর বসত বাটির দু'টি ঘর ছাড়া তিনি সমস্তই বিক্রি করেছেন। বিষয়টি আমার কাছে খুবই

১. প্রাগুক্ত, পৃ.
২. জওশন আরা রহমান, এক অজানা মেয়ের কথা, সংবাদ সাময়িকী দৈনিক সংবাদ, ৩ জুন, ২০০৪, পৃ. ১০২
৩. গোবিন্দলাল দাশ, গাবিান্ধার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা-১৯৯৪, পৃ-১০২

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। শুনলাম তিনি বিপু অর্থ ব্যয় করেছিলেন তাঁর পুত্রের চিকিৎসার জন্য। কেবল ডাক্তারি চিকিৎসার পেছনে নয় ঝাড়ফুঁক, ফকিরী চিকিৎসার জন্যও। যে যা বলেছে তাই তিনি করেছেন আপনা পুত্রের চিকিৎসার জন্য। তাঁকে অনেক ব্যক্তি অনেক ভাবে প্রতারণা করেছে। স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করতে যেয়েও প্রথমে তাঁকে করতে হয়েছিল অনেক মামলা। তাতেও তিনি ব্যয় করেছেন প্রচুর অর্থ। তিনি মারা গিয়েছেন অত্যন্ত দারিদ্রেরই মধ্যে। তাঁর পুত্র, যার বয়স ৬০ বছর, পড়ে আছে শয্যায়। অনাহারে কাটছে তার দিন।[১]

দৌলতননেছা খাতুনের অসুস্থ ডাক্তার পুত্র তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ জীবনে দৌলতননেছা খাতুন তাঁর পিতার পরিজন ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ক্রমাগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দিনকে দিন। স্বামী হারিয়ে তিনি দৃঢ় মনোবলের মধ্যে দিয়ে জীবনের দ্বন্দ্ব-সংকট কাটিয়ে উঠবার জন্য যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আপনা মার্যাদা নষ্ট করে কারও আছে ছোট হননি। সাংসারিক জীবনেও তিনি একজন সংগ্রামী মহিলা হিসেবে নিজের পরিচয় স্পষ্ট করেছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিধস্ত হয়েছেন কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি। তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও ব্যক্তি মর্যাদা কখনো নষ্ট হতে দেননি। সংসার জীবনে করুণ হয়ে কোন ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্যের স্বারস্থ হননি।

জন্মগতভাবেই দৌলতননেছা খাতুন ছিলেন এক অতিশয় আবেগপ্রবণ সমাজ দরদী ব্যক্তিত্ব। সেদিককার সে দিনসেদিনকারী বাংলাদেশসহ সারা ভারতবর্ষের পদ্দাম রাজনীতি জনমনে এক প্রবল ভাবাবেগত সৃষ্টি করেছিল। দৌলতননেছা খাতুন সেই ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে আন্দোলনে ঝঁপিয়ে পড়েন। দেশে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। দৌলতননেছা সেই আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন। তখনকার দিনে উত্তরবঙ্গে বিখ্যাত ত্যাগী কংগ্রেস নেতা আবু হোসেন সরকার ছিলেন মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী। সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা গান্ধীসহ সুভাষ বসু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের রাজনীতির পাশাপাশি শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক প্রজার মুক্তি আন্দোলন এবং বামপন্থী কম্যুনিস্ট আন্দোলন তখন জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করেছে। এই জোয়ারে ভেসে গেলেন তরুণী গৃহবধু দৌলতননেছা খাতুন বিপ্লবীদের প্রভাব পড়েছিল তার উপর। তিনি সেই তরুণ বয়সেই অতিশয় দুঃসাহসের পরিচয় দেন। পারিবারিক গন্ডি অতিক্রম করে তিনি যোগ দেন আন্দোলনে। শোনা যায়, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে এলে তিনি বিপ্লবী বেনজীর আহমদের মতোই ঝাঁপ দেন নদীতে। বহুপরে আবার আত্মপ্রকাশ করে রাজনীতিতে তার অবস্থান অক্ষুন্ন রাখেন। সমাজের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করাকে তিনি মনে করেন তার জীবনের সার্থকতা। এতেই তার আনন্দ এবং সন্তুষ্টি, মানুষের ন্য জীবন উৎসর্গ করাতেই তার উৎসাহ।[২]

এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হন। সেদিন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল করছে গাইবান্দা, মিছিলটি তাঁর বাসভবনের পাশ দিয়ে

১. এবনে গোলাম সমাদ, প্রসঙ্গ দৌলতননেছা খাতুন ইনকিলাব, ১৯ সেপ্টেম্বর-১৯৯৭, ঢাকা।
২. শাহেদ আলী, দৌলতননেছা খাতুন: অন্তরঙ্গ আলোকে, দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ আগষ্ট, ১৯৯৭, ঢকা।

Dhaka University Institutional Repository

যাবার সময় হঠাৎ করে তিনি বেরিয়ে এসে সোজাসুজি মিছিলটায় যোগ দিলেন এবং মিছিল শেষে এক জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। তখনকার সামাজিক অবস্থানে একজন মহিলা হিসেবে এই ভূমিকা ছিল এক বিদ্রোহীর ভূমিকা। এরপর ক্রমাগত গভীরভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বৃটিশ আমলে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সে সময়ে দু'বার কারাবরণ করেন।[১] দৌলতননেছা খাতুন গুপ্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও সম্পর্কিত ছিলেন। এমনকি তিনি গোপনভাবে পিস্তল চালনার প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে লবণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধ গ্রেফতার হন এবং তাঁদের বাড়ী ক্রোক করে বাড়ী তেকে তাঁর স্বামীকে বের করে দেয়া হয়।[২]

১৯৮৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এম. আবদুর রহমানের 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'স্কুলের ছাত্রী থাকলেই তিনি (দৌলতননেছা) দেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই সূত্রে গাইবান্ধার দেশনেত্রী মহামায়া ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসেন তিনি। স্বদেশী আন্দোলনের সভাসমিতিতে এবং মিছিলে যোগ দেবার কালে তাঁ হিম্মত এবং বক্তৃতার শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিশোরী মেয়ে দৌলতউন্নিসার জোশপূর্ণ বক্তৃতা জনগণের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করত। মেয়ে মহলের প্রশংসা পাবার ও প্রিয় হয়ে যাবার সাথে সাথে সেই অল্প বয়সেই গড়ে তুলেছিলেন 'গাইবান্ধা মহিলা সমিতি' নামে একটি সেবাসংঘ। মহামায়া দেবীকে করা হয়েছিল সেই সেবা সমিতির সভানেত্রী। সদস্যদের আগ্রহে কিশোরী দৌলতউন্নিসা হয়েছিল সম্পাদিকা। পাশ্ববর্তী বারো চৌদ্দখানি গ্রামের হিন্দু-মুসলিম মেয়েরা ছিলেন এই কাজের সাথে যুক্ত। তাঁরা গ্রামে গ্রামে দিয়ে স্বদেশী প্রচারের কাজ করতেন। তাঁদের চেষ্টায় সমগ্র এলাকায় বিলিতে বস্ত্র বিক্রি বন্ধ হয়েছিল। বৃদ্ধি পেয়েছিল স্বদেশী বস্ত্র ও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার। সরকার তাঁদের কার্যকারা সহ্য করতে না পেরে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা জারি করেন। আইন অমান্য করতে অগ্রসর হন মহামায়া দেবী এবং দৌলতউন্নিসা বেগম প্রমুখ বহু মহিলা। এজন্যে গ্রেফতার বরণ করে কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁদের। দেশ সেবার জন দৌলতউন্নিসাকে গ্রেফতার বরণ করে কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁদের। দেশ সেবার জন্য দৌলতউন্নিসাকে একাধিকবার জেলে যেতে হয়েছিল। ইংরেজ সরকার তাঁর স্বামীর বাড়ি ঘর বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে গাইবান্ধা এলাকা হতে বহিস্কৃত করেছিল।[৩]

দৌলতননেছা খাতুন যখন কংগ্রেসের পক্ষে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছেন তখন মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং বাংলার মুসলমানদের মধ্যে লীগের প্রভাব প্রায় সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগের স্বাতন্ত্র্যবাদী সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রবল প্রতাপের সময়ে যে বোধ থেকে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, তার কোন সবিস্তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। সিলেটের জোবেদা খাতুন চৌধুরানী ছাড়া এই পথে তাঁর সতীর্থ মুসলিম নারীর দেখা আর বিশেষ আমরা পাই না। যে রাজনীতি দৌলতননেছা বরণ করেছিলেন ক্রমে ক্রমে পুর্ব বঙ্গে তার পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৫ সালের নির্বাচন তো স্পষ্টভাবে বাংলার জনগণকে হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করে দিল। এর পরের অমোঘ ঘটনাধারা দেশ ভাগ ও

১. গোলাম কিবরিয়া পিনু, দৌলতননেছা খাতুন, দৈনিক বার্তা, রাজশাহী, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৩. মফিকুল হক, দৌলতননেছা খাতুন ইতিহাসের উপেক্ষিতা, অনন্যা বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৫, ঢাকা, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ শাসিত পাকিস্তানের উদ্ভব অনিবার্য করে তুলল। মফঃস্বল শহর গাইবান্ধার এক মুসলিম তরুণীর পক্ষে ইতিহাসের এই প্রবল আলোড়নের বিরুদ্ধে তরী বেয়ে চলা কঠিন হয়ে উঠল। তবে তিনি যে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি সেটা কম বড় অর্জন নয়।... এটাও তো আমাদের জানা পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাবে সিলেটের জোবেদা খাতুন চৌধুরানী কংগ্রেস ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন মুসলিম লীগে এবং রায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের টানে আবারও ফিরে এসেছিলেন জনতার কাতারে। দৌলতননেছার মধ্যে সে রকম কোন দ্বিধা কাজ করেনি। তাঁর এই আদর্শনিষ্ঠা চিন্তাশ্রয়ী অবস্থান যেমন অনন্য তেমনি বিস্ময়কর। ১৯৪৯ সালের ৯ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'যে ভাষায় প্রথম মা বলিয়া ডাকিয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি, ঝগড়া করিয়াছি, যে ভাষার সহিত আমাদের বত্রিশ নাড়ির বহু যুগ যুগান্তরের অবিচ্ছিন্ন মিশ্রণ, বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই শ্যামনিমা ভূ-প্রকৃতির ঋতু বৈচিত্রের মধ্যে মিশাইয়অ একান্ত তাহারই হইয়অ বড় হইয়াছি। তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাঁচিব কি লইয়া? ... বাংলার বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় আপত্তি ইহাতে মুসলমানদের তমদ্দুনের অভাব, অর্থাৎ মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টির প্রকৃত স্বরূপ ইহার মধ্যে প্রকাশমান নয়। যদি তাহাই সত্য হয় তবে বিচার করিয়া দরকার ইহার জন্য দায়ী কে? ভাষা নিজে দায়ী বা সাহিত্যিক অথবা পাঠক? এখানেই প্রশ্ন ওঠে মাতৃভাষা একটি জাতির প্রতিবন্ধক হইতে পারে কি? তা যদি পারত তবে ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরবী ভাষা কি পৌত্তলিকতার ভার বহনকারী ছিল না? কিন্তু তাহাতে তো কই ইসলামী ভাবধারা প্রচারের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই। বরঞ্চ মাতৃভাষার সাহায্যে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবার পথে সাহায্য করিয়েছিল।'[১]

পাকিস্তানী জমানার একেবারে সূচনার ঘোর তমসাচছান্ন সময়ে দ্বিধাহীনভাবে যে যৌক্তিক অবস্থান দৌলতননেছা গ্রহণ করেছিলেন এবং যে অনুপম ভাষাভঙ্গিতে তা প্রকাশে সমর্থ হয়েছিলেন এর তুলনা খুব বেশি মিলবে না। বুঝতে অসুবিধা হয় না, আত্মোপলব্ধি থেকে আত্মশক্তির যে চেতনা তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল সেটা তাকে বেরী সময়ে বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।[২]

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় স্বামীসহ ঢঅকায় বসবাসের চেষ্টা নিয়েছিলেন দৌলতননেছা র‍্যাংকিন স্ট্রিটে একটি বাড়ি ভাড়াও নিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের ২৭ এবং ২৮ মার্চ মুসলিম লীগের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বামপন্থী সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকা শহরে সভা আয়োজনের উপায় ছিল না লীগের গুন্ডামীর কারণে। যুবলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বুড়িগঙ্গার বুকে নৌকোয় হ্যাজাক বাড়ি জ্বালিয়ে। নবগঠিত সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন দৌলতননেছা খাতুন। চরম নিপীড়নের মুখে যুবলীগ বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। দৌলতননেছাও অচিরে ঢাকা ছেড়ে আবার ফিরে যান গাইবান্ধায়।[৩]

১. প্রাগুক্ত, পৃ.১০
২. প্রাগুক্ত, পৃ.১১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

দৌলতননেছা খাতুন ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনে সচেতন ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৫৪ সালে রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া সমন্বয়ে গঠিত এলাকার মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভোটে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দৌলতননেছা খাতুন ৯২ (ক) ধারায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করলে করলে প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় নহ এবং ১১ মাস কারাভোগ করেন এবং ৩ মাস অন্তরীণ থাকেন।

দৌলতননেছা খাতুন আইয়ুব খান শাসনভার গ্রহণ করলে পড়াশুনা প্রতি মনোযোগী হন এবং ১৯৫৯ সালে প্রাইভেট পরীক্ষায় সমাজকল্যাণে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ক্রমাগত প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে যেতে থাকেন। এর মধ্যে ১৯৬৪ সালে তাঁর স্বামী এক দুর্ঘনায় মৃত্যুবরণ করেন। এতে তিনি সাংসারিক ও অন্যান্য ঝামেলায় পতিত হন। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অবস্থান থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন থাকেন নি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান সভা থেকে দূরবর্তী অবস্থানে থেকেছেন।

জিয়াউল রহমানের মাসনামলে ১৯৭৯ সালে দৌলতননেছা খাতুন জাতীয় সংসদের কুড়িগ্রামে গাইবান্ধা এলাকার সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। এই সময়ে তাঁর দ্যোগে 'যৌতুন নিরোধ বিল' বেসরকারীভাবে সংসদে উথাপন হয়। এ বিল উপস্থাপনে তাঁর নিজস্ব উদ্যোগ ছিল বিশেষভাবে, সরকারের আগ্রহ কম ছিল, বিরোধীদলের সদস্যদের সহানুভূতি ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত অনেক কাটছাট করে বিলটি গৃহীত হয়। এই পারিবর্তন তাঁর পছন্দ হয়নি অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর কিছু করারও ছিল না। দৌলতননেছা খাতুন' যৌতুন নিরোধ বিল' উপস্থাপন করে এক যুগান্তকারী ভূমিক পালন করেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাঁর অনুভবের কথা এভাবে বলেন, আমি শৈশব থেকেই রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত আছি। আমি গাইবান্ধা শহরে থাকি, যার সাথে গ্রামগুলোর প্রত্যক্ষ যোগাগেগ রয়েসে। যৌতুকের কারণে গ্রামগুলোতে যে দূরবস্থার সৃষ্টি হয় তা বলে বোঝানো যাবে না। প্রতি বছর যৌতুকের কারণে গ্রামগুলোতে যে দূরবস্থায় সৃষ্টি হয় তা বলে বোঝানো যাবে না। প্রতি বছর যৌতুকের কারণে অসংখ্য নারী অত্যাচারিত হচ্ছে। ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য কন্যার পিতা। এসব খবর আমরা সকলে রাখি না। এইসব অসহায় মেয়েদের কথা ভেবেই আমি ১৯৭৯ সালের ২৬শে মে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যৌতুক বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উথাপন করেছিলাম।[১]

দৌলতননেছা খাতুন জিয়াউল রহমান আমলে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে জাতীয় সংসদের সদস্য থাকাকালীন সময়ে লক্ষ করা গেছে যে, তিনি সংসদীয় কার্যক্রম ও আনুষ্ঠানিক কিছু কর্মে সক্রিয় ছিলেন, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আর কোনভাবে তাঁকে সক্রিয় হতে দেয়া যায়নি।

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে সামাজিক সংগটন ও কর্মের সাথে আমৃত্যু যোগাগোগ ছিল দৌলতননেছা খাতুনের। তিনি মহিলা সমিতি, নার্সারি, শিশুরক্ষা সমিতিসহ এমনি ধরণের বহু সংস্থার মূল প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিশুকল্যান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা

---

১. মালেকা বেগম, যৌতুক, পায়রা, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ.৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সহ-সভাপতি, ১৯৪৭ সালের সিরাজী সংসদের সেক্রেটারী ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্যও ছিলেন। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় এতিমখানা স্থাপন করে আর্তমানবতার সেবায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এছাড়া প্রলয়ংকরী ঝড়-বন্যা দুর্ভিক্ষে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। স্থানীয় মহিলাদের সংগঠিত করে ১৯৩২ সালে গাইবান্ধা মহিলা সমিতি গঠন করেন। দৌলতননেছা খাতুন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত 'উন্নত পরিবার গঠন মহিলা সংস্থা' এর সভাপতি ছিলেন, এই সংস্থাটি ১৯৭৮ সালে গাইবান্ধায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটির কার্যক্রম গাইবান্ধা পৌর এলাকাসহ গাইবান্ধা সদরের আরও ৪টি ইউনিয়নে বিস্তৃত ছিল।[১]

১৯৫৬ সালে বিশ্ব নারীকল্যাণ সংস্থার যে চল্লিশ জাতির সম্মেলন চীনের পিকিং-এ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে চীন সরকারের আমন্ত্রণে একজন প্রতিনিধি হিসেবে দৌলতননেছা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।[২]

দৌলতননেছা খাতুন বার বৎসর থেকে লেখালেখি শুরু করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাহিত্যচর্চা করেছেন। মাঝে মাঝ বিভিন্ন কারণে সাহিত্যচর্চার ছেদ পড়েলেও তাঁর মধ্যে সাহিত্য রচনায় অদম্য শক্তির বাহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

অল্প বয়স থেকে দৌলতননেছা রচনা বঙ্গশ্রী, দেশ, নবশক্তি, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশি হতে থাকে। এসব পত্রিকায় মুসলমান মেয়ের রচনা পাওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রথম দিক থেকেই নতুন চেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও গভীর সংবেদণশীলতা তাঁর রচনায় লক্ষ করা যায়। রসরচনা, একাংকীকা, প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস প্রভৃতি রচনার মাধ্যমে তার বাস্তববাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।[৩]

দৌলতননেছা খাতুনের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো-=উপন্যাস: পথের পরশ (১৯৫৭) বধুর লাগিয়া (১৯৬২), নাসিমা ক্লিনিক (?) কমরপুরের ছোট বৌ (১৯৮৮), বিবস্ত্র (১৯৮৯), শিশু সাহিত্য: ঝরণা (নাটক) ১৯৬৯, সমাজকল্যাণ বিষয়ক গ্রন্থ: সমাজকল্যাণ (প্রথম খন্ড) ১৯৬৫, সমাজকল্যাণ (দ্বিতীয় খন্ড) ১৯৬৬।

দৌলতননেছা খাতুন আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যার পান্ডুলিপি রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় পঞ্চাশটির বেশি ছোটগল্প খুজে পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন, যেগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। চিত্রনাট্য টিভি নাটকসহ আরও কিছু ভিন্নধর্মী লেখার পান্ডলিপি পাওয়া যায়।

পঙ্গু অসহায় পুত্রের পাশের টেবিলে বসেই তিনি রচনা করছিলেন একটি উপন্যাস তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে।[৪] দৌলতননেছা খাতুন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন আমৃত্যু তাঁর সাহিত্য-সাধনা নিছক সখের তাড়নায় তাড়নায় উন্মুখ নয়, জীবনকে আবিস্কার ও বিকাশের দায় নিয়ে আপন দৃষ্টিভঙ্গিজাত অবস্থান থেকে মেধা দিয়ে সাহিত্য পরিমন্ডলে নিজেকে উজ্জ্বল করেছেন।

---

১. গোলাম কিবরিয়া পিনু, দৌলতননেছা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯ পৃ. ১৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩. মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৬৭, পৃ. ১৪৬
৪. এবনে গোলাম সামাদ, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দৌলতননেছা খাতুন ১৯৭৭ সালে 'নূরন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদনী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের 'আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার' এবং ১৯৮৮ সালে 'দৈনিক দাবানল পুরস্কার' লাভ করেন। এছাড়াও গাইবান্ধা সদর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক 'একুশের পদক' লাভ করেন। ১৯৮২ সালে গাইবান্ধা সাহিত্য পরিষদ এবং পরবর্তী সময়ে গাইবান্ধা গ্রন্থমেলা ও বৈশাখী মেলায় বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। 'আশরাফ হোসেন স্মৃতিপদক' সহ আরও পদকে সম্মানিত হন।

দৌলতননেছা খাতুন ৪ঠা আগষ্ট ১৯৯৭ সালে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর। গাইবান্ধা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

দৌলতননেছা খাতুন শেষ জীবনে গাইবান্ধা শহর ঘেষা ঘাঘট নদীর পাশেই নিজস্ব বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। সাথে ছিল দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ একমাত্র ছেলে-সন্তান। অসুস্থ ছেলের শেষ জীবনের দিনগুলো কাটছিল তাঁর। বহু সম্পত্তি ছিল কিন্তু এক এক করে সেসব সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে।[১]

দৌলতননেছা খাতুন নিঃশেষ হয়েছেন অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনকে দিন, তুবও কখনো কারো কাছে সাহায্যের জন্য হাত পাতেননি বা করুণা ভিক্ষা করেননি বরং অনেকে তাঁর সরলতা ও বিপদের সুযোগ নিয়ে সম্পত্তি অর্থ লোপাট করেছে বলে জানা যায়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিমন্ডলে দৃঢ় অবস্থানে থেকেও ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য হাপিত্যেশ করে ব্যক্তিগত মর্যাদা নষ্ট করেননি শেষ জীবনেও।[২]

প্রায় আশি বছর বয়সে অনন্য কৃতির অধিকারী এই সংগ্রামী নারীর জীবনাবসান ঘটলে তা সমাজে সামান্য আলোড়নও তুলতে পারেনি। যিনি হতে পারতেন মুক্তমনা তেজস্বী নারীর প্রতীক, তিনি সর্বদা থেকেছেন প্রচারবিমুখ, পাদপ্রদীপের আলোতে এসে দাঁড়ানোর চাইতে কর্মের সাধনাকে অধিক মূল দিয়েছেন, আর কেবল সে কারণে যদি থেকে যান অন্তরালে, তবে ক্ষতিটা সমাজেরই হবে বেশি।[৩] কিন্তু আজ হোক কাল হোক দৌলতননেছা খাতুনের কাছে আমাদের ফিরে আসতে হবে। বিশ শতকে বাংলার নারী জাগরণ তথা বাঙালি মুসলিম মহিলারা চেতনাগত বিবর্তনের হদিশ যদি কেউ পেতে চান তবে দৌলতননেছা খাতুনের জীবনকাহিনী তাঁকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।[৪]

---

১. গোলাম কিবরিয়া পিনু, দৌলতননেছা খাতুন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ২২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
৩. মফিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

জোবেদা খানম (১৯২০-১৯৮৯):

সনদপত্রে জোবেদা খানমের জন্মতারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ৫ই মার্চ, ১৯২০ সন। পারিবারিক ডায়রীতে ১৩২৪ সনের ২১শে শ্রাবণ সন্ধ্যা। সম্ভবত সনদে উল্লিখিত সনের এক বা দুই বছর আগে তাঁর জন্ম হয়ে থাকতে পারে। বাবা খন্দকার আজহারুল ইসলাম। মা মোসাম্মৎ আলতাফুন্নেছা। দাদা খন্দকার মহীউদ্দীন আহমদ ধর্মপরায়ণ ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। অনেক পুরুষ ধরেই এই পরিবার গ্রামের মানুষের কাছে ছিল সম্মানিত পীর পরিবার। তিনি মুরিদ করতেন। স্থায়ী আবাস কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলায় বালিয়াকান্দি গ্রামে। জোবেদা খানম বলেছেন, 'অজপাড়া গাঁ'।[১]

জোবেদা খানমের বাবা খন্দকার আজহারুল ইসলাম পড়াশুনায় মেধাবী ছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং এক পর্যায়ে স্কুল সব ইন্সপেক্টর পদে চাকরি লাভ করেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ.বি.টি। মেয়েদের ব্যাপারে গোঁড়া হলেও পোষাক পরিচ্ছদে, চাল-চলনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৌখিন, আধুনিক এবং উদার। গান বাজনার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। তিনি নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠ সন্তান জোবেদা খানম। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর বাবার মেধার অনেকখানি অধিকার করেছিলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল বই। বুদ্ধিমান পিতার তা দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই সমাজ শাসন ও বড় ভাই 'পীর সাহেব' এর ভয়ে আতঙ্কিত থাকলেও মেয়েকে সুযোগ মত বাংলা অংক কিছু কিছু পড়াতেন।[২]

জোবেদা খানম ছিলেন দশ ভাইবোনের একজন। পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন। ১৯৫৮ সনে বাবা মারা যান। ১৯৮৫ সনে মা। বাবা মার আবর্তমানে জোবেদা খানমই ছিলেন সকল ভাই বোনের যোগ্য অভিভাবক। সাধ্যমত তিনি চেষ্টা করেছেন সকল ভাইবোনকে মানুষ করতে। সকলেই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। সকলেরই তিনি প্রিয় 'বড় বু'।[৩] জোবেদা খানমের দুই ছেলে-মেয়ে, জাহানারা খানম মুন্নী এবং আবদুল মান্নাফ। বিশিষ্ট সমাজকর্মী জাহানারা খানম মুন্নী লন্ডনে বসবাস করতেন। ১৯৯০ সনের ৪ঠা জানুয়ারি বার্মিংহাম থেকে লন্ডনে ফেরার পথে তিনি এক গাড়ি দুর্ঘটনায় শিকার হন এবং মারা যান।[৪] ছেলে মেজর জেনারেল আবদুল মান্নাফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনিও বেঁচে নেই।

চব্বিশ পরগণার বশিরহাটের যে বাড়িতে জোবেদা খানম বড় হয়েছেন তার দোতলা বারান্দা ও জানালায় বাঁশের তৈরি চিকন জালি করা পর্দা ঝোলানো থাকতো সবসময়ই। বাবু ফণীভূষণ মজুমদারের বিরাট এলাকা জুড়ে দোতলা বাড়ি। চারদিকে পাঁচিল ঘেরা। জোবেদা খানমের বাবা এ বাড়িতে ভাড়া ছিলেন ১৫ বছর। বাড়িটির ছাদের উপর চিলেকোঠা সংলগ্ন খোলা জায়গায় মেয়েদের সামান্য খেলার ব্যবস্থা ছিল। মাঝে মধ্যে দহলিজ ঘরে মাহফিল বসত।

---

১. বেগম রাজিয়া হোসাইন, জোবেদা খানম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯২, পৃ. ১০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, ১১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য এবং ধর্মীয় সেইসব আসরে মেয়েদের যোগদান ছিল নিষেধ। পাশের ঘরে বসে এইসব শোনার আগ্রহ ছিল জোবেদা খানমের। বাবার কাছে মোটামুটি বাংলা শেখা হয়েছে। তাই পাশের ঘরে বসে শুনে শুনে হলেও তিনি বেশ কিছু উপলব্ধি করতে পারতেন এবং লেখার চেষ্টা করতেন। তাঁর সেই কাঁচা লেখার খাতার নাম ছিল 'সোনার কণ্ঠী'। বাড়িতে গান বাজনার রেওয়াজ ছিল। চোঙওয়ালা কলের গানের আব্বাস উদ্দীন, আঙুরবালা, পঙ্কজ মল্লিক, ইন্দুবালা, রাধারাণী, কাননবাল, কে.সি.দাস, কে মল্লিকের গান বাজত। শুনে শুনে জোবেদা খানম কবিতা লিখতেন। কবি জসিম উদ্দীন একবার জোবেদা খানমের বাবার হাতে এই 'সোনার কণ্ঠী' দেখে প্রচুর প্রশংসা করেন। বাবা খন্দকার আজহারুল ইসলামও লিখতেন। সে সময় তাঁর তিনখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। হিমালয় বঙ্গে, আশার প্রভাত এবং আলোকের পথে। কোলকাতার বিখ্যাত মখদুমী লাইব্রেরি ছিল এই বইগুলোর প্রকাশক ও বিক্রেতা। বাড়িতে বইয়ের বেশ ক'খানা আলমারি ছিল। যদিও বাবাকে ছাড়া খোলা নিষেধ, তবু চুপিসারে প্রায় সব বই জোবেদা খানম পড়ার চেষ্টা করতেন। পড়ার ঝোঁক ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি। এসময় বাবা তাঁর এই আগ্রহের জন্য চাবি তারই হাতে তুলে দেন। চব্বিশ পরগণার বশির হাটে নতুন মেয়ে স্কুলে জোবেদা খানম যাবার অনুমতি না পেলেও ডাক্তার চাচার কাছে বাড়িতে পাঠ্য বিষয়গুলোর পড়া শেষ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং এসময় আপার প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পান। একটা পৃথক বন্ধ ঘরে দুই তিনটি মেয়ে প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই পরীক্ষা দেন। জোবেদা খানমের বাবা স্কুল পরিদর্শক ছিলেন বলে কর্তৃপক্ষের এই অনুমতি পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।[১]

তের বছর বয়সে জোবেদা খানমের বিয়ে হয়ে যায়।[২] স্বামী ডাঃ আব্দুর রহিম খান জোবেদা খানমকে নিজেই পড়াতে শুরু করেন। বছর পাঁচেকের মধ্যেই জোবেদা খানম প্রাইভেটে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর সিনিয়র ট্রেনিং কোর্স সমাপ্ত করেন। স্বামী তাঁকে ভিক্টোরিয়া কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি করে দেন। ইতোমধ্যে তাঁদের তিন সন্তান হয়েছে। তৃতীয় সন্তান পান্না জন্মগ্রহণ করে এবং মারা যায়। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও জোবেদা খানম ভেঙে পড়েননি। চাকরি করতে করতে তিনি প্রাইভেটে আইএ পাশ করেন। তারপর প্রাইভেটে বি.এ পাশ করেন। চাচাত ভাই রফিকুল আলম এবং নাজমুল আলম তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তিনি পরে কোলকাতা ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি পাশ করেন। তখন ১৯৪৬ সন। দাঙ্গা শুরু হয়। দেশ বিভাগের আন্দোলন চলে। তিনি প্রাণ নিয়ে দুই সন্তানসহ কুষ্টিয়াতে চলে আসেন। দেশ বিভাগের পর তিনি যখন ঢাকায় কামরুন্নেসা স্কুলে শিক্ষিকা তখন ১৯৫০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে এম.এ পাশ করেন। আমেরিকার কেন্টাকী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট' ট্রেনিং গ্রহণ করেন

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬, ১৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

এবং কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং গ্রহণ করেন গ্রীস, ডেনমার্ক, জ্যামাইকা থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারলটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বয়স্ক শিক্ষার উপরও ট্রেনিং গ্রহণ করেন।[১] জোবেদা খানমের সময়কালে নারীশিক্ষা ছিল পশ্চাৎপদ অবস্থানে, নারীদের বিবাহ হত অল্প বয়সে এ রকম সামাজিক পরিবেশে নিজেও মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্বাসী ও নিজের কর্মস্পৃহা নিয়ে ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন, যা মুসলিম নারী হিসেবে কম উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়, কম সাফল্যের উদাহরণ নয়। এ ধরণের আত্মপ্রতিকৃতি তাঁর সময়কালে বিশেষ উজ্জ্বল বলেই বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে।

স্বামীর মৃত্যুর পর জোবেদা খানম হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে দেখেন তাদের সবকিছুই এমনকি স্বামীর পোশাক কলম ঘড়ি পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। তখনও তাঁর শ্বশুর বেঁচে ছিলেন। তাই আইন অনুযায়ী জোবেদা খানম সম্পত্তির কিছুই পেলেন না। শূন্য বুকে দু'টি সন্তানকে ধারণ করে তাকালেন সামনের পৃথিবীর দিকে। মনে হল তাই বুঝি স্বামী শিক্ষা দান করে গেছেন। নিজের বাবার বাড়িতেও যাননি তিনি। কারণ ঘরে বিমাতা আছেন। কোথাও সন্তান নিয়ে আশ্রিত হতে তাঁর মন চাইল না। স্কুলের চাকরি সম্বল করে নতুনভাবে জীবন শুরু করেন। বেতনে চলত না বলে চার পাঁচটা টিউশনি করতেন। পূর্বের বাসাবাড়ি ছেড়ে দেয়া হল। শরীফ লেনে একটা ছোট্ট এক ঘরের বাড়ি ভাড়া নিলেন। পাশেই বাস করতেন তাঁর এক আত্মীয় আবু তালেব, লেবার অফিসের চাকুরে। তিনি অনেকটা আর্শীবাদের মতো জোবেদা খানমের অসহায় জীবন অভিভাবক হলেন। তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে আবদুল মান্নাফের শ্বশুর।[২]

জোবেদা খানম কলকাতায় কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষয়ত্রী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং দেশ বিভাগের (১৯৪৮) পর ঢাকায় এসে কামরুন্নেসা স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করে তিনি সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর (১৯৫৪-৫৫), ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের ইনস্ট্রাক্টর (১৯৫৫-৬১), জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার সহকারী পরিচালক (১৯৬১-৭১), শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্পেশালিস্ট (১৯৭১-৭৬) এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রথম পরিচালক (১৯৭৬-৮৩) চেয়ারম্যান (১৯৮৩-৮৫) পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যানের (১৯৭২-৮৫) দায়িত্বও পালন করেন।[৩] এসব দায়িত্বের পাশাপাশি জীবন নির্বাহের জন্য গাইবান্ধা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জুনিয়র শিক্ষিকার চাকরি করেন। যশোর মোনেম.ই. গার্লস স্কুল ও কুষ্টিয়ার চারুলতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকার পদে কাজ করেন। আবার ১৯৪৬ সালের সময় কলকাতার পার্ক সার্কাসে মুসলিম গার্লস স্কুলে প্রভাতী শাখায় চাকরি করে সংসার ব্যয় নির্বাহ করেন। জোবেদা খানম একজন সংগ্রামী মহিলা যিনি নিজে সংসারের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য যেমন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন চাকরির জন্য শ্রম দিয়েছেন, তেমনি নিজেকে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের ডিগ্রি গ্রহণে তৎপর থেকে নিজেকে তাঁর সময়কালে একজন শিক্ষিত নারী বিশেষত মুসলিম নারীর উজ্জ্বল প্রতিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩. ওয়াকিল আহমদ, জোবেদা খানম, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

জোবেদা খানম তাঁর কর্মবহুল জীবনের সাথে সমাজকর্ম ও সমাজ সংগঠনকেও যুক্ত করেছেন। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া যখন দুর্ভিক্ষ এল তখন তিনি একাধিক রিলিফ ক্যাম্পে তত্ত্বাবধায়কের কাজ করেন। তিনি ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত অল পাকিস্তান উইমেন্স এসোসিয়েশন সংক্ষেপে আপওয়ার সদস্য, ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরে চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত বিজনেস এন্ড ক্যারিয়ার হিউম্যান্স ক্লাবের সাংগঠনিক কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরে সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা ইউনির্ভাসিটি উইমেন্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ কাউন্সিল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদমর্যাদায় থেকে কাজ করেছেন।

জোবেদা খানম উচ্চতর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সভা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, তৎকালীন পশ্চিম জার্মান ও পূর্ব জার্মান, সুইজারল্যান্ড, ইটালী, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, নর্থ কোরিয়া, বুলগেরিয়া, আমেরিকা, ডেনমার্ক, গ্রীস, জ্যামাইকা, মরক্কো, তুরস্ক, মিশর, ভারত, পোর্টোরিকা, নেপাল, নরওয়ে, হংকং, ফিলিপাইন, ইরাক, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেছেন। একজন মুসলিম নারী হিসেবে তাঁর সময়কালে এত দেশ ভ্রমণ উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

জোবেদা খানম যে সময়কালে বেড়ে ওঠেছেন, তা ছিল ব্রিটিশ শাসিত আমল, তারপর পাকিস্তানী শাসনামল, এরপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল। এই সময়কালে তিনি যা অনুভব করেছেন, তা তিনি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, এইসব ভাষ্য থেকে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা ও ভূমিকা আমরা খুঁজে পাই। ব্রিটিশদের দ্বারা পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে কী নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে অন্যান্যদের সাথে জোবেদা খানমের অনুভব ও অবস্থার বর্ণনা তাঁর লিখিত ডায়েরিতে এভাবে উঠে আসে, 'এমনি অনেকের কাছ থেকে অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিয়ে একদিন রওয়ানা হলাম নিজের দেশে পাকিস্তানে। অনেক কষ্টে ট্রেনে উঠলাম। কিন্তু ট্রেনে পা রাখার জায়গা ছিল না। নিজের সন্তান দু'টিকে নিয়ে টয়লেটের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে যাচ্ছি।..... যাবার পথেও ভয় কম ছিল না। তখনও ট্রেন থেকে মানুষ টেনে নামিয়ে মেরে ফেলার খবর আসছে বহু জায়গা থেকে। প্রতি ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য।'[১]

জোবেদা খানমের ডায়েরিতে পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান হওয়ার পর মানুষের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার চিত্র এভাবে লিখিত হয়, 'আমরা বেশ বুঝতে পারতাম পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে সমান সম্মান ও মর্যাদা দেয়নি। তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে ছিল একটা মুখোশ ঢাকা তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা। তাঁদের প্রতিটি কাজে ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল যে তাঁরা আমাদের কলোনী করেই রাখতে চায়।'[২]

---

১. বেগম রাজিয়া হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

জোবেদা খানম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী উত্তাল দিনগুলোতে নিজেও সম্পর্কিত ছিলেন, এমন কি রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দিতেন, এমন বর্ণনা তাঁর ভাষ্য থেকে পাই, 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাল ধরে দাঁড়াবার জন্যে এলেন দুই নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এবং মৌলানা ভাসানী। কিন্তু এই দুই জনদরদী দেশপ্রেমিক নেতার মতও পথ এক ছিল না। প্রায়ই দুই নেতার জনসভা বসত পল্টন ময়দানে। শ্রোতার দলে মেয়েদের মধ্যে আমিও বসে যেতাম বক্তৃতা শুনতে।... ১৯৬৬ সনের ১২ ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬ দফার কার্যসূচি। মিছিলে মিছিলে শ্লোগানে শ্লোগানে প্রতিদিন মুখর হয়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি এলাকা।....... ৭ই মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা হলো শেখ মুজিবুরের আহ্বানে। শেখ সাহেব এই সভায় নির্দেশ দিলেন প্রতিটি ঘরকে দূর্গ করে গড়ে তুলে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। মহিলাদের মধ্যে বসে কেমন যেন শিউরে উঠলাম। এত অস্ত্রশস্ত্রের মুখোমুখি হলে কি ঘটবে বাংলার মানুষের জীবনে? আমি শিউরে উঠলেও বাংলার মানুষ শিউরে উঠলো না। তাঁরা সত্যই দাঁড়ালো।'[১]

তৎকালীন সমাজে একজন বিধবা মুসলমান রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চলার যে এমন বলিষ্ঠ প্রত্যয়, দু'টি সন্তানের ভরণপোষণের গুরুদায়িত্ব পালন এবং একটানা রাতদিন কাজ করে যাওয়ার সমন্বিত শক্তি ও সাহস তা অবশ্যই ব্যতিক্রমী। স্বামীর সম্পত্তির কানাকড়ি থেকেও বঞ্চিত বিধবা জোবেদা খানম একদিন ঠিকই ভেবেছিলেন, 'জীবন কাটাবো কি করে?' সামনের পৃথিবীকে দেখেছিলেন একেবারে শূন্য। তবু তিনি কারো আশ্রয়ে যাননি। এমনকি বাবার বাড়িতেও নয়। বহু আশ্রিত বিধবার অপমান অসম্মান দেখে দেখে তিনি দু'টি সন্তান নিয়ে এরকম অবস্থার শিকার হতে চাননি। নিজের সন্তানকে মানুষ করেছেন। অতি সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করেছেন। টিউশনি করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অদম্য উৎসাহে উচ্চতর ডিগ্রিগুলো অর্জন করেছেন। এসবই সম্ভব হয়েছে তাঁর একাগ্রতা ও নিষ্ঠার জন্য। প্রবল আত্মবিশ্বাস তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেছে সামনে। ক্রমান্বয়ে তিনি উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। সরকারি চাকরির গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। দেশ-বিদেশের শিক্ষা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা সমিতিতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তার সকল ব্যস্ততার মধ্যেও কাজ কের গেছে একটি সৃষ্টিশীল মন, দুঃস্থ অনাথকে সেবা দিয়ে গেছে একটি ভালোবাসার হৃদয়। নারী শিশুদের জন্য তাঁর মমতা অপরিসীম। তিনি তাঁর বহু গল্প উপন্যাসে এদের সমস্যা তুলে ধরেছেন। দেশ ও সমকালীন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন। তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন, গর্বিত হননি।'[২]

জোবেদা খানম ১৯৮৯ সালের ২৬ জানুয়ারি তাঁর মহাখালীস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬, ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ছোটবেলা থেকেই জোবেদা খানম শিল্প-সাহিত্যের পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। স্কুলে যাবার সুযোগ না ঘটলেও বাড়ির পরিবেশ তাঁর মন মানস তৈরির সহায়ক ছিল। বাবা আজহারুল ইসলাম বিশিষ্ট সাহিত্যক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। বাড়িতে অনেক বই ছিল। জোবেদা খানম চুপিসারে আলমারীর সব বই পড়তেন। বাড়িতে গান-বাজনা সাহিত্যের আসর হলে পাশের ঘর থেকে সব শুনতেন। এমনি করে তার একটি সৃষ্টিশীল মনের জন্ম হয়। কাঁচা হাতের লেখা 'সোনার কণ্ঠী' এর প্রমাণ। শিশু মনের ভাবনা-চিন্তা এবং জীবন রহস্যের উদ্ভাবনী শক্তির প্রথম প্রকাশ এই 'সোনার কণ্ঠী'।[১] বিয়ের পর কোলকাতায় বাসায় বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সাহচর্যে তিনি পরিচিত হন কবি জসিমউদ্দীন, গায়ক আব্বাসউদ্দীন, কবি মঈনউদ্দীন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে। বিভিন্ন সাহিত্য আসরে স্বামী-স্ত্রী যোগ দিতেন। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু, মুজিবুর রহমানের আনোয়ারা জোবেদা খানমের মনকে খুবই নাড়া দিত। আত্ম-প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ করে তুলত নজরুলের জীবন জাগানো গান।[২]

মুসলমান লেখক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে সওগাত, মাহেনও, মোহাম্মদী পত্রিকার বিশেস ভূমিকা ছিল। জোবেদা খানম তখনো পুরোপুরি লেখার জগতে আসেননি। তবে তাঁর ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ছিল। কিছু কিছু লেকা সওগাত, মৃত্তিকা, মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনে। তারপর বহু ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেন তিনি। তাঁর লেখার উপজীব্য বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য হলো, 'সামাজিক সমস্যা, প্রেম, ভ্রমণকাহিনী, শিশুদের সমস্যা, মহিলাদের সমস্যা, বিভিন্ন দেশের অতি পরিচিত শিশুদের কাহিনী, জন্তু জানোয়ারের জীবন ইত্যাদি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চিন্তাকে দখর করেছে।[৩]

একজন লেখিকা হিসেবে জোবেদা খানমের বিশেষ খ্যাতি ছিল। উপন্যাস, গল্প, নাটক, শিশুসাহিত্য বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত অভিশপ্ত প্রেমে (১৯৫৯), আঁখি দু'টি তারা (১৯৬৩), আকাশের রং (১৯৬৪), বনমর্মর (১৯৬৭), অনন্ত পিপাসা (১৯৬৭) উপন্যাস, একটি সুরের মৃত্যু (১৯৭৪), জীবন একটি দুর্ঘটনা (১৯৮১), গল্পগ্রন্থ, ঝড়ের স্বাক্ষর (১৯৬৭), ওরে বিহঙ্গ (১৯৬৮) নাটক এবং গল্প বলি শোন (১৯৬৬), মহাসমুদ্র (১৯৭৭), সাবাস সুলতানা (১৯৮২) শিশুসাহিত্য। শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার' (১৯৮৩) লাভ করেন।[৪] নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭৪ সনে তিনি 'নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদনী' পুরস্কার অর্জন করেন।

গল্প উপন্যাসে তিনি সাধারণত রোমান্টিক এবং মিলনাত্মক যবনিকা টানতে আগ্রহী। কেউ কেউ বলেছেন, নিজের জীবনের বিয়োগব্যথাকে তিনি লেখনীতে মিলনাত্মক করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। সময়ের গতির সঙ্গে নারী সমাজের আত্মবিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে তাঁর লেখনী বারবার সোচ্চার হয়েছে। তাঁর রচনার মূল বক্তব্য বলা যায় সংগ্রামই মানুষকে আত্মবিশ্বাস আ উন্নতির

১. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

পথে সফলতার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। পরনির্ভরশীল আর বিলাসবহুল জীবন কখনো উন্নতর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। স্বাধীনতা উত্তরকালের পরবর্তিত পরিস্থিতিকে উদ্ভূত নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যারা সাহিত্যে সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে জোবেদা খানমের নাম বিশেষভাবে স্মারণীয়।[১]

জোবেদা খানমের আরও গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি। তার নাটক রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। তার দু'টি আঁখি দু'টি তারা এবং একটি শিশু উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তিনি নিজে রেডিও-টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে প্রকাশিত মাসিক শিশু এবং ফুলঝুড়ি নামক আর একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তিনি যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন উৎসাহ ও শুভকামনা তাঁরা হলেন- সুফিয়া কামাল, শামসুন নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, প্রফেসর কবি সৈয়দ আলী আহসান, নাসিরউদ্দীন, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, কবি মঈনউদ্দীন, কবি জসিমউদ্দীন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. আবদুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দীন প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ।[২] আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বনমর্মর উপন্যাসটি পড়ে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, কথাগুলো এরকম 'আপনার লেখা বনমর্মর পড়ে খুব ভালো লাগল। তাই আপনার ঠিকানা যোগার করে এই চিঠি লিখছি। আপনি লেখার অভ্যাসটা ছাড়বেন না। এমনি ভালো লাগার কথা তিনি অনেকের কাছে শুনেছেন।[৩]

১. বেগম রাজিয়া হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১, ৩২
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯):

১৯১১ সালের ২০ জুন (১০ই আষাঢ়, ১৩২৮) বরিশালের শায়েস্তাবাদ নবাব পরিবারে সুফিয়া কামালের জন্ম।[১] ডাক নাম ছিল হাসনা বানু। নানী রেখেছিলেন এই নাম আরব্য উপন্যাসের হাতেম তাইয়ের কাহিনী শুনে। সুফিয়া খাতুন নাম রেখেছিল দরবেশ নানা। তিনিই আজকের সুফিয়া কামাল।[২] 'একালে আমাদের কাল' শীর্ষক লেখায় সুফিয়া কামাল তাঁর জন্ম প্রসঙ্গে বলেছেন এভাবে, 'মাটিকে বাদ দিয়ে ফুল গাছের যেমন কোন অস্তিত্ব নেই আমার মাকে বাদ দিয়ে আমারও তেমন কোন কথা নেই। আমি জন্ম নেবার আগেই মায়ের মুখে 'হাতেম তাইয়ের কেচ্ছা' শুনে আমার নানীআম্মা আমার নাম রেখেছিলেন হাসনাবানু। আমার নানা প্রথমে বয়সে সদর আলা থেকে জজগিরি পর্যন্ত সারা করে শেষ বয়সে সাধক 'দরবেশ' নাম অর্জন করেছিলেন। শুনেছি যেদিন আমি হলাম, নিজের হাতে আমার মুখে মধু দিয়ে তিনি আমার নাম রেখেছিলেন সুফিয়া খাতুন। কিন্তু আমার ডাক নাম হাসনা বানুটাই আমাদের পরিবারে প্রচলিত। সুফিয়া বললে এখনও কেউ কেউ আমাকে হঠাৎ চিনতে পারেন না। আমার ভাইয়া ছোটবেলায় আমাকে ডাকতেন 'হাচুবানু' বলে; কেউ কেউ বলতো 'হাসুবানু'।'[৩]

তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল বারি পেশায় ছিলেন উকিল। সুফিয়ার যখন সাত বছর বয়স তখন তাঁর পিতা গৃহত্যাগ করেন। নিরুদ্দেশ পিতার অনুপস্থিতিতে তিনি মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের স্নেহ পরিচর্যায় লালিত-পালিত হতে থাকেন। শায়েস্তাগঞ্জে নানার বাড়ির রক্ষণশীল অভিজাত পরিবেশে বড় হয়েও সুফিয়া কামালের মনোগঠনে দেশ, দেশের মানুষ ও সমাজ এবং ভাষা ও সংস্কৃতি মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।[৪] সুফিয়া কামাল নিজেও 'একালে আমাদের কাল' লেখায় উল্লেখ করেন, 'আমরা জন্মেছিলাম এক আশ্চার্যময় রূপায়নের কালে। প্রথম মহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম রেনেসাঁর পুনরুত্থান, রাশিয়ান বিপ্লব, বিজ্ঞান জগতের নতুন নতুন আবিষ্কার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবরূপ সূচনা, এসবের শুরু থেকে যে অভাবে মধ্যে শৈশব কেটেছে তারই আদর্শ আমাদের মনে ছাপ রেখেছে সুগভীরভাবে।৫

সুফিয়া কামাল তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তখনকার পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবেশে বাস করেও তিনি নিজ চেষ্টায় হয়ে ওঠেন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত। বাড়িতে উর্দুর চল থাকলেও নিজেই বাংলা ভাষা শিখে নেন। পর্দার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন একজন আধুনিক মানুষ।[৬]

---

১. সাজে কামাল সম্পাদিত, সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০২, পৃ. ১০
২. কুররাতুল আইন তাহমিনা, শুভ জন্মদিন সুফিয়া কামাল, অবসর (৪২), ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২০ জুন, ১৯৯৮, পৃ. ৪
৩. সাজেদ কামাল সম্পাদিত, সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০
৪. আহমদ কবির, সুফিয়া কামাল, বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ২২১
৫. সাজেদ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮
৬. আহমদ কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৩ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে মামাত ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে সুফিয়ার বিয়ে হয়। তখন তিনি 'সুফিয়া এ. হোসেন' নামে পরিচিত হন। নেহাল হোসেন ছিলেন একজন উদার প্রকৃতির মানুষ। তিনি সুফিয়াকে সমাজসেবা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেন। সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে সুফিয়ার যোগাযোগও ঘটিয়ে দেন তিনি। এর ফলে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং ধীরে ধীরে তিনি একটি সচেতন মনের অধিকারীণী হয়ে ওঠেন। তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় পশ্চাৎপদ মহিলাদের মধ্যে গিয়ে সেবামূলক কাজ করা। ১৯২৩ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম গল্প 'সৈনিক বধু' যা বরিশালের 'তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১]

মহাত্মা গান্ধীর হাতে তুলে দেন নিজ হাতে চরকায় কাটা সূতা (১৯২৫)। কলকাতায় গেলেন। সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হল প্রথম কবিতা বাসন্তী (১৯২৬)। সামাজিক, পারিবারিক বাধা ভেঙ্গে বাঙালি পাইলট চালিত বিমানে চড়লেন (১৯২৮)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন প্রমুখের প্রভাব ও সহযোগিতায় তাঁর জীবন বিকশিত হয়েছে কৈশোর থেকে তারুণ্যে।[২]

বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কবি তারুণ্য পেরিয়েছেন। ২১ বছর বয়সে নেহাল হোসেনকে হারালেন (১৯৩২), বেগম রোকেয়াকে হারালেন (১৯৩২)। পারিবারিক অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব তাঁকে নিঃশেষ করতে পারেনি। তিনি মেরুদণ্ড সোজা করে জয় করেছেন মানবসত্তা। অনেকেই তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। সর্বাগ্রে বলতে হয় কামালউদ্দিন খানের নাম, যিনি ১৯৩৯ এ সুফিয়া কামালের কোমল হাতে তুলে নিয়ে ৩৮ বছর সুফিয়া কামালের দাম্পত্যজীবনের সঙ্গী হয়েছিলেন। মাকে হারালেন ১৯৪১ এ। পুত্র শোয়েবকে হারালেন ১৯৬৩ তে। স্বামী কামালউদ্দিন খানকে হারালেন ১৯৭৭ এ।[৩]

সুফিয়া কামাল সাহিত্যচর্চা পাশাপাশি সমাজসেবা ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায়, 'চৌদ্দ বছর বয়সে বরিশালে প্রথমে সমাজ সেবার সুযোগ পাই। বাসন্তী দেবী ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইয়ের ছেলের বৌ। তাঁর সঙ্গে দুঃস্থ মেয়েদের বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য মাতৃসদনে আমি কাজ শুরু করি।'[৪]

জীবনের পরবর্তী সময়ে সমাজসেবা ও সংগঠনমূলক কাজের বিবরণ সুফিয়া কামাল এভাবে বর্ণনা করেন, 'প্রথম জীবনে কাজ করার পর আঠারো থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'আঞ্জুমান খাওয়াতিনে' কাজ করি। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল কলকাতার বস্তি এলাকার মুসলমান মেয়েদের মনোভাব একটু শিক্ষিত করে তোলা।'

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
২. কুররাতুল আইন তাহমিনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪. নূরজাহান মুরশিদ, বেগম সুফিয়া কামালের মুখোমুখি, একাল, ঢাকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৬, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

মিসেস হামিদা মোমেন, মিসেস শামসুন্নাহার মাহমুদ, সরলা রায়, জগদীশ বাবুর স্ত্রী অবলা বসু, ব্রহ্মকুমারী দেবী এরা সকলেই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে। আমার স্বামী ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ, এসব কাজে তাঁর কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি আমি। এরপর ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় বর্ধমানে এবং ৪৬ এর 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'র হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বিপন্ন এবং আহতদের মধ্যে কাজ করেছি। এই সময়ই তো হাজেরা মাহমুদ, রোকেয়া কবীর, হোসনা রশীদ ও তোর (নূরজাহান মুরশিদ) সঙ্গে আমার পরিচয় হল।'[১]

১৯৪৭ এর পরই ঢাকায় এলাম। প্রথমে ওয়ারি মহিলা সমিতি করি এবং এই সমিতির মাধ্যমেই কাজ শুরু করি। প্রখ্যাত নেত্রী লীলা রায় আমাকে সমাজ কল্যাণের কাজে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। এরপর পর্যায়ক্রম ভাষা আন্দোলন, গণআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে আমি বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ি।[২]

১৯৩১ সালে সুফিয়া মুসলিম মহিলাদের মধ্যে প্রথম 'ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন' এর সদস্য নির্বাচিত হন।[৩] ১৯৩৩-৪১ পর্যন্ত তিনি কলকাতা কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এই স্কুলেই তাঁর পরিচয় হয় প্রাবন্ধিক আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) এবং কবি জসীম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) এর সঙ্গে।[৪] ১৯৪৮ সালে সুফিয়া ব্যাপকভাবে সমাজসেবা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। এ বছরই তাঁকে সভানেত্রী করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সুলতানা পত্রিকা, যার নামকরণ করা হয় বেগম রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থের প্রধান চরিত্রের নামানুসারে।[৫]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর দমন-নীতির অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তিনি 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন' পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালে 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' (বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) গঠিত হলে তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাচন হন এবং আজীবন তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[৬] স্বাধীনতার পরও সুফিয়া কামাল অনেক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। তিনি যে সব সংগঠনের প্রতিষ্ঠা-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন সেগুলো হলোঃ বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন কমিটি এবং দুঃস্থ পুনর্বাসন সংস্থা। এছাড়াও তিনি ছায়ানট, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এবং নারী কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী ছিলেন।[৭]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩. আহমদ কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থটি। এর ভূমিকা লিখেছিলেন নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ এটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।[১] রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে সুফিয়া এন. হোসেন (তাঁর তখনকার পরিচয়) কে লেখেন, 'তোমার কবিত্ব আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা।' শুধু সাহিত্যে নয়, বাংলাদেশের জনগণের মনে বেগম সুফিয়া কামাল ধ্রুব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁর স্বকীয় স্বভাবগুণে।[২]

সুফিয়া কামাল একালে আমাদের কাল নামে একটি আত্মজীবনী রচনা করেছেন। তাতে তাঁর ছোটবেলার কথা এবং রোকেয়া প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। তিনি অনেক ছোটগল্প এবং ক্ষুদ্র উপন্যাসও রচনা করেছেন। কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭) তাঁর একটি উলেস্নখযোগ্য গল্প গ্রন্থ। তাঁর আরও কয়েকটি উলেস্নখযোগ্য গ্রন্থ হলোঃ মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), উত্তপ্ত পৃথিবী (১৯৬৪), অভিযাত্রিক (১৯৬৯) ইত্যাদি। তাঁর কবিতা চীনা, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, রম্নশ, ভিয়েতনামিজ, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে রম্নশ ভাষায় তাঁর সাঁঝের মায়া গ্রন্থটি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে বাংলা একাডেমি তাঁর কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ দিয়ে Mother of Pears and other poem এবং ২০০২ সালে সুফিয়া কামালের রচনা সমগ্র প্রকাশ করেছে।[৩]

কেয়ার কাঁটা সমেত সুফিয়া কামালের মোট প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ সংখ্যা চার। অন্য তিনটি হল, সোভিয়েতের দিনগুলো (ভ্রমণ ১৯৬৮), একালে আমাদের কাল (আত্মজীবনীমূলক রচনা, ১৯৮৮) এবং একাত্তরের ডায়েরী (১৯৮৯)। অগ্রন্থিত গদ্যের মধ্যে রয়েছে একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস অম্স্মরা। বৈশাখ ১৩৪৫ থেকে পাঁচ কিস্তিতে অম্স্মরা প্রকাশিত হয় কলকাতার মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায়। এর পরে আছে আর একটি ছোট্ট উপন্যাস (Novella) জনক। সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রিমিয়ায় স্বাস্থ্য নিবাসে ১৯৭৭ সালে ৬ থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে মাত্র ১৫ দিনে সুফিয়া কামাল জনক রচনা করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত নূরজাহান বেগম সম্পাদিত সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় ১২ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় (৩০ বর্ষ ৩৭ থেকে ৪৮ সংখ্যা, ১৯ মার্চ, ১৯৭৬ থেকে ৪ জুন, ১৯৭৮)। উপন্যাস দু'টি সংগ্রহের কাজ চলছে।[৪]

সাহিত্যচর্চা জন্য সুফিয়া কামাল অসংখ্যা পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৬১ সালে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'তঘমা-ই-ইমতিয়াজ' নামক জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন; কিন্তু ১৯৬৯ সালে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি তা বর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি পুরস্কার ও পদক হলোঃ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), Women's Federation for World Peace Crest (১৯৯৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণপদক (১৯৯৬),

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১
২. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, জননী গরীয়সী, শুক্রবারের সাময়িকী, প্রথম আলো, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১৩
৩. আহমদ কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
৪. সাজেদ কামাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের Lenin Centenary Jubilee Medel (১৯৭০) এবং Czechoslovakia Medal (১৯৮৬) সহ বেশ কয়েকটি আন্ত র্জাতিক পুরস্কারও লাভ করেন।[১] ১৯৯৯ সালে ২০ নভেম্বর ঢাকায় সুফিয়া কামালের জীবনাবসান ঘটে।

সুফিয়া কামাল কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত কিন্তু গদ্যলখক হিসেবেও তাঁর অবদান রয়েছে। বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী ও সচেতন নাগরিক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উজ্জ্বল। তাঁর সময়কালে পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের একজন মহিলা হিসেবে সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে ভূমিকা রাখা ছিল শুধু গৌরবের নয়, বিশেষভাবে অসাধারণ বিষয়। সুফিয়া কামাল এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বেড়ে ওঠা সময়কালের সামাজিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেন, 'তখনকার সময়টাতে শ্রেণিভেদ একটা বড় ব্যাপার ছিল। বড়লোক, ছোটলোক, সম্ভ্রান্ত লোক, চাষী কৃষক, কামার-কুমার ইত্যাদি সমাজে বিভিন্ন ধরণের বংশ ছিল এবং এইসব বংশে শ্রেণিবিভেদ ছিল। সেই শ্রেণিভেদ অনুসারে বলা যায়, তখন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের ঘরের মেয়েরা পড়ালেখা বেশি জানতো না। তারা বড়জোর কুরআন শরিফ পড়া শিখতো। আর হয়তো বাবা-মায়ের কাছে দোয়া-দরূদ নামাজ পড়া শিখতো। এই ছিল তাদের শিক্ষা। স্কুল-কলেজের বালাই তো ছিলই না। তবে ধর্মীয় শাসনের একটি প্রক্রিয়া ছিল। সেটা ছেলে-মেয়ে সকলের ওপরই কার্যকর থাকতো।'[২]

সুফিয়া কামাল পর্দাযুগের মেয়েদের সঙ্গে এখনকার সময়কালের মেয়েদের তুলনা করেন এভাবে, যাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনা লক্ষ্য করা যায়, আগে মেয়েরা ষোলআনা নির্ভরশীল ছিল পুরুষের ওপর। স্ত্রীকন্যার কি প্রয়োজন না প্রয়োজন তা স্বামী বা পিতাই নির্ধারণ করতেন। যেখানে পুরুষ মানুষটি এসব ব্যাপার তেমন মাথা ঘামাতো না সেখানে স্ত্রীকন্যা নীরবে কষ্ট সহ্য করতো এবং সেই পরিস্থিতিতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতো। এখন আবার সে সব মেয়েদের রোজগার আছে, স্বামীরা তাদের রোজগার কেমন করে খরচ হবে তাও বলে দিতে চায়। আর টাকা পয়সার ব্যাপারে দেখা গেছে মেয়েরা নিজের টাকা যত খরচ করে স্বামীরা ততই হাত গুটোয়। পুরুষদের সম্পর্কে উক্তি আছে 'তারা হাতে মারে, ভাতে মারে, দাঁতে মারে' এই অবস্থায় একজন মানুষ সুখী কেমন করে হবে? আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কত স্তরের দুঃখ যে আছে তার ঠিক নেই। তাই তুলনামূলকভাবে কাউকে কাউকে একটু বেশি মনে হয়। পর্দার যুগে কোন অবস্থাতেই মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে পালাতে পারতো না-আজকাল পারে। মেয়েদের স্বামী পরিত্যাগ করার ঘটনাও বিরল নয়। আজকাল মেয়েদের স্বাধীনতা বেশি এবং সেই অনুপাতে নিশ্চয়ই সুখও বেশি।[৩]

১. আহমদ কবির, পৃ. ২২২
২. কুররাতুল আইন তাহমিনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৩. নূরজাহান মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়া কামাল নারীর সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে মুক্তির উন্মোচন করার জন্য নিবেদিত ছিলেন। নারীর সামগ্রিক মুক্তির জন্য তাঁর ভূমিকা ছিল সমসময়ের জন্য উদ্দীপনামূলক ও আগ্রহদ্দীপক, সে কারণে তাঁর অনুভব এমন, 'আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে এই দেখে যে, মেয়েরা আগের তুলনায় এখন অনেক সাহসী হয়েছে। মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরিয়ে অস্পষ্ট নিজেদের কথা বলতে শিখেছে। আমরা চেয়েছিলাম, মেয়েরা কথা বলতে শিখুক, সাহসী হয়ে উঠুক, নিজেদের অধিকার তারা বুঝতে পারুক। এটা এখন হয়েছে। এটা বড়ো আনন্দের।'[১]

তবে নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে সুফিয়া কামালের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগত বিবেচনা ছিল, এ কারনে তিনি নারী স্বাধীনতার সাথে সাথে নীতি আদর্শ ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনি প্রতিভাস তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায়, 'মেয়েরা স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু অনেকেই সেই স্বাধীনতার ব্যবহার সবসময় সঠিকভাবে করতে শিখেনি। অনেক সময় অপব্যবহার করছে। এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগে। এই যে মেয়েরা অপ্রয়োজনে বিদেশের ফ্যাশনের হুজগে নিজেদের সংস্কৃতি বিরোধী কাপড় পরছে, ব্যবসায়ী মহল তাদেরকে ব্যবহার করছে নানাভাবে, মেয়েরা ভাবছে এটাই স্বাধীনতা। এটাই অপব্যবহার। মেয়েরা মডেলিং করুক, অভিনয় করুক, কিন্তু তা যেন মর্যাদা হারাবার মাধ্যমে না হয়। অযথা অশালীন অভিনয়, যাত্রা, নাচগানের কোন দরকার নেই। নারীদের যেন কোন পণ্য না করা হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিজ্ঞাপনে মেয়েদের শরীর প্রদর্শন করিয়ে কোটি কোটি টাকা অর্জন করা হয়েছে। এটা বন্ধ করতে হবে। পর্ণো ম্যাগাজিনের পণ্য হওয়া মেয়েদের বন্ধ করতে হবে।'[২]

সুফিয়া কামাল রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কথা ভেবেছেন, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার বাসনা অনুভব করেছেন। মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও সাম্য তাঁর লেখা ও কর্মকাণ্ডে ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করেছে। দার্শনিক বিবেচনাবোধ থেকে এভাবে তিনি ইতিহাস ও সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন, ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, মূঢ়তা এবং হিংস্রতা যখন ধ্বংস করেছে। হয়তো অনেক সুন্দর ও শুভকে এজন্যে আত্মাহুতি দিতে হয়, কিন্তু ভয় এবং হতাশায় নিষ্কৃতি কোথায়?... আরও একটা কথা মানি, আমাদের দারিদ্র্য এবং হতাশার অন্যতম কারণ; জনসংখ্যার অনুপাতে আমাদের সম্পদের অভাব; মানুষের ক্ষুধায় এবং লোভে প্রকৃতি লুণ্ঠিত, শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রতিকারের পথ একটাই: দুঃখের অন্ন সবাইকে একসাথে ভাগ করে খেতে হবে, তারপর মানুষ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্যে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাই সব সমস্যা দূর করতে সক্ষম।[৩]

১. নূরজাহান মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২. কুররাতুল আইন তাহমিনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ব্রত মানুষের কল্যাণ। তাঁর ছিল সত্যের সাধনা। কঠিন দুঃকীর্ণ সত্যের। সততার সাধনায় মেলে সাহস, অর্জিত হয় চারিত্রিক দৃঢ়তা। তার ব্যক্তিত্বের শিরদাঁড়া এবং চরিত্র ঋজু ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় চরিত্র আর স্বচ্ছ মানস জন্মদেয় সুন্দরের। যে সুন্দর সাহসী এবং এজস্বী। আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার পরিপক্ক। সুফিয়া কামাল সংসারকে কখনও প্রাধান্য পেতে দেননি, এমনকি কাব্যকেও জীবন জুড়ে দাঁড়াতে দেননি, খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা গ্রাস করতে পারেনি জীবন। তাঁর পটভূমি ও ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল দেশ ও ইতিহাস। দেশের কাজ এবং ইতিহাসের দায় সুফিয়া কামালকে সবসময়ে রেখেছে ব্যস্ত। কঠিন এবং অবশ্যই সঠিক সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়েছে বারংবার। ইতিহাসের কী সব ঘূর্ণিপাক, বাঁক তিনি পেরিয়েছেন সাবলীল স্বচ্ছলতায় যখন বহু মনীষীও হোঁচট খেয়েছেন, বোকা হয়েছেন। এভাবে সুফিয়া কামাল যেন হয়ে উঠেছিলেন সত্য পথের ধ্রুবতারা। প্রজ্ঞার মাধুর্যে স্থির আর চিত্তের জৌলুসে উজ্জ্বল।[১]

আমরা তাঁকে বলি সাহসিকা। এই জননী প্রতিমা জাতি ধর্ম বর্ণ অতিক্রম করে তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক কল্যাণময়তায় সবাইকে নাড়া দেয়। সেখানে ছেলেমেয়ের বৈষম্যও থাকে না। জননীত্ব স্বয়ং সার্বভৌমত্ব পায়। তা শুধু আগলেই রাখে না, বাড়তেও দেয়। জীবনের শোভন সুন্দর বিকাশের মানসিক আশ্রয় হয়ে থাকে। ব্যাপ্ত চরাচরে প্রকৃতি যেমন তেমনই। একই রকম স্বয়ংক্রিয় সুষমা। একই রকম প্রত্যয়দৃঢ় আত্মগরিমা। অহংকারের আস্ফালন নেই, কিন্তু সংকোচ ও আপসও নেই। মৃদু মাধুর্যে অন্তরাত্মার সত্য ছবি আঁকে। মুক্ত প্রাণের অবাধ মহিমাকে অকুণ্ঠে ফুটিয়ে তোলে। শুধু মাধুর্যে অন্স্মরাত্মার সত্য ছবি আঁকে। মুক্ত প্রাণের অবাধ মহিমাকে অকুণ্ঠে ফুটিয়ে তোলে। শুধু নিজের ভেতরে নয়। জাগিয়ে তোলে তা আর সবার ভেতরেও। তাই শুধু জননী নন, তিনি জননী সাহসিকা। প্রকৃতি যে নারীত্বের সমার্থক, তারই প্রাণশক্তিকে পরিপূর্ণ ধারণ করে তার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটান তিনি অপন জীবন ধারায়। কোন অশুভ বাধাই তিনি মানেন না কায়েমি স্বার্থের পিছুটানকেও স্বীকার করেন না। সর্ব খর্ব তারে দহে সব প্রতিকূলতা উপেড়্যা করে জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির সহজতায় নিজেকে মিলিয়ে জননীর অনপেক্ষ সমদৃষ্টি নিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যে মঙ্গল দীপ জ্বেলে সর্বাত্মক শুভকামনা নিয়ে সামনে থেকে পথ দেখিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন। অন্যায়ের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ তাতে মেশে। মেশে দুঃসাশনের প্রতিরোধ। নারী তার পূর্ণতায় পরমা হয় বুঝি এভাবেই। অখণ্ড মনুষ্যত্বের চরিতার্থও তার এখানেই।[২] তাঁর অনুভূতি, মনন, বুদ্ধি, ইচ্ছা, এমন কি কায়া, ছিল সমস্ত পৃথিবীর সাথে তিনি যে একাত্মবোধ নিয়ে চলতেন তারই এক অবিচ্ছেদ্য রূপ। তিনি সর্বদাই পৃথিবীর সর্বড়োত্রে উপস্থিত ছিলেন, হয়ত গড়ার কাজে নয়ত প্রতিবাদে। এ উপস্থিতিতে তিনি সদা নির্দেশ নিয়েছেন তাঁর বিবেকের কাছ থেকে এবং কখনই হননি পলায়নপর।[৩]

১. নূরজাহান মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২. আবুল মোমেন, সত্যপথের ধ্রুবতারা, শুক্রবারের সাময়িকী, প্রথম আলো, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১৪
৩. সনৎ কুমার সাহা, রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সম-অংশীদারিত্ব: রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সংবাদ সাময়িকী, সংবাদ, ঢাকা ২৪ জুন, ২০০৪, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২):
খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার ফকিরহাট থানার মূলঘর গ্রামে ১৯২১ সালের ১১ই অক্টোবর সোমবার সকাল দশটায় তাঁর পিত্রালয়ে নীলিমা ইব্রাহিম তখন নীলিমা রায় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। নীলিমা ইব্রাহিমের পিতার নাম প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী আর মাতা কুসুমকুমারী দেবী।[১] তাঁর পিতা জেলা সদরের তৎকালীন স্বনামধন্য সরকারি উকিল প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী শিল্প সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী ছিলেন। পরিবারটির আবহাওয়া ছিল উদার, সংস্কৃতিবান ও মধুর। নীলিমার জীবনে সেই মধুর, উদার অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি শিক্ষা সাহিত্যের প্রতি বাল্যকাল থেকেই রীতিমত অনুরাগী হয়ে ওঠেন।[২]

নীলিমা ইব্রাহিমের মানসগঠনে পিতা প্রফুল্লকুমারের প্রভাব ছিল ব্যাপক। প্রফুল্লকুমারের রাজনীতি চেতনা, পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য-অনুরাগ নীলিমা ইব্রাহিমের মানসলোকে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। পিতার কথা বলতে গিয়ে নীলিমা ইব্রাহিম লিখেছেন, 'আমাদের বিশেষ করে আমার জীবনে আমার বাবার প্রভাব খুব বেশি। বাবা প্রফুল্লকুমার বিদ্বান, তীক্ষ্ণধী, পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যকে আমি তার ক্ষেত্রে পৃথক করছি এ কারণে যে, ক্ষেত্রোপযোগি সকল বিদ্যাই তার করায়ত্ত ছিল। ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস ও অর্থনীতি ছিল তার অবাধ স্বাচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র। জল থেকে ক্ষীর গ্রহণের শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন।'[৩]

শৈশব কৈশোরে নীলিমা ইব্রাহিম ছিলেন দুরন্ত ও ডানপিঠে স্বভাবের। মাঠে ফুটবল খেলেছেন, ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরছেন, অভিনয় করেছেন শখের থিয়েটারে। মুক্ত পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন বলে শৈশব থেকেই নীলিমা ইব্রাহিমের মানসলোকে উপ্ত হয়েছিল স্বাধিকার প্রমত্ত মানসিকতার বীজ। নিজের শৈশব জীবনের কথা বলতে গিয়ে নীলিমা ইব্রাহিম লিখেছেন, 'আমাদের জীবনটা ছিল অনেকখানি খোলামেলা। বারো তের বছর বয়স পর্যন্ত মাঠে ভাইদের সঙ্গে ফুটবল খেলেছি। মায়ের কাছে নালিশ আসত কিন্তু একেবারেই গেছো ছিলাম বলে মাও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। মাঝে মধ্যে দুঃখ করে বলতেন, এ মেয়ে নিয়ে আমি করবটা কি? যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। আমিও মনে মনে এ আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে জীবনযুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তি সঞ্চার করতাম। তখন দেবী চৌধুরানী পড়ে ফেলেছি। বাড়ির ও আশেপাশের পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি, দাপাদাপি, কুল, জামরুল, জাম, কাঁচা আমের বংশ লোপ, এসব ছিল যেন আমার জন্মগত অধিকার। একবার ডুবে গিয়েছিলাম। আমার এক বান্ধবী আর সঙ্গী একটা ছেলে টেনে

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, নীলিমা, ইব্রাহিম: জীবনকথা, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ১১
২. অধ্যাপক মজির উদ্দীন, বাংলা সাহিত্য মুসলিম মহিলা, দিনার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৬৭, পৃ. ১২
৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

তুলেছিল। ছেলেটা প্রায়ই ঘ্যান ঘ্যান করত জানিস আমি তোকে প্রাণে বাঁচিয়েছি।[১] কেবল দুরন্ত পনাই নয়, শৈশব-কৈশোরে নীলিমা ইব্রাহিমের মানসলোকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও সঞ্চারিত হয়েছিল। পারিবারিক পরিমণ্ডলই এক্ষেত্রে তাঁকে প্রণোদনা সঞ্চার করেছে। তিনি লিখেছেন, এইসব ছেলে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা আমাদের ভেতরে কাজ করেছিল। বড়রা কংগ্রেস করতেন, আমরা কিন্তু সব বিপ্লব-পন্থী। কোথা থেকে বইপত্র আসত, কেউ জানতাম না। সে তাই করত।[২]

১৯২৬ সালে নীলিমা ইব্রাহিত খুলনার করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে তিনি, ১৯৩৫ সালে চারটি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। খুলনায় এই স্কুলে পড়ার সময়ে স্কুল হোস্টেলে থাকতেন, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'খুলনায় চিৎকার করে কাঁদতাম। বাবা দারোয়ানকে ডেকে বলতেন, এখন তোদের দায়িত্ব। তোরা করবি। যাই হোক আস্তে আস্তে স্কুলকে ভালোবেসে ফেললাম। দীর্ঘ ১২ বছর ওখানেই কাটল।'[৩]

নীলিমা ইব্রাহিম কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন থেকে ১৯৩৭ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখান থেকেই তিন ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে অর্থনীতিতে অনার্সসহ স্নাতক পরীক্ষা পাস করেন। পরের বছর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন কিন্তু মা কুসুমকুমারী দেবীর আকস্মিক অসুস্থতার কারণে তাঁর এম.এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এরপর তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে বি.টি. ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯৪২ সালে প্রথম শ্রেণিতে বি.টি পরীক্ষা পাস করেন। এই বছরই তিনি ডিপেস্নামা ইন ব্রেইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

নীলিমা ইব্রাহিম ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম.এ. পরীক্ষা তিনি দিয়েছিলেন প্রাইভেটে। কেন পরীক্ষা দেয়া হয়নি নিয়মিত ছাত্র হিসেবে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হঠাৎ খবর পেলাম মা খুব অসুস্থ, খুলনাতে এলাম। মাকে দেখলাম বিছানার সঙ্গে মিশে গেছেন। কি অসুখ, কেউ বলতে পারে না, গলায় আটকায়। কলকাতায় আনা হয়। বিধানদাতাকে দেখানো হল। বিধান দা বললেন ব্যাধিটা মানসিক। আমাদের চাকর-বাকর বললো, মা খায় না। তখন দুর্ভিক্ষের সময়। যখন কেউ এসে বলে মা চাট্টি ভাত দেন, ফ্যান ফেন। তখন মা খাওয়াটা ঢেলে দিয়ে আসেন। না খেয়ে না খেয়ে মার এরকম হয়েছে। উনি বললেন, কোন ঔষধ নেই। দুর্ভিক্ষের এরিয়ার বাইরে নিয়ে যাও। তখন মাকে নিয়ে যাওয়া হল। বাবা গেলেন। সবাই গেলেন। আমি থাকব। এক বছর পরীক্ষা না দিলে কিছু হবে না। সবাই চলে এলেন সবার কাজকর্ম আছে। আমি থেকে গেলাম। আমার যে সবচেয়ে ছোট বোন সেও রইল। পুরনো একজন চাকর রইল, পুরনো একজন মেইড সার্ভেন্ট রইল। আমরা ছ'মাস ওখানে থাকলাম।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৩. গোলাম কিবরিয়া পিনু, সাক্ষাৎকার, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ছ'মাস বাদে আমরা মার্কে নিয়ে ফিরে এলাম। পরীক্ষা দেয়া হল না। ও বছর তবু কলকাতা এলাম। পরীক্ষা দেয়া হল না।[১]

পরীক্ষা তিনি কিভাবে দিলেন এ প্রসঙ্গে বলেন, রেগুলার তো নয় প্রাইভেট। তখন অনেক সুবিধা ছিল। বন্ধুবান্ধবেরা বলল, দ্যাখ পরীক্ষা দিতে দিয়েছিল। আমি যত বলি 'না' ওরা বলে তোর আঙুলে কালি কেন? সে যাই হোক রেজাল্ট যখন বের হল, সেটা বিরাট, আমি নিজে কল্পনা করতে পারিনি, আমি ফার্স্টক্লাস পেয়েছি। হইচই ব্যাপার।[২]

'সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক, বিষয়ে গবেষণা করে নীলিমা ইব্রাহিম ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলায় তিনিই প্রথম এই গৌরব অর্জন করেন। ড. নীলিমা ইব্রাহিম ঢাকার আলিয়াঁস ফ্রাঁসেস থেকে ১৯৫৮ সালে ফারসি ভাষায় প্রিলিমিনারী এবং ১৯৫৯ সালে ইন্টারমিডিয়েট ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৩]

নীলিমা ইব্রাহিমের পি.এইচডি ডিগ্রি লাভ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গবেষক আনিসুজ্জামান তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন, এভাবে নীলিমা আপার পি.এইচডি ডিগ্রি লাভে আমরা সকলেই খুব উল্লাসিত হয়েছিলাম। টাইপ রাইটারের সুবিধা কেন যেন তিনি পাননি। চারপ্রস্থ অভিসন্দর্ভ তিনি নিজের হাতে লিখেই জমা দিয়েছিলেন। সংসার করে, তারপর গবেষণার কাজ, তার ওপরেও এই কায়িক শ্রম এর মূল্য তিনি পেয়েছিলেন। আমাদের উল্লাসের অনুপাতেই খানাপিনা হল সে এক এলাহি কারবার। নীলিমা ইব্রাহিমই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বাংলা বিষয়ে পি.এইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপরেই ওই একই ডিগ্রি পেলেন আশুতোষ ভট্টাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের শিক্ষক ছিলেন এককালে, ডিগ্রি লাভের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের লেকচারার। সমাবর্তন উৎসবে যতোদূর মনে করতে পারি, ১৯৬২ সালে তিনিও এলেন কলকাতা থেকে। তিনি ও নীলিমা আপা একসঙ্গে ডিগ্রি নিলেন। ততদিনে আমারও ডিগ্রি হয়ে গেছে। আশুতোষ বাবু ও নীলিমা আপা আর তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি কনভোকেশনের পোশাকে শোভিত হয়ে ছবি তুললাম।[৪]

একজন নারী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পি.এইচডি ডিগ্রি অর্জন করা শুধু নয়, তিনি এই বিভাগের প্রথম গবেষক, যিনি এই ডিগ্রি অর্জনে সমর্থ হন। ডিগ্রি অর্জনের পর নীলিমা ইব্রাহিমের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, সে বর্ণনা দিতে দিয়ে ড. আনিসুজ্জামান এভাবে উল্লেখ করেন, এরপর নীলিমা আপার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে এদেশের নানা স্থান থেকে তো বটেই, পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও সমিতিতে তাঁর ডাক আসতে লাগলো। তিনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন।[৫]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮
৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৪. আনিসুজ্জামান, স্মরণ, নীলিমা ইব্রাহিম সাহিত্য গবেষণা, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৭৫
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান নীলিমা ইব্রাহিমের সাহিত্যচর্চার বিষয়টি এভাবে উলেস্নখ করেন, পি.এইচডি ডিগ্রি লাভের পরে নীলিমা আপা ঝুঁকেছিলেন সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে নাটক, উপন্যাস, রম্যরচনায়। তাঁর নাটক অভিনীত এবং উপন্যাস সমাদৃত হয়েছিল।[১]

নীলিমা ইব্রাহিমের গবেষণার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন পাকিস্ত্মান-শাসনামলে পূর্ব বাংলার সাহিত্য গবেষণার যে নবযুগ সূচনা হয়েছিল, তার প্রতিভাস বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ভীস্মদের চৌধুরী তা এভাবে উলেস্নখ করেন, পাকিস্ত্মান শাসিত পূর্ব বাংলার সাহিত্য গবেষণার জগতে যে নবযুগ সূচিত হয়েছিল, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নীলিমা ইব্রাহিমের নাম। মুহম্মদ আবদুল হাই এর তত্ত্বাবধানে এ সময়ে তিনি যে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন তার শিরোনাম ছিল 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় শতাব্দীর বাংলা নাটক'। বস্তুত প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রিক এই গবেষণাকর্মের মধ্যে দিয়েই এদেশের সাহিত্য গবেষণায় আধুনিক সাহিত্য প্রথম অবলম্বিত হয়। ইতিহাস নির্মাণ ও মধ্যযুগের সাহিত্য নির্ভর গবেষণা থেকে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পালাবদলের প্রথম স্মারক হিসেবে তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভ সবিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত।[২]

ইন্ডিয়ান আর্মি মেডিকেল কোরের ক্যাপ্টেন ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সঙ্গে ১৯৪৫ সালে নীলিমা রায় চৌধুরী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর তিনি নীলিমা ইব্রাহিম নামেই সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। মিষ্টভাষী কৌতুকপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডা. ইব্রাহিমের সঙ্গে নীলিমা রায় চৌধুরীর প্রেম ও বিয়ের কথা তাঁর মুখ দিয়েই শোনা যাক, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস। সব চিন্ত্মা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে আমরা পরস্পর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলাম। ওর সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়, আলাপ, প্রেম সবই ঘটেছিল আমাদের বাড়ির বসবার ঘরে। অনেক ইংরেজি, ফারসি, অস্ট্রেলিয়ান, ক্যানাডিয়ানের সঙ্গে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরে উনি আমাদের বাড়িতে আসেন। আমি তখন খুলনায় থাকতাম না। কালে ভদ্রে ছুটিতে আসতাম এবং আমাদের বাড়ির সর্বশেষ ওঁর পরিচিত ব্যক্তি আমি। তবে পরবর্তীকালে কলকাতায় ডায়মন্ড হারবার, দমদমের চৌহদ্দীতে খুবই ঘুরেছি। একবার উড়িষ্যায় আমার কাকার ওখানেও ঘুরে এলাম। সবাই দেখেছেন, জেনেছেন কিন্তু কেউ কোন মন্ত্মব্য করেননি। সবাই ভেবেছিলেন এ অসম বিবাহের পরিণতি সম্পর্কে আমরা তো ওয়াকিবহাল। সুতরাং এমন কিছু করব না যা নিজেদের জন্য বিপজ্জনক বা সমাজের নিন্দনীয় হতে পারে। কিন্তু যা হওয়া উচিত নয় তাই হল।... এ বিদ্রোহ কেউ মানতে চাইলেন না। আমার বাবা আমার স্বামীকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন তিনি যেন সুখী হন, কারণ তিনি সত্যিই ভালো মানুষ কিন্তু আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন বা নিতে বাধ্য হলেন।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২. ভীস্মদের চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহিমের সাহিত্য গবেষণা, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ২২৩
৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের পরিবার ছিল পুরোনো ঢাকার গেন্ডারিয়ার অতি বনেদি ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। ১৯৪৬ সালে স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় এসে নীলিমা ইব্রাহিম গেন্ডারিয়ার বাসাতেই বসবাস করতেন। তখন ডা. ইব্রাহিমের কর্মস্থল ছিল তেজগাঁওস্থ সি.এস.এইচ.এ। প্রায় আট-ন' বছর নীলিমা ইব্রাহিম যৌথ পরিবারে বাস করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার্সে উঠে আসেন। তবে এর আগে তিনি ডা. ইব্রাহিমের ক্রয় করা নর্থ ব্রুক হল রোডের একটি বাড়িতে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন।[১]

নীলিমা ইব্রাহিম যে আট-নয় বছর যৌথ পরিবারে ছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, আমি যখন সংসারে আসি তখন ডা. ইব্রাহিমের জয়েন্ট ফ্যামিলি। মা ছিলেন না, উনি দাদির কাছে বড় হয়েছেন। দাদিকে আমরা মা ডাকতাম। আমি এত স্নেহ পেয়েছি, আদর পেয়েছি, সব দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ ভুলে গিয়েছিলাম। যখন ছিলাম আনন্দে ছিলাম, লোকজন অনেক ছিল, আমার চারজন দেবর ছিল, হৈ-হৈ-রৈ-রৈ সব সময়, এক এক করে বিয়ে টিয়ে হয়ে গেল। অনেক বড় বাড়ি ছিল।[২]

নীলিমা ইব্রাহিমের দাম্পত্যজীবনে ছিল বেশ আনন্দময় ও সুখী। শেষ জীবনের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের চলচিত্র তিনি এভাবে উলেস্নখ করেন, ডা. ইব্রাহিমের রানিং এইটি টু। আমি অসুস্থ থাকি। সবকিছু তিনি করেন। তিনি এতকিছু দেখেন, যেটা কোনো সমাজে কোন নারী স্বামীর কাছে আশ করতে পারেন না।[৩]

শেষ জীবনে যখন সন্তানরা তাঁদের সংসার ও জীবন নিয়ে আলাদা, তখন নীলিমা ইব্রাহিম স্বামীকে নিয়ে সুন্দর অন্তরঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন, এ বর্ণনা তিনি এভাবে উল্লেখ করেন, সারা দিন সেও কাজ করে, সন্ধ্যা বেলাটা খুব প্লেজার। ঐ সময়টায় কখনো টেলিভিশন দেখি, কখনো অতীত স্মৃতি রোমন্থন করি, কখনো দেশের পলিটিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে ডিসকাস করি, এটা ডা. ইব্রাহিমের খুব আগ্রহের ব্যাপার। ক'টা যে কাগজ সে পড়ে সেই জানে। খোদ চোখটা ভালো দিয়েছে, ৫/৬ টা তো পত্রিকা পড়ে।[৪]

নীলিমা ইব্রাহিমের পাঁচ কন্যা-সন্তান, এঁরা হলেন-মঞ্জুরা, ডলি (প্রয়াত), পলি, বাবলী, ইতি। এঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। প্রয়াত ডলি ছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী ডলি আনোয়ার নামে সমধিক পরিচিত।

অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিমের কর্মজীবন ছিল বহুমুখী। তিনি প্রধানত ছিলেন শিক্ষক। দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত ও তাঁর ছাত্রদের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। প্রশাসক ও সংগঠক হিসেবেও তিনি নিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান, রোকেয়া হলের প্রভোস্ট, বাংলা একাডেমির

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২. গোলাম কিবরিয়া পিনু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

মহাপরিচালক, মহিলা সমিতির সভাপতি এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গঠিত নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের অন্যতম নেতা হিসেবে তিনি আন্তরিক, পরিশ্রম ও ফলপ্রসূ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন।[১]

নীলিমা ইব্রাহিম ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচার পদে যোগ দেন, এ পদে তিনি ১৯৬৪ পর্যন্ত ছিলেন। অতঃপর ১৯৬৪ থাকে ১৯৬৫ অস্থায়ী রিডার। সিনিয়র লেকচারার ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ছিলেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত প্রফেসর পদে তিনি ছিলেন। ১৯৭৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯ সালের ১ লা জুলাই থেকে ১৯৮২ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত তিনি বাংলা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে শিক্ষকতা জীবনের ইতি টানেন।

নীলিমা ইব্রাহিমের সমাজকল্যাণ, নারী-উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড উজ্জ্বল কীর্তিতে ভাস্বর। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ফেলো: বাংলা একাডেমি; জীবন-সদস্য: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি; সভানেত্রী: বাংলাদেশ মহিলা সমিতি: জীবন-সদস্য: বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতি; জীবন সদস্য: বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি; চেয়ারপার্সন: বোর্ড অব গভর্ণরস, কনসার্ন উইমেন ফর ফ্যামিলি প্লানিং ইত্যাদি। সাংগঠনিক দক্ষতা, প্রশাসনিক নৈপুণ্য এবং সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টির জন্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই নীলিমা ইব্রাহিম উপনীত হন নেতৃত্বের আসনে।[২]

নীলিমা ইব্রাহিম অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ইউমেন- এর সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এসোসিয়েটেড কান্ট্রি ইউম্যান অব দি ওয়ালর্ড এর সাউথ ও সেন্ট্রাল এশিয়ার এরিয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন নারী নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়, অনেকেই হয়ে ওঠেন তার একান্ত বন্ধু।[৩]

প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর জীবন বহু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে গভীরভাবে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সম্পৃক্ত ছিলেন বাংলাদেশের মহিলা সমিতির সঙ্গে। তাঁর কর্মময় জীবনে শত ব্যস্ততার মধ্যেও মহিলা সমিতি ছিলো তার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের প্রতিষ্ঠান। প্রায় আপন সন্তানের মতো, সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। এদেশের নারীমুক্তির জন্য এই মহিলা সমিতির মাধ্যমে তিনি দেশ-বিদেশে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে এসেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঢাকা ইউনির্ভাসিটি উইমেন্স হল এর রোকেয়া হল নামকরণ, রোকেয়া রচনাবলী বাংলা বিভাগের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার তার ভূমিকা ছিলো, তা পূর্ণাঙ্গ হয় সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী জাগরণে তার ভূমিকায়। তিনিও বেগম সুফিয়া কামালের মতো বেগম রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন জীবনের শেষ পর্যন্ত নারীমুক্তি ছিল

---

১. শামসুজ্জামান খান, ড. নীলিমা ইব্রাহিম এবং মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা, নীলিমা ইব্রামি স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৮৮

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিমের সকল কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র। এদেশের হতভাগ্য, নির্যাতিত, নিগৃহীত, নিপীড়িত নারীদের জাগরণে প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম ছিলেন এক মহান মানবতাবাদী সমাজকর্মী; শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, সমাজ নিয়ে তার ধ্যান-ধারণা ছিল এক উদার মুক্ত সুসংস্কৃত বাংলাদেশ, আজীবন তিনি সে জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।[১]

নীলিমা ইব্রাহিম প্রথম লেখা প্রকাশ হয় দেশ পত্রিকায়। ১৯৪৭ সালের দিকে, একটি আবেগঘন গল্প, নাম ছিল 'দেবরের কাছে'। লেখার শুরুর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কলেজ ম্যাগাজিন, এটাতে সেটাতে লেখা বের হতো। এখানে এসে প্রথম আরম্ভ হলো, আমি তখন বরিশালে, ডাক্তার সাহেব বরিশালে, সেখানে থাকা অবস্থায় অনেক সময় পেতাম, উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলাম। বেগম পত্রিকায় ছাপা হলো।[২]

বেগম পত্রিকায় বিশ শতকের মেয়ে নামের উপন্যাসটি ছাপা হয় ১৯৪০ সালের দিকে।

নীলিমা ইব্রাহিম ২৫টির বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। এর মধ্যে প্রবন্ধ-গবেষণাঃ শরৎ প্রতিভা (১৯৬০), বাংলার কবি মধুসূদন (১৯৬১), উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক (১৯৬৪), বাংলা নাটক উদ্ভব ও ধারা (১৯৭২), বেগম রোকেয়া (১৯৭৪), বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৮৭), সাহিত্য সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ (১৯৯১), সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তঃ অত:পর অমানিশার অন্ধকার (১৯৯৫), আমি বীরাঙ্গনা বলছি (প্রথম খণ্ড ১৯৯৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৭), বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব (১৯৯৬), গল্পঃ রমনা পার্ক (১৯৬৪)। উপন্যাসঃ বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), এক পথ দুই বাঁক (১৯৫৮), পথ-শ্রান্ত (১৯৫৯), কেয়াবন সঞ্চারিণী (১৯৬২), বহি বলয় (১৯৮৫)। নাটকঃ দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪, যে অরণ্যে আলো নেই (১৯৭৪), রোদজ্বলা বিকেল (১৯৭৪), সূর্যাস্তের পর (১৯৭৪)। অনুবাদঃ এলিনর রুজভেল্ট (১৯৫৫), কথাশিল্পী জেমস ফেমিনোর কুপার (১৯৬৮), বস্টনের পথে (১৯৬৯), ভ্রমণ কাহিনীঃ শাহী এলাকার পথে পথে (১৯৬৩)। আত্মজীবনীঃ বিন্দু বিসর্গ (১৯৯১। এর মধ্যে তার বহুল আলোচিত গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের নিয়ে দু'খণ্ডে লিখেছেন 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি।'[৩]

নীলিমা ইব্রাহিম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেন এগুলো হলোঃ বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জয়বাংলা পুরস্কার (ভারত, ১৯৭৩), মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৭), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৯), বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতিপদক (১৯৯০), মুহম্মদ নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯২), অন্যান্য সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), বঙ্গবন্ধু পুরস্কার (১৯৯৭), শের-এ বাংলা পুরস্কার (১৯৯৭), থিয়েটার সম্মাননা পদক (১৯৯৮), একুশে পদক (২০০০)।

নীলিমা ইব্রাহিম ২০০২ সালের ১৮ই জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে ৮১ বছর বয়সে ঢাকার মহাখালীস্থ মেট্রোপলিটন মেডিকেল সেন্টারে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ২১ জুন শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে মিরপুর বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে তাঁর মেয়ে ডলি ইব্রাহিমের কবরের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

---

১. রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিমঃ ইক অনন্য সাধারণ অকুতোভয় বিদূষী, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৭৩

২. গোলাম কিবরিয়া পিনু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

৩. রিশিত খান, যে মহীয়সীর মৃত্যু নেই, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশে অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া খাতুন (জন্ম-১৯৩৫):

রাবেয়া খাতুনের জন্ম ১৯৩৫ সনের ২৭ ডিসেম্বর তৎকালীন ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে মামার বাড়ি পাউসন্নে। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রামে। বাবা মৌলভী মোহাম্মদ মুল্লুক চাঁদ, মা হামিদা খাতুন। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী আর দাদা ছিলেন শখের কবিরাজ।[১]

পুরান ঢাকার রায় সাহেব বাজারের অলি-গলির দুর্বান্ন অন্বেষণেই কেটেছে শৈশবকাল। মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়ি গিয়েও বেড়াতেন পরম আনন্দে। রাবেয়া খাতুনের ভাষায়, আমার কবিরাজ দাদা নৌকা করে দেবী দর্শনে নিয়ে আসতেন তাঁর তৃতীয় প্রজন্মকে। ষোরঘর থেকে শ্রীনগর যাতায়াত বড় কষ্টের। এমন কিছু দূরে নয়। কিন্তু পুরো তল্লাটের পানি দখল করে থাকতো কচুরি পানায়। এই পানা ঠেলে প্রতিমা দেখতে যাওয়া চাট্টিখানি বিষয় নয়। কাকারা বলতেন আধখানা প্রাণ বেরিয়ে যেতো। বিশেষ করে আমার মাস্টার কাকা হাফিজ উদ্দিন আহমদ (ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক) খুব গাঁইগুঁই করতেন বৈঠা টানতে। কিন্তু সেকালের কিশোর তরুণদের পিতার ইচ্ছায় বাধা দেয়ার কোন ক্ষমতা থাকতো না। তো কারা যত কষ্টই করুণ আমরা থাকতাম দারুণ আনন্দে। হ্যাজাক বাতিতে রাত হয়েছে দিন। গান-বাজনা। মিষ্টি, মুড়কি আরও কত কি। দাদা দুতির (তখনকার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাইরের পোশাক) প্রাপ্ত কিংবা আদ্দির পাঞ্জাবির পকেট থকে দু' পয়সা এক পয়সা করে আমাদের হাতে দিতেন ইচ্ছামত খরচ করার জন্য (এ প্রাপ্তির কোন তুলনা নেই)। একে নতুন ফ্রক স্যান্ডেল পেয়ে খুশি তার ওপর ঝকঝকে তামার পয়সা। আমি খাবার নয় খেলনা কিনতাম। পুতুলের জন্য ছিল একচোখা আসক্তি। একটু বেশি চঞ্চল ছিলাম বলে নৌকা চালার সময় ধানগাছ ধরে ফেলতাম। পাতার ধানে হাতকেটে রক্ত ঝরতো। মা বকুনি দিতেন। ওই পানি থেকেই কি এক লতা দাঁতে চিবিয়ে প্রলেপ লাগাতেন। কচুরিপানার জনপথ পার হবার সময়ও সেগুলো স্পর্শ করতাম।.. বাবা ছিলেন অতি সুকণ্ঠের শখের গাইয়ে এবং মাছ ধরার ওস্তাদ। নগর জীবনে সে সুযোগটি ছিল না তা পূরণ হতো গ্রামে এসে। এই মৎস্য শিকারের সঙ্গে আমি তো থাকবোই। ঘন কচুরিপানার দুর্লভ চোয়ান স্থানটিতেই কাজ হতো। কিন্তু চুপচাপ নৌকার খোলে পুতুলের মতো বসে থাকা আমার স্বভাবে নেই। প্রায়ই নৌকার খোলে পুতুলের মতো বসে থাকা আমার স্বভাবে নেই। প্রায়ই নৌকো নড়াচড়া দিয়ে বিস্তর বুকনি খেয়েছি। তারপরও বাবা আমাকেই সঙ্গে নিয়ে গিছেন। কারণ আমি থাকলে নাকি মাছ ঘন ঘন টোপ গেলে।[২]

রাবেয়া খাতুন রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সদস্য হওয়ায় লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকার পরও স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে যেতে পারেননি। সেই সময়কালে স্কুলেও মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। মুসলমানদের সামাজিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমান মেয়েরা লেখাপড়ার জন্য স্কুলে প্রবেশ করতে পারেনি সে সময় উল্লেখযোগ্যভাবে।

---

১. কামরুন ঝুমুর, রাবেয়া খাতুন, গুণীজন, (Gunijan/development, research network (D. Net), info@gunijan.org) ওয়েবসাইট ২০০৬

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় শিক্ষকতা করেছেন। তিনি সাংবাদিকতাও করেছেন-ইত্তেফাক, সিনেমা ও খাওয়াতীন পত্রিকায়, এছাড়াও পঞ্চাশ দশকে বের হতো তাঁর সম্পাদনায় অঙ্গনা নামের একটি মহিলা মাসিক পত্রিকা। সাংবাদিকতায় আসা প্রসঙ্গে রাবেয়া খাতুন বলেন, আমি যখন সাংবাদিকতায় আসি তখন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হাতে গোনা কয়েকজন। ফজলুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, জহির রায়হান ও আমি। তোমরা এখন যেমন সাক্ষাৎকার নিতে আসো, আমিও সে সময় সাক্ষাৎকার নিতে যেতাম লায়লা আরজুমান্দ বানু, আব্বাসউদ্দিনের, এখনতো সময় অনেক পরিবর্তন হয়েছে মেয়েরা ইচ্ছে করলেই আসতে পারছে। কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে।[১]

রাবেয়া খাতুনের বিয়ে হয় ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাই স্বামী এটিএম ফজলুল হক, তিনি সাংবাদিকতার পাশাপাশি চিত্র পরিচালকও ছিলেন। চার সন্তানের জননী রাবেয়া খাতুন। বিয়ে প্রসঙ্গে রাবেয়া খাতুনের ভাষ্য, জাহানারা ইমামের পত্রিকা খাওয়াতীন এ কাজ করতাম। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মহিলা পত্রিকা। জাহান আরার সঙ্গে প্রেস শো দেখতে গিয়ে দূর থেকে দেখেছি সম্পাদক ফজলুল হককে। বাসার পরিস্থিতি খুব খারাপ। বিয়ের কারণে আমার ওপর পরিবার রীতিমতো বিরক্ত। কোনো পাত্রই পছন্দ হয়না। আত্মীয় পরিজনরা হাসাহাসি করে, বলাবলি করেও হবে এ দেশের বড় লেখিকা। আর ওর জন্য আকাশ থেকে আসবে রাজপুত্র। সত্যি এলো রাজপুত্র, তবে আকাশ থেকে নয়, জমিন থেকে ফজলুল হক আর কাইয়ুম চৌধুরী (এখন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী)। তখন জুটি হিসেবে সাইকেলে ঘোরাফেরা করে। প্রথমজন চালক আর দ্বিতীয়জন রডে বসা আরোহী। কাইয়ুম আমার বাড়ি চেনে। এক বিকেলে দু'জন এসে বাবার সঙ্গে আলাপ করে গেল। বাসা থেকে আমার ওপর এলো প্রবল চাপ। এরা কেনো এলো। আমি তো আসলেই কিছু জানি না। চিন্তাও করিনি এমন দুঃসাহস। জাহানারা ইমামের সঙ্গে প্রেস শো দেখতে গেছি প্রবোধ স্যান্নালের 'মধ্যপ্রস্থানের পথে' মায়া সিনেমা হলে। এক ফাঁকে ফজলুল হক আমার সঙ্গে কথা বলতে এলো। প্রস্তাব রাখল আমি যদি রাজি থাকি তবে বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে তার আত্মীয়স্বজন। টল, স্মার্ট, সুদর্শন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যুবক। আপত্তি নেই জানিয়েছিলাম। দু'সপ্তাহের মধ্যে কাবিন হয়ে গেল। বাবা-কাকার মত ছিল না। চেনা জানা নেই, দূর দেশ (?) বগুড়ার ছেলে। কিন্তু ভীষণ খুশি হলো আমার মা। হকের বাড়িতে এর বাবা ভাইবোন সবাই বেজায় খুশি। বেজার শুধু ওর মা কারণ তিনি স্থানীয় ধনী কন্যাকে ঠিক করে রেখেছিলেন। বায়ান্ন সালের তেইশে জুলাই আমাদের বিয়ে হয়। ঢাকার সিক্কাটুলীতে বাসা নেয়া হলো। আমার বয়স তখন উনিশ, রান্নাবান্নাও জানি না। অবশেষে বার্বুচি এলো। দশটায় খেয়েদেয়ে দু'জনে অফিসে চলে যাই। কোর্ট হাউস স্ট্রিটের একটা বিশাল বাড়ির দোতলায় সিনেমা পত্রিকার অফিস। পত্রিকা চালায় মূলত তিনজন। ফজলুল হক। ওর ছোট ভাই ফজলুল করীম (এখন বিশ্ব বিখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ) ও কাইয়ুম চৌধুরী। ওদের সাথে যুক্ত হলাম আমি। পরিচিত হতে লাগলাম উদীয়মান সাহিত্য প্রতিভাদের সঙ্গে। এককথায় সাহিত্যাঙ্গনের স্বপ্নের মানুষদের সঙ্গে।[২]

---

১. তাহেরা আফরোজ, কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুন সৃষ্টি বহুমাত্রিক, আজকের কাগজ, ঢাকা-২৮ নভেম্বর, ২০০৪, পৃ. ৪

২. কামরুন ঝুমুর, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, রাবেয়া খাতুন অনেকটা উদার পরিবেশে নিজের স্বাধীনতা নিয়ে শুধু বেড়ে ওঠেননি, তৎকালীন মুসলিম সমাজের একজন নারী হিসেবে অগ্রসরমান থেকে শিল্প সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেছেন বেশ আগ্রহ সহকারে। তাঁর বিয়েও হয়ে ওঠেছে লেখালেখির পরিপূরক।

রাবেয়া খাতুন ১২-১৩ বছর বয়স থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম প্রগতিশীল সাপ্তাহিক যুগের দাবীতে ছাপা হয় ছোটগল্প প্রশ্ন। ১৯৬৩ সালের ১ জুলাইতে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই মধুমতী। তাঁর লেখালেখি কীভাবে শুরু হয়, তা তিনি এভাবে উল্লেখ করেন, আমার লেখার হাতে খড়ি হয় উপন্যাস দিয়ে! ঢাউস উপন্যাস (এখনো সংগ্রহে আছে কয়েকটা)। বাড়ির নিয়ম ছিল সপ্তাহে দুটো বায়োস্কোপ বা টকি সিনেমা দেখা। আমার কাহিনী তৈরি হতো সম্ভবত সেই মালমসলায়। ভেতরে আমারই আঁকা ক্যাপশন থাকত। প্রথমটা নাম ছিল নিরাশ্রয়া, পরে বিদায়, অশোক-বেরা এই ধরণের আর কি? মা দুটো ব্যাপারে ভীষণ রেগে যেতেন। প্রায়ই তাঁর কাছে ধরা পড়ে যেতাম পাঠ্যপুস্তকের তলায় গল্পের বই নিয়ে। কখনো গল্প লিখতে গিয়ে। সব মায়ের মতো তাঁরও স্বপ্ন মেয়ে ক্লাসে ফাস্ট হবে। আমাদের পড়াশুনা মূলত একটি ভালো বিয়ে দেয়ার জন্যই করানো হতো। উঁচু গ্রেডে পাশ দূরে থাক আমি টায় টায় পাশ করতাম। ছাত্রী হিসেবে মোটেই ভালো ছিলাম না। মা তার জন্য দায়ি করতেন বই পড়া ও গল্প লেখার নেশাকে।[১]

রাবেয়া খাতুনের প্রকাশিত গ্রন্থ-উপন্যাসঃ মধুমতী (১৯৬৩), অনন্ত অন্বেষা (১৯৬৭), মন এক শ্বেত কপোতী (১৯৬৭), রাজবিনো শালিমার বাগ (১৯৬৯), সাহেব বাজার (১৯৬৯), ফেরারী সূর্য ৯১৯৭৪), অনেক জনের একজন (১৯৭৫), জীবনের আর এক নাম (১৯৭৬), দিবস রজনী (১৯৮১), নীল নিশীথ (১৯৮৩), বায়ান্ন গলির এক গলি ৯১৯৮৪), মোহর আলী (১৯৮৫), হানিফের ঘোড়া ও নীল পাহাড়ের কাছাকাছি (১৯৮৫), সেই এক বসন্তে ৯১৯৮৬) ইত্যাদি। ছোটগল্প গ্রন্থঃ আমার এগারটি গল্প ৯১৯৮৬), মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী (১৯৮৬), সুমন ও মিঠুর গল্প (১৯৭৮), লাল সবুজ পাথরের মানুষ (১৯৮১), তিতুমীররের বাঁশের কেল্লা (১৯৮৪) ইত্যাদি। একাত্তরের নয় মাস ও স্বপ্নের শহর ঢাকা নামের দু'টি স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। রাবেয়া খাতুন অনেক ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, এগুলো হলো, হে বিদেশী ভোর, মোহময়ী ব্যাংকক, টেমস থেকে নায়াগ্রা, কুমারী মাটির দেশে, হিমালয় থেকে আরব সাগরে, কিছুদিনের কানাডা, চেন্রি ফোঁটার দিনে জাপানে, মমি উপত্যকা, ভূস্বর্গ সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি। তাঁর গবেষণাধর্মী লেখা-জীবন ও সাহিত্য, পাবনা মানসিক হাসপাতাল, স্মৃতির জ্যোর্তিময় আলোকে যাদের দেখেছি। এছাড়া তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। রাবেয়া খাতুনের উপন্যাস অবলম্বনে বেশ কটি চলচিত্র নির্মিত হয়েছে, এসব চলচিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি ও মেঘের পর মেঘ, এছাড়া তার কাহিনী নিয়ে ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম কিশোর চলচিত্র তৈরি করা হয়। রেডিও ও টিভি থেকে প্রচারিত হয়েছে তাঁর রচিত অসংখ্য নাটক।

---

১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া খাতুন ভ্রমণ করেছেন বহুদেশ, এগুলো হলো-ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, সুইডেন, জাপান, নেপাল, ভারত, সিকিম, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মিশর, দুবাই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদিআরব, তাসখন্দ, মারিশাস ও মালদ্বীপ। এছাড়াও টরেন্টো ইউনির্ভাসিটি বাংলা বিভাগের আমন্ত্রণে ঘুরে এসেছেন কানাডা।

তিনি শিল্প সাহিত্যের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন। বাংলা একাডেমির কাউন্সিল মেম্বার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের গঠনতন্ত্র পরিচালনা পরিষদের সদস্য, জাতীয় চলচিত্র জুরি বোর্ডের বিচারক, শিশু একাডেমির কাউন্সিল মেম্বার ও টেলিভিশনের 'নতুন কুঁড়ির বিচারক' হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। যুক্ত আছেন কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কার সংস্থার সঙ্গে। তিনি মহিলা সমিতি, কথাশিল্পী সংসদ, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, ঢাকা লেডিজ ক্লাব, বাংলাদেশ লেখক শিবিরসহ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

কথাসাহিত্যিক ও লেখক হিসেবে রাবেয়া খাতুন বহু পুরস্কার অর্জন করেন, এসব পুরস্কার হচ্ছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩), হুমায়ন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯৩), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯৫), জসীমউদ্দিন পুরস্কার (১৯৯৬), শেরে বাংলা পুরস্কার স্বর্ণপদক (১৯৯৬), অতীশ দীপঙ্কর পুরস্কার (১৯৯৮), লায়লা সামাদ পুরস্কার (১৯৯৯), অন্যান্য সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯), মিলেনিয়াম এ্যাওয়ার্ড (২০০০), টেলিভিশন রিপোর্টার্স এ্যাওয়ার্ড (২০০১), বাংলাদেশ কালচারাল রিপোটার্স এ্যাওয়ার্ড (২০০২), শেলটক পদক (২০০২), মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার (২০০৫) ও বাংলাদেশ চলচিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার (২০০৫)।[১] রাবেয়া খাতুনের গল্প ইংরেজি, উর্দু, হিন্দী ও ইরানী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

রাবেয়া খাতুন যে সময়ে লেখালেখি শুরু করেন, সেই সময়ে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার হার কম শুধু ছিল না, লেখক হিসেবে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর বিষয়টি ছিল আরও প্রতিকূলতায় ঘেরা, এ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত, সামাজিক বাধা বিপত্তি অতীতে ছিলো, এখনো আছে। এদেশের মহিলা সাহিত্যিকদের চলার পথ নানা কারণে দুর্গম। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর অবদানের চেয়ে বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তিনি পুরুষ কি স্ত্রীলোক। বর্তমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরের প্রকৃত নগ্ন চিত্র যদি উন্মোচিত হয় একজন পুরুষের হাত দিয়ে গর্বের সঙ্গে তখন জাহির করা হয় অভিজ্ঞতার সুফসল বলে। মহিলাদের ক্ষেত্রে তা দেখা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন বিরূপদৃষ্টিতে।২
লেখালেখির বিষয়ে তিনি আরও উল্লেখ করেন, লেখালেখির ক্ষেত্রে পরিবার থেকে উৎসাহের বাদলে পেয়েছি অবহেলা এবং সামাজিক ভাবে চোখ রাঙানি। তখনকার বেশ কটি পত্রিকায় নিয়মিত গল্প প্রকাশ হচ্ছিল। বিষয়টা বড় বোনের শ্বশুর বাড়িতে জানাজানি হলে তারা ইয়া লম্বা চিঠি পাঠালেন বাবার কাছে, যে লাইনগুলো এখনো ভুলিনি, আপনার পরিবারের একটি কন্যার হস্তাক্ষর বাইরের পর পুরুষেরা দেখিতেছে। উভয় খানদানের জন্য ইহা অত্যন্ত অসম্মান এবং লজ্জার ব্যাপার। বিষয়টির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে...।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত

২. হাসান হাফিজ, দুর্গম পথের যাত্রীঃ রাবেয়া খাতুন, রহমান মুস্তাফিজ সম্পাদিত সোনা রং, ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৪২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া খাতুন নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন এভাবে, এই প্রশ্নটি সমকালীন আসরে অনুষ্ঠানে যতো বেশি উচ্চারিত সমাধানিক নয় আংশিক মাত্রাতেও। অধিংশ ক্ষেত্রে ধারণা দেয়া হয় নারী যতোক্ষণ অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হতে পারবে ততোক্ষণ তার জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা দুরন্ত বিষয়। কথাটা যদি সত্যি হতো তাহলে বিদেশ ভূমিতে পরাধীন প্রতিষ্ঠাহীন মহিলাদের সমস্যা মাথা খাড়া করে আছে ক্যানো? তারা শিক্ষিতও বটে। উপার্জনশীলও। স্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠা কেউ কাউকে দেয় না, অর্জন করে নিতে হয়। এই পথে প্রতিবন্ধকতা ঘরে বাইরে সর্বত্র। চেহারাগুলো তাদের মোটেও ভালো নয়।

বাইরের ভুবনে যাবার আগে সংসারে যদি ঢুকি কিরূপ দেখি সেখানে তার? পুরুষ রমণীর দ্বৈত প্রচেষ্টায় যে বৃত্ত, সেখানে সর্ব বিষয়ে প্রাধান্য পুরুষের। তিনিই পরিচালক, সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র মালিক। একটা সময় হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। মহিলারা ছিলেন অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। শিক্ষার সঙ্গে সাহস, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বর্জনের শক্তির সম্পর্ক প্রায় অচ্ছেদ্য। বর্তমানে কুশিক্ষার অন্ধকার অনেকখানি দূর হলেও কাঠামোর সনাতন ভিতে পরিবর্তন খুব একটা আসেনি। স্বামী, সন্তান, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কতোটা নিজ মতাবলম্বী করতে পারছেন একজন মহিলা? সন্ধানী পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে মুখোমুখি বা ভাবে ভঙ্গিতে তিনি যতোটা আত্ম সবলতা জাহির করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তা নন। কেবল শিক্ষা, অর্থ উপার্জনের যে মোহাবিষ্ট সময় অতিক্রম করছে বর্তমান, সেখানে নারী স্বাধীনতার মুখোশে, স্বেচ্ছারিতার প্রশ্ন অবান্তর ঘটনা নয়। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত মুক্তবুদ্ধি, সুসাহস, পরিশুদ্ধ অভিজ্ঞান, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সংযুক্তি প্রয়োজন। মহিলাদের সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঘর থেকে শুরু হলে বাইরের প্রাঙ্গণের প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া হয়তো অসম্ভব অলৌকিক ঘটনা হবে না।[১]

রাবেয়া খাতুন ছোটগল্প রচনার সংখ্যা একজ হাজারের বেশি। সম্ভবত বাংলা ভাষায় কেউ এক হাজারের অধিক ছোটগল্প লেখেননি। 'এক হাজার' শুধু একটা সংখ্যা নয়, আক্ষরিক অর্থেই রাবেয়া খাতুন দীর্ঘ ৫০ বছরের অধিককাল ধরে এই গল্পগুলো লিখেছেন। বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং অজস্র বিষয়, অজস্র চরিত্রের সমাহার তাঁর ছোটগল্পকে করে তুলেছে আশ্চর্য সুন্দর।[২]
রাবেয়া খাতুনের প্রতিভারও সবচেয়ে উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অধ্যায় হচ্ছে উপন্যাসগুলো। রাবেয়া খাতুনের উপন্যাসসমূহ কয়েকটি বিভাগে শনাক্ত করা যায়। ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস রাবেয়া খাতুনের প্রিয় বিষয়। রাবেয়া খাতুন ইতিহাসের আকরগ্রন্থ পাঠ করতেও আনন্দ পান। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে শ্রেণির চরিত্র বাংলা ভাষায় লক্ষ করা যায় রাবেয়া খাতুন সেই সহজ পথে হাঁটেন না। ইতিহাসের পটভূমিকায় তিনি নির্মাণ করেন নতুন কোন কাহিনী বিন্যাস। অতীতের মধ্যে রয়েছে মধুমতি প্রথম প্রকাশেই যে উপন্যাসটি আলোচনার শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত। সাহেব বাজার, বায়ান্ন গলির এক গলি, শালিমার বাগ এসব উপন্যাসে উঠে এসেছে পুরানো ঢাকার বিচিত্র জীবনযাপন প্রণালী। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম উপন্যাসটিও রাবেয়া খাতুন রচনা করেন ফেরারী সূর্য।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

২. আমীরুল ইসলাম, রাবেয়া খাতুন: জীবনের অধিক জীবন্ত যিনি, রহমান মুস্তাফিজ সম্পাদিত, সোনারং, ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর-২০০৫, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

বাগানের নাম মালনীছাড়া, ঘাতক রাত্রি, মেঘের পর মেঘ-পটভূমিকায় বিস্তৃতভাবে মুক্তিযুদ্ধ। আর প্রেমের উপন্যাসের কথা বলতে গেলে বিস্মিত হতে হবে। নর-নারীর সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন, যৌনতার বহু বিচিত্র গতি প্রকৃতি, মানব-মানবী এবং নারীর স্বকীয়তা অবিশ্বাস্য শক্তিমত্ততায় রাবেয়া খাতুন লিপিবদ্ধ করেছেন। মন এক শ্বেত কপোতী, সেই এক বসন্তে, রঙিন কাচের জানালা, কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি, শঙ্খ সকাল প্রকৃতি, সাকিন ও মায়াতরু, আকাশে এখনো অনেক রাত, সৌন্দর্য সংবাদ, ছায়া হরিণী, শুধু তোমার জন্য এ রকম গুচ্ছ গুচছ আরো উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যায়। ভাবতে অবাক লাগে, পঞ্চাশোর্ধ বয়সেও রাবেয়া খাতুন মননশীলতায় আরও আধুনিকতম হয়েছেন। যে বৈধ-অবৈধ সম্পর্কের নিত্য দোলাচালে, সামাজিকতার কারণে প্রকাশমান হয় না, হলেও নিন্দনীয় সেই সব বিষয়কে দক্ষ কুশলতায় রাবেয়া খাতুন কালো অক্ষরের উজ্জ্বলতায় বন্দি করেছেন।[১]

মুসলিম নারী লেখকদের একেবারেই হাতে গোনা যায়। গল্প-উপন্যাস পরিশ্রম সাপেক্ষ রচনা-রাবেয়া খাতুন সেই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন একাকী। ঠিক মহিলা হিসেবে তিনি কখনও বিবেচিত হননি। মহিলা লেখকদের কতারেও তার নাম উচ্চারণ হয়নি কখনও। নারী লেখক হিসেবে বিভাজনের সীমানা তৈরি করেননি। তাঁর লেখক জীবনের সূচনাপর্বেরই সহযাত্রী ছিলেন শামসুদ্দিন আবুল কালাম, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আহসান হাবীব, কাইয়ুম চৌধুরী, মির্জা আবদুল হাই, সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়হান প্রমুখ যশস্বী ও কৃতিমনা লেখকেরা।[২]

রাবেয়া খাতুনের বিপুল, অজস্র বহুমুখী রচনাসম্ভাবের সামনে দাঁড়ালে বিস্মিত হতে হয়। কান্তিহীন, নিরন্তর তিনি সৃষ্টি সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। প্রতিদিন তিনি অফিস করার মত রুটিন বেঁধে লেখার কাজ করে থাকেন। এই নিষ্ঠা বাঙালি লেখকদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না। আপন ঘোরে, নিজস্ব বলয়ে বৃত্তাবদ্ধ অসাধারণ এই লেখক এখনো আধুনিকতম সৃজনশীলতায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

বদরুন্নেসা আহমদ (১৯২৭-১৯৭৪ খ্রি.):

আধুনিক যুগে নারী শিক্ষা প্রসারকল্পে যাদের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তন্মধ্যে বদরুন্নেসা অন্যতম। তিনি ১৯২৭ সনের ৩ মার্চ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে যতোদূর জানা যায়, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সনে এম.এড এবং ১৯৬৩ সনে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। পচাশের দশকের শুরুতে আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হয়। ১৯৫৪-১৯৫৮ সন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৯-১৯২৭ সনে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির সভানেত্রী ছিলেন।[১] পরে ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখেন। ১৯৫৪ সনে ৯৪(ক) ধারার শাসনামলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে কারাবরণ করেন। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পাক সামরিক জান্তার নৃশংসতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপক জনমত গঠন করেন। আওয়ামীলীগের মনোনয়নে ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ বছর ৩ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এতে শিক্ষা বিস্তারমূলক অনেক কাজ করা তাঁর জন্যে সহজ হয়। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত কথা স্মরণ রাখার নিমিত্তে তাঁর নামানুসারে ঢাকাস্থ বকশীবাজার মহিলা কলেজের নামকরণ করা হয় বদরুন্নেসা কলেজ। আজও কলেজটি নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রত্যেক বছর হাজার হাজার ছাত্রী ইন্টারমিডিয়েট, অনার্স ও মাস্টার্স করে নারী শিক্ষার পথকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে। পরিশেষে তিনি ১৯৭৪ এর ২৫ মার্চ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।[২]

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-১৯৭৯):

আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে যে সমস্ত মহিয়সী অবদান রেখেছেন, তন্মধ্যে মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার নাম অবিস্মরণীয়। তিনি ১৯০৬ সনের ১৬ ডিসেম্বর পাবনাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস হচ্ছে কুষ্টিয়া জেলার নিয়ামত বাড়ি গ্রামে। তিনি মূলত কবি ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সে সময়ের ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর মুহাম্মদ সোলায়মান। পিতার চাকরিতে বদলী হওয়ার কারণে তিনি রাজশাহী মিশন স্কুল, বরিশাল ও পাবনায় শিক্ষা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, রাজশাহীতে তাঁর গৃহ শিক্ষক ছিলেন 'আনোয়ারা' উপন্যাসের লেখক মুহাম্মদ নজিবর রহমান। ১৯২৮ সনে 'হাইজিনে' ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। রন্ধন প্রণালীতে 'লেডি কারমাইপকেল ডিপ্লোমা' পাস করেন। অল্প বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে পরিচিতি লাভ করে।[৩]

---

১. বাংলা একাডেমি লেখক অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ২৪৩

২. ঐ, পৃ. ২৪৪

৩. সোনিয়া নিশাত আমিন, বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০২, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ পশারিনী (১৩৩৮), মন ও মৃত্তিকা (১৩৬৭) এবং অরণ্যের সুর (১৯৬৬), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কলিকাতার এলবার্ট হলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'ডক্টর অফ লিটারেচার' উপাধি দেয়া উপলক্ষে যশোর সাহিত্য সংঘ কর্তৃক যে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল, সে অনুষ্ঠানে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া ১৯৩৭ সনে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনেও যোগদান করেন। তিনি ধার্মিক ও কলিকাতার পীর সাহেবের মুরীদ হওয়া সত্ত্বেও কুসংস্কার, পর্দা, অশিক্ষার বিরুদ্ধে চিরদিন প্রতিবাদ করেছেন। ছবি আঁকা ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। মুসলিম বাঙালি মহিলা কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম সনেট ও গদ্য ছন্দে কবিতা লিখেছেন।[১] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর 'পশারিণী' কাব্য গ্রন্থের পূর্বে আর কোন বাঙালি মুসলিম মহিলা কবির কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তিনি ১৯৬৭ সনে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৭৭ সনে একুশে পদক লাভ করেন। আজীবন কুমারী ছিলেন। তিনি ১৯৭৯ সনের ২ মে মৃত্যুবরণ করেন।[২]

শামসুন নাহার মাহমুদ (জন্ম ১৯০৮-১৯৬৪):

আধুনিক যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও এদেশের যে ক'জন মহিলা সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁদের অন্যতম। তিনি ১৯০৮ সনে নোয়াখালী জেলার ফেনী থানার অন্তর্গত গুথুমা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও সাংস্কৃতিবান মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তিনি একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ছিলেন। ছয়মাস বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজের চট্টগ্রামের বাড়িতে শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। শিক্ষা জীবনের সূচনা চট্টগ্রাম শহরে ড. খাস্তগীর স্কুলে। ১৯২৬ সনে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। অতঃপর ড. ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কলিকাতার ডায়োসিসন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৮ সনে আই.এ, ১৯৩২ সনে বি.এ এবং ১৯৪২ সনে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এম.এ পাস করেন। ১৯৪৪ সনে এম.বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৩ সনে ইষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদানের মধ্য দিয়ে চাকুরি জীবন শুরু করেন। তারপর কলিকাতা সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন, কলিকাতা লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ ও ঢাকা ইডেন কলেজে বাংলার অধ্যাপিকা হন।

অতঃপর বেগম রোকেয়ার সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (১৯১১) সম্মেলনে, ১৯৩৯ এর মহিলা শাখার সভানেত্রী ও ১৯৪১ সনে সমিতির পরবর্তী সম্মেলনে শিশু সাহিত্য শাখার সভানেত্রী হন। এছাড়া ১৯৪৮ সনে নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী, ১৯৫৮ সনে পূর্ব পাকিস্তান শিশু কল্যাণ পরিষদের সভানেত্রী ও ১৯৬২ সনে ঢাকা লেডিস ক্লাবের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিচরণ ছিল তাঁর। ১৯৬২-১৯৬৪ সন পর্যন্ত সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।[৪]

---

১. ঐ. পৃ. ২৭১

২. বাংলা একাডেমি লেখক অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

৩. বাংলা একাডেমি চরিতা অভিধান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য অঙ্গনেও তাঁর অবাধ বিচারণ ছিল। তিনি প্রচুর লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত সাহিত্য কর্ম হচ্ছে পূণ্যময়ী (১৯২৫) রোকেয়া জীবনী (১৯৩৭), বেগম মহল (১৯৩৮), শিশুর শিক্ষা (১৯৩৯), নজরুলের যেমন দেখেছি (১৯৫৮), ফুল বাগিচা, আমার দেখা তুরস্ক ইত্যাদি বড় ভাই হাবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে 'বুলবুল' (১৯৩৩), নামে চর্তুমাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এটি দ্বিতীয় বর্ষে (১৯৩৪),ত্রৈমাসিক ও তৃতীয় বর্ষে (১৯৩৬) মাসিক পত্রে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষা সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এসব গুণাবলীর জন্যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্নেহ ও আশীবাদ লাভ করেন। নজরুল কর্তৃক তাঁর 'সিন্ধু-হিল্লোহ' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থ 'বাহার-নাহার' এর নামে উৎসর্গ হয়। ১৯৪৬ সনের ১০ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।[১]

এভাবে তিনি সাহিত্য কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে নারী শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

ডা. জোহরা বেগম কাজী (১৯১২-১৬০৬)

আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার উন্নয়নে যে সকল মহিয়সী নারী অবদান রেখে গেছেন, তম্মধ্যে ডা. জোহরা বেগম কাজী এর অবদান অতুনীয়। বিশ শতকের ৫ সময়টাতে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত এবং সমাজের কাছে তাদের মূল্য নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর মতো, ঠিক সে সময়টাতে নারীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হলেন অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী। উপমাহদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী, ভারতের মধ্য প্রদেশের রাজনানগাঁও এ ১৯১২ সানের ১৫ অক্টোবর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডা. কাজী আব্দুস সাত্তারের জন্মস্থান বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার কালিকিনী থানার গোপালপুর গ্রামে।

অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী লেখাপড়া করেছে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে। ১৯২৬ সনে এসএসসি পাস করেন। পরে ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যায় হতে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। ১৯৩৫ সনে দিল্লীতে অবস্থিত লেডি হাডিং ফর ওম্যান মেডিক্যাল কলেজ হতে এমবিবিএস এ প্রথম স্থান পেয়ে অত্যন্ত সম্মানজনক পদক "ভাইস রয়াস" এ ভূষিত হন।[২]

অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী ডাক্তারী পেশায় ১৩ বছর কাটিয়েছেন অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা চলে আসেন। পরবর্তী সময় উচ্চ শিক্ষার জন্যে লন্ডনে স্কলারশীপ নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং চিকিৎসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী এফ.আর.সি.ও জি. লাভ করেন।

অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম বহুদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপালের গাইনোলজী বিভাগের প্রধান ও অনারারি প্রফেসর ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় সরকারি ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে সুনামের সাথে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালেও দায়িত্বপালন করেছেন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮
২. মেহেরুন্নেসা মেরী, অধ্যাপক, ডা. জোহরা বেগম কাজী, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ৩৮/৪, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-২০০১, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া নারী অধিকারের ক্ষেত্রে যে জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন, সে জোয়ারের ঢেউ এসে লেগেছিল বিশ শতকের গোটা কয়েক অভিজাত ঐতিহ্যবাহী প্রগতিশীল মুসলিম পরিবারে। অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী ঠিক তেমনি এক প্রগতিশীল সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধির উন্মেষের সাথে সাথে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এদেশের নারী জাতি নির্যাতিত হয়ে আসছে। তাদের চিরাচরিত নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে হলে বেরিয়ে আসেত হবে প্রচলিত গন্ডি থেকে। তিনি সমাজ সংস্কারের অস্ত্র হিসেবে ডাক্তারী পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন এবং সমাজের নিয়ম-কানুনের উপর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন নির্ভীকচিত্তে।[১]

সে যুগে ধারণা ছিল যে, নারীরা থাকবে পর্দার অন্তরালে। শুধু ঘর-সংসার করবে এবং সন্তান জন্মদানের পর তাদের মানুষ করার মাধ্যমে হিসেবে তাঁরা যাবতীয় কাজকর্ম করে যাবে। ডা. জোহরা বেগম কাজী ব্যতিক্রমধর্মী এক ব্যক্তিত্ব । তিনি ঠিকই রোঝে ছিলেন যদি প্রচলিত নিয়মের বাইরে না যাওয়া যায়, তাহলে নারীদের মুক্তি সম্ভব নয়। তাই চিকিৎসাক পিতার সাহচর্যে থেকে তিনি সবসময় চিন্তা করতেন যেখানে এত বড় বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠি রয়েছে, সেখানে একজন মহিলা ডাক্তার নেই। পুরুষরা যদি চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়ন করে জনকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে, তবে মহিলারা কোনো পারবে না? তাদের জ্ঞান, মেধা, বিদ্যা, বুদ্ধি তো পুরুষের তুলনায় কম নয়। মানব সেবা যদি পরম ধর্ম হয়ে থাকে। তবে নারীরা কেনো এ পরম ধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? বাবার আদর্শ জোহরা বেগম কাজীর মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে। যতো দিন যায় ততোই তিনি এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।[২]

১৯০৬ সনের এক জরিপের রিপোর্টে প্রকাশ , তৎকালীন বাংলাদেশে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ১৫১। তাদের মধ্যে কোন বাঙালি মহিলা চিকিৎসক ছিল না। ১৯০৬ সন (জরিপ পরবর্তী) থেকে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত কোন বাঙালি নারী চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সাহস পায়নি যদিও এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক নারী প্রতিভার উন্মেষ হয়েছে, বিকাশও হয়েছে।

অধ্যাপক ড. জোহরা বেগম কাজী ১৯৩৫ সনে প্রথম বাঙালি নারী হিসাবে এমবিবিএস এ প্রথম স্থান লাভ করে গৌরব অর্জন করেন। বাঙালির ইতিহাসে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ইতিহাসে সংযোজিত হলো এক সাহসী বাঙালি মহিলার নাম।

বাংলাদেশের চিকিৎসা অঙ্গনে ডা. জোহরা কাজী একটি নতুন ভূবন রচনা করেন। এদেশের স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা এবং অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী একসূত্রে গাঁথা। তিনি নিৎস্বার্থভাবে মানবকল্যাণে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে বিচরন করে সার্বজনীন হয়েছেন। তিনি সেবাধর্মের আদর্শের প্রতীক। এদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা ডাক্তার ও আদর্শবান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে এবং আগামী দিনের জন্যে খুবই মঙ্গলজনক। এভাবে তিনি নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্যে কাজ করেছেন।[৩]

---

১. ঐ.পৃ.৬
২. ঐ পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

বেগম সারা তৈফুর(১৮৯৩-১৯৯১):

১৮৯৩ সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতা দু'জনেই শিক্ষানুরাগী ছিলেন কিন্তু সমাজ ও পরিবেশের কারণ কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেননি। সারা তৈফুরের পিতা ছিলেন হোসেন নূর আহমেদ এবং মাতা বদরুন্নেসা বেগম শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের বড় বোন ছিলেন। প্রতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা তিনি সেই সময়ে পাননি। অতি বাল্য বয়সে তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে কিছু বাংলা শিখেছিলেন। তাঁদের বরিশালের বাড়িতে সে যুগের 'মহিলা বান্ধব' রামাবোধিনী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা আসত এবং সেগুলো ঘরে বসে তিনি খুব ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত পড়তেন। সারা তৈফুরের সাহিত্য অংঙ্গণে পদক্ষেপ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল।[১]

১৯১৪ সনে ঢাকার বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও গ্রন্থবার সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। জনাব তৈফুর স্ত্রীর মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন তাই স্ত্রীর প্রতিভা বিকাশে তাঁর সুদৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁর একমাত্র গ্রন্থ 'স্বর্গের জ্যোতি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সামাল এর জীবনী লিপিবব্ধ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এর আগে কোন মহিলা নবী জবিনী লেখেনি। সওগাত, বঙ্গীয় মুসলামন সাহিত্য পত্রকা ইত্যাদিতে তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রকার দ্বিতীয় সংখ্যায় বেগম সারা খাতুনের "ময়না" নামে একটি প্রকাশত হয়েছিল তাঁর পূর্ণ নাম ছিল বেগম হুরায়ুন্নিসা সারা খাতুন। তাঁর একমাত্র গ্রন্থ 'স্বার্গের জ্যোতি প্রকাশের পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। সারা তৈফুর ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলা যিনি রেডিওর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিশেষত অনুষ্ঠানগুলোকে চালু করেউজ্জীবিত রাখার জন্য স্ক্রিপ্ট লিখে ব্রডকাস্ট করতেন।[২]

আকিকুন্নেসা আহমদ (১৮৯৬-১৯৮২):

আকিকুন্নেসা ১৯৯৬ সালের ১ জানুয়ারি ময়মন সিংহ জেলার বার্নিস্বর্দি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলনা আহমেদ আলী আকালুবী। মাতা-হায়তুন্নেসা, বিখ্যাত লেখক, কলামিস্ট, আইনজীবি ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের স্ত্রী হচ্ছেন আকিকুন্নেসা।[৩] "আধুনিক স্ত্রী" ও "আধুনিক স্বামী" নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মাত্র দুটি গ্রন্থ রচনা করেও তিনি ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেত পেরেছেন। বেগম আকিকুন্নেসা নিজে একজন গৃহবধূ তিনি ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছেন। বেগম আকিকুন্নেসা নিজে একজন গৃহবধু হিসেবে সন্তানদের দেখাশুনা করা এবং সকল প্রকার সামাজিকতা বজায় রেখেও নারীদের প্রতি তাঁর নিজের কর্তব্যের প্রতি সজাগ ছিলেন। তাই তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে "আধুনিক স্ত্রী" (১৯৫৩) ও "আধুনিক স্বামী" (১৯৬২)গ্রন্থ দুটি রচনা করেন। ১৭ জনু ১৯৮২ সনে বেগম আকিকুন্নেসা আহমদ ইন্তেকাল করেন।

---

১. শত বছরের বাংলাদেশের নারী, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, পৃ. ১২-১৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

জেব-উন-নেসা জামাল (মৃ. ১৯৯৫)

জেব-উন-নেসা জামাল বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।১৯২৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর। বাবা মরহুম ডা. কাসির উদ্দীণ মা জিয়াউন নাহার তালুকদার। মা জিয়াউন নাহর সেই ব্রিটিশ আমল তেকে বাংলাদেশ হওয়া পর্যন্ত একটানা মিউনিসিপ্যালটির মহিলা কমিশনার ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে তারা একটি উচ্চবিত্ত পরিবার ছিল। ১৯৫৪ সালে বীরভূম জেলার সৈয়দ জামাল উদ্দীনের সঙ্গে জেব-উন-নেসা জামাল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিন বছর তিনি কণ্ঠশিল্পী হিসাবে বেতারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ গীত গ্রন্থ "সাগর তীর থেকে" । এছাড়াও রয়েছে গল্প গ্রন্থ হারানো দিনের গল্প।[১] জেব-উন-নেসা জামাল বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গণে গীতিকার হিসেবে পরিচিত। জেল-উন-নেসা জামাল লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন একেবারে ছোট বয়সে। তখন তিনি মাত্র ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়েন, আজাদ পত্রিকার 'মুকুলেল মহিফল' কলকাতা থেকে প্রকাশিত ছোটদের পত্রিকা জলছবি, শিশুসাথী রং মশাল প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তিনি কবিতাই বেশি লিখতেন। পঞ্চাশ ষাটের দশক থেকে গদ্য রচনা শুরু করেন। সেসব লেখা মাসিক মোহাম্মদী পত্রকায় ছাপা হত। তিনি একটি ইংরেজী বই অনুবাদ করেন। কিশোরদের উপযোগী এই বইটির নাম বেল সাহেবের টেলিফোন আবিস্কার। জেব-উন-নেসা জামাল একজন সঙ্গীত শিল্পীও ছিলেন। গায়িকা থেকে গীতিকার হওয়ার প্রেরণা আসে তাঁর মেয়ে জিনাত রেহানার জন্য। মেয়ের জন্য ১৯৬৬ সালে তিনি গান লিখতে শুরু করেন। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারের মত। "আমার গান" জেব-উন-নেসা জামালের প্রথম গীতি সংকলন। "আর্জি" নামে মরমী গানের কেটি সঙকরন ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আর একটি গানের বই "গান এলো মোর মনে"। এই প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার, লেকিখা ও টিভি ব্যক্তিত্ব জেব-উন-নেসা জামাল ৭০বছর বয়সে ১৯৯৫ সনে ১লা এপ্রিল ইন্তেকাল করেন।[২]

সৈয়দা মোহাহেরা বানু(১৯০৬-১৯৭৩):

সৈয়দা মোতাহেরা বানু ১৯০৬ সালে নভেম্বর মাসে বরিশাল জেলার পটুয়াখালীর বাসনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি সৈয়দা মোতাহেরা বানুর বিয়ে হয় ১৯১৯ সালের ১৪ই এপ্রিল, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের আপন ভাগ্নে আবু নাসের মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর সঙ্গে। পারিবারিক পরিমন্ডলে পিতা-মাতা, মাতামহ, স্বামী এবং স্বামীর বোন সারা তৈফুরের কাছ থেকে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হওয়ার অনুকূল প রিবেশ লাভ করেন। কবি সৈয়দা মোতাহেরা বানুর কাব্যচর্চা শুরু হয় তার বিয়ের পর থেকে। তবে লেখালেখির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পিতা সৈয়দ সাজ্জাদ মোজাফফরের কাছ থেকেই। 'সওগাত ১৩২৬ সংখ্যায়' খেলার সাথী নামে কবিতাটিই হচ্ছে তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত কবিতা । সেই মোতাহেরা বানু কবিতা লেখাশুরু করেন আর থামেননি। এর মধ্যে বাল্য বিধবা, প্রতীক্ষা, অধীরা ও চিরবাঞ্চিত অন্যতম।[৩]

---

১. সৈয়দা খালেদা জাহান জেব-উন-নেসা জামাল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১১-১৭
২. ঐ, পৃ. ১৭
৩. সাঈদা জামান, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০০, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

কবি মোতাহেরা বানুর কবিতাগুলো মোসলেম ভারত নামক মাসিক পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে আষাঢ় ১৩২৭, শ্রাবণ ১৩২৭, ভাদ্র ১৩২৭ ও আশ্বিন ১৩২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মোহাহেরা বানুর মত একজন বাল্য কুলবধুর পক্ষে এ কাব্যচর্চা খুবই কৃতিত্বের পরিচয়ক ছিল। সৈয়াদ মোতাহেরা বানুর জীবদ্দশায় তার কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবে তাঁর মৃত্যুর পর ড. আমলেন্দু দে'র সম্পাদনায় 'কাফেলা' নামে তাঁর একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়।[১] সৈয়দা মোহাবেরা বানুর কাব্যচর্চা দীর্ঘকালেল নয়। তাঁর কাব্যকাল মূলত আট-দশ বছরের। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন খুবই ধর্মভীরু। নিষ্ঠাবান নামাজি। তিনি পরলোক গমন করেন। ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ ঢাকার হলি ফ্যামেলি হাসপাতালে।

আখতারমহল সাঈদা খাতুন (১৯০১-১৯২১) :

আখতার মহল সাইদা খাতুনকেও এই সকল লেখকদের দলে স্থান দেয়া যায়। আখতার মহল সাঈদা খাতুন ১৯০১ সালে পূর্ব বাংলায় ফরিদপুর একটি ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ির বৌ এর বই পত্রে এবং লেখালেখিতে আসক্তি শ্বশুর বাড়ির লোকন ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু আখতার মহল গোপনে লিখে গেছেন। তিনি তার লেখা ট্রাংকের ভেতর তালাবদ্ধ করে রাখতেন। একদিন তাঁদের নোয়াখালীর বাড়িতে এসে স্বয়ং কবি নজরুল ইসলাম সেগুলো আবিস্কার করেন। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা নওরোজ ছদ্মনামে এবং সওগাতে স্বনামে প্রকাশিত হয়। মাত্র ২০ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যুতে তাঁর লেখক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর লেখা দুটি প্রবন্ধ এখণ পাওয়া যায়।[২]

ড. মাহিলা খাতুন(১৯২৮):

ড. মালিহা খাতুন ১৯২৮ সালের ২২ জুলাই পাবনা জেলায় জন্মগ্রহন করেন। ১৯৪০ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৭ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান ও ১৯৫৯ সালে দর্শনে এম.এ পাস করেন। ড. মালিকা খাতুন অনেক বই এর প্রণেতা মুলত তিনি নাট্যকার, উপন্যাসিক গল্পকার-প্রবন্ধকার ও কবি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ১৫টি। ১৯৭৭ সালে সাহিত্য বিনোদিনী পুরস্কার লাভ করেন। ড. মাহিহা খাতুনের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান উল্লেখযোগ্য। নারী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের যে কয়জন মহিলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি তাঁদের মধ্যে অনন্যা। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন রোকেয়া স্মরণ সমিতি। এই সমিতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
২. সোনিয়াত নিশাত আমীন, বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, পৃ. ১৬৯
৩. শত বছরের বাংলাদেশের নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদা খাতুন (জন্ম ১৯০৬):

মাহমুদা খাতুন সিদ্দীকা ১৯০৬ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। কবি মাহমুদা খাতুনের লেখাপড়া হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর বাড়িতেই। বিখ্যাত "আনোয়ারা" পুস্তক রচয়িতা মুজিবর রহমানকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের খুব বেশী সুযোগ হয়নি তার। তাঁর বারো বছর বয়সে "ইসলাম জ্যোতি" নামেতার প্রথম কবিতা ছাপা হয় আল-ইসলাম পত্রিকায়। মাহমুদা খাতুন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন। অপরিণত বয়সে পুতুল খেলার মত বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। সে কারনে তিনি আজীন কুমারীর মত জীবন কাটিয়েছেন। সওগাত এবং বেগম পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি নিয়মিত লেখেছন। মাহমুদা খাতুনের প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম "পসারিনী" ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য লেখা "মন ও মৃত্তিকা ও অরণ্যের সুর"। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ও পান্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাঁর কবিতার সংখ্যা প্রায় শতাধিক। কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[১]

রোমেনা আফজ (জন্ম ১৯২৬):

রোমেনা আফাজ মহিলাদের সাহিত্যচর্চার ভুবনে রহস্য সিরিজ লেখার একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী এবং বাংলা উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রচনা প্রাচুর্যে ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি সত্যিই একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। বিশেষ করে এদেশের কিশোর যুবক সকলেই তাঁর লেখার একনিষ্ঠ ভক্ত।

১৯২৬ সালে বগুড়ার শেরপুরে রোমেনা আফাজের জন্ম। তাঁর বাবা কাজেমুদ্দীন একজন পুলিশ ইনসপেক্টর ছিলেন। বাবার চাকরির সুবাদে তিনি বাবার সাথে অখন্ড ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছেন। রহস্য উপনঅস লেখার বিশেষ প্রেরণা পেয়েছেন, বাবা যেহেতু পুলিশে কাজ করতেন। পঞ্চাশ দশকের এই লেখিকার কথা লন্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা "Our Home' এর নিবন্ধে 'A brilliant Authoress' শিরোণামে তার সম্পকে্ একটি লেখা ছাপা হয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ডা. আফাজের সাথে তার বিয়ে হয়। পরবর্তীকালে স্বামী সহযোগিতা ও প্রেরণা তাঁকে সাহিত্য চর্চায় অধিকতর আগ্রহী করে তোলে। সাহিত্য রচনায় তিনি বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।[২]

মিসেস রাজিয়া মজিদ (জন্ম ১৯৩০):

মিসেস রাজিয়া মজিদ ১ জানুয়ারি ১৯৩০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪০ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর লেখিকা জীবন আরম্ভ হয়। বর্তমানে 'রোববার' 'ইত্তেফাক' 'বেগম' 'দৈনিক নিকিলাব' ও দৈনিক দিনকালে নিয়মিত লিখেছেন নিয়মতি লিখেছেন। তিনি 'পেনশন' ছায়াছবির কাহিনীকার। টেলিভিশন ও রেডিও ন্যাটকার। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৯ সারে একুশে পদক ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রচুর ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। মিসেস রাজিয়া মজিদ এখনও নিয়মিত লিখেছেন।[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১০৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

কবি আজিজা এন মোহাম্মদ (মৃত্যু- ১৯৮৪):

কবি আজিজা এন মোহাম্মদের জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে কবি আজিজা কাব্যচর্চা করেছেন। তার বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নয় সন্তানের জননী আজিজা এন. মোহাম্মদ ১৯৮৪ সালের ৬ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। তৎকালীন সময় যে সকল মহিলারা শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরাই লেখার জন্য কলমও হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাই সাহিত্য ক্ষেত্রে তো অবশ্যই অন্যান্য ক্ষেত্রের মহিলারা বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করতে থাকে সংখ্যায় কম হলেও। এঁদের মধ্যে সাংবাদিকতায় নূরজাহান বেগম। 'বেগম' পত্রিকায়। নার্সিং এ তুবা খানম। সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ রাজিয়া খান, শিক্ষাবিদ মেহেরুন্নেসা ইসলাম জোহরা বেগম, জোবেদা খানম, আনোয়ারা ইসলাম মনসুর সহ আরও অনেক মহিলা ব্যক্তিত্ব যাদের ত্যাগ ও সীমাহীন চেষ্টায় বর্তমানের মুসলিম নারী সমাজ শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।[১]

খোদেজা খাতুন (১৯১৭-১৯৯০):

বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র খোদেজা খাতুন। তিনি ১৯১৭ সালের ১৫ই আগস্ট বগুড়া জেলার মন্ডল ধরণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাবিদ ও লেখিকা হিসেবে সমধিক পরিচিত। তিনি ১৯৩৩ সালে বগুড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল হতে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা ইডেন কলেজ হতে তিনি ১৯৩৫ সনে এইচএসসি এবং ১৯৩৭ সনে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪১ সনে কলিকাতা লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে বাংলার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর কলিকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন। অতঃপর ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজের অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ১৯৬০-৬৮ সন পর্যন্ত তিনি এখানে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ছিলেন। ১৯৬৮-৭১ পর্যন্ত রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বপালন করেন এবং ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা পদে নিয়োগ পান এবং একই বছর ১৫ আগস্ট এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭৭-৮৫ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের সভানেত্রী ছিলেন। সাহিত্য সাধনা করে তিনি ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেছেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হচ্ছে কাব্য গ্রন্থ বেদনার এ বালুচরে (১৯৬৩), গল্পগ্রন্থ শেষ প্রহরের আলো (১৯৬৯), একটি সুর একটি গান। কিশোর গল্পগ্রন্থ, রূপকথার রাজ্যে (১৯৬৩)। প্রবন্ধ গ্রন্থ-সাহিত্য ভাবনা, আমার দীর্ঘতম ভ্রমণ, রম্যরচনা, অরণ্য মঞ্জুরী (১৯৭১)। লোক সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ বগুড়ার লোক সাহিত্য (১৯৭০), সম্পাদিত গ্রন্থ শত পুষ্পা ১ম খণ্ড কবিতা সংকলন, ১৯৮৪, ২য় খণ্ড ছোট গল্প সংকলন (১৯৮৯), ৩য় খণ্ড প্রবন্ধ সংকলন (১৯৯০)।

শিক্ষাবিদ হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার (১৯৬৭) ও লেখিকা হিসেবে নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যা বিনোদনী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯০ সনে ৩ রা ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।[২]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

২. বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান, পৃ. ১৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

ফজিলাতুন নেসা (১৮৯৯-১৯৭৭):
আধুনিক যুগে নারী শিক্ষার অগ্রপথিক হিসেবে ফজিলাতুন্নেসার অবদান ব্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী। তিনি গণিত বিষয়ে এমএ পাস করেন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমণ করেন। তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য সেকালের কলিকাতার বেকার হোস্টেল, সওগাত অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মুসলিম ছাত্র সমাজ তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন দান করেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ সন পর্যন্ত ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১]

তিনি নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি সম্পর্কে 'শিখা' সওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্প রচনা করেছেন। তার লেখা রচনাগুলো হল 'মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' (সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪); 'নারী জীবনের আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' (শিখা ১৩৩৫); 'মুসলিম নারীর মুক্তি' (সওগাত, ভাদ্র-১৩৩৬)। তিনি ১৯৭৭ সনে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। এভাবেই নানা পর্যায়ে তিনি নারী শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতিতে অবদান রাখেন।[২]

এছাড়াও বাংলাদেশে এমন কিছু সংখ্যক মহিলা আছেন যারা আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে সরাসরি জড়িত। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে যেমন বিভিন্ন মহিলা মাদ্রাসা, কলেজ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে জ্ঞানার্জন করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন এবং ইসলামী বিষয়ে অধ্যাপনা, গবেষণাকর্ম, গ্রন্থাদি রচনার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত আছেন। তবে তাদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছেন। আর কিছু সংখ্যক আপন অবস্থানে থেকে ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে কাজ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, ড. সৈয়দা ফাতেমা সাদেক (জন্ম-১৯১৮ খ্রি.), ড. সাহেরা খাতুন (জন্ম-১৯৪০), প্রফেসর শামীমা আখতার (জন্ম-১৯৬১), ড. মাহবুবা রহমান (জন্ম-১৯৫৯ খ্রি.), ফেরদৌস আরা বুকল (জন্ম-১৯৬৪ খ্রি.), সাইয়েদা মুনিয়া বেগম (জন্ম-১৯৩৩), রাশিদা খাতুন (জন্ম-১৯৩৮), খন্দকার আয়শা খাতুন (জন্ম-১৯৫৪), নুরুন্নেসা সিদ্দিকা (জন্ম-১৯৫৭), শাহান আরা বেগম (জন্ম-১৯২৯ খ্রি.), সুফিয়া আহমদ (জন্ম-১৯৫০ খ্রি.) প্রমুখ অন্যতম।

---

১. বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান, পৃ. ৩৩৬

২. ঐ, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বিশ্বের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে বিদ্যাচর্চা ও নিরক্ষরতার অভিশাপ দূরীকরণে জ্ঞানের অন্বেষণে তিনি মহিমান্বিত করেছেন। রাসূল (স.) শিক্ষার ভীতকে শক্তিশালী ও কল্যাণকর করতে তিনি জাতিকে যথেষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। নিজে 'উম্মি' বা নিরক্ষার হয়েও শিক্ষা প্রসারে তার অনুপ্রেরণা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা নীতিমালা অনুপম ইসলামী শিক্ষাদর্শনরূপে গণ্য হয়েছে। কেননা তার মধ্যে প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বিচক্ষাণতা তথা দূরদৃষ্টিভঙ্গির কোন অভাব ছিল না। তিনি সরাসরি মহান আল্লাহর ছাত্র এবং আলল্লাহ সরাসরি তার শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন। আল্লাহর দেয়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষাণের ফলে রাসূল (স.) শিক্ষা ও জ্ঞান-গবেষণায় সর্বশীর্ষে আরোহন করেন। আল্লাহ বলেন: 'হে নবী আপনাকে আমি এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি যা আপনিও জানতেন না এবং আপনার পূর্বপুরুষও জানতো না'। (আল-কুরআন ৬:৯) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দক্ষতায় রাসূল (স.) এতই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে, শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষকরূপে তার আবির্ভাব হয়েছিল।

কুরআনের বাণীকে জাতির সামনে তুলে ধরে নিরক্ষরতা মূলে আঘাত হেনে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী করে তুলেন। কুরআনের বাণী উদ্বৃত্ত করে জানালেন: 'যাকে জ্ঞান-প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাকে মহাকল্যাণে ভূষিত করা হয়েছে।' (আল-কুরআন, ২:২৬৯)। তিনি কুরআন থেকে আরো আয়াত উদ্বৃত্ত করে শুনালেন: 'যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে আর যে জ্ঞান রাখে না তারা উভয় কি সমান হতে পারে'? (আল-কুরআন ৩৯:৯) অর্থাৎ যারা জ্ঞানী আর যারা মূর্খ তারা সম্মান-মর্যাদায় এক হতে পারে না জ্ঞানীর মর্যাদা অনেক বেশি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন: 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী আল্লাহ তাদের মর্যাদা সুউচ্চ করে দিবেন।' (আল-কুরআন ৫৮:১১) আল-কুরআনে যেমন জ্ঞান ও জ্ঞানের মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি রাসূল (স.) এর হাদিসেও আমরা দেখতে পাই 'জ্ঞানান্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরয হিসেবে বিবেচ্য।' রাসূলের (স.) এ হাদীসে তাঁর সুদূরপ্রসারী শিক্ষাদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কতই বিনির্মণের স্বপ্ন দেখেছিলেন আরবের সেই চরম অধঃপতিত ও বর্বর যুগে। তিনি জ্ঞানান্বেষণে বলেছেন: 'রাতের কিছু সময় জ্ঞানের অনুশীলন করা সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।' এভাবে রাসূলের অনেক হাদীস

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে যেসব হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গঠন, শিক্ষা ও জ্ঞানদক্ষতার উন্নয়ন।

মহানবী (স.) নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে শিক্ষা অনুপ্রেরণার পাশাপাশি কিছু বাস্তবমুখী ফলপ্রসূ কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। ব্যক্তির মাঝে শিক্ষানুরাগ সৃষ্টি ও সমাজে শিক্ষা অনুরাগী তৈরি করতে তিনি ইসলামের শিক্ষাদর্শন অনুসরণের তাগিদ দেন। তাঁর শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষা প্রেরণা পরিণত হয় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর আরব্য মরুভূমি পরিণত হয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐতিহাসিক সাফা পর্বতের পাদদেশে 'দারুল আরকাম' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন তিনি নিজেই। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটিই ইতিহাসের সর্বপ্রথম শিক্ষালয়। এভাবে মদিনার আবু উসামা বিন যুবায়ের (রা.) বাড়িতে একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) কে রাসূল (স.) এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। রাসূল (স.) দেয়া শিক্ষানীতি ও দর্শনের ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। হিজরতের পর প্রচুর সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষিত হলে তাদেরকে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-দক্ষতায় পারদর্শী করে তোলা হয়। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত এটিই সর্বপ্রথম শিক্ষালয়। মদিনায় দ্বিতীয় শিক্ষালয়টি হচ্ছে হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) এর ব্যক্তিগত বাসভবন। আনসারীর (রা.) এই ভবনে রাসূল (স.) দীর্ঘ আট মাস শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করেন। শিক্ষার আলো মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে রাসূল (স.) এভাবে আলোকিত মানুষকে নিয়ে আলোকিত সমাজ গড়ার দৃপ্ত শপথ নেন।

নারী শিক্ষার ব্যাপারটিও তিনি গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন এবং তৎকালীন আরবের তমসাচ্ছন্ন জাতিকে মুক্ত করতে আলোর পথ দেখাতে তিনি নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যুগে যুগে তার অনুসৃত শিক্ষানীতি অনুসরণ করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই, তার মধ্যে নারীরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। জীবন এবং সমাজ গঠনে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের সংমিশ্রণে বৈচিত্রময় এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলিম নারীরা ছিল অনুন্নত। মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ ভারত তথা বাংলার মুসলিম নারীদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান নাওয়াব ফয়জুন্নেসা ও বেগম রোকেয়া। তবে একথা সত্য যে, প্রথম দিকের নারী শিক্ষার ধারক ও বাহক ছিলেন পুরুষরা এবং পরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নারী শিক্ষার পথ আলোকিত করতে এগিয়ে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে দেখা যায়, শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক আগাগোড়াই বেশ নিবিড়। ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'আরবী শব্দ। এর আভিধানিক বাংলা প্রতিশব্দ হল 'আবৃত্তি করা' বা 'পাঠ করা'[১] শুধু ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থই নয় বরং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সাথেও লেখা-পড়ার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। হিব্রু শব্দ 'বাইবেল' অর্থ 'বই' ব্যাপক অর্থে 'জ্ঞান' বা 'শিক্ষা'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্মগ্রন্থগুলোর নামের সাথে শিক্ষার বা জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।

এখন প্রশ্ন দেখা যায় এযুগে আসলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা? বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রচলিত চরম নৈতিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হলে ইসলামী শিক্ষার যে কোন বিকল্প নেই একথা আজ আর অস্বীকারের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুরোটাই ধর্ম নির্ভর। সুতরাং মুসলমানদের জন্য ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষার চিন্তা অবান্তর। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম মনীষীগণ ধর্ম শিক্ষাকে প্রাধান্য দেবেন। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য অমুসলিম বরেণ্য শিক্ষাবিদ, মনীষী, শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা এ প্রসঙ্গে কি বলেন তা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা দরকার। বলাবাহুল্য তাঁদের অনেকেই শিক্ষার সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্ট্যানলি হল (Stanly Hall), জন মিল্টন (John Milton), এ্যলবার্ট স্কেজার (Albert Scezer), প্রফেসর হিম্যান এইচ হোম (Prof. Heman, H. Home), শিক্ষা বিজ্ঞানী রাস্ক (Rusk), নান (Nune), এমনকি বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক পেল্পটো (Plato) পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চাননি।

বিশিষ্ট শিক্ষা বিজ্ঞানী স্ট্যানলী হল (Stanly Hall) দ্ব্যর্থহীনভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে মত ব্যক্ত করে বলেন, If you teach their the three `R's, Reading, Writing and Arithmatic and do'nt teach the fourth `R' Religion, they are sure to become fifth `R' Rascal.[২] (শিক্ষার্থীকে শুধু পড়তে লিখতে আর অংক কষতে শিখালে, আর ধর্ম না শিখালে তারা দুষ্ট হয়ে পড়বেই।)

John Milton মনে করেন, Education is the harmonious development of body, mind and soul. (শরীর, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের নাম শিক্ষা।)

এই তিনের সুষম বিকাশ ঘটাতে হলে ধর্মকে বাদ দিয়ে যে সম্ভব নয় তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষা চিন্তাবিদ Albert Scezer তাঁর একটি গ্রন্থে শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, The kinds of progress are significant progress of knowledge and technology, progress in socialigation of man progress in spirituality.

---

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৩৩০

২. Albert Seezer-The Teachings of Reverence for life, London, P. 213

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই শেষ না করে এর সাথে তিনি যোগ করেন The last one is the most important. এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আর একটু এগিয়ে তিনি পরামর্শ রাখেন, Our age must achieve spirtual renewal. A new renaissence must come the renaissenece in which mankind descovered that ethical action is the supreem truth and the supreem utiliterieansm by which mankind will be liberated.[১]

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিজ্ঞানীদের এই সকল ধারণা ও মতামত শুধু তত্ত্ব হয়েই থাকেনি বরং বাস্তবে এর প্রতিফলন কিভাবে ঘটতে পারে সে ব্যাপারেও তাদের চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে কিভাবে ধর্মকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার পথ বাতলে দিয়েছেন রাস্ক (Rusk)[২] প্লেটো (Plato)[৩] প্রমুখ মনীষী।

এতো হল, সাধারণ ধর্মের কথা, যার সকল ক্ষেত্রে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল পর্যায়ে ইসলামের রয়েছে সমৃদ্ধ দিক-দর্শন। শিক্ষার ব্যাপারেও এর রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা। আর সেই ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে যে নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুতরাং দেশের আগামী নাগরিককে নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত রেখে সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলামী শিক্ষার অপরিহার্যতা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় আজকের শিশু-কিশোর আগামী প্রজন্মকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিম দেশগুলো ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইসলামী শিক্ষা কোন পর্যায়ে রয়েছে সে বিষয়টা বিবেচনার অবকাশ রাখে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়। এর মধ্যে ইসলামী দেশগুলো ছাড়া আমেরিকা, বৃটেন, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, ভারত প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল গীর্জাসংশিস্নষ্ট এবং প্রধানত রোমান ক্যাথোলিক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত। ধর্ম শিক্ষাদানের জন্যই এই স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই স্কুলগুলো উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। পাবলিক স্কুলগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও অঙ্গরাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বেসরকারি ও গীর্জা পরিচালিত স্কুলগুলোকে নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। তাদেরকে রাজ্যের শিক্ষার মান সংরক্ষণ করতে হয়, অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হয় ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়।[৪]

---

১. Ibid, P. 14

২. রাস্ক শিক্ষাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। (ক) শারীরিক শিক্ষা (খ) আধ্যাত্মিক শিক্ষা। আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে আবার চারটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে (১) মানবিক (২) নৈতিক (৩) চারুকলা ও (৪) ধর্ম।

৩. প্লেটো যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক তা হল আদর্শবাদ। তাঁর এই আদর্শবাদ শিক্ষা দেয় বস্তু জগতকে আয়ত্ব করতে। মানব জীবনের সারাংশ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিকাশের মাধ্যমে এর উৎকর্ষতা সাধনই আদর্শবাদী শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য।

৪. মো. সিদ্দিকুর রহমান ও মো. শাওকাত ফারুক, শিক্ষা ব্যবস্থা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বৃটেন বা যুক্তরাজ্যেও একই ভাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে ধর্মীয় দল বা গীর্জা পরিচালিতি স্কুলগুলো অর্থাভাবে শিক্ষার মান রক্ষার করতে অসমর্থ হয় স্কুলেগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা ও শিক্ষার উন্নত মান সংরক্ষণের জন্য তারা সরকারি অর্থ সাহায্যের দাবী জানাতে থাকে। ফলে ১৮৯০-১৯০০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৪০০ ধর্মীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে অর্থ সাহায্য দানের গুরুভার বহন করতে হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে উদারপন্থী রাজনৈতিক দল ধর্মীয় ও জাতীয় এই দ্বৈত বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একই প্রকার জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে আন্দোলন শুরু করে।[১]

একইভাবে থাইল্যান্ডে ও শ্রীলংকায় প্যাগোডা ভিত্তিক শিক্ষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে থাইল্যান্ডে সরকারি সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই প্যাগোডা ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে বলে জানা যায়।[২]

ভারতে ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা এদেশের সাথে তুলনীয়। মুসলমান ও হিন্দু ধর্মীয় দু'টি সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় দু'টি ধারাকে কখনও অস্বীকার করা যায়নি। এক আন্ত র্জাতিক সমীক্ষায় ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার এই অনিবার্য অবস্থাকে স্বীকার করে মন্তব্য করা হয়, Indian culture has evolved out of impact of there two main streams of the society. One of the most salient feature and the religious education during this period was co-ordination between secular and religious education. Also the religious and social leaders directed their attention to the esential unity and equaly of all religious creeds to infuse national intigration.[৩]

এটা হলো ভারতের বর্তমান শিক্ষার অবস্থা। অবিভক্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল পুরোপুরি ধর্মনির্ভর। সে আমলে শিক্ষাকে ইহকাল ও পরকালের প্রস্তুতি হিসেবে ধরে নেয়া হত। তখন ধর্ম প্রত্যেক শিক্ষার মূল হিসেবে কাজ করত। প্রতিটি মাদ্রসা ও মসজিদের সাথে মক্তব সংযুক্ত ছিল এবং প্রতিটি মসজিদে আলাদাভাবে ধর্ম ছাড়াও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত, যাতে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে বৈষয়িক শিক্ষাও হাত ধরাধরি করে চলতে পারে।[৪] মুসলিম শাসনের শেষাবধি শিক্ষার হালফিল এ রকমই ছিল। মুসলমানদের হাত থেকে রাজ ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার পর ইংরেজশাহী শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনে। আজকের বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা তারই অনিবার্য ফসল।

আরব বিশ্বে প্রায় প্রতিটি দেশেই ইসলামী শিক্ষার সুযোগ বেশ সম্প্রসারিত। বিশেষত সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষার মূল ভিত্তিই রচিত হয়েছে ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে।৫ সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা কার্যকর রয়েছে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
২. মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত মূল্যায়ন রিপোর্টি ২০০১। প্রকল্প কর্মীরা সরেজমিনে উক্ত দেশ দু'টির সফর করে গভীরভাবে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে এই রিপোর্টি তা উল্লেখ করেন।
৩. UNESCO-NIER Regional Programme for Educational Research. Asian study of curriculum, Tolyo 1970, P. 111
৪. Henry Holt & Company, New York, P. 393
৫. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, পঁচিশ বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর-১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

Edited : World Book of Encyclopaeda. (Jnited States, Vo!-3

Imam Ghazali : Ihay Ulum-al Din, Vol-I.

Abraham H. Maslow : Motivation and Personality, New York, 1970

Moinuddin Khan : Political of the Present Age: Capitalism, Comminism and what next, Baitush Sharf Islamic Research Centre, Chittagong, 1990.

Mausrica Bucaille : The Bible. The Quran and Science, American Trust Publication, Indianapolis- 1979

M.A. Kazi : The pursuit of scientific knowledge in Islam, Islamic Thought and Scientific Creativity, Vol-I, January-March, 1990.

Dr. Serajul Haque : Imam Ibn Taimiyah (R.) and His projects of Reform, 1987

Albert Seezer : The Teachings of Reverence for Life, London.

Syed Amir All : The Spirit of Islam, Delhi, Madras, Calcutta, 1947

Mohammad Ali : The Religion of islam, London, 1965

Prof. Kazi Ayub Ali : An Introduction to Islamic Culture.

Sir Mohammad Iqbal : The Reconstruction of Religions Thought in Islam, Lahore, Pakistan.

M.A. Sattar : Tarikh-I-Madrasah-I-Alia, Research Publication Section, Madrasah-t-Aliah, Dacca, 1957.

Edited : History of Muslim Education, Vol. II, Karachi, 1967.

Edited : The Islamic University Studies, Vol-I, No-I, June 1990, Kustia.

Edited : Islamic Culture Centre (Hydrabad Deccan) Vol. XII, 1993.

Muhammad Kutub : Islam and Women, Adhunik Prokashoni, Dhaka.

Abu Daud : Sunnan, (K.Tibb) B. Ruqai Qumn Mazid-O-Islami Kutub Khana, Deuband.

Baladhuri : Fathul Buidan, First Edition, Cairo

Allama Shibli : Siratunnabi (Urdu Tex), Azamgarh,1 375K

Mufti Amimul Ahsan : Tarikh-i-IIIm-I-I-Iadith, Mufti Manzil, Dacca.

Tuta Khalil : The Contribution of the Arabs to Education, New York, 1926

Edited : Encyclopedia of Religion and Eghics (Gold Ziher), Vol-V, Edinburgh.

Dr. Haniiduddin : History of Muslim Education, Bairut, 1954

P.K.Hitti : Hisory of the Arabs, Tenth Edition, London, 1970

Translited : Mishkat (K. Ilm) Chapter III, Mataba-i-Rashidia, Delhi, 1967

Maulana Muhammad Ali : The Religion of Islam: a Comprehensive Discussion of the sources, Principles and Practices of Islam. 1950

Johnson : E.D. and Harris: M.H. History of Libraries in the Western World, 3 Edn. Metuchen Scarecrow Press. 1976

K.N. Dikshit : Memories of the Archaeological Suvery of India, No.55

Dr. A. FT. Dani : Proceding of the Pakistan Conference, 1st Session, Karachi, 1951

Abdul Karim : Society History of Muslim in Bengali, Chittagong,- 1985

Dr. Md. Enamul Haq : A History of Sufism in Bengal, Dhaka, 1975

Dr. Md. Adbur Rahim : Social and Cultural History of Bengal, Karachi, 1963

Prof. Hasan Askari : Bengal-Past and Present Vol. Lxvii, Serial No. 130, 1988

Sayed Athar Abbas Rezvi : A History of Sufism in India, Vol-2, New Delhi, 1983

Arniya Kumar Banariee : West Bengal District Gazetters (Howrah), Calcutta, 1922

Rafiquddin Ahmad (ed.) : Islam in Bangladesh, Dhaka, 1983

Edited : JASB, Vol-18, P. 1922.

Mohar Ali : History of The Muslim of Bengal, Vol-I, Ryath, 1885

Edited : Islamic Culture, Vol-32, Hydrabad, 1958

Edited : JASB, 1860

Edited : Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1872

Edited : JASB, 1873

Dhaka University Institutional Repository

Edited : JASB. 1 878

ABM Shamsuddin Ahrnad : Bengal Under The early Ilyas Shahi Dynarti.

Edited : JASB. 1875

Edited : JASB. 1923

William Adam : Report on the state of Education in Bengal (1835—1838). Calcutta-I 941

S.M. Jaffar : Education in Muslim India. Delhi-1972

Abul Fazi : Ain-i-Akbri. Vol-TI, tr. Janet and Sarkar. Calcutta-1948

Jafar Sharif : islam in India or the Qanun-i-I slam, tr.GA Narklots (India Reprint). New Delhi-1972

M. L. Bhagi : Mediaval Indian Culture and Thought. Amballa Cantt-1965

A.K.M Yaqub Au : Education for Muslims Under the Bengal Sultanate. Islamic Studies, Vol-XXIV, No-4, Islamabad- 1985

K.A. Nazarni : Some Aspects of Religion and Politics in India During the Thirteenth Century, Aiigarh- 1961

W. Adam : Education Report, 1335-38, Calcutta-1911

A.R. Mallick : British Policy and Muslim Of l3engal, Dacca-1961

Muhammad Mohar Ali : The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities Chittagong: The Mehrab Publication, 1965

Sekandar Au Ibrahirny : An Introduction to Islamic Education in Bengaladesh, Dhaka, 1992

Sekadar Au Ibrahimy : Reports on Islamic Education and Madrasha. Education in Bengal, 1861-1977, Dhaka, If. B. 1987. Vol-4

Dr. James Wise : Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 18g3

Prem Sunder Bush : ed—Keshab Chandra Sen in England 3, edn. Calcutta, 1983

M. Azizul 1-laque : History and Problems of Muslim Education in Bengal, (Calcutta-I 971)

J.S. Brubacher : A History of the problems of Education. NY-1947

Edited : The Mussalman, Vol-V, June-9, 1911, No. 26

Edited : The Mussalman, Vol-V. June-9, 1911, No. 26

Edited : The Mussalman, Vol-IX, March-23. 1917, No. 7

Edited : The Mussalman, VoI-XXII, T. W. Edition, Vol-I V. September 20, 1928. No. 108

Edited : The Mussalman, Vol-XXVI, T.W. Edition, Vol-February, 16, 1932

Edited : The Mussalman, Vol-XXVI. T.W. Edition, Vol-VIII. 14 January, 1932, No. 6

Edited : The Mussaiman, Vol-Xi, 23 March. 1917. No. 17

A.R.M. Nilam : Education of Muslim Girls. Lahore-1916

Edited : The Mussiman, Vol-XXVI: Daily Edition Vol-1. 1 December, 1932, No. 131

Edited : The Musslman. Amrita Bazar. Patrika, The Statesman, Advance.

Edited : The Mussalman, Vol-VVV, T.W. Falitio, Vol-VU. 5 March. 1931, No.20

Edited : The Amrita Bazar. Saturay, 10 December, 1932

Edited : The Musslman, 10 December, 1932

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদকবৃন্দ : আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

শফিউল আলম, মমতাজ জাহান ও অন্যান্য সম্পাদিত : শিক্ষাকোষ, সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোং অপারেশন (এসডিসি), কানপানিয়ান অব এডুকেশন, প্রজেক্ট, ঢাকা-২০০৩

মুহিউদ্দীন আহমদ : বয়স্ক শিক্ষা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকাঃ ১৯৭৩

মো. সিদ্দিকুর রহমান ও মোঃ শাওকাত ফারুক : শিক্ষা ব্যবস্থা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৯৮

হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সুচিপত্র প্রকাশন, ঢাকা-২০০২

ড. কাজী সাহাবুদ্দিন ও অন্যান্য সম্পাদিত : বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা-২০০৩

ড. মোঃ ময়নুল হক : ইসলামঃ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ, ঢাকা-২০০৩

গুলশান আরা : বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা, ঢাক-২০০৩

বাসন্তি সাহা : ২০০৬ এ বাংলাদেশের নারীঃ কিন্তু বাস্তবতা কিছু প্রত্যাশা, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত (ঢাকঃ ১৪৭তম সংখ্যা ১৩ মে-২০০৬)

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, খায়রুন প্রকাশনী ঢাকা-১৯৯৫

হোসেন আরা শাহেদ সম্পাদিত : বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সূচীপত্র প্রকাশনী, ঢাক-১৯৫৫

গাজী শাসমসুর রহমান : মানবাধিকার ভাষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৪

কে.আলী : মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯)

মুজিবুর রহমান (এডভোকেট) : ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব' বাংলাদেশ সৌদী আরব শাশ্বত ভ্রাতৃত্ব সংকলন- ১৯৯১, বাংলাদেশ সৌদি আরব ভ্রাতৃত্ব সমিতি।

আমিনুল ইসলাম : মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, ঢাকা-১৯৯৫

রশীদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ঢাকা-১৯৮০

আব্দুর রহীম : আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শঃ খায়রুন প্রকাশানী, ঢাকা-১৯৮০

আমিনুল ইসলাম : মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, নওরোজ কিতাবিস্তান-১৯৯১

কাজী দীন মুহাম্মদ : মানব জীবন (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-১৯৮৭)

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী(রহ.) : বোখারী শরীফ (১ম খন্ড), হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬

ইমাম গাযালী (রহ.) (অনু. এম,এন, এম ইমদাদুল্লাহ) : এহইয়াই উলূমুদ্দীন' (১ম খন্ড), (নরসিংদী-১৯৯৫)

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) মাওলানা আশরাফ আলী, থানভী চিশতী (রহ.) : :বোখারী শরীফ (১ম খন্ড), হামিদিয়অ লাইব্রেরী লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬

অনু. মাওলানা শামছুল হক (রহ.) : 'বেহেশতী জেওর' (১১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড), এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা-১৯৯০

ইমাম গায়ালী (রহ.) (অনু. মাওলানা মাজহার উদ্দীন) : 'মনহাজুল আবেদীন' আব্দুলাহ এন্ড ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৫

আবুল আলা মওদুদী : তাফহীমূল কুরআন, ১৯ খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮১

শহীদ অধ্যাপক আয়াতুলাহ মুর্তজা মোজাহারী : আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ, ঢাকা-ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতিক কেন্দ্র-১৯৮৪

সম্পাদিত : ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, পঁচিশ বর্ষঃ দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯৮৫

সামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইসহাক : শিক্ষা, সাহিত্য সংকৃতি, ইসলামি সংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম-১৯৮০

ড. আবু ইউছুফ

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ নেছার উদ্দিন : ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান (১৯৭১-১৯৯৯ খ্রী.) অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০২

অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম ছিফাতুল্লাহ : ইসলামী শিক্ষা: বন্ধ সংকোচন ও নিরসন' মাসিক দারুস সালাম, ৩য় বর্ষ, ২য় ৩য় সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০

মুসলিম ইবন আল হাজ্জাল আল-কুশায়রী : মুসলিম শরীফ, আল মাকতাবা রশিদিয়া, দিলী, ১৩৭৬ হিজরী

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী : মেশকাত শরীফ, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪, ২য় খন্ড।

ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল আশশায় বানী : আল-মুসনাদ, কায়রো: মাতবা'আ আশশারকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৭, ১ম খন্ড

মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ আল কুশায়রী : সহীহ মুসলিম, দিলী: আল-মাকতবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হিজরী, ২য় খন্ড।

ড. আবদুল ওয়াহিদ : বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১

আ.খা. আবদুল মান্নান : শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষানীতির মূলকথা, ঢাকা: তা.বি

মৌ. আবদুল রহমান : কুরআন ও জীবন দর্শন, ঢাকা-১৯৬৯

মোহাম্মদ আজিজুল হক : বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মুস্তফা নূর-উল ইসলাম অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, ঢাকা।

শেখ ফজলুর রহমান : সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় মনানবী (স.) সীরাতুল নবী (স.) স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

লুৎফর রহমান ফারুকী : হিজরতের পূর্বে কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র, মাসিক পৃথিবী, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৯, জুন ১৯৯২, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

ফজলুর রহমান আশরাফী : মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামিক নলেজ এন্ড ডায়েরী ১২ নভেম্বর ১৯৯৪, ঢাকা।

মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মোঃ সোহাব উদ্দীন : ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি, পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স, ৩০ আগষ্ট ১৯৯৬, ঢাকা।

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : নারী, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, দ্বিতীয়ত সংস্করণ ১৯৮৮

দেলওয়ার হোসাইন : ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, আল হেরা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯২, ঢাকা।

মাও. মুহাম্মদ আবদুর রশিদ : বিশ্বনবীর জীবনী, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা: ১৯৮৮

ড. মোঃ আতাহার আলী : শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলা একাডেমী,ম ঢাকা: ১৯৮৬

মোহাম্মদ সুরুল করিম : ইসলাম ও জীবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৭৫

ফজলুর রহমান খান : ইসলামের শিক্ষাব্যবস্থা ও বাংলাদেশ, ৪২/২, আজীমপুর, ঢাকা ১৯৯২

আলামা শিবলী নো'মানী অধ্যক্ষ : আল-ফারুক, অনুবাদ: মুহিউদ্দীন খান, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৮০

মুহাম্মদ আব্দুর রব ও এ.এস. এম : ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ঢাকা-১৯৯৯

ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান সম্পাদিত : মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ক্রমবিকাশ, রাজশাহী: সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড ১৯৮৯

পি.কে. হিট্টি : আরব জাতির ইতিহাস, কলিকাতা: মলিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯

অধ্যাপক মুহাম্মদ মোমিন উল্লাহ : শিক্ষার ইতিহাস,রহমান আর্ট প্রেস, ঢাকা-১৯৮০

মোহাম্মদী তাকী মেসবাহ : 'ইসলামে নারীর মর্যাদা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংকৃতিক কেন্দ্র ধানমন্ডি, ঢাকা-১৯৮৭

মো আজহার আলী : শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাবু বাজার, ঢাকা-১৯৭৫

মাহাম্মদ কুতুব : ইসলাম ও নারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৮

আলামা শিবলী : সিরাতুন্নবী (উর্দু টেক্সট), ২য় খন্ড, আজমগড়, ১৯৭৫ হিজরী)

মুফতী আমীমুল আহসান : তারিখুল ইলমুল হাদীস, মুফতি মঞ্জিল, ঢাকা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, (১ম খন্ড) প্রাচীন যুগ, কলকাতা-১৯৮১

ড. মুহম্মদ এনামুল হক : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা-১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ড. কাজী দীন মুহাম্মদ : বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশ: কিছু ভাবনা, অগ্রপথিক, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

ড. আবদুল করিম : বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম (অনু. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান) : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩

ড. আবদুল করিম : চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম-১৯৮০

ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ : আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যঃ, কলকাতা-১৯৩৫

ড. হাসান জামান : সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৮০

আবুল হাসান আলী নদভী : উপমহাদেশে প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা।

গোলাম হোসাইন তাবতাবাঈ : (অনু. হাজী মোস্তফা), সিয়ারুল মুতামাখ খিরীন, নৌলজিশার, লক্ষ্মৌ, কলিকাতা-১৭৮৯

করম আলী (অনু. জে, এন সরকার) : মুজাফফর নামা, কলিকাতা-১৯৫২

সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসংগ, ঢাকা: ১৯৭৬

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ঢাকা, ইফাবা-১৯৮৬

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ : ১ম খন্ড, ঢাকা ইফাবা-১৯৮৬

আব্দুল হক ফরিদী : মাদরাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ, ঢাকা: একাডেমী, ১৯৮৫

সেনিয়া নিশাত আমিন : নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খন্ড, সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩

প্রদীপ রায় : বিদ্যাসাগর, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, বুক ট্রাস্ট, কলকাতা-১৯৮৬

মালেকা বেগম, সৈয়দ আজিজুল হক : আমি নারী, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০৪

বিনয়ভূষণ রায় : অন্তপুরের শিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-১৯৯৮

গোলাম মুরশিদ : সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪

গোলাম মুরশিদ : সংকোচের বিহবলতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫

মালেকা বেগম : বাংলার নারী আন্দোলন, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮৯

গোলাম মুরশিদ : সংকোচর বিহবলতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫

বিনয় ভূষণ রায় : অন্ত:পুরের স্ত্রী শিক্ষা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-১৯৯৮

শ্রীনাথ চন্দ্র : ব্রাহ্ম সমাজে চলিশ বৎসর, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা-১৩৭৫

মোতাহার হোসেন সূফী : :বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮৬

স্বপন বসু : সমাজ সংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণী কলকাতা-২০০৩

তাহমিনা আলম : বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৯৮

ওয়াকিল আহমেদ : :সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৩-৮৪

মালেকা বেগম : সৈয়দ আজিজুল হক, আমি নারী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ. ২০০৪

আনিসুজ্জামান : বাঙালি নারী, সাহিত্য ও সমাজ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-২০০০

শাহীন আখতার : মৌসুমী ভৌমিক, জানালা মহফিল, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৮

শাহীদা আখতার : রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-বাংলা পিডিয়া, খন্ড-৯, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৪

আবদুল মান্নান সৈয়দ : বেগম রোকেয়া বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩

গোলাম মুরশিদ : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, বাংলা একাডেমী , ঢাকা-১৯৯৩

মজির উদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ নুরুল ইসলাম : সমাজসংস্কার ও নারীর ক্ষমতায়নে বেগম রোকেয়া, বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ, শিক্ষাবার্তা, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০০৩

মোরশেদ শফিউল হাসান : বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা-১৯৯৬

শহীদ ইকবাল : বেগম রোকেয়া সমাজচিন্তা-একটি বিশ্লেষণ, সংবাদ সাময়িকী, সংবাদ, ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর ২০০৩

মোতাহার হোসেন সুফী : বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৮৬

আব্দুল কাদির সম্পাদিত : রোকেয়া রচনাবলী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯

জিল্লুর রহমান সিদ্দীকী : বেগম রোকেয়াঃ নারী শিক্ষা, প্রণোদনা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯৭ইং

আব্দুল মালেক : বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম সাহিত্য পত্রিকা, একচল্লিশ পর্ব, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক-১৪০৪

মোরশদ শফিউল হাসান : বেগম রোকেয়াঃ সময় ও সাহিত্যঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২

রাশিদা জামান : বেগম রোকেয়ার পদ্মরাগ, সাহিত্য পত্রিকা, চলিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন-১৪০৩

মোরশদ শফিউল হাসান : বেগম রোকেয়া, সময় ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২

বন্দে আলী মিয়া : বেগম রোকেয়া, ছোটদের জীবনী গ্রন্থ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা-১৯৮৬

শামসুন নাহার মাহমুদ : রোকেয়া জীবনী, প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৬

শামসুন আলম : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৯

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার স্ত্রী শিক্ষা-১৮০০-১৮৫৬ (কলিকাতা, বাং-১৩৫৭)

মোশফেকা মাহমুদ : পত্রে রোকেয়া পরিচিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৬৫, ২১.০৫.২৯ তারিখের পত্র

ফকির আহমেদ : রোকেয়া জীবনী, সওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, (বাংলা ১৩৩৯)

আব্দুল মান্নান সৈয়দ : বেগম রোকেয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩, পরিশিষ্ট-৬

মোরশেদ সফিউল হাসান : বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২

আব্দুল মান্নান সৈয়দ : বেগম রোকেয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩

মিসেস আর এস হোসেন : সিসেম ফাঁক, সওগাত, ১ম বর্ষ, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন-১৩২৫(বাংলা)

ছৈয়দা রোকেয়া সুলতান : অন্ধকার যুগে আলো- রোকেয়া, সওগাত, মহিলা সংখ্যা, মহিলা, সংখ্যা অগ্রাহায়ন, ১৩৫২

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন : রোকেয়া পরিচিতি, সওগাত, (বৈশাখী বাং-১৩৮৫)

আনোয়ার বাহার চৌধুরী : বেগম রোকেয়াকে যেমন দেখেছি, সংবাদ, ২৪ অগ্রহায়ন, (বাং১৩৮৯)

রাশিদ আল ফারুকী : নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭

মজির উদ্দীন : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, দিদার পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা-১৯৬৭

মাসিক মোহাম্মদ : ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯

সিদ্দিকা মাহমুদা : এম ফাতেমা খানম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৯

বেগম জাহান আরা : বাঙলা সাহিত্যে লেখিকাদের অবদান, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৭

গোলাম কিবরিয়াত্র পিনু : :দৌলতননেছা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯

জওশন আরা রহমান : এক অজানা মেয়ের কথা, সংবাদ সমায়িকী, দৈনিক সংবাদ, ৩ জুন, ২০০৪

গোবিন্দলাল দাশ : গাইবান্ধার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, গাইবান্ধা ফাউন্ডেশন, গাইবান্ধা-১৯৯৪

এবনে গোলাম সামাদ : প্রসঙ্গ দৌলতননেছা খাতুন, দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, ঢাকা

শাহেদ আলী : দৌলতননেছা খাতুনঃ অন্তরঙ্গ আলোকে, দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ আগষ্ট, ১৯৯৭ ঢাকা।

মফিকুল হক : দৌলতননেছা খাতুন ইতিহাসের উপেক্ষিতা, অনন্যা বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৫, ঢাকা।

মালেকা বেগম : যৌতুক, পায়াট্ট, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৪

মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৬৭

গোলাম কিবরিয়া পিনু : দৌলতননেছা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯

বেগম রাজিয়া হোসাইন : জোবেদা খানম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯২

সাজে কামাল সম্পাদিত : সুফিয়া কামাল রচনাসংগ্রহ, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০২

Dhaka University Institutional Repository

কুররাতুল আইন তাহমিনা : শুভ জন্মদিন সুফিয়া কামাল, অবসর (৪২), ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২০ জুন, ১৯৯৮

আহমদ কবির : সুফিয়া কামাল, বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৪

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : জননী গরীয়সী, শুক্রবারের সাময়িকী, প্রথম আলো, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৯

আবুল মোমেন : সত্যপথের ধ্রুবতারা, শুক্রবারের সাময়িকী, প্রথম আলো, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৯

সনৎ কুমার সাহা : রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সম-অংশীদারিত্বঃ রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সংবাদ সাময়িকী, সংবাদ, ঢাকা ২৪ জুন, ২০০৪

গোলাম কিবরিয়া পিনু : সাক্ষাৎকার, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩

আনিসুজ্জামান : স্মরণ, নীলিমা ইব্রাহিম সাহিত্য গবেষণা, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩

বিশ্বজিৎ ঘোষ : নীলিমা ইব্রাহিমঃ জীবনকথা, নীলিম ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩

অধ্যাপক নজির উদ্দীন : বাংলা সাহিত্য মুসলিম মহিলা, দিদার পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৬৭

ভীষ্মদেব চৌধুরী : নীলিমা ইব্রাহিমের সাহিত্য গবেষণা, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩

শামসুজ্জামান খান : ড. নীলিমা ইব্রাহিম এবং মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৮৮

রফিকুল ইসলাম : অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিমঃ এক অনন্যসাধারণ অকুতোভয় বিদুষী, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৭৩

রিশিত খান : যে মহীয়সীর মৃত্যু নেই, নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশের অধ্যয়ন কেন্দ্র, ঢাকা-২০০৩

সোনিয়া নিশাত আমিন : বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০২

মেহেরুন্নেসা মেরী : অধ্যাপক, ডা. জোহরা বেগম কাজী, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ৩৮/৪, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-২০০১

সৈয়দা খালেদা জাহান : জেব-উন-নেসা জামাল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৯

সাঈদা জামান : সৈয়দ মোতাহেরা বানু, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০